মন্দিরময় ভারত

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

(নাগর)

অপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পরম সাধক গুরুপ্রতীম জিতেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তির অর্ঘ্য।

শুভ মহালয়া
১৯শে আশ্বিন ১৩৭১ বঙ্গাব্দ—

শ্রীঅপূর্বরতন ভাদুড়ী

ভূমিকা

শ্রীঅপূর্বরতন ভাদুড়ী গত দশ বছর একান্ত পরিশ্রমে ভারত স্থাপত্য-শিল্পের (সচিত্র) ইতিহাস তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ করেছেন সেজন্য সমগ্র জাতির ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য।

"মন্দিরময় ভারত"-এর চার খণ্ড "দ্বীপময় ভারত" (অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) অনুকরণে শেষ করলে আমরা সুখী হব কারণ ভারতের শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী প্রভাব দেখে এসেছি "Greater India" বা বৃহত্তর ভারত পরিক্রমায়।

ইতিমধ্যে তাঁর স্বদেশের পাঠক-পাঠিকারা মন দিয়ে পড়ুন—(১) প্রথম খণ্ড: দ্রাবিড় বেশর ও কাশ্মীরের রীতি অনুপাতে মন্দিরগুলি (২) দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ জৈন ও হিন্দু গুহামন্দির ও অজন্তা এলোরা বর্ণনায়-ভরা দ্বিতীয় খণ্ড এবং অধুনা নাগর-পদ্ধতিতে বিরচিত অন্য সব মন্দিরগুলি—(৩) তৃতীয় খণ্ড M. C. Sarkar প্রকাশনী থেকে ছাপা ও প্রকাশিত হচ্ছে। ভারত মাতার সুসন্তান ভাদুড়ী মহাশয়—কী একাগ্র নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা বলে এই জাতীয় পুস্তকমালা রচনা ও চিত্রিত করে গেছেন দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি ও সর্বান্তকরণে তাঁর সাধুবাদ করি। Ajanta Ellora Elephanta নাসিক বেদশা প্রভৃতি মন্দির ও গুহাগুলি পাঠে সবাই জ্ঞানলাভে কৃতার্থ হবেন ও তীর্থ ভ্রমণও সস্ত্রীক ভাদুড়ী মহাশয়ের সঙ্গে সার্থক হবে। অজন্তার বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি প্রভৃতির ছবি (Photo) দিয়ে লেখক সাধারণ পাঠকদের উপকৃত করেছেন। সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে চাই।

প্রথম খণ্ডে অর্জুনের তপস্যা ও গঙ্গাবতরণ ছবিখানিও উৎকৃষ্ট হয়েছে। তৃতীয় খণ্ড ছাপা শেষ করে মন্দিরময় ভারতের মন্দিরগুলির ছবি, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের দীপ্ত প্রকাশ দেখিয়ে ভাদুড়ী মহাশয় তাঁর "পিতৃতর্পণ" সার্থক করুন এই প্রার্থনা জানাই।

ভারত সভ্যতার ইতিহাস পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে হলে চাই তার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাস। সেটি সরল বাংলায় রচনা করে ভাদুড়ী মহাশয় তাঁর কর্তব্য সুসঙ্গতভাবে সম্পূর্ণ করেছেন। এবার তাঁকে অনুরোধ করি কালানুসারে ও দেশ ও সংস্কৃতি-ধারা অনুসরণ করে চার খণ্ড Index যোজনা করতে। তাহলে তাঁর পরিশ্রম সার্থক হবে ও সাধারণ পাঠকরাও বিশেষ উপকৃত হবেন। সেই Index রচনার সময় ভাদুড়ী মহাশয় শিল্পী-শ্রেষ্ঠ Ruskin-এর Seven Lamps of Architecture থেকে একটি করে স্মারক চিহ্ন যোজনা করতে পারেন যথা (১) Lamps of Sacrifice-হবন স্থাপত্য Vedic and Proto-Vedic যজ্ঞ বেদী চিতা ও চৈত্যাদি রেলিং প্রদক্ষিণা সমেত—

(২) Epic বা রামায়ণ-মহাভারত পুরাণাদি যুগের কুটির প্রাসাদ মতুগৃহাদি—Youth যুদ্ধে ব্যূহ-রচনার Plan সমেত, সত্য ও অহিংসা শান্তি পর্ব পর্যন্ত (Pre Mauryan Terra Cotta etc.)।

সূত্র-শাস্ত্র যুগের রচনা পরে ইতিহাস পুরাণাদি।

(৩) Power (মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থাপত্য)।

(৪) Beauty (অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ বাঁশ ও মাটি (Terra Cotta) থেকে কাঠ ও পাথরের গড়ন)।

(৫) Life (হিন্দু পারসিক এবং আরব ও তুর্কী জাতিদের দান)।

(৬) Memory শ্রুতি-স্মৃতির ধারা (পুরাণ ও তন্ত্রাদি) পাল-সেন ও বলভী।

(৭) Obedience বা ভক্তি (Siva-Vaisnava) উত্তর ও দক্ষিণ তথা মধ্যভারত 'Rajput School'।

এই সাতটি অধ্যায়-সূত্র ধরে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ইতিহাসও সংকলন করা যায় তার ইশারা দিয়ে গেছেন মনীষী John Ruskin—যাঁর Seven Lamps of Architecture আজও স্মরণীয় (জন্ম ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯—মৃত্যু ২০ জানুয়ারি ১৯০০)।

ভারতের ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ইতিহাস ভাদুড়ী মহাশয় সম্পূর্ণ করে সমগ্র জাতির ধন্যবাদ অর্জন করুন এই প্রার্থনা করি। শেষ খণ্ডটি "স্থাপত্যের

সপ্ত প্রদীপ” এইভাবে নামাঙ্কিত হলে আমরা সুখী হব। চিত্র-তালিকা ও মানচিত্রাদি শেষ খণ্ডে সবিস্তার বর্ণনায় সাহায্য করবে। যদি photo ও line blocks দিলে বইগুলির দাম বেড়ে যায় তবে wood blocks জুড়ে খরচ কমান যেতে পারে সেটাও স্মরণ করাতে চাই।

Tri colour blocks না ছেপে সস্তায় বহু বই (art blocks) ভাল ছাপা হয়েছে।

১৯শে আশ্বিন ১৩৭১ বঙ্গাব্দ — শ্রীকালিদাস নাগ

নিবেদন

মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, বাসস্থান দ্রাবিড় মনীষীর আর আর্য ঋষির।

ভারতের ধর্ম, ভারতের দর্শন, তার অধ্যাত্মবিদ্যা, তার আধ্যাত্মিকতাই অধিকার করে মুখ্য স্থান তার মন্দির নির্মাণে, গৌণ শৈল্পিক রূপদান। মূর্ত হয় মন্দিরের অঙ্গে প্রতিটি যুগের আধ্যাত্মিকতার সুষ্ঠু বিকাশ—এক অনুপ্রাণিত প্রকাশ ভারতবাসীর সহজাত সৌন্দর্য জ্ঞানেরও। তাই এক অনুপম শিল্পশৈলে পরিণত হয় ভারতের মন্দির— বাস্তব পরাজয় স্বীকার করে আধ্যাত্মিকতার কাছে। তাই এই বিশিষ্ট রূপ ভারতের স্থাপত্যের।

আছে ভারতের মন্দিরের বিভিন্ন পরিভাষাও, সর্বাধিক প্রচলিত তাদের মধ্যে বিমান আর প্রাসাদ।

বিভক্ত ভারতীয় মন্দিরের নির্মাণ-পদ্ধতি তিন ভাগে—শিল্প শাস্ত্রের অনুশাসনে—নাগর, বেশর ও দ্রাবিড়ে। তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন মনীষী ফারগুসানও ভারতের স্থাপত্যকে—ইণ্ডোএরিয়ান বা আর্যাবর্তে, চালুক্যে আর দ্রাবিড়ে।

দর্শিত হয়েছে এই গ্রন্থের মুখবন্ধে তাদের বিভিন্ন গঠনরূপ, সন্নিবদ্ধ হয়েছে দ্রাবিড় ও বেশর পদ্ধতিতে নির্মিত প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির বিবরণও। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে তাদের স্থাপত্যরূপ, তাদের প্রতিটির অঙ্গের সুন্দরতম আভরণ আর মহামহিমময় মূর্তির সম্ভার, তাদের ক্রমবিকাশ—অগ্রগতি প্রতিটি অংশেরও।

এই সমস্ত দেউল, বিমান আর মন্দির ছাড়াও, গড়ে ওঠে ভারতের বুকে এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্থাপত্য আর ভাস্কর্য। নির্মিত হয় গুহামন্দির শৈলমালার অঙ্গ কেটে। ভারত-সম্রাট মৌর্য অশোকই প্রথম নির্মাণ করেন জৈন আজীবিক সম্প্রদায়ের বাসের জন্য গুহামন্দির বুদ্ধগয়ার নিকট বরাবর ও নাগার্জুনী শৈলমালার অঙ্গে প্রকৃতির এক ভয়ঙ্কর নয়নাভিরাম পরিবেশে।

নির্মিত হয় কর্ণকৌপর আর সুদামা। তিনিই প্রবর্তন করেন প্রস্তরের ব্যবহার ভারতের স্থাপত্যে। শাশ্বত হয় ভারতের স্থাপত্য।

পশ্চিমঘাট শৈলমালার অঙ্গকেটেও বারশ গুহামন্দির নির্মিত হয়। ভূষিত হয় গুহামন্দির দিয়ে মহাপবিত্র খণ্ডগিরি আর উদয়গিরির অঙ্গও। শোভিত হয় গুহামন্দির দিয়ে শিরগুজা, বাদামি ও পবিত্র-আত্মা বিন্ধ্যর অঙ্গের বাঘও।

বুকে নিয়ে আছে তারাও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কত মহাঅভিজ্ঞ বৌদ্ধ, হিন্দু আর জৈন স্থপতির আর ভাস্করের, শ্রেষ্ঠ-দান—দান কত বহুশত বৎসরের অক্লান্ত সাধনার ও কামনার। অলঙ্কৃত করেন তাদের সর্বাঙ্গ ঢেলে দিয়ে হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্য, উজাড় করে দিয়ে মনের অপরিসীম মাধুর্য।

ভূষিত করেন মহাপারদর্শী চিত্রশিল্পীও অনুপম চিত্রসম্ভার দিয়ে শিরগুজার, অজন্তার আর বাঘের গুহামন্দিরের প্রাচীরের গাত্র আর ছাদের অঙ্গ। রচিত হয় চিত্রে কত কাহিনীও—কাহিনী কত জাতকের, বুদ্ধের পূর্ব জন্মের, কাহিনী তাঁর জীবনের ঘটনাবলীরও। অঙ্কিত করেন কত দৃশ্যও—দৃশ্য কত প্রান্তরের, কত বন, উপবনের, কত রাজসভার, কত রাজ-নর্তকীর, কত শোভাযাত্রারও। মহাসমৃদ্ধশালী করেন তাদের কত পরম রূপবতী অপরূপ নারীমূর্তি দিয়ে। নারীকেই করেন মধ্যমণি মন্দিরের আভরণে। কেউ বিবসনা, কেউ স্বল্পবসনা, কেউ সূক্ষ্ম-পরিদৃশ্যমান বসনের অন্তরাল থেকে তাদের যৌবন-মদমত্ত পরিপুষ্ট পীনোন্নত বক্ষ। লীলায়িত তাদের গ্রীবা, আকর্ণ-বিস্তৃত তাদের নয়ন, মসৃণ তাদের কপোল আর গুরুভার তাদের নিতম্ব। পরিণত হয় গুহামন্দির এক স্বপ্নপুরীতে, এক রহস্যলোকে। রচিত হয় কত ইন্দ্রলোক, কত অমরাবতী শৈলমালার অন্তরতম প্রদেশে, প্রকৃতির সুন্দরতম লীলানিকেতনে। লাভ করেন ভারতের স্থপতি, ভারতের ভাস্কর আর চিত্রশিল্পী শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের, ভাস্কর্যের আর চিত্রশিল্পের দরবারে-চিরস্মরণীয় হন।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত আমার প্রথম রচনা "মন্দিরময় ভারত" প্রথম ভাগে বর্ণিত হয়েছে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দ্রাবিড়, বেশর ও কাশ্মীর পদ্ধতিতে নির্মিত সমস্ত প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি। সন্নিবদ্ধ হয়েছে দ্বিতীয় ভাগে প্রায় সমস্ত গুহা মন্দিরের বিবরণ, অনুরূপ পদ্ধতিতে।

অধুনা প্রকাশিত "মন্দিরময় ভারত" তৃতীয় ভাগে লিপিবদ্ধ হয়েছে নাগর পদ্ধতিতে নির্মিত সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরের বিষয়—সমাপ্ত হবে আমার মন্দিরময় ভারতের রচনাও, হবে এক গবেষণাও—পরিসমাপ্তি হবে ভারত পরিক্রমার।

বাসনা আছে ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন কীর্তি সম্বন্ধে এবং "ভারতে ইসলামের অবদান" নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়নেরও। ডঃ কালিদাস নাগ মহাশয়ের ইচ্ছানুযায়ী নামকরণ হবে এই চতুর্থ গ্রন্থের "স্থাপত্যের সপ্ত প্রদীপ"—তবেই সার্থক হবে আমার দুরূহ ও দুঃসাধ্য সংকল্প, সফল হবে আমার লেখনী ধারণ। পাঠকও অবগত হবেন কি অনবদ্য, সুন্দরতম, সূক্ষ্মতম অলঙ্করণে, জীবন্ত মূর্তিসম্ভারে আর অনুপম চিত্রসম্পদে অলঙ্কৃত হয়ে আছে এই মহাপুণ্যভূমি ভারতের ও বৃহত্তর ভারতের বুকের অগণিত বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য আর বিহার, হিন্দু মন্দির, জৈন তীর্থনগর, ইসলামের মসজিদ আর সমাধি মন্দির, বুকে নিয়ে কত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কত মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির আর মহাপারদর্শী ভাস্করের কত গৌরবময় যুগের, মহাসমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে পূর্ব গৌরবের ঐতিহ্যে।

চারিটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে প্রথম ভাগ অন্ধ্রদেশ, দ্রাবিড় স্থান, চালুক্যভূম আর করকোটা ও উৎপল রাষ্ট্রে। আছে প্রথম অধ্যায়ে অন্ধ্রদেশে সীমাচলমের মন্দির ও সর্পভয়মের মন্দির। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রাবিড় স্থানে আছে কাপালির মন্দির, পার্থসারথির মন্দির, একাম্বরনাথের মন্দির, কৈলাশনাথের মন্দির, বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দির, বালাজীভেঙ্কটেশের মন্দির, ধর্মরাজের মন্দির, জলশয়ানের মন্দির, বৃহদীশ্বরের মন্দির, সুব্রমনিয়ামের মন্দির, শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথমের মন্দির, জম্বুকেশ্বরের মন্দির, কন্যাকুমারীর মন্দির, সুচিন্দ্রমের মন্দির, পদ্মনাভনের মন্দির, মীণাক্ষী মন্দির, রামলিঙ্গেশ্বরমের মন্দির, শঙ্করাচার্যের মন্দির। শেষ পরিচ্ছেদে দ্রাবিড় স্থাপত্যের ধারা। তৃতীয় অধ্যায়ে চালুক্যভূমে বর্ণিত হয়েছে নববৃন্দাবন, কেশবের মন্দির, হোয়সলেশ্বরের মন্দির, কেদারেশ্বরের মন্দির, শেষ পরিচ্ছেদে চালুক্য স্থাপত্যের ধারা। চতুর্থ অধ্যায়ে করকোটা ও উৎপল রাষ্ট্রে সন্নিবদ্ধ হয়েছে রঘুনাথজীর মন্দির, শঙ্করাচার্যের মন্দির, অবন্তীশ্বরের মন্দির, সুগন্ধেশা প্রভৃতিদের মন্দির, শেষ পরিচ্ছেদে কাশ্মীর স্থাপত্যের ধারা।

ভাগ করা হয়েছে মন্দিরগুলিকে স্থাপত্য হিসাবে অন্ধ্র, দ্রাবিড়, চালুক্য, হোয়সল ও কাশ্মীর স্থাপত্যে। তাদের পরিচয়, তাদের সৌন্দর্য, তাদের অঙ্গের সুন্দরতম অলঙ্করণ আর মহিমময় মূর্তির সম্ভারের বিবরণ ছাড়াও বিবৃতি আছে সেই দেশের ইতিহাসের, ইতিহাস স্থাপত্যের আর স্থাপত্যের ধারার; আছে তাদের রীতিনীতি, জীবন যাত্রার বর্ণনা, পৌরাণিক কাহিনী। স্থাপত্যের ধারা ক্রমবিকাশ প্রতিটি স্থাপত্যের, বিষয়বস্তুর পরিপূরকও।

দ্বিতীয় ভাগেও তিনটি অধ্যায়ে গুহামন্দিরগুলি বিভক্ত হয়েছে—গুহামন্দির-দাক্ষিণাত্য, গুহামন্দির-কলিঙ্গ আর গুহামন্দির-মালব। বর্ণিত হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে নাসিকের পাণ্ডুলেনা চৈত্য, নহপন, গৌতমীপুত্র, শ্রীজ্ঞান বিহার, কার্লির চৈত্য, ভাজার চৈত্য ও বিহার, বিদিশার চৈত্য, কানেরির চৈত্য ও বিহার, যোগেশ্বরীর মন্দির, এলিফ্যাণ্টার গণেশ গুম্ফা, অজন্তার চৈত্য ও বিহার, ঔরঙ্গাবাদের চৈত্য ও বিহার, এলোরার বিশ্বকর্মা চৈত্য, দোতলা বিহার, কৈলাস শৈব মন্দির, দশাবতার বিষ্ণু মন্দির ও ইন্দ্রসভা জৈন মন্দির। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির হাতীগুম্ফা, রাণী গুম্ফা, অলোকাপুরী গুম্ফা, অনন্ত গুম্ফা, এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বাঘের গৃহ, পাণ্ডব কি গুম্ফা, হাতীখানা, রঙমহল ও গুহামন্দির নির্মাণ স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশ বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগেও রচিত হয়েছে প্রতিটি গুহামন্দিরের বিবরণ প্রাচীন ঐতিহ্যের ও স্থাপত্যরীতির ভিত্তির উপর, হয়েছে তাদের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্প সৌন্দর্যও, তাদের ইতিহাস, তাদের পুরাতত্ত্ব, তাদের শৈল্পিকরূপ। ইতিহাস দেশেরও পৌরাণিক যুগ থেকে সুরু করে। সন্নিবদ্ধ হয়েছে তাদের সম্মুখভাগের, প্রবেশ পথের, ছাদের আর স্তম্ভের অঙ্গের সুন্দরতম শিল্পসম্ভার আর জীবন্ত মূর্তিসম্ভারের আর চিত্রসম্ভারের বিস্তৃত বিবরণ, বর্ণিত হয়েছে বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন মূর্তিতত্ত্ব ও ধর্মমতবাদ, জাতকের গল্প, বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলীর কাহিনী, কাহিনী পুরাণেরও। স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশে বর্ণিত হয়েছে বিস্তৃত বিবরণ প্রতিটি যুগের গুহামন্দিরের ঐতিহাসিক পটভূমিতে, তাই ক্রমবিকাশ পরিবর্ধক বিষয়বস্তুর।

মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, মহাসৌন্দর্যের নিকেতন বুকে নিয়ে আছে তার

পথ, প্রান্তর, বন, উপবন, গভীর অরণ্য, শৈলমালা, পর্বত কন্দর, গিরিসঙ্কট আর গিরিশৃঙ্গ, কত নয়নাভিরাম পরিবেশ, কত সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন। বুকে নিয়ে আছে কত কলনাদিনী স্রোতস্বিনী, নৃত্যচপল নির্ঝর, মহামহিমময় জলপ্রপাতও, কত রহস্যলোক আর কত স্বপ্নপুরী। এই পবিত্র পথ দিয়েই পরিক্রমণ করতেন কত হিন্দু সন্ন্যাসী, কত বৌদ্ধ শ্রমণ আর জৈন তীর্থঙ্কর, রণিত হত তার প্রতিটি ধূলিকণা, কত সাধু মহাত্মার, কত শুদ্ধসত্ত্ব আত্মার চরণস্পর্শেও, তাঁরা তীর্থদর্শনে যেতেন। তাই এই তিন ভাগেই বর্ণিত হয়েছে ভ্রমণের মাধ্যমে যা কিছু দেখেছি সত্য, দেখেছি সুন্দর, দেখেছি অপরূপ—রূপ মহা ঐশ্বর্যশালী ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকৃতির।

সন্নিবদ্ধ হয়েছে দুই ভাগেই বহু আলোক চিত্র বহু মন্দিরের, বহু দৃশ্যের আর মূর্তিরও।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের মত মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ—তাদের স্থাপত্যরূপ, তাদের নির্মাণের তারিখ, তাদের অঙ্গের সুন্দরতম অলঙ্করণ আর মহামহিমময় মূর্তির সম্ভার ছাড়াও উল্লিখিত হয়েছে এই তৃতীয় ভাগে দেশের ইতিহাস প্রাকসিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা থেকে সুরু করে, ইতিহাস ভারতের সংস্কৃতির, কৃষ্টির, সাহিত্যের, ইতিহাস তার স্থাপত্যেরও।

লিপিবদ্ধ হয়েছে ইতিহাস প্রতিটি স্রষ্টা রাজবংশেরও। সন্নিবদ্ধ হয়েছে প্রায় সারা ভারতের ইতিহাস। নইলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় ভারতের বুকের মন্দিরের বিবরণ। বর্ণিত হয়েছে তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও জীবন যাত্রার প্রণালী ও নাগর শিখরের ক্রমবিকাশ।

বিস্তৃত হয়ে আছে নাগর মন্দির ভারতের তিন চতুর্থাংশ ভূভাগ নিয়ে, তাই সীমাহীন তাদের সংখ্যা, বহু বিস্তৃত তাদের রূপও। বিস্তৃত হয়ে আছে তারা এক একটি অঞ্চল নিয়ে অঙ্গে নিয়ে আছে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। তাই ভাগ করা হয়েছে এই তৃতীয় ভাগ আটটি অঞ্চলে বা অধ্যায়ে—কলিঙ্গ, বঙ্গ, মধ্যদেশ, উত্তরাপথ, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য আর কামরূপে। সন্নিবদ্ধ হয়েছে প্রতিটি অঞ্চলের আনুমানিক মন্দির নির্মাণের কালও অধ্যায়ের প্রথমে। উল্লিখিত হয়েছে প্রথমে প্রতিটি অঞ্চলের ইতিহাস পৌরাণিক যুগ থেকে সুরু করে, তার পর সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও

বিস্তৃতি। বর্ণিত হয়েছে এই বিস্তৃতিতে বিষদ বিবরণ সেই অঞ্চলভুক্ত প্রতিটি মন্দিরের—তাদের স্থাপত্যরূপ, তাদের অঙ্গের সুন্দরতম অলঙ্করণ আর মহামহিমময় মূর্তিসম্ভার মূর্তিসম্ভার তাদের প্রবেশ পথের, তাদের প্রাচীরের গাত্রের, স্তম্ভের আর ছাদের অঙ্গেরও।

অন্তর্ভুক্ত হয় নাই যে সমস্ত মন্দির পরিচ্ছেদে, এই বিস্তৃতিই ক্রমবিকাশ সেই অঞ্চলের স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের। তাই প্রয়োজন হয় নাই প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের মত সেই স্থাপত্যের ধারা ও স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশ অন্তর্ভুক্ত করা প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে আর গ্রন্থের শেষে। বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থের শেষে শুধু নাগর শিখরের ক্রমবিকাশ, শিখরই মধ্যমণি নাগর মন্দিরের।

বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে প্রতিটি প্রসিদ্ধ মন্দিরের অঙ্গের অলঙ্করণ আর মূর্তিসম্ভার—তার স্তম্ভের অঙ্গের, প্রাচীরের গাত্রের আর ছাদের অঙ্গের—তার সর্বাঙ্গের। বিষদভাবে অঙ্কিত হয়েছে প্রাচীরের গাত্রের কয়েকটি চিত্রসারি আর মূর্তি · মূর্তি কয়েকটি সুরসুন্দরীর, অপ্সরার আর শালভঞ্জিকার—তারা অধিকার করে আছে এক বিশিষ্ট স্থান খাজুরাহোর মন্দিরের অলঙ্করণে। সামঞ্জস্য দেখান হয়েছে তাদের অবস্থানের সঙ্গে তাদের দেহের প্রতিটি ভঙ্গীর, তাদের অঙ্গের অলঙ্কারের সঙ্গে তাদের বসনের। বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে চারিটি বিদ্যাধরের মূর্তির আর একটি গণমূর্তির, নর ও সিংহের দৃশ্যের, সূর্য-ব্রহ্মা-শিবের মূর্তির ও আরও কয়েকটি মূর্তির-তারাও অধিকার করে আছে বিশিষ্ট স্থান খাজুরাহোর মন্দিরের আভরণে। দর্শিত হয়েছে তাদের নির্দিষ্ট স্থানও মন্দিরের গাত্রে।

অধিকার করে মিথুনের দৃশ্য এক বিশিষ্ট স্থান কলিঙ্গের কোণার্কের (কোণারকের) সূর্যমন্দিরের অলঙ্করণে আর খাজুরাহোর কয়েকটি মন্দিরের আভরণে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ মিথুনের দৃশ্য অঙ্গে নিয়ে আছে খাজুরাহোর মন্দিরের গাত্র। তাই অঙ্কিত হয়েছে এই গ্রন্থে খাজুরাহোর মন্দিরের কয়েকটি মিথুনের দৃশ্য, বর্ণিত হয়েছে মিথুনের দর্শনও।

খাজুরাহোর এই সমস্ত চিত্রসারির, মূর্তির ও দৃশ্যের রূপায়ণে আর কয়েকটি মন্দিরের স্থাপত্যরূপ রচনায় আমি সাহায্য গ্রহণ করেছি বিদুষী শ্রীমতী স্টেলা

ক্রামরিশ প্রণীত—"দি হিন্দু টেম্পল" (The Hindu Temple) নামক গ্রন্থের, তাই সীমাহীন আমার ঋণ তাঁর কাছে।

অধিকার করে আছে এক বিশিষ্ট স্থান পার্শ্বদেবতার মূর্তি, বামনের ও নৃসিংহের মূর্তি, মূর্তি ফণাযুক্ত নাগ আর নাগিনীরও কলিঙ্গের (উড়িষ্যার) মন্দিরের ভূষণেও। অপরূপ কোণার্কের সূর্যমন্দিরের অঙ্গের সঙ্গীতজ্ঞাদের মূর্তিগুলি আর যুদ্ধাশ্বের মূর্তিটি। বিষদ ভাবে অঙ্কিত হয়েছে তাদের চিত্রও মন্দিরের অলঙ্করণের বর্ণনায়। সাহায্য গ্রহণ করেছি M. M. Ganguly প্রণীত "Orissa and Her Remains—Ancient and Mediaeval" নামক গ্রন্থের তাদের রচনায়-তাই ঋণী আমি তাঁর কাছেও।

সর্বাধিক সাহায্য গ্রহণ করেছি আমি Percy Brown প্রণীত Indian Architecture নামক গ্রন্থের-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য, মন্দিরের গঠনরূপ আর তার অঙ্গের ভূষণের রূপায়ণে-অশেষ আমার ঋণ তাঁর কাছেও।

বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে বহু উপাখ্যান, কিংবদন্তী ও বহু পৌরাণিক কাহিনী যা রূপায়িত হয়ে আছে মূর্তি দিয়ে মন্দিরের গাত্রে।

আছে একুশখানি আলোক চিত্রও, পরিপূরক তারা মন্দিরের বর্ণনার—দর্শনেরও। আছে তাদের মধ্যে ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির, বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলা আর খাজুরাহোর কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দির। আলোক চিত্র আছে কোণার্কের সূর্যমন্দিরের, বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেবের আর ওশিয়ার হরিহরের মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রের, অর্বুদের (আবুপর্বতের) মণ্ডপের, মধেরার সূর্যমন্দিরের স্তম্ভের আর খাজুরাহোর মিথুনের ও সুরসুন্দরীর মূর্তির। অঙ্গে নিয়ে আছে প্রচ্ছদপট ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বরের মন্দির।

যে সমস্ত বই থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি এই গ্রন্থের রচনায় উল্লিখিত হয়েছে সেই সব গ্রন্থের নাম এই পুস্তকের শেষে। সন্নিবদ্ধ হয়েছে পরিভাষা এই গ্রন্থে লিখিত কয়েকটি শব্দের, হয়েছে নাগর মন্দিরের একটি মানচিত্র, নির্দেশিকা আর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত।

অপরিসীম আমার ঋণ বাংলার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ শ্রীকালিদাস নাগের কাছেও তাঁর অক্লান্ত প্রেরণার, নিরন্তর উৎসাহের আর অকুণ্ঠ

সাহায্যের এই গ্রন্থের ইতিহাস প্রণয়নে ও এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ তাঁর মূল্যবান ভূমিকা রচনার জন্য।

অশেষ আমার ঋণ রামকৃষ্ণ কালচার ইনস্টিটুটের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমলেন্দু মজুমদারের কাছেও। সর্বদা সাহায্য করেছেন তিনি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দিয়ে— নইলে সম্ভব হ'ত না এই গ্রন্থের প্রণয়ন, হ'ত না সহজ।

কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি খ্যাতিমান প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও সজনীকান্ত দাসকে এই গ্রন্থ রচনায় প্রেরণাদানের জন্য, জানাই অগ্রজপ্রতীম পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারকে তাঁর নিরন্তর অকৃত্রিম সাহায্যের জন্য, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীহুমায়ুন কবির, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ বিদ্বজ্জনকেও। কৃতজ্ঞতা জানাই সুসাহিত্যিক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়, শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়কে, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়কে, পরমাত্মীয় শ্রীঅমিয়গোপাল বাগচীকে, অগ্রজপ্রতীম শ্রীবিমলাকান্ত লাহিড়ীকে, বন্ধুবর শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে, সুকবি শ্রীনরেন দেবকে আর আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী উষা দেবীকে তাঁদের উৎসাহ দানের জন্য। শ্রীগোপালদাস মজুমদার সম্পাদিত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দ্বিতীয় ভাগে শেষ পরিচ্ছেদে স্থান লাভ করেছে এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ। প্রকাশিত হয়েছে এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ রচনা ভারতবর্ষ, বসুমতী ও মন্দিরা মাসিক পত্রে, অমৃতে ও মঞ্জরীর পূজা সংখ্যায়, কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের সম্পাদকদেরও, জানাই আমার দুই পুত্রবধূ মঞ্জুলিকা ও শুভশ্রী, কন্যা মন্দাকিনীকে আর তেজোকে। তাঁরা সাহায্য করেছেন এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে আর প্রুফ দর্শনে। অকুণ্ঠ আর অকৃত্রিম তাঁদের উৎসাহ দানও, তাই সহজ ও সম্ভব হয় এই গ্রন্থের সুষ্ঠু প্রকাশও। তবুও রয়ে গেছে কিছু ছাপার ভুল—১৮ পৃষ্ঠার, তৃতীয় প্যারায়, প্রথম লাইনে কাঁটির পরিবর্তে জঙ্ঘা হবে, সব শিখারা শিখর হবে, শিখারার শিখরের, শিখারায় শিখরে ও অঙ্গশিখারা অঙ্গশিখর হবে।

এই সব বৌদ্ধ চৈত্য আর বিহার বা সঙ্ঘারাম, হিন্দু আর জৈন মন্দিরগুলিই ছিল ভারতের ও বৃহত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র, শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল ছিল মহামিলনের। এই মহাভারতের এক অখণ্ড বিভিন্ন সভ্যতার, শিক্ষার আর কৃষ্টির, পরিণত হয়েছিল তার ধর্মের ও ইতিহাসের পাদপীঠে—ইতিহাস রাজনৈতিক, সামাজিক

রীতিনীতিরও, বুকে নিয়ে ছিল তার শাশ্বত কীর্তির নিদর্শন—প্রতীক হয়ে ছিল তার মহাগৌরবময় ঐতিহ্যের--ঐতিহ্যের সর্বযুগের। যদি প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের মত এই ভাগও পাঠক ও সুধী সমাজে আদৃত হয়, বাসনা জাগে তাঁদের অন্তকরণে মন্দির দর্শনের—সন্ধান লাভের সেই বিস্মৃত নিখিল ভারতীয় অবিচ্ছিন্ন মিলন সূত্রের, সেই মহাগৌরবময় ঐতিহ্যের, তবেই সফল হবে আমার মন্দিরময় ভারত রচনা—সার্থক হবে এই কঠোর ও অক্লান্ত পরিশ্রম।

শুভ মহালয়া : ১৯ আশ্বিন ১৩৭১ বঙ্গাব্দ
২৩।এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১৯

শ্রীঅপূর্বরতন ভাদুড়ী

সূচীপত্র

নাগর মন্দিরের অবস্থিতি
১৩ মার্তণ্ড
১১ মানালী
১১ বৈজনাথ
১৪ অমৃতসহর
তিব্বত
নেপাল
৮ বৃন্দাবন
মথুরা ৯
যোধপুর (ওসিয়া) ১৫
১০ জয়পুর
২৩ রাণকপুর
২৫ চিতোরগড়
আবু পর্বত ১৬
সিদ্ধাপুর ১৭
মোধেরা ১৮
২৪ উদয়পুর
দেওগড় ২৬
২৭ গোয়ালিয়র
১৮ খাজুরাহ
২৯ উদয়পুর (গোয়ালিয়র)
৭ বারাণসী
৬ বুদ্ধগয়া
বিষ্ণুপুর ৫
বরাকর ৪
১৯ গির্ণার
জুনাগড় ২০
ভদ্রাবল ২১
পালিতানা ২২
৩১ বম্বাই (অম্বরনাথ)
হানামকোণ্ডা ৩০
ভুবনেশ্বর ১
৩ কোনার্ক
২ পুরী
বঙ্গোপসাগর
আরবসাগর
রেল লাইন
রাস্তা

প্রথম অধ্যায়

কলিঙ্গ

(খ্রীষ্টাব্দ ৮০০—১২৫০)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভুবনেশ্বর

১। লিঙ্গরাজের মন্দির
২। অনন্তবাসুদেবের মন্দির
৩। পরশুরামেশ্বরের মন্দির
৪। মুক্তেশ্বরের মন্দির
৫। বৈতাল দেউল
৬। রাজারানীর মন্দির

বহু বছর আগে পুরী একস্প্রেসে চড়ে পুরী অভিমুখে রওনা হই। তখন নিদাঘতপ্ত কলিকাতা, অসুন্দর বাসের পক্ষে। ট্রেন থেকে নেমে, জিনিস-পত্র হোটেলে রেখে সমুদ্র সৈকতে উপনীত হই।

সেদিন আমার জীবনের পরম স্মরণীয় দিনের অন্যতম। সেই দিনই প্রথম সমুদ্র দেখি। দর্শন করি মহাপবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে বঙ্গোপসাগর।

দেখি উত্তাল তরঙ্গ বুকে নিয়ে, উন্মত্ত আবেগে সহস্র ফণা বিস্তার করে ছুটে আসেন সাগর। আসেন প্রচণ্ড গর্জনে। প্রতিহত হন কূলে। ছড়িয়ে পড়ে তাঁর শিকর লক্ষশত ধারায়। প্লাবিত হয় ধরিত্রীর বুক, সোহাগে আদরে, চুম্বনে আর শুভ্র কলহাস্যে। পর মুহূর্তেই পরিবর্তিত হয় তাঁর রূপ। আসেন তিনি বুকভরা স্নেহ নিয়ে, মন্থর তাঁর গতি, বুলিয়ে দেন স্নেহের স্পর্শ বসুন্ধরার অকলঙ্ক ললাটে, করেন আশীর্বাদও, ধন্য হয় বসুন্ধরা।

বিরামহীন এই মেলা, শাশ্বত, চিরন্তন, চলেছে লক্ষ কোটি বৎসর ধরে সাক্ষী তার, একমাত্র নীলাচলে মন্দিরে বিরাজিত, জগন্নাথ দেব, দারুরূপী ভগবান। তিনিই বলতে পারেন কবে হবে এর সমাপ্তি। দিক চক্রবালে মিশে যায় তার নীল সমুদ্র আর নীল আকাশ, হারিয়ে ফেলে তাদের পৃথক সত্তা।

উঠে আসে এক গতির তরঙ্গ সাগরের বুক থেকে, প্রতিফলিত হয় আমার সর্বাঙ্গে, প্রবেশ করে আমার শিরায় উপশিরায়। এক অদম্য তীব্র বাসনা

জাগে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে—ইচ্ছা হয় ঝাঁপিয়ে পড়তে সাগরের বুকে, বিলুপ্ত হতে সিন্ধুতে, মিশে যেতে তাঁর গতির তরঙ্গের সঙ্গে, এক হয়ে যেতে একেবারে। বাসনা জাগে তার সঙ্গে ভ্রমণ করতে নতুন নতুন দেশে—মিশরে, ইরাকে, ইরানে, তুরস্কে, ইউরোপে, আমেরিকায়, চীনে, জাপানে ও আরও কত দেশে, উপনীত হয়েছে যারা সভ্যতার শ্রেষ্ঠ শিখরে, প্রদীপ্ত যারা সংস্কৃতির আলোকে। মহিমান্বিত যারা কৃষ্টির দ্যুতিতে। উপনীত হতে দক্ষিণ আর উত্তর মেরুতেও। যেতে সেইসব দেশে, যা আজও হয়নি সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত, রয়েছে অর্ধাবিষ্কৃত আর অনাবিষ্কৃত অবস্থায়।

তার পরেও দেখেছি সমুদ্রকে—দেখেছি বঙ্গোপসাগরকে, আরবকেও দেখেছি। দেখেছি এই মহাভারতের প্রায় সবগুলি সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে—কলিঙ্গের, অন্ধ্রের, তামিলনাদের, চোলমণ্ডলের, কেরলের, বোম্বাইয়ের আর সৌরাষ্ট্রের। দেখেছি কন্যাকুমারীতে, তিন সমুদ্রের মিলন ক্ষেত্রে চঞ্চল বঙ্গোপসাগরকে উদ্দাম বেগে ছুটতে ছুটতে এসে সৌম্য আরবের বুকে মিশে যেতে। তার পর দু'জনের প্রশান্ত, গম্ভীর অচঞ্চল ভারতের বুকে আশ্রয় নিতে। এক হয়ে যেতে একেবারে। হারিয়ে ফেল্‌তে তাদের নিজস্ব রূপ।

দেখেছি সিন্ধুকে সহস্রবার—প্রত্যুষে শয্যায় শুয়ে থেকে দেখেছি, সকালে আর অপরাহ্নে তার সৈকতে বসে দেখেছি, দ্বিপ্রহরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে জানালায় দাঁড়িয়ে দেখেছি, গভীর রাত্রিতে ঘুম থেকে উঠে এসে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসেও দেখেছি।

দেখেছি তাঁকে শত শত রূপেও। কখন তিনি উদ্দাম গতিতে উত্তাল তরঙ্গ বুকে নিয়ে, অমিত বিক্রমে ধরিত্রীকে গ্রাস করবার জন্য ছুটে আসেন, লক্ষশত ফণা বিস্তার করে ঝাঁপিয়ে পড়েন তার বুকের উপর। কূলে প্রতিহত হয়ে ফিরে যান। আবার কখনও উন্মত্ত আবেগে, ছুটতে ছুটতে এসে, সহস্র বাহু বিস্তার করে তার কণ্ঠ বেষ্টন করেন। সোহাগে, আদরে, চুম্বনে আর শুভ্র কলহাস্যে প্লাবিত হয় তার ললাট। সহ্য করতে পারে না সে আবেগ বসুন্ধরা হাঁপিয়ে ওঠে, চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। লজ্জিত হয়ে ফিরে যান জননী সিন্ধু, যান নীরবে, সন্ত্রস্ত পদক্ষেপে, স্তব্ধ বুকে পড়ে থাকে ধরিত্রী। কখনও উদ্দাম গতিতে এসে, লক্ষশত ধারায় ঝাঁপিয়ে পড়েন শাসনের বেত্রদণ্ড

নিয়ে, আবার পর মুহূর্তেই বুকভরা স্নেহ নিয়ে এসে বুলিয়ে দেন স্নেহের স্পর্শ তার ললাটে, মুছে যায় শাসনের জ্বালা। কখনও তাকে আলিঙ্গন করেন বুকে নিয়ে লক্ষকোটি আলোর বিন্দু, নিভৃতে, নির্জনে, আলোয় আলোকিত হয় বসুন্ধরার বুক, প্রতিফলিত হয় সেই আলোকের দ্যুতি দিগন্তে। উদ্ভাসিত হয় দিগন্ত, প্রদীপ্ত হয়। কখনও তিনি মৌন, ধ্যান গম্ভীর। কখনও নিস্তব্ধ, নীরব, নিশ্চল, বিশ্রাম করেন দিগন্তের বুকে, স্থাপিত তাঁর পদ ধরিত্রীর অঙ্কে। কিন্তু যতবার তাঁকে দেখেছি, যে রূপেই দেখেছি, প্রতিবারই অভিনব মনে হয়েছে তাঁকে, উপলব্ধি করেছি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে নিত্য নতুন স্পন্দন নতুন আবেগ, নব উন্মাদনা। লাভ করেছি মহাশান্তিও, এক প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হ য়েছে সারা অন্তঃকরণ।

বহু কীর্তিত এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। পরিচিত শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র নামেও। বিরাজ করেন এখানে নীলাচলে মন্দিরে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীজগন্নাথ, সঙ্গে নিয়ে ভ্রাতা বলরাম আর ভগ্নী সুভদ্রা দারুময় মূর্তিতে। এই উৎকলেই পতিত হয় সতীর নাভীও, বিরাজ করেন এখানে বিমলাদেবী। তাই পরিচিত পুরুষোত্তম বিরাজ ক্ষেত্র নামেও। আবার এইখানেই পর্যায়ক্রমে দশাবতারে লীলা করেন ভগবান। তাই দশাবতার ক্ষেত্র নামেও খ্যাতিলাভ করে, পরিণত হয় মহাতীর্থে।

এই জগন্নাথ ক্ষেত্রেই প্রচার করেন জগৎগুরু শঙ্করাচার্য তাঁর অদ্বৈতবাদের বাণী। প্রতিষ্ঠা করেন গোবর্ধন মঠ পুরীধামে, অন্যতম তাঁর প্রতিষ্ঠিত চার ধামের চার মঠের।

দশ যোজন পরিধি নিয়ে বিস্তৃত এই মহাপবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, বিভক্ত চার মণ্ডলে বা ক্ষেত্রে—শঙ্খ মণ্ডল বা শঙ্খ ক্ষেত্র, বিস্তৃত এই মণ্ডল পঞ্চ ক্রোশ পরিধি নিয়ে, এক দিকে তার নীলাচল, অপর দিকে বঙ্গোপসাগর। মহানদী তীরে ভুবনেশ্বর, চক্রমণ্ডল বা চক্রক্ষেত্র, বৈতরণী তীরে যাজপুর গদামণ্ডল বা গদাক্ষেত্র, চন্দ্রভাগা তীরে অর্কক্ষেত্র পদ মণ্ডল বা কোনার্ক। মহাপ্রসিদ্ধি লাভ করে তাদের মধ্যে চক্র ক্ষেত্র বা ভুবনেশ্বর।

অন্যতম প্রাচীনতম দেশ ভারতের এই কলিঙ্গ। উল্লিখিত আছে তার নাম পরবর্তী হিন্দু ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে। বিস্তৃত এই কলিঙ্গ ভারতের পূর্ব উপকূলে

বৈতরণী নদীর তীর থেকে গোদাবরী অস্মাকা ও মুলাকা পর্যন্ত। স্বাধীন এই রাজ্য, মহাপরাক্রমশালী তার অধিবাসীরা।

লেখা আছে একটি প্রাচীন কলিঙ্গ শিলালিপিতে মগধ সম্রাট মহাপদ্মনন্দ নির্মাণ করেন কলিঙ্গ দেশে একটি পয়ঃপ্রণালী খুব সম্ভব পরাজিত হন সমসাময়িক কলিঙ্গ রাজা মহারাজা নন্দের কাছে। কিন্তু অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করে কলিঙ্গ। স্বাধীন তারা মৌর্য সম্রাট বিন্দুসার ও চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালেও। মহাপরাক্রমশালীও, বিস্তৃত তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ভারতের রাষ্ট্রিক গগনে, উল্লিখিত আছে গ্রীক গ্রন্থে। তোসালীতে তাদের মহাসমৃদ্ধিশালী রাজধানী, পরিপূর্ণ ধনে জনে, কেন্দ্রস্থল কলিঙ্গ সভ্যতার, তার সংস্কৃতিরও।

রাজ্যাভিষেকের আটবছর পরে, সম্রাট অশোক কলিঙ্গ বিজয়ে অগ্রসর হন। পরাজিত হন তাঁর কাছে কলিঙ্গরাজ। কিন্তু নিহত হন এক লক্ষেরও অধিক লোক, আহত হয় দেড় লক্ষ, হয় গৃহহীনও। সমূহ ক্ষতি হয় আরও অনেকের। মগধের অধিকারে আসে কলিঙ্গ, অধিকারে আসে মৌর্যসম্রাট অশোকের। সম্পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে মগধ সম্রাট বিম্বিসারের মগধকে কেন্দ্র করে রাজ্য সম্প্রসারণের খ্রীষ্টপুর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে প্রবর্তিত নীতি। লাভ করে পুর্ণ পরিণতি। প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম সার্বভৌম সাম্রাজ্য ভারতে।

কিন্তু ক্ষণস্থায়ী মগধের কলিঙ্গে আধিপত্য। স্বাধীনতা ঘোষণা করে কলিঙ্গ সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পরেই। পরিণত হয় এক স্বাধীন সার্বভৌম মহাশক্তিশালী রাষ্ট্রে চেত বংশের প্রবল পরাক্রান্ত খারবেলের নেতৃত্বে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে। তাঁর অধীনস্থ হন পশ্চিমের মূষিক নগরের অধিবাসীরা, দাক্ষিণাত্যের রথিকরা, ভোজকরাও হন। উত্তরে তাঁর কাছে পরাজিত হন রাজগৃহের নৃপতি বহু পরিমিত। খুব সম্ভব তিনিই পাটলিপুত্রের অধিপতি পুষ্যমিত্র। তাঁর অধীনস্থ হন অন্ধ্র আর মগধ রাজ। প্রবেশ করে তাঁর বিজয় বাহিনী তামিলনাদ পর্যন্ত। উৎকীর্ণ আছে তাঁর বিজয়ের কাহিনী হাতিগুম্ফার শিলালিপিতে। নিবদ্ধ থাকে না তার কীর্তি শুধু রাজ্যজয়েই। তিনি সংস্কার করেন রাজধানী কলিঙ্গ নগরের দুর্গের প্রাচীর আর তোরণ। সংস্কৃত হয় মহারাজ নন্দের নির্মিত পয়ঃপ্রণালীও। নির্মিত হয় কুমারী পর্বতের শীর্ষদেশে

একটি জয় স্তম্ভও। তিনি প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতিতে পরিগণিত হন।

তার পরের ইতিহাস—ইতিহাস এক উত্থান আর পতনের, জয়ের আর পরাজয়ের, স্বাধীনতার আর পরাধীনতার, গৌরবের আর অগৌরবের। কখনও মহাশক্তিশালী হন কলিঙ্গের রাজারা। স্বাধীন হয় কলিঙ্গ মহাসমৃদ্ধিশালী হয়, পরিণত হয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে, কেন্দ্রস্থল হয় সংস্কৃতির আর কৃষ্টিরও। গড়ে ওঠে কত অসংখ্য মন্দির কলিঙ্গের বুকে অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম স্থাপত্যের নিদর্শন, নিদর্শন কত গৌরবময় সৃষ্টির, কত অবিনশ্বর শাশ্বত কীর্তির। কত বিভিন্ন শিল্পও, অঙ্গে নিয়ে অনবদ্য, সূক্ষ্ম কারুকার্য। এমনই করেই একদিন প্রতিষ্ঠিত হয় কর-বংশ কলিঙ্গ দেশে। রাজত্ব করেন তাঁরা প্রবল পরাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরা কলিঙ্গের, সাজান ভুবনেশ্বরের বুক সুন্দরতম মন্দির দিয়ে। প্রতিষ্ঠিত হয় মহাশক্তিশালী কেশরী বংশও কলিঙ্গদেশে, স্থাপন করেন প্রবল পরাক্রান্ত যযাতী কেশরী অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে। অলঙ্কৃত করেন একে একে কলিঙ্গের সিংহাসন কেশরী বংশের চল্লিশজন রাজা। শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরাও শোভিত করেন ভুবনেশ্বরের বুক কত শত সুন্দরতম মহিমময় মন্দির দিয়ে। মন্দির নগরে পরিণত হয় ভুবনেশ্বর।

আবার মূহ্যমান হয় কলিঙ্গ অধীনতার পাশে, কলঙ্কিত পরাধীনতার অগৌরবের গ্লানিতে। পরাধীনতা স্বীকার করে অন্ধ্র সাতবাহনদের কাছে, রাষ্ট্রকূট দন্তিদুর্গের কাছে, বেঙ্গীর চালুক্য রাজাদের কাছে; বঙ্গাধীপ শশাঙ্কের আর দেবপালের কাছেও। পরাজয় বরণ করে মগধের গুপ্ত সম্রাটদের আর কনৌজের ও থানেশ্বরের হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের কাছেও। জন্মান নাই কোন খারবেলের মত শ্রেষ্ঠ নৃপতি, কোন দিগ্বিজয়ী বীর কলিঙ্গের রঙ্গমঞ্চে। চির-স্মরণীয় হন নাই আর কোন কলিঙ্গ রাজা ইতিহাসের পাতায়, হন নাই বরণীয়ও।

এমনই করে অতিবাহিত হয় দীর্ঘ সহস্র বৎসর। শেষে ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় কলিঙ্গ দেশে (উৎকলে) চোড় গঙ্গ বংশ, স্থাপন করেন মহা-শক্তিশালী অনন্ত বর্মণ চোড়গঙ্গ। মাতা তাঁর চোল-নৃপতি রাজেন্দ্র চোলের কন্যা রাজসুন্দরী। তিনি রাজত্ব করেন ১০৭৬ থেকে ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

তিনিই সুরু করেন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্মাণ। মহা-পরাক্রমশালী তাঁর পুত্র অনিয়াকও, পরিচিত প্রথম অনঙ্গভীমদেব নামেও, রাজত্ব করেন ১১৭০ থেকে ১২০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বাড়ে রাজ্যের সীমানা হুগলি জেলার ত্রিবেণী পর্যন্ত। তিনিই নির্মাণ করেন জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পাতালেশ্বরের নিভৃত কক্ষ। নির্মিত হয় বহু মন্দির সারা কলিঙ্গ দেশে, হয় কত ঘাট আর সেতুও। প্রবল পরাক্রান্ত রাজা নরসিংহও রাজত্ব করেন ১২৩৮ থেকে ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি ব্যাহত করেন উৎকলে মুসলমান আক্রমণ। তিনিই নির্মাণ করেন কোণারকের প্রখ্যাত সূর্য মন্দির, সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির কলিঙ্গ দেশের, অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির ভারতেরও। পরিসমাপ্ত হয় জগন্নাথ দেবের মন্দিরের নির্মাণও তাঁর প্রচেষ্টায়।

স্থাপিত হয় উৎকলে গজপতি বংশ ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতা তার কপিলেন্দ্র এক মহাশক্তিশালী নৃপতি। তাঁর বিজয় অভিযান অতিক্রম করে বহু দেশ—করে বিজয় নগর, বিদর আর উদয়গিরি। কাঞ্চী তাঁর অধিকারে আসে। গৌরব বাড়ে উৎকলের, বর্ধিত হয় রাজ্যের সীমানাও—বিস্তৃত হয় গঙ্গা থেকে কাবেরী পর্যন্ত। রাজত্ব করেন পুরুষোত্তম ১৪৭০ থেকে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অধিকার করেন তাঁর রাজ্যের কিছু অংশ বিজয় নগরের নরসিংহ—শালুব আর বহমনির সুলতানেরা। তাঁর পুত্র প্রতাপরুদ্র দেব রাজত্ব করেন ১৪৯৭ থেকে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা বাংলার মেদিনীপুর থেকে গুণ্টুর জেলা পর্যন্ত। পরম ভক্ত তিনি যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের, পৃষ্ঠপোষক গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের, অমরত্ব লাভ করেন তিনি তাদের সাহিত্যে। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই শ্রীচৈতন্যদেব অতিবাহিত করেন বহু বৎসর. এইখানেই হয় তাঁর মহা প্রয়াণও। মুকুন্দ হরিচন্দন, শেষ নৃপতি এই বংশের রাজত্ব করেন ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভোই বংশ অধিকার করেন উৎকলের সিংহাসন। রাজত্ব করেন ভোই বংশ মাত্র আঠার বৎসর। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিতাড়িত হন ভোইরাজ, গজপতি মুকুন্দ হরিচন্দন উদ্ধার করেন হৃত সিংহাসন। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মুসলমান সুলতান সুলেমান কররাণী আক্রমণ করেন উৎকল বর্তমান উড়িষ্যা। যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন মুকুন্দ। উড়িষ্যা মুসলমানের অধিকারে আসে।

তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় ধ্বংস করেন জগন্নাথদেবের মহাপবিত্র মন্দির। পরিসমাপ্তি হয় উৎকলে হিন্দু শাসনের, সঙ্গে নিয়ে হিন্দু সভ্যতা, হিন্দু সংস্কৃতি হিন্দু কৃষ্টি। সুরু হয় আফগানে আর মুঘলে সংঘাত উড়িষ্যার অধিকার নিয়ে।

বুকে নিয়ে আছে এই কলিঙ্গই নাগর স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন, শ্রেষ্ঠ নিদর্শনও। এইখানেই, ভুবনেশ্বরে তার প্রকৃত সুরু, তার ক্রমোন্নতি। আবার এই কলিঙ্গেই, কোণারকে, লাভ করে সে পূর্ণ পরিণতি। উপনীত হয় নাগর স্থাপত্য পদ্ধতি উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে কোণারকের সূর্যমন্দিরে, লাভ করে সুন্দরতম আর মহামহিমময় রূপ, সর্বশ্রেষ্ঠ রূপও হয় বিশ্বজিৎ।

নিবদ্ধ থাকে না নাগর স্থাপত্য পদ্ধতি শুধু কলিঙ্গদেশে, বিস্তৃত হয়ে আছে ভারতের তিন চতুর্থাংশ ভূভাগ নিয়ে। ছড়িয়ে আছে পাঞ্জাবে, হিমালয়ে, মস্‌রুরে, কাংড়াতে, হাটে, রাজৌরাতে কুলুতে, অঙ্গে নিয়ে গণেশ, বিষ্ণু ও দুর্গার মূর্তি। আছে গঙ্গার উপত্যকায়—কালারে আর সাপুরে। আছে বাংলার বাঁকুড়া জেলায়, বাহুলাডায়, সোনা তপনে, বর্ধমান জেলার বরাকরে। সুন্দরবনে আর দোহারে আছে শিরপুরে। আছে উত্তর প্রদেশে ফতেপুর জেলায়। আছে মালবে আর গোয়ালিয়রে। বুকে নিয়ে আছে জেজাক্‌-ভুক্তির (বর্তমান বুণ্ডেলখণ্ডের) রাজপুত চন্দেল্ল রাজধানী খাজুরাহ। ছড়িয়ে আছে সৌরাষ্ট্রে, রাজস্থানে আর পশ্চিম ভারতেও। দক্ষিণ ভারতেও কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রার অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। তাই সম্ভব নয় তাদের রাজবংশ হিসাবে ভাগ করা। বিস্তৃত হয়ে আছে তারা এক একটি অঞ্চল নিয়ে, বুকে নিয়ে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য।

বিভক্ত ভারতীয় মন্দির নির্মাণ পদ্ধতি তিন ভাগে শিল্প শাস্ত্রের অনুশাসনে—নাগর, বেসর ও দ্রাবিড়ে। তিন ভাগে ভাগ করেন মনীষী ফারগুসানও ভারতীয় স্থাপত্যকে—ইণ্ডোএরিয়ান বা আর্যাবর্তে, চালুক্যে আর দ্রাবিড়ে।

নাগর স্থাপত্য রূপ পরিগ্রহ করে রেখ দেউলে। বলা হয় শিখর দেউলও। ঈষদ বক্র এইসব দেউলের গর্ভগৃহের ছাদ, অনুরূপ পুরাণে বর্ণিত শুকপাখীর নাসিকার, শিখরাকৃতিতে সোজা উপরের দিকে উঠে যায়। রচিত হয় আমলক আর চূড়া শিখরের শীর্ষদেশে। রচিত হয় মূল বা প্রধান শিখরের চারিপাশে কতকগুলি শিখরও। ক্ষুদ্রতর এই শিখরগুলি, পরিচিত অঙ্গ শিখর

নামে। বিভিন্ন তাদের গঠনরূপ বিভিন্ন অঞ্চলে। বিভিন্ন বাংলার বাহুল্যাড়ার সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরের অঙ্গ শিখরের গঠন রূপও। বৈশিষ্ট্য বাংলার স্থাপত্যের। অঙ্গে নিয়ে আছে তার নিজস্ব রূপ। নির্মিত হয় গর্ভ গৃহের সংলগ্ন মণ্ডপ, কোথাও অলিন্দ। নির্মিত হয় দ্রাবিড় মন্দিরে আয়ত ক্ষেত্র গর্ভগৃহ। তার উপরে রচিত হয় পিরামিডাকৃতিতে ক্রম হ্রস্বায়মান ছাদ বা বিমান, বিমানের উপরে অষ্টভুজ অথবা বহুভূজ বহতল বিশিষ্ট শিখারা বা চূড়া, শীর্ষে নিয়ে কোথাও বৃত্তাকার কোথাও অষ্টকোণ গম্বুজ পরিচিত স্তূপিকা নামে প্রবেশ দ্বারে নির্মিত হয় গোপুরম শিরে নিয়ে ক্রমহ্রস্বায়মান ছাদ, হয় স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপও।

নিবদ্ধ এই স্থাপত্য পদ্ধতি ভারতের দক্ষিণ প্রত্যন্ত প্রদেশ, দ্রাবিড়স্থানে। বুকে নিয়ে আছে দ্রাবিড় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মহাবলীপুরম, কাঞ্চীপুরম, ভেলুর, চিদাম্বরম, তাঞ্জোর, কুম্ভকোনাম, শ্রীরঙ্গম, জম্বুকেশ্বর, মাদুরা, সুচীন্দ্রম, বিজয়নগর আর রামেশ্বরম।

পল্লবেরাই আদি স্রষ্টা দ্রাবিড় স্থানের মন্দিরের। রাজত্ব করেন তাঁরা প্রবল প্রতাপে দক্ষিণ ভারতে সাতবাহনদের পতনের পর ৬১০ থেকে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। স্থাপিত হয় তাঁদের রাজধানী কাঞ্চীপুরমে। এই বংশের মহেন্দ্র বর্মণই আদি স্রষ্টা দ্রাবিড় স্থানের, রাজত্ব করেন ৬১০ থেকে ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত। তিনিই জীবন্ত শৈলমালার অঙ্গ কেটে নির্মাণ করেন চোদ্দটা মণ্ডপ, তিরুচুরা পল্লীতে আর আরকটে। বিভিন্ন তাদের আকার কেউ সমাপ্ত কেউ অর্ধ সমাপ্ত।

তাঁর পুত্র নরসিংহ বর্মণ, শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাও, অলঙ্কৃত করেন পল্লব সিংহাসন ৬৪০ থেকে ৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। নির্মিত হয় শৈলমালার অঙ্গ কেটে সাতটি রথ, পরিচিত সপ্ত প্যাগোডা নামেও, আর দশটি মণ্ডপ, অঙ্গে নিয়ে চৈত্যগবাক্ষ, দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম বন্দর মামাল্লাপুরমের, বর্তমান, মহাবলীপুরমের সমুদ্র সৈকতে। শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে ধর্মরাজার রথ আর মহিষাসুরের মণ্ডপ। ঘটে এক সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক ঘটনা, এক যুগসন্ধি ভারতের স্থাপত্যের ইতিহাসে, রচনা করেন পল্লব নৃপতি আর পল্লব স্থপতি। প্রস্তরিভূত হয় পূর্ববর্তী বৌদ্ধ স্থাপত্য জন্মগ্রহণ করে দ্রাবিড় স্থাপত্য—লাভ করে নব জীবন। পূর্বাভাষ তারা ভবিষ্যৎ মহামহিমময়

মন্দিরের আর সুউচ্চ গোপুরমের, অঙ্কুর এক মহান ভবিষ্যতের, স্বপ্ন এক বিশ্ব-জয়ের। মহামহিমন্বিত হয় মামাল্লাপুরমের দ্রাবিড় ঋষির বপিত বীজ, পরিণত হয় মহামহীরুহে তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের, মাদুরার মীনাক্ষীর আর রামেশ্বরমের মন্দিরে। শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে দ্রাবিড় স্থাপত্য উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, পায় সুন্দরতম আর মহামহিমময় রূপ, বিশ্বজিৎ হয়।

৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয় নরসিংহ বর্মণের, রাজসীমা অধিরোহণ করেন পল্লব সিংহাসনে। রুদ্ধ হয় পাহাড়ের অঙ্গ কেটে মন্দির নির্মাণ, প্রবর্তিত হয় প্রস্তর দিয়ে মন্দির নির্মাণ, এক অভিনব নতুন পদ্ধতি। নির্মিত হয় ছয়টি মন্দির ৬৯০ থেকে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, শিরে নিয়ে সুউচ্চ ক্রম হ্রস্বায়মান শিখারা বা চূড়া। প্রাচীনতম তাদের মধ্যে মামাল্লাপুরমের জলশয়ানের মন্দির, শ্রেষ্ঠ কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথের মন্দির, সর্বশ্রেষ্ঠ কাঞ্চীপুরমের বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দির। নির্মিত হয় আদি বা প্রথম ক্রম হ্রস্বায়মান শিখারা দ্রাবিড় মন্দিরের শীর্ষদেশে, সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে দ্রাবিড় মন্দির মহিমন্বিত হয়, হয় দ্রাবিড় স্থাপত্যও। নির্মিত হয় মুক্তেশ্বর আর মাতঙ্গেশ্বরের মন্দির কাঞ্চীপুরমে ও আরও অনেক মন্দির তার আশে পাশে, নির্মাণ করেন নন্দীবর্মণ ও পরবর্তী পল্লব রাজারা। নিকৃষ্ট সংস্করণ তারা কৈলাসনাথের ও বৈকুণ্ঠ পেরুমলের।

মূর্তির অলঙ্করণই শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য পল্লব মন্দিরের। বুকে নিয়ে আছে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মামাল্লাপুরমের অর্জুনের তপস্যার দৃশ্য, গঙ্গা অবতরণের দৃশ্য নামে খ্যাত। অঙ্গে নিয়ে আছে বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দিরও। বৃহত্তর এই মন্দিরটি, বহু বিস্তৃতও, বিভক্ত বিভিন্ন অংশে। কিন্তু অনবদ্য সুসমন্বিত তার প্রতিটি অংশ, তার গর্ভগৃহ আর অলিন্দ, অভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, এক হয়ে যায় একেবারে। সুষ্ঠু, নিখুঁত রূপ দান এক মহা মহিমময় পরিকল্পনার মহাঅভিজ্ঞ পল্লব স্থপতির। সাজান মহাপারদর্শী পল্লব ভাস্কর, তার সুউচ্চ শিখারার অঙ্গ, তার অলিন্দ তার প্রতিটি অঙ্গ—কত সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ দিয়ে, ভূষিত করেন কত প্রতীক দিয়ে, কত মহিমময় মূর্তিসম্ভার দিয়ে, কত কেশরযুক্ত সিংহের স্তম্ভের শ্রেণী দিয়েও। সুসামঞ্জস্য হয় তার উন্নত শির শিখারার আভরণে আর প্রাচীরের গাত্রের অলঙ্করণে। মহা মহিমন্বিত হয়

মন্দির তাঁদের যুক্ত অবদানে। তাই পল্লব স্থপতির আর ভাস্করের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রতীক হয়ে আছে এই মন্দিরটি, নিদর্শন তাঁদের শাশ্বত মহাগৌরবময় কীর্তিরও, চরম উন্নতির, পূর্ণ পরিণতির।

বুকে নিয়ে আছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিমান তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দির, ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে চোল নৃপতি রাজা রাজদেব চোল নির্মাণ করেন। অঙ্গে নিয়ে আছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিমানের নিদর্শন গঙ্গাইকোণ্ডাপুরমের মন্দিরও নির্মাণ করেন ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোল। চতুর্দশ তল এই বিমান দুইটি, সোজা চতুষ্কোণ পিরামিডের আকারে উর্ধ্বে ওঠে শীর্ষে নিয়ে এক একটি বৃহৎ গম্বুজ, অঙ্গে নিয়ে পংক্রম। দাঁড়িয়ে আছে তারা মহামহিমময় মূর্তিতে, উর্ধ্বে তুলে তাদের সুমহান উন্নত গগনস্পর্শী শির। নির্মিত হয় তার শতবর্ষ পূর্বে আরও একটি সুন্দরতম, মহিমময় বিমান শ্রীনিবাসানাপুরে কোরঙ্গনাথের মন্দিরে, চোল রাজারাই নির্মাণ করেন। রাজত্ব করেন তাঁরা দক্ষিণ ভারতে ৮৫০ থেকে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

পাণ্ড্যরা প্রবল হন দক্ষিণ ভারতে, রাজত্ব করেন ১১০০ থেকে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে গোপুরম দ্রাবিড় স্থাপত্যে, পরিণত হয় স্থপতির আর ভাস্করের মধ্যমণিতে। বর্ধিত হয় গোপুরমের আকার আর অঙ্গের শিল্প সম্ভার, প্রশমিত হয় মন্দিরের বিমানের আকার, লাঘব হয় অঙ্গের শিল্পসম্পদও। লুক্কায়িত থাকে বিমান মন্দিরের সুউচ্চ প্রাচীরের আর প্রাঙ্গণের অন্তরালে, দাঁড়িয়ে থাকে প্রবেশ দ্বারে মহামহিমময় গোপুরম রূপ পরিগ্রহ করে চোল রাজাদের বিমানের উচ্চতায় আর অঙ্গের শিল্প ও মূর্তিসম্ভারে। বুকে নিয়ে আছে চিদাম্বরম, কুম্ভকোনাম, শ্রীরঙ্গম আর তিরুভান্নমালাই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, পাণ্ড্যরাজাদের নির্মিত গোপুরমের।

নির্মিত হয় দ্রাবিড় মন্দিরে সুন্দরতম স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপগুলি। বিজয় নগরের হিন্দুরাজারা নির্মাণ করেন। মহা পরাক্রমশালী হন তাঁরা দক্ষিণ ভারতে, মহা সমৃদ্ধিশালীও রাজত্ব করেন ১৩৫০ থেকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বুকে নিয়ে আছে বিজয়নগরের রাজাদের তৈরী স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কাঞ্চীপুরমের একাম্বরনাথের মন্দির আর ভেলুরের কল্যাণ মণ্ডপম। অভিনব তাদের মধ্যে ভেলুরের কল্যাণ মণ্ডপের স্তম্ভের অঙ্গের অলঙ্করণ, মহামহিমময়ও। রাজত্ব

করেন কৃষ্ণদেব রায়, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বিজয়নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ভারতেরও, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাও ১৫০৯ থেকে ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, উপনীত হয় বিজয়নগর উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে মহাসমৃদ্ধিশালী হয় বিজয়গর। ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নির্মাণ সুরু করেন বিঠালস্বামীর মন্দির শ্রেষ্ঠ মন্দির দক্ষিণ ভারতেরও। অপরূপ এই মন্দিরের স্তম্ভযুক্ত কল্যাণ মণ্ডপম, সুন্দরতম এই মন্দিরের এক প্রস্তর রথটি। সমসাময়িক এই মন্দিরটি রাজ পরিবারের ব্যবহারের জন্য নির্মিত বিজয়নগরের হাজারা রামের মন্দিরের। রচিত হয় তাদের ভিতরের প্রাচীরের গাত্রে মূর্তি দিয়ে রামায়ণের কাহিনী। বুকে নিয়ে আছে তদ্‌পত্রির মন্দির সুন্দরতম গোপুরম বিজয়নগর যুগের। আছে কাঞ্চীপুরমের একাম্বরনাথের আর চিদাম্বরমের নটেশের মন্দিরও।

সম্পূর্ণ রূপ লাভ করে, স্তম্ভের শীর্ষদেশে বিলম্বিত পদ্মাকার বন্ধনী। গড়ে ওঠে অপরূপ স্তম্ভ বুকে নিয়ে মহাপরাক্রমশালী অশ্ব, পৃষ্ঠে নিয়ে আরোহী। স্তম্ভের বাহন সিংহ আর গজলক্ষ্মীও, পায় বিচিত্র রূপ। কল্পনাতীত সেই রূপ।

পতন হয় বিজয়নগরের, নায়করা প্রবল হন দক্ষিণ ভারতে, প্রতিষ্ঠা করেন এক স্বাধীন রাজ্য। মাদুরাতে স্থাপিত হয় তার রাজধানী। তিরুমল নায়ক শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, রাজত্ব করেন ১৬২৩ থেকে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অন্যতম শ্রেষ্ঠস্রষ্টা তিনিও দক্ষিণ ভারতের, নির্মাণ করেন মাদুরাতে মীনাক্ষী মন্দিরের বিপরীত দিকে, সুন্দরতম পদু মণ্ডপম, পরিচিত বসন্ত মণ্ডপম নামেও। একটি সমতল ছাদ বিশিষ্ট দরদালান এই মণ্ডপটি, বিভক্ত তিনটি গলিপথে, অনবদ্য স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে। তিনিই নির্মাণ করেন, মীনাক্ষীর মহামহিমময় মন্দিরের সুন্দরতম সহস্র স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপমটি। রচিত হয় মীনাক্ষীর মন্দিরে সুন্দরতম স্তম্ভ অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ মূর্তি সম্ভার, মূর্তি দেবদেবীর, মূর্তি তাঁর নিজের ও তাঁর পত্নীর। প্রমাণ আকৃতির এই মূর্তিগুলি। তাঁরই প্রচেষ্টায় ও অর্থে নির্মিত হয় শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথমের মন্দিরে শেষ গিরি রাওয়ের মণ্ডপম। সুন্দরতম মণ্ডপম দক্ষিণ ভারতের বুকে নিয়ে আছে এই মণ্ডপটি শ্রেষ্ঠ অশ্বস্তম্ভের নিদর্শন। অপরূপ, সুন্দরতম, নায়ক যুগের, রামনাদের সেতুপতি বংশের রাজা উদয়নের নির্মিত, রামেশ্বরমের মহামহিমময় অলিন্দটি, অনুপম কিন্তু নায়ক যুগের নির্মিত সুব্রমমিয়ামের ক্ষুদ্র মন্দিরটি, দাঁড়িয়ে আছে তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের

মহামহিমময় বিমানের পাশে। সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম এই মন্দিরের অঙ্গের শিল্প সম্ভার, অনবদ্য, অতুলনীয় তার গাত্রের অলঙ্করণও। ভূষিত করেন মহা অভিজ্ঞ স্বর্ণকার প্রস্তরের কঠিন বুক অপরূপ সূক্ষ্মতম ভূষণে, রচিত হয় এক অনবদ্য, সুন্দরতম সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ কীর্তি এক মহাগৌরবময় যুগের।

অস্তমিত হয় নায়কদের ক্ষমতা দক্ষিণ ভারতে, পরিসমাপ্তি হয় বৃহৎ মন্দিরের নির্মাণ। কিন্তু মৃত্যুহীন দ্রাবিড় স্থপতি আর শিল্পী, আজও বুকে নিয়ে আছেন তাঁরা, তাঁদের পুর্ব পুরুষের অতীত গৌরবের স্মৃতি। জাতিতে তাঁরা কাম্মালার, কিন্তু মর্যাদায় ব্রাহ্মণের সমান। ভূষিত তাঁদের পূর্বপুরুষ বহু বিভিন্ন উপাধিতেও। নিযুক্ত তাঁরা মন্দির নির্মাণে বংশ পরম্পরায়, নির্মাণ করেন মন্দির শিল্পশাস্ত্রের বিধান অবলম্বন করে। উত্তর সাধক তাঁরা তাঁদের পুর্ব পুরুষের তাই নাই কোন পরিবর্তন তাঁদের পুর্ব পুরুষের অবলম্বিত পদ্ধতি ও তাঁদের পদ্ধতিতে।

নাগর ও দ্রাবিড় স্থাপত্যের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে বেসর স্থাপত্য বুকে নিয়ে তাদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা।

নির্মাণ সুরু করেন বেসর পদ্ধতিতে, পরিচিত পরবর্তী চালুক্য পদ্ধতি নামেও, মন্দির, পরবর্তী চালুক্যরাজারা, হন তাঁরা দাক্ষিণাত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, রাষ্ট্রকূটদের পতনের পর, রাজত্ব করেন ৯৭৩ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁরা মন্দির দিয়ে সাজান ধারোয়ারের মহীশূরের, আর দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তীর্ণ অংশ, নির্মিত দ্রাবিড় ও নাগরের সম্মিলিত পদ্ধতিতে তাদের যুক্ত পদ্ধতিতে অঙ্গে নিয়ে তাদের নিজস্ব রূপ, আপন বৈশিষ্ট্য। অনুচ্চ এই মন্দিরগুলি, নিম্নতর দ্রাবিড় বিমানের আর নাগর দেউলের তুলনায়। কিন্তু বিস্তৃততর। নির্মিত তারা তারকার পদ্ধতিতে। বেষ্টিত তাদের মহামণ্ডপম বা কেন্দ্রস্থলের সভা গৃহ বা কক্ষ তিনটি পৃথক গর্ভগৃহ আর বিমান দিয়ে। নির্মিত হয় বিমানের উপর শিখর পিরামিডের আকৃতিতে। কিন্তু নয় তারা দ্রাবিড় শিখাবার মত তল বিশিষ্ট। থাকে থাকে উর্ধ্বে ওঠে শিখাবা, নিচের গর্ভগৃহের শীর্ষ দেশে। অঙ্গে নিয়ে আছে এই মন্দিরগুলি বহু গবাক্ষ, রচিত মন্দিরের প্রস্তরের অঙ্গ কেটে, বুকে নিয়ে আছে সুন্দরতম, অনবদ্য মসৃণ স্তম্ভের শ্রেণী। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরগুলি সুউচ্চ ভিত্তির উপর মহামহিমময় মূর্তিতে। বিভক্ত

এই ভিত্তি বহু থাকে, অঙ্গে নিয়ে আছে সুন্দরতম অনবদ্য শিল্পসম্ভার ভূষিত হয়ে আছে জীবন্ত, সুষ্ঠু গঠন মূর্তি সম্ভার দিয়েও। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই সব মন্দিরের তাদের সর্বাঙ্গের পর্যাপ্ত অনবদ্য, মহিমময় মূর্তির সম্ভার। তুলনাহীন এই মূর্তি সম্ভার, অপরাজেয় সৃষ্টি—চালুক্য ভাস্করের, সর্ব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এক মহা গৌরবময় যুগের।

বুকে নিয়ে আছে বেসর স্থাপত্যের সুন্দরতম নিদর্শন ধারোয়ার জেলার ইতাগি আর গডাগের নিকটের শৈব মন্দির, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। দ্বাদশ শতাব্দীতেই নির্মিত হয় দোদ্দাবাস ভাম্নাতে একটি মন্দির অঙ্গে নিয়ে গর্ভগৃহ আর মণ্ডপম, রচিত তারকার পদ্ধতিতে। অপরূপ এই মন্দিরটির নির্মাণ কৌশল, সুন্দরতম আর বহু বিস্তৃত তার অঙ্গের মূর্তিসম্ভার। তাই লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন এই মন্দিরটি পশ্চিম ভারতে।

লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, উপনীত হয় উন্নতির চরম শিখরে বেসর স্থাপত্য পদ্ধতি হোয়সল রাজাদের আমলে। প্রবল পরাক্রান্ত হন তাঁরা দাক্ষিণাত্যে মহীশূরে চালুক্য রাজাদের পতনের পর, রাজত্ব করেন ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মহাপরাক্রমশালী বিষ্ণুবর্ধন, অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা ভারতেরও, সাজান সুন্দরতম, সুমহান মন্দির দিয়ে রাজধানী দোরসমুদ্র, বর্তমান হলেবিদ। সুন্দরতম, মহিমময় মন্দির দিয়ে শোভিত হয় দোদ্দোস-দাতল্লি, সোমনাথপুর আর বেলুড়ও।

দাঁড়িয়ে আছে সোমনাথপুরে কেশবের মন্দির, বুকে নিয়ে তিনটি গর্ভগৃহ, সংযুক্ত একটি অনবদ্য স্তম্ভযুক্ত মহামণ্ডপম দিয়ে। বেষ্টিত হয়ে আছে সমস্ত মন্দিরটি একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ দিয়ে।

দাঁড়িয়ে আছে বেলুড়ে পাঁচটি মন্দিরের সমষ্টি। সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি উপমন্দির। বেষ্টিত হয়ে আছে সুউচ্চ প্রাচীর দিয়েও। পূর্বদ্বারে শোভা পায় দুইটি গোপুরম, অঙ্গে নিয়ে অনুপম শিল্প সম্ভার। অভিনব প্রধান মণ্ডপের গবাক্ষের অঙ্গের মূর্তি সম্ভার আর অলঙ্করণ, বহু বিস্তৃতও।

সুন্দরতম, মহামহিমময় দোরসমুদ্রের কেদারেশ্বরের মন্দিরের অঙ্গের ভূষণ, মহাসমৃদ্ধিশালীও। এই অলঙ্করণ আর অঙ্গের ভূষণ পৌছায় চরমে, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে লাভ করে সর্বশ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম, মহা মহিমময়রূপ

দোর সমুদ্রের হোয়সলেশ্বরের অসমাপ্ত মন্দিরে, হয় অপরূপ, বাঙ্ময় হয়। এক বিশিষ্ট প্রস্তর দিয়ে নির্মিত এই মন্দিরটি। নমনিত থাকে প্রস্তর সদ্যখচিত যখন পাহাড় থেকে, ক্রমে রূপান্তরিত হয় কঠিন প্রস্তরে বাইরের আলোকে আর বাতাসে। তাই সম্ভব হয় ভাস্করের মন্দিরের প্রতিটি অঙ্গে, সুন্দরতম লতাপল্লব আর মহা মহিমময় মূর্তির সম্ভার রচনা করা, ভূষিত করা তার সর্বাঙ্গ অনবদ্য সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ দিয়ে, অলঙ্কৃত করা মহাসমৃদ্ধিশালী ভূষণেও। বিভিন্ন জীবজন্তুর মূর্তি দিয়ে রচিত হয় ভিত্তির গাত্রে সর্বনিম্ন পাড়। আছে তাদের মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, অশ্ব, পৃষ্ঠে নিয়ে আরোহী। তার উপরে মূর্তি দিয়ে রচিত হয় রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী। তাদের ফাঁকে ফাঁকে লতা আর পুষ্পের পাড়। সবার উপরে গভীর কুলুঙ্গির ভিতর, বিচিত্র কারুকার্য সমন্বিত চন্দ্রাতপের নিচে দুপাশের উদ্গত স্তম্ভের মধ্যে বিরাজ করেন দেবতারা, করেন দেবীরাও। ভূষিত তাঁরা বহুমূল্য বসনে আর শিরো ভূষণে, অনবদ্য, বিভিন্ন তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গীও। মহামহিমময় তাঁদের মূর্তি। আছেন কত অপ্সরাও, দাঁড়িয়ে আছেন নৃত্যের ছন্দে, অপরূপ এই নৃত্যের ছন্দ। কল্পনাতীত এই সৃষ্টি, শাশ্বত অবিনশ্বর কীর্তি এক মহা গৌরবময় যুগের।

মন্দিরনগর ভুবনেশ্বর কলিঙ্গদেশের, মহাতীর্থ হিন্দুদের, বেষ্টিত হয়েছিল তার মহাপবিত্র সরোবর সপ্তসহস্র মন্দির দিয়ে। আজও দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ শত মন্দির—ত্রিশটি অক্ষত, অবশিষ্ট অর্ধভগ্ন আর ভগ্ন অবস্থায়। প্রতীক হয়ে আছে তার পূর্ব গৌরবের, এক মহামহিমময় ঐতিহ্যের। নির্মিত হয় তাদের মধ্যে প্রাচীনতম মন্দির ষষ্ঠ শতাব্দীতে, সব শেষের মন্দির ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। অব্যাহত থাকে মন্দির নির্মাণের কাজ দীর্ঘ সাত শত বৎসর কলিঙ্গদেশে।

বিভক্ত এই যুগে তিনটি সুনির্দিষ্ট ভাগে: আদি যুগ ৫০০ থেকে ৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, মধ্যযুগ ৭০০ থেকে ৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, পরবর্তী যুগ ৯০০ থেকে ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

নির্মিত হয় আদি যুগে পরশুরামেশ্বর, বৈতাল দেউল বা কপালিনীর মন্দির, উত্তরেশ্বর, ঈশ্বরেশ্বর, শত্রুগণেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর, গৌরী ও মোহিনীর মন্দির। সবগুলিই ভুবনেশ্বরে। নির্মাণ করেন কলিঙ্গের আদি স্রষ্টা কর-বংশের নৃপতিরা রাজত্ব করেন তাঁরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে।

মধ্যযুগে নির্মিত হয় মুক্তেশ্বর, লিঙ্গরাজ, ব্রহ্মেশ্বর, রামেশ্বর, কেদারেশ্বর ও অলাবুকেশ্বরের মন্দির ভুবনেশ্বরে। নির্মাণ করেন কলিঙ্গের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা কেশরী বা সোম-বংশের রাজারা, রাজত্ব করেন তাঁরা অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে।

নির্মিত হয় পরবর্তীযুগে বাসুদেব, যমেশ্বর, মেঘেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, সারি দেউল, সোমেশ্বর আর রাজারানীর মন্দির ভুবনেশ্বরে ; পুরীধামে জগন্নাথ দেবের মন্দির ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে আর কোণার্কে বা কোণারকে সূর্য মন্দির ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে। নির্মাণ করেন উড়িষ্যার চোড় গঙ্গ বংশের রাজারা, রাজত্ব করেন তাঁরা প্রবল প্রতাপে একাদশ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরাও কলিঙ্গের। পঞ্চদশ শতাব্দীতে গজপতি বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি কপিলেশ্বর দেব নির্মাণ করেন ভুবনেশ্বরের দক্ষিণ সীমানায় কপিলেশ্বর দেবের মন্দির।

বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরগুলি কলিঙ্গের, বর্তমান উড়িষ্যার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। আছে উড়িষ্যার মন্দিরের প্রতিটি অংশের বিভিন্ন, আর বিশিষ্ট নামও। গর্ভগৃহের উপরে নির্মিত হয় নাগর পদ্ধতিতে রেখ বা শিখর দেউল। ঈষৎ বক্র রেখায় তার চাল বা ছাদ শিখরাকৃতি হয়ে সোজা উর্ধ্বে উঠে যায়, শীর্ষে নিয়ে আমলক। আমলকের উপরে শোভা পায় কলস। সবার উপরে নির্মিত হয় শৈব মন্দিরে ত্রিশূল, বিষ্ণুমন্দিরে চক্র, প্রতীক তারা শিবের আর বিষ্ণুর। বাঢ়নামে পরিচিত হয় নিম্নতম ঋজু অংশ, তার উপরের ঈষৎ বক্র অংশ রথক বা রথ নামে পরিচিত। বিভক্ত এই অংশ পর্যায়ক্রমে ভূমি আর আমলক দিয়ে। শীর্ষদেশের সমতল শিলাখণ্ড আমলক নামে পরিচিত। আমলকের নিচে গ্রীবা বা বেঁকি, উপরে কর্পূরি। সবার উপরের অংশ কলস নামে পরিচিত।

নির্মিত হয় গর্ভগৃহের সামনে চতুষ্কোণ মণ্ডপ, পরিচিত জগমোহন নামে। ক্রমশীর্ণায়মান পোতল বিভক্ত পিরামিডের আকৃতিতে উর্ধ্বে ওঠে তার ছাদও, পরিচিত পীঢ় নামে। রচিত হয় পীঢ়ের উপরে ঘণ্টাকৃতি কলস, পরিচিত ঘণ্টা-কলস নামে। তার উপরে আমলক শিলা। আমলকের নিচে বেঁকি, উপরে কর্পূরি। সবার উপরে ত্রিশূল অথবা চক্র। পীঢ়ের নিচের ঋজু অংশ বাঢ় নামে পরিচিত, খ্যাতি লাভ করে জগমোহন পীঢ় দেউল নামে। সম্পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে উড়িষ্যার মন্দির। দাঁড়িয়ে থাকে দেউল আর জগমোহন একটি

সুউচ্চ ভিত্তির উপর। পীঠ বা পৃষ্ঠ নামে পরিচিত সেই ভিত্তি। ভিত্তি গাত্র থেকে উদ্গত চতুষ্কোণ স্তম্ভ পগ নামে পরিচিত। রাহাপগ নামে পরিচিত কেন্দ্রস্থলেরটি, দুই প্রান্তদেশের কোণক ও তাদের অন্তবর্তী অনর্থ পগ নামে পরিচিত। এই পগের শ্রেণী বিভাগের উপরই নির্ভর করে মন্দিরের শ্রেণী বিভাগ, বিভক্ত হয় তারা একরথে, ত্রিরথে, পঞ্চরথে, সপ্তরথে ও নবমরথে। নাই কোন পগ একরথ দেউলের অঙ্গে। ত্রিরথের দুই প্রান্তে দুইটি কোণক ও কেন্দ্রস্থলে একটি রাহা পগ থাকে। পঞ্চ রথের একটি রাহা, দুইটি কোণক ও দুইটি অনর্থপগ থাকে। সপ্তরথের একটি রাহা, দুইটি কোণক ও চারিটি অনর্থ পগ থাকে তাদের মধ্যে দুইটি পরিকোণক। নবম রথের একটি রাহা, চারিটি কোণক আর চারিটি অনর্থ পগ থাকে। তাদের মধ্যে দুইটি পরিকোণক। বৈতাল দেউল, তার বিমান আর জগমোহন ও পরশুরামেশ্বরের মন্দির পড়ে এক রথের পর্যায়ে, পরশুরামেশ্বরের বিমান ত্রিরথের, লিঙ্গরাজ, অনন্ত বাসুদেব, রাজারানী, ব্রহ্মেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, মেঘেশ্বর রামেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর আর যমেশ্বর পঞ্চ রথের, সারিদেউল সপ্তরথের। নাই কোন নিদর্শন নবম রথ দেউলের। বিভক্ত হয় পীঢ় দেউলও বিভিন্ন শ্রেণীতে। নির্ভর করে এই শ্রেণীবিভাগ, পিরামিডাকৃতি শিখরের উচ্চতার উপর। বিভক্ত হয় তারা ঘণ্টাশ্রী মোহন, নাড়ুমোহন আর পীঢ় মোহনেতে। শীর্ষে নিয়ে আছে ঘণ্টাশ্রী মোহন, আমলক, শ্রী আর কলস। দৃশ্যমান নয় নাড়ুর কাঁটি, নাই শীর্ষদেশে শ্রী আর আমলক, শোভিত শুধু কলস দিয়ে। পীঢ় মোহনের নাই আমলক, নাই কলসও, শুধুই পীঢ় নিরাভরণ।

বাড়ে মন্দিরের আকার নির্মিত হয় একই অক্ষে, পীঢ় দেউলের সম্মুখে নাটমন্দির, নাটমন্দিরের সামনে ভোগমন্দির। দুইভাগে বিভক্ত এই মন্দির-গুলির চালও। ঘন ক্ষেত্র তাদের নিম্নাংশ বাঢ় নামে পরিচিত, পীঢ় নামে পরিচিত পিরামিডাকৃতি উর্ধ্বাংশ। একতলা এই মন্দিরগুলি, একতলা জগমোহন বা পীঢ় দেউলও।

পাঁচ ভাগে বিভক্ত নিচের ঋজু অংশ-বাঢ়ও—কাঁটি, বারাণ্ডি, বন্ধন, উর্ধ্ব বারাণ্ডি আর উর্ধ্ব জঙ্ঘা। সহজ হয় স্থপতির মন্দির নির্মাণ, সুষ্ঠু হয়।

বেলে পাথরের তৈরী এই মন্দিরগুলি। মুক্তেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর আর বৈতাল

দেউল ছাড়া, নাই তাদের অভ্যন্তরে ভাস্করের হস্তের স্পর্শ, নাই কোন শিল্প সম্ভার, নাই মূর্তির সম্ভারও। বিরাজ করেন সেখানে মন্দিরের বিগ্রহ দেবতা। নিভৃতে, স্বল্পালোকে, এক রহস্যময় পরিবেশে।

স্তম্ভ বিহীন এই মন্দিরগুলি। স্তম্ভের পরিবর্তে রচনা করেন কলিঙ্গের (উড়িষ্যার) মহা অভিজ্ঞ স্থপতি মন্দিরের ঋজু অংশে বারাণ্ডির অঙ্গে, উদ্গত স্তম্ভ অথবা পগ শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য উড়িষ্যার মন্দিরের। মূর্তি আর বিভিন্ন লতা পুষ্প দিয়ে শোভিত করেন তার সর্বাঙ্গ উড়িষ্যার সুনিপুণ ভাস্কর, নিঃশেষ করে দিয়ে অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্য, মিশিয়ে দিয়ে মনের সবখানি মাধুর্য। রচিত হয় এক একটি সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, ইন্দ্রলোক, স্বর্গপুরী। কেউ বলেন তাঁরা অবলম্বন করেন মানসারের পদ্ধতি, কেউ বলেন মানসারের নয়, শিল্প শাস্ত্রের।

রচিত হয় মন্দিরের তিন গাত্রে, দক্ষিণে, বামে ও পশ্চাতে কেন্দ্রস্থলের উদ্গত স্তম্ভের, (রাহা পগের) অঙ্গে তিনটি, সুগভীর সুবৃহৎ কুলুঙ্গি। সাজান তার চারিপাশ ও শীর্ষ দেশ বিভিন্ন সুন্দরতম লতা পুষ্প, আর অনবদ্য ঝালর ও ট্যাসেল দিয়ে। দোলায়মান হারের অঙ্গ থেকে বিলম্বিত হয় একটি পদ্ম ও শীর্ষদেশে। ক্ষোদিত হয় এই সব কুলুঙ্গিতে এক একটি মহামহিমময় পার্শ্ব-দেবতার মূর্তি। শৈব মন্দিরে পিছনের প্রাচীরের গাত্রে কার্তিকেয়, দক্ষিণে গণেশ আর বামে পার্বতীর মূর্তি। বিষ্ণু মন্দিরে নরসিংহ, বামন আর কালীর মূর্তি। মূর্তি বিষ্ণুর তিন অবতারের। শাক্ত মন্দিরে হরগৌরী, দুর্গা আর ভৈরবীর। কোণারকের সূর্য মন্দিরে তিন সূর্যের মহামহিমময় মূর্তি, বিভিন্ন তাঁদেব দাঁড়াবার ভঙ্গী। অপরূপ এই মূর্তিগুলি, সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত, অনুপম, অনবদ্য কুলুঙ্গির অঙ্গের শিল্প সম্ভারও। উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নিদর্শন, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরও।

তাদের দুই পাশে অনর্থ পগের অঙ্গে (উদ্গাত স্তম্ভের গাত্রে), আটটি ক্ষুদ্রতর, অগভীর কুলুঙ্গির ভিতর, রচিত হয় অষ্টদিকপালের মূর্তি, সঙ্গে নিয়ে তাঁদের বাহন। উত্তরে সপ্ত কলসের বাহনে ধনাধিপতি কুবের, উত্তর পূর্বে হরিণ বাহনে বায়ুর অধিপতি পবন, উত্তর পশ্চিমে মকর বাহনে জলাধিপতি বরুণ, দক্ষিণ পশ্চিমে নর বাহনে নৈঋর্ত, দক্ষিণ পূর্বে মহিষ বাহনে মৃত্যু দেবতা

যম, মেষ বাহনে অগ্নি, ঐরাবতের পৃষ্ঠে দেবরাজ ইন্দ্র, বৃষ বাহনে ঈশান বা মহাদেব। তাঁরা অধিকার করে আছেন পুরাণে বর্ণিত দিক।

ক্ষোদিত হয় অনর্থপগের অঙ্গে, বৃক্ষের নিচে অষ্ট সখীর মূর্তি, নির্গত তাদের অঙ্গ বারাণ্ডি থেকে। অপরূপ, সুন্দরতম এই নারী মূর্তিগুলি, লাস্যময়ী দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন অনবদ্য ভঙ্গীতে। বাদ যায় না নাগ আর নাগিনী মূর্তি—সর্পের পূজারী হিন্দুরা, পূজা করেন মনসা, বাসুকী, তক্ষক ও আরও কত সর্পকে। তাই অধিকার করে এক বিশিষ্ট স্থান নাগ আর নাগিনীরা উড়িষ্যার মন্দির অলঙ্করণে—তারা কেউ এক ফণা যুক্ত, কারও শীর্ষে শোভা পায় একাধিক ফণা।

ব্যবহৃত হয় জন্তুও মন্দির অলঙ্করণে। প্রধান তাদের মধ্যে শার্দূল বা সিংহ। কেউ কর্ণ উঁচু করে বীর বিক্রমে দাঁড়িয়ে আছে অবনত হস্তীর পৃষ্ঠের উপর, কোণক আর অনর্থ পগের অন্তবর্তী কুলুঙ্গীর ভিতর। মহা পরাক্রমশালী কেউ, দাঁড়িয়ে আছে হস্তীর পৃষ্ঠের উপর, বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হস্তী, শুণ্ডে ধারণ করে আছে একটি দানব, দাঁড়িয়ে আছে রাহা আর অনর্থ পগের মধ্যবর্তী কুলুঙ্গির ভিতর। দাঁড়িয়ে আছে বীরদর্পে, হস্তীর পৃষ্ঠের উপর, পৃষ্ঠে উপবেশন করে চালান সেই হস্তী, কোথাও নর, কোথাও নারী, লাগামের অঙ্গ থেকে বিলম্বিত হয় বহুমুল্য ঝালর। দাঁড়িয়ে আছে তারা বিমান আর জগমোহনের সন্ধিস্থলে কুলুঙ্গির ভিতর। দাঁড়িয়ে আছে শৃঙ্গী, উন্নত-কর্ণ কেশরী, মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথের দুই পাশে। মুখ বাড়িয়ে আছে বিমানের অঙ্গ থেকে, শোভা করে আছে জগমোহনের শীর্ষদেশ, আছে কত বিভিন্ন স্থানে, কত বিভিন্ন আর বিচিত্র রূপে।

সিংহের পরেই হস্তীর স্থান। বাহন তারা শার্দূলের। রচিত হয় হস্তীর সারি জঙ্ঘার অঙ্গে। দাঁড়িয়ে আছে এক প্রস্তর হস্তী, অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে, সারি দেউলে আর কোণারকের সূর্য মন্দিরে। অপরূপ, জীবন্ত এই হস্তী মূর্তিগুলি, শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে কোণারকের হস্তীটি।

হস্তীর পরেই অশ্ব, দাঁড়িয়ে আছে অশ্ব পীঢ়ের অঙ্গে। বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ অশ্ব কোণারকের সূর্য মন্দির। মহাপরাক্রমশালী এই অশ্বগুলি অপরূপ, শোভন গঠন, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের প্রতীক।

অলঙ্কৃত হয় বৃষ, গরু, হরিণ, খরগোস, রাজহংস, বানর আর মকর দিয়েও। জীবন্ত তারা। সুন্দরতম লিঙ্গরাজের মন্দিরের দেবতার বাহন এক প্রস্তর বৃষটি। অভিনব উড়িষ্যার মন্দিরের মকরের মূর্তিগুলিও। বিকশিত তাদের দন্ত, বিস্তৃত তাদের পক্ষ ও পুচ্ছ, অনুরূপ চালুক্য ভাস্কর্যের রচিত মকরের মূর্তির, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার মহা অভিজ্ঞ ভাস্করেরও।

সাজান উড়িষ্যার ভাস্কর মন্দিরের প্রবেশ পথও অনুপম সাজে। শোভিত করেন তাদের সম্মুখ ভাগের তিন দিকও তিন শ্রেণীর অলঙ্করণ দিয়ে, সবগুলিই লতার অলঙ্করণ—কেউ বুকে নিয়ে আছে শুধুই পুষ্প, কেউ পুষ্প আর নর অথবা জন্তুর মূর্তি। সুন্দরতম তাদের পরিকল্পনা, সূক্ষ্মতম, নিখুঁত রূপ দান।

এই লতাপুষ্প দিয়েই রচিত হয় দ্বারের অঙ্গের কাঠাম, অলঙ্কৃত করা হয় তার সর্বাঙ্গ। শোভিত হয় উপরের চৌকাঠের অঙ্গ কোথাও লতা দিয়ে, কোথাও নর ও নারীর কাল্পনিক দৃশ্য দিয়ে। কোথাও শোভা পায় সারি সারি উড্ডীয়মান অপ্সরা। অপরূপ এই মূর্তিগুলিও। উর্ধ্ব চৌকাঠের কেন্দ্র স্থলে প্রক্ষিপ্ত শিলার উপর রচিত হয় মহামহিমময়ী লক্ষ্মীর মূর্তি। মূর্তি গজ লক্ষ্মীর, মূর্তি মহালক্ষ্মীরও। একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর উপবিষ্ট গজলক্ষ্মী, বিলম্বিত তাঁর দক্ষিণ পদ। তাঁর দুই পাশে দুই হস্তী। উত্তোলিত তাদের শুণ্ড দেবীর মস্তকের উপর, নিযুক্ত তারা তাঁর শিরে বারি সিঞ্চনে। প্রস্ফুটিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট মহালক্ষ্মীও, কিন্তু নাই তাঁর দুই পাশে দুই গজ, সহচর গজ লক্ষ্মীর।

বাজুর দুই পাশে রচিত হয় পীঢ় দেউলের প্রতীক, তাদের দক্ষিণে মকর বাহনে গঙ্গা আর কূর্ম বাহনে যমুনা। বামে মহাকাল আর নন্দী। ক্ষোদিত হয় প্রবেশ পথের সম্মুখে নবগ্রহের মূর্তি, মূর্তি রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, কেতু আর রাহুর, কল্যাণদাতৃ তাঁরা মানবের, দান করেন স্বাস্থ্য, সম্পদ আর সমৃদ্ধি। অলঙ্কৃত হয় নবগ্রহের মূর্তি দিয়ে শ্রীদেউল আর জগ-মোহনের সন্ধি স্থলের প্রবেশ পথও।

রচিত হয় মন্দিরের গাত্রে জালির বাতায়নও, বিভিন্ন তাদের আকৃতি, কেউ চতুষ্কোণ, কেউ অষ্ট, কেউ আয়ত ক্ষেত্র, কেউ কারুকার্য বিহীন—নিরাভরণ, শোভিত কারও অঙ্গ সুন্দরতম লতা পুষ্প আর মূর্তি দিয়ে। শোভিত হয় মন্দিরের গাত্র বিভিন্ন অনবদ্য পুষ্প সম্ভার দিয়েও।

লাভ করে উড়িষ্যার মন্দিরের প্রতিটি অঙ্গ মহা অভিজ্ঞ ভাস্করের হস্তের স্পর্শ, সিঞ্চিত হয় তাঁর মনের অপরিসীম মাধুরীতে, মহিমন্বিত হয় হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্যে, প্রাণবন্ত হয়, হয় বাঙ্ময়ও। পরিণত হয় শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম সৃষ্টিতে, অবিনশ্বর কীর্তিতে, পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের ভাস্কর্যের দরবারে, বিশ্বজিৎ হয়।

৬ই মে আমরা পুরী থেকে স্টেশন-ওয়াগনে চড়ে ভুবনেশ্বর অভিমুখে রওনা হই। অতিক্রম করে যাই কত সর্পিল পথ, কত ঘনবসতি, কত গ্রাম-উপবন, কত স্রোতস্বিনী, কত দিগন্ত-প্রসারী প্রান্তর, স্পর্শ করে যাই পবিত্র সাক্ষী-গোপালের পদতল, দর্শন করে যাই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতা সাক্ষীগোপালকে। ঘুরে ঘুরে দেখি তাঁর ক্ষুদ্র মন্দিরটি, তার অঙ্গের শিল্প-সম্পদ আর মূর্তি-সম্ভার, মহা পবিত্র ভুবনেশ্বরে উপনীত হই। লিঙ্গরাজের মন্দিরের সামনে এসে আমাদের মোটর থামে।

অভিহিত ভুবনেশ্বর একাম্রকানন নামেও স্কন্দ পুরাণে। বিবাহ করেন কৈলাসপতি মহাদেব, হিমালয়-দুহিতা গিরিকুমারী গৌরীকে, বাস করেন এসে সপত্নী শ্বশুর-আলয়ে হিমালয়ে। মাতৃমুখে পতিনিন্দা শুনে ক্রুদ্ধা হন গৌরী। পরিত্যাগ করেন স্বামীর সঙ্গে পিতৃগৃহ। প্রসিদ্ধ তীর্থ প্রয়াগ অতিক্রম করে, তাঁরা বৃষভবাহনে, দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গার তীরে বারাণসী ধামে উপনীত হন। আশুতোষের আদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেন সেখানে একটি স্বর্ণনগর, পরিপূর্ণ সুদৃশ্য হর্ম্যরাজিতে। মহা পবিত্র সেই নগর, বাস করেন এসে সেই নগরে কত মহারাজা, কত নৃপতি, কত শ্রেষ্ঠী। পরিণত হয় বারাণসী ভারতের অন্যতম প্রাচীনতম মহাসমৃদ্ধিশালী নগরে, মহাতীর্থে পরিণত হয় কাশীর মণিকর্ণিকাও।

বহুবর্ষ অতিবাহিত হয়, মহাতীর্থ বারাণসীতে কোটি লিঙ্গ স্থাপন করে, পশুপতি কৈলাসে ফিরে যান। আসে দ্বাপর যুগ। কাশীরাজ অধিরোহণ করেন বারাণসীর সিংহাসনে। মহাপরাক্রমশালী তিনি শিবের বরে, মনস্থ করেন গিরিবজ্র (মগধ) রাজ মহাশক্তিশালী জরাসন্ধের হত্যার প্রতিশোধ নিতে, হত্যাকারী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে আঘাত করতে। তাঁকে বার বার যুদ্ধে আহ্বান করেন।

অবগত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণ পশুপতির বরের কথা। নিক্ষেপ করেন তিনি তাঁর হস্তে ধৃত সুদর্শন চক্র, দ্বিখণ্ডিত হয় তার আঘাতে কাশীরাজের মস্তক, ভস্মীভূত হয় তার দীপ্তিতে মহাসমৃদ্ধিশালী বারাণসী নগরও।

মহাকুপিত হন পশুপতি, বৃষভারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হন, হস্তে নিয়ে পাশুপত অস্ত্র। ভস্মীভূত হয় সুদর্শন চক্রের তেজে তাঁর হস্তের পাশুপতও। ভীত, কম্পিত বৃষধ্বজ তখন পুরুষোত্তমের স্তব-স্তুতিতে নিযুক্ত হন। সন্তুষ্ট হন তাঁর স্তুতিতে পুরুষোত্তম, অবতীর্ণ হন তাঁর সম্মুখে, গরুড়বাহনে, পদ্মাসনে, বনমালায় অলঙ্কৃত হ'য়ে। তাঁর শিরে শোভা পায় মুকুট, কণ্ঠে হার, কর্ণে কুণ্ডল, মণিবন্ধে কেয়ূর। বাম অঙ্কে তাঁর কমলাদেবী, দক্ষিণপার্শ্বে সত্যভামা।

বলেন বাসুদেব, কেন তাঁর এই দুর্মতি? কোন্ সাহসে তিনি ক্ষুদ্র নরের পক্ষ নিয়ে বাসুদেবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন?

বিশ্বনাথ স্বীকার করেন তাঁর নিজের দোষ। কৃত অপরাধের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করেন। সন্তুষ্ট হন মূলাধার ভগবান। বলেন যেতে হবে তাঁকে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে, একাম্রকাননে। মহাপবিত্র এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। সেখানে দক্ষিণ-সাগরের তটভূমে, নীলগিরিতে, দেহ চতুষ্টয় ধারণ করে, নীলকান্ত মণিময় বিগ্রহে আমি অবস্থিত। বলেন শ্রীকৃষ্ণ, তবেই স্থায়ী হবে তাঁর গৌরীর সঙ্গে ধরাধামে বাস, পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে বারাণসী নগরীও।

আশুতোষ সম্মত হন, বিরাজ করেন এসে একাম্রকাননে গৌরীর সঙ্গে, পরিচিত হন ত্রিভুবনেশ্বর নামে, অভিষিক্ত হন কোটি লিঙ্গের রাজ পদে। মহাপবিত্র তীর্থে পরিণত হয় একাম্রকাননও।

পুরুষোত্তমের পথে, উপনীত হন এই একাম্রকাননে মালবাধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন। সঙ্গী তাঁর দেবর্ষি নারদ, পথ-প্রদর্শক সসৈন্যে ওড্ররাজ। তিনি দান করেন দেবতার প্রীত্যর্থে বিপ্রগণকে অসংখ্য হস্তী, তুরগ, ধনরত্ন, বসন আর বিভূষণও। বিন্দুসরোবরের পবিত্র জলে স্নান করে, অর্চনা করেন ত্রিভুবনেশ্বরকে ভক্তিভরে। সন্তুষ্ট হন তাঁর অর্চনায় ত্রিভুবনেশ্বর, বলেন—পূর্ণ হবে নৃপতির মনস্কাম; দর্শন হবে নীলমাধব। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও এই ভুবনেশ্বরে এসে শম্ভুকে দর্শন করেন। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে এই ভুবনেশ্বরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল উড়িষ্যায় কলিঙ্গের শাসন। অলঙ্কৃত করেন যখন নন্দ বংশের নৃপতিরা মগধের

সিংহাসন পাটলিপুত্রে, রাজত্ব করেন কলিঙ্গ দেশে মহাপরাক্রমশালী রাজারাও, স্থাপিত হয় তাঁদের রাজধানী এই ভুবনেশ্বরের নিকটে তোসলীতে। কলিঙ্গ বিজয়ের পর দীক্ষিত হন মৌর্য-সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মে, পরিচিত হন প্রিয়দর্শী নামে, ধর্মাশোকে পরিণত হন, লিপিবদ্ধ করেন ভুবনেশ্বরের নিকটে ধউলিগিরি বা ধবলগিরিতে তাঁর অনুশাসন। প্রচারিত হয় বুদ্ধের বাণী, শান্তির আর অহিংসার বাণী ধবলগিরির শীর্ষদেশ থেকে, পরিণত হয় ধবলগিরি বৌদ্ধ-মহাতীর্থে। আবার এই ভুবনেশ্বরের পুর্বদিকে শিশুপালগড়ে রাজধানী স্থাপন করেন ভারত-বিজয়ী, কলিঙ্গশ্রেষ্ঠ চেত বংশের মহাপরাক্রমশালী খারবেল, পরিচিত কলিঙ্গনগর নামেও। বিবাহ হয় চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীরের পিতৃস্বসার কলিঙ্গনৃপতি জিতারির সঙ্গে। দীক্ষিত হন তিনি জৈনধর্মে। বাস করেন তিনি ভুবনেশ্বরের নিকটে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে। কঠোর তপস্যা করে তিনি লাভ করেন সিদ্ধি, পরিণত হন অর্হতে। পরিণত হয় খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিও জৈন-মহাতীর্থে, বাসস্থান কত জৈন শ্রমণের। সেখান থেকে প্রচারিত হয় জৈনধর্ম, হয় মহাবীরের বাণী সারা কলিঙ্গ দেশে। ধবলগিরিতে আর খণ্ড ও উদয় গিরিতে, তার পর্বত শীর্ষে বৌদ্ধ আর জৈনরা ধর্ম প্রচার করেন। বাস করেন কত শত মুনি ঋষি তার প্রান্তরে, তার বনে-উপবনে, নিযুক্ত থাকেন তাঁরাও কঠোর তপস্যায়। মহাতীর্থে পরিণত হয় ভুবনেশ্বর, রূপ পরিগ্রহ করে এক মহাপুণ্য ভূমির। কেন্দ্রস্থল হয় বিভিন্ন ধর্মের আর সভ্যতার, বিভিন্ন সংস্কৃতির আর কৃষ্টিরও যুগে যুগে। গড়ে ওঠে একে একে এই পুণ্যভূমি ভুবনেশ্বরের বুকে জৈন, বৌদ্ধ, শৈব ও বৈষ্ণব সংস্কৃতি আর কৃষ্টি।

তান্ত্রিক মতাবলম্বী তার কর-বংশের নৃপতিরা, তাঁরা নির্মাণ করেন কপালিনীর মন্দির ভুবনেশ্বরে, পূজিত হন সেই মন্দিরে তান্ত্রিক দেবী বিকটাকারা, চামুণ্ডা, শোভিত হয় তার গর্ভগৃহের প্রাচীরগাত্র সপ্ত মাতৃকা ও আর পনেরটি তান্ত্রিক দেবী-মূর্তি দিয়ে। পরিণত হয় কপালিনীর মন্দির প্রধান তান্ত্রিক পীঠে, তান্ত্রিক মতবাদের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলেও পরিণত হয় ভুবনেশ্বর।

গাড়ী থেকে নেমে, স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি মন্দিরের দিকে। দাঁড়িয়ে

আছে বিশ্ববিখ্যাত লিঙ্গরাজের দেউল, বৃহত্তম ও সুন্দরতম মন্দির ভুবনেশ্বরের। অন্যতম বৃহত্তম ও সুন্দরতম মন্দির ভারতের—শহরের কেন্দ্রস্থলে এক মহা মহিমময় মূর্তিতে, উর্ধ্বে তুলে আছে তার ১৬৫ ফুট উচ্চ শির। দাঁড়িয়ে আছে পাঁচশত কুড়ি ফুট দীর্ঘ ও চারিশত পঁয়ষট্টি ফুট প্রস্থ চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে, সঙ্গে নিয়ে আছে কয়েকটি ক্ষুদ্র মন্দিরের সমষ্টি। বেষ্টিত হয়ে আছে মন্দিরটি সাড়ে সাত ফুট গভীর সুউচ্চ দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে। মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য ভিতরের দিকে, প্রাচীরের সংলগ্ন একটি সুউচ্চ মঞ্চও আছে। প্রাচীরের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত দেশে ভেটমণ্ডপ, একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, মিলিত হন এখানে, মহা আড়ম্বরে, লিঙ্গরাজ তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে রথযাত্রা থেকে ফিরে এসে।

দাঁড়িয়ে আছে উত্তরে, দক্ষিণে আর পূর্বে, তিনটি প্রবেশ-দ্বার মন্দিরের। পরিচিত উত্তরের মহিমময় প্রবেশ-দ্বারটি সিংহ-দরজা নামে। নির্মিত পীঢ় দেউলের অনুকরণে; বিভিন্ন দ্রাবিড় মন্দিরের প্রবেশ পথের মহামহিম গোপুরমের সঙ্গে; দুইপাশে নিয়ে আছে এই সিংহ দুয়ার দুইটি জীবন্ত, দুর্ধর্ষ সিংহ।

পূর্ব প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে, একটি সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে আমরা প্রাঙ্গণে উপনীত হই। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মন্দিরের সুউচ্চ মঞ্চে উপস্থিত হই। মন্দিরটি একটি সুউচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আছে, বিভক্ত হ'য়ে আছে চারি অংশে। বিমান অথবা দেউল, অভিহিত শ্রীমন্দির নামেও। জগমোহন, নাটমন্দির আর ভোগমন্দির।

সঠিক জানা যায় না কে এই মন্দিরের নির্মাতা। উল্লিখিত আছে মাদলা পঞ্জীতে, কেশরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা, মহাপরাক্রমশালী যযাতি কেশরী সুরু করেন এই মন্দিরের দেউল আর জগমোহনের নির্মাণ, শেষ করেন সেই নির্মাণ ললাটেন্দু কেশরী, ৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকেরা বলেন কেশরী বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা উদ্যোত কেশরী নবম শতাব্দীতে এই মন্দিরের দেউল আর জগমোহনটি নির্মাণ করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই নির্মিত হয় ভোগমন্দিরটিও নির্মাণ করেন গঙ্গ বংশের অধিনায়ক ভীমদেব, পরিচিত অনঙ্গ ভীমদেব নামেও অলঙ্কৃত করেন তিনি উড়িষ্যার সিংহাসন ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সূর্যবংশের

প্রতিষ্ঠাতা কপীলেশ্বরদেব দান করেন বহু সম্পত্তি, লিঙ্গরাজের প্রতিদিনের সেবার ও পূজার জন্য। লেখা আছে মন্দিরের অঙ্গের বিভিন্ন শিলালেখে।

পঞ্চরত্ন দেউল—এই বিমানটিই শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের বিস্তার করে আছে আধিপত্য সমস্ত ভুবনেশ্বর শহরের উপর, উন্নত করে আছে সুবিশাল স্পর্ধিত, তার গগনচুম্বী মহামহিমময় শির। গর্ভগৃহে বিরাজ করেন মন্দিরের আরাধ্য-দেবতা শ্রীলিঙ্গরাজ মহাপ্রভুর এক বিশাল শক্তিপীঠ; পূজিত হন শ্রীশ্রীলিঙ্গরাজদেব হরিহররূপে। প্রবর্তন করেন এই হরিহরের পূজা গঙ্গ বংশীয় অনঙ্গ ভীমদেবই। নিষিদ্ধ হয় পূর্ব প্রচলিত শুধু হরের পূজা, মহাতীর্থে পরিণত হন লিঙ্গরাজ পবিত্র তীর্থ শৈবদের, পুণ্যতীর্থ বৈষ্ণবদেরও। মিলন হয় এখানে শৈব ও বৈষ্ণবের। আজও প্রতিদিন সমাগত হন এখানে, সহস্র যাত্রী, আসেন কতশত পরিব্রাজকও, ধন্য হন শ্রীভুবনেশ্বরকে পূজা দিয়ে, সাথক হয় তাঁদের জীবন এই মন্দিরের অঙ্গের সুন্দরতম অলঙ্করণ দেখে।

আমরাও ভক্তিভরে দেবাদিদেব হরিহরকে পূজা দিয়ে, মন্দির দর্শন সুরু করি।

দেখি, বিমানটি একটি প্রস্তরনির্মিত চতুর্ভুর্জ ভিত্তির ক্ষেত্রের উপর দাঁড়িয়ে আছে, বিস্তৃত হ'য়ে আছে তার ভিত্তির পার্শ্বদেশ ছাপ্পান্ন ফুট পরিধি নিয়ে। রচিত হয় তলাপত্তনের উপর সাড়ে দশ ফুট দশটি পংক্তি দিয়ে উঁচু বিমানের জঙ্ঘা, বিভক্ত হয় বাঢ়, উর্ধ্ব জঙ্ঘা, উর্ধ্ববারাণ্ডি, বন্ধন, নিম্নবারাণ্ডি ও নিম্ন-জঙ্ঘাতে। উর্ধ্বজঙ্ঘার উপরে কোণক পগের অঙ্গেও রচিত হয় একের পর এক অনুরূপ অনুভূমিক ক্রমহ্রস্বায়মান সারি, উপনীত হয় একশ পঁচিশ ফুট উঁচুতে অবস্থিত গ্রীবা বা বেঁকী পর্যন্ত। গ্রীবার উপর সুবিশাল বৃত্তাকার শিরাযুক্ত আমলক-শিলা, স্কন্ধে নিয়ে আছে সিংহ। তার উপরে কলস। কলসের উপরে শোভা পায় ত্রিশূল, শিবের প্রতীক।

বাঢ়ের শীর্ষদেশে. পগের অঙ্গেও রচিত হয় একের পর এক অনুরূপ নয়টি অনুভূমিক সারি। তার উপরে একটি রেখ দেউল, ক্ষুদ্র সংস্করণ তার নিজের। রেখ দেউলের উপর ছয়টি অনুরূপ সারি, তার উপরে আর একটি রেখ দেউল। তার উপরে চারিটি সারির উপর আরও একটি রেখ দেউল। আবার একটি সারির উপর একটি রেখ দেউল। ক্রমহ্রস্বায়মান এই রেখ দেউলগুলিও

স্পর্শ করে বিমানের গ্রীবা। রেখের বারাণ্ডির অঙ্গে শোভা পায় একটি লক্ষ্মীমূর্তি।

অনুরূপ অনুভূমিক পংক্তি দিয়ে জঙ্ঘার উপরিস্থিত রাহাপগের অঙ্গও শোভিত হয়। বাড়ের শীর্ষদেশে, উদ্গত শিলাখণ্ডের উপর পদ্মভো বিরাজ করেন, দুইপার্শ্বে নিয়ে দুইটি সহচর। তার একটি সিংহ, মহাশূন্যে লম্বিত তার দেহ। জগমোহনের বিপরীত দিকের রাহাপগের অঙ্গে, ষষ্ঠ ভূমিতে একটি অপরূপ সিংহ।

জঙ্ঘার কেন্দ্রস্থলে শোভা পায় উল্লম্ব বন্ধনী, বন্ধনীর শীর্ষদেশে ক্ষুদ্রতর দেউল। অঙ্গে নিয়ে আছে এই দেউলের গাত্র মূর্তিসম্ভার। সুস্পষ্ট নয় এই মূর্তিগুলি, নিশ্চিহ্ন হয়েছে কালের নির্মম হস্তে।

দাঁড়িয়ে আছে বিমানের তিন দিকে—দক্ষিণে, উত্তরে আর পশ্চিমে কেন্দ্রস্থলের সুগভীর কুলুঙ্গির সন্নিকটে তিনটি দ্বিতল মন্দির। এই তিনটি কুলুঙ্গিতে পার্শ্ব দেবতারা বিরাজ করেন। তাঁদেরই মোহন এই মন্দিরগুলি শীর্ষে নিয়ে আছে বিমান। স্পর্শ করে আছে পীঠের নিম্নতল, কুলুঙ্গির শীর্ষদেশ। অভ্যন্তর ভাগে গর্ভগৃহ, সেইখানে পার্শ্ব-দেবতারা বিরাজ করেন। খুব সম্ভব পরবর্তী কালে নির্মিত।

অপরূপ সুন্দরতম এই কুলুঙ্গির পার্শ্বদেবতার মূর্তিগুলি, শ্রেষ্ঠদান উড়িষ্যার ভাস্করের, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ কীর্তি এক মহাগৌরবময় যুগের। পরিদৃশ্যমান তাঁদের অঙ্গের বহুমূল্য, সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে অলঙ্কৃত বসনের প্রতিটি ভাঁজ।

পশ্চিমের কুলুঙ্গির ভিতরে, গর্ভগৃহের পিছনে এক বৃহৎ প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর ময়ূর-বাহনে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কণ্ঠে শোভা পায় বহুমূল্য রত্ন-খচিত হার, বাহুতে বাজু। জীবন্ত এই ময়ূরটিও, বিস্তৃত তার পুচ্ছ। শোভিত পদ্মের সম্মুখভাগ ও সূক্ষ্মতম লতাপুষ্প দিয়ে। তাঁর দুই পাশে ক্ষুদ্র দেবতারা দাঁড়িয়ে আছেন। ঊর্ধ্বে দুই উড়ন্ত অপ্সরা, হস্তে নিয়ে মালা। পটভূমিতে কীর্তিমুখ, তার মুখগহ্বর থেকে বিলম্বিত মুক্তার ঝালর।

উত্তরের কুলুঙ্গির ভিতর প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর সিংহের অঙ্গে হেলান দিয়ে চতুর্ভুজা পার্বতী দাঁড়িয়ে আছেন। নিবদ্ধ দেবীর আননে সিংহের দৃষ্টি, তাঁর

দুইপাশে অন্য দেবীরা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের পাশে দুই বাদকের দল—কেউ করতাল বাজান, কেউ ডমরু, কেউ বীণা। উর্ধ্বে মালা হস্তে দুই অপ্সরা। পটভূমিকায় এক সুবিশাল কীর্তিমুখ। দেবীর কণ্ঠে শোভা পায় মালা, বাহুতে বাজু, মণিবন্ধে কঙ্কণ, বামপদে মল, অঙ্গে কারুকার্যখচিত সূক্ষ্ম বসন। অপরূপ এই মূর্তিটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে!

দক্ষিণের কুলুঙ্গির ভিতরে লম্বোদর, চতুর্ভুজ দেবতা গণেশ দাঁড়িয়ে আছেন পার্শ্বে নিয়ে আছেন বাহন মূষিক, আর একটি ঝালরযুক্ত কুঠার। সর্পাকৃতি তাঁর পদের ভূষণ, সর্পাকৃতি তাঁর অঙ্গের যজ্ঞোপবীতও। অপরূপ এই মূর্তিটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান উড়িষ্যার ভাস্বরের দেখি স্তব্ধ হয়ে। দেখি বারাণ্ডির অঙ্গের কুলুঙ্গির ভিতর দিক্‌পতিদের মূর্তিও। দেখি, মেষবাহনে অগ্নি, সামনে নিয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। কুলুঙ্গির ভিতর থেকে ইন্দ্রের মূর্তিটি অপসারিত হয়েছে। অবশিষ্ট আছে শুধু বিভিন্ন জন্তুর মূর্তি, ঐরাবত, মূষিক, ময়ূর ও আরও অনেক জন্তু। দেখি, মহিষ-বাহনে যম। দেখি, একটি পদ্মের উপর বসে আছেন নৈঋর্ত। মকর বাহনে বরুণ, মৃগবাহনে পবন, বৃষবাহনে ঈশান আর কুবেরকেও দেখি।

গর্ভগৃহে বিরাজ করেন বিশালকায় দেবতা লিঙ্গরাজ। উনিশ ফুট স্কোয়ার এই গর্ভগৃহটির পরিধি, ক্রমশীর্ণায়মান হ'য়ে চিম্‌নির আকারে উর্ধ্বে উঠে তার ছাদ। দেবতাকে ভক্তিভরে পূজা দিয়ে, তাঁর মস্তক স্পর্শ করে, জগমোহনে উপনীত হই। পরিচিত জগমোহন পীঢ়া দেউল নামেও। সমসাময়িক শ্রী দেউলের, বিস্তৃত হ'য়ে আছে জগমোহন বাহাত্তর ফুট দীর্ঘ ও ছাপ্পান্ন ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, উন্নত করে আছে একশ ফুট উঁচু শির। চৌত্রিশ ফুট উঁচু তার বাঢ়ও, বিভক্ত হয়ে আছে পাঁচটি ভাগে—উর্ধ্ব-জঙ্ঘা, উর্ধ্ব-বারাণ্ডি বন্ধন, নিম্ন-বারাণ্ডি আর নিম্ন-জঙ্ঘাতে, অনুরূপ বিমানের বাঢ়ের। চতুষ্কোণ বাঢ়ের শীর্ষদেশে, ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠে যায় জগমোহনের গর্ভগৃহের ছাদও ক্রমহ্রস্বায়মান পিরামিডের আকৃতিতে, শীর্ষে নিয়ে আমলক শিলা আর চূড়া। মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখি তার সুমহান রূপ। দক্ষিণ প্রবেশপথে উপনীত হই।

শোভিত হ'য়ে আছে প্রবেশ-পথের শীর্ষদেশ লক্ষ্মীর মূর্তি দিয়ে। নাই নবগ্রহের মূর্তি, নাই কোন শিল্প-সম্ভার উদ্গত অংশের অঙ্গেও। উদ্গত অংশের

আর লক্ষ্মীর মূর্তির মাঝখানে পাড়ের অঙ্গে, মূর্তি দিয়ে কত পৌরাণিক কাহিনী রচিত হয়। দেখি, দাঁড়িয়ে আছে বৃক্ষের নিচে, দুইটি বিবসনা, পীনোন্নত-বক্ষা পরমা রূপবতী নারী মূর্তি দ্বারের দক্ষিণ পাশে। বাম পাশেও একটি। দেখি প্রথম পীঢ়া আর উদ্গত অংশের মধ্যবর্তী স্থান তিনটি ক্ষুদ্র রেখ দেউল দিয়ে অলঙ্কৃত। উদ্গত স্তম্ভের আর রেখ দেউলের মাঝখানে চারিটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দুইটি নারী।

দেখি একটি বাতায়ন, রচিত পাঁচটি স্তম্ভ দিয়ে। ভূষিত এই স্তম্ভের অঙ্গও কত অপরূপ উলঙ্গ নারীর মূর্তি দিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে নারী বৃক্ষের নিচেও, অনবদ্য বিভিন্ন ভঙ্গীতে। দেখি স্তব্ধ হয়ে, উড়িষ্যার ভাস্করের এক সুন্দরতম সৃষ্টি। অলঙ্কৃত হয়ে আছে বাতায়নের চারিদিক তিনটি করে বন্ধনী দিয়ে, বুকে নিয়ে আছে প্রথম দুইটির অঙ্গ ঝালর, তৃতীয়টির অঙ্গে শোভা পায় কত জন্তুর মূর্তি, অস্পষ্ট কালের করালে।

শীর্ষে নিয়ে আছে দুই পাশের উদ্গত স্তম্ভ, সুন্দরতম বামনের মূর্তি, নিযুক্ত তারা পীঢ়া উত্তোলনে। প্রথম পীঢ়া আর নিম্নতম পীঢ়ার মধ্যবর্তী স্থানেও রচিত হয় তিনটি ক্ষুদ্র রেখ দেউল। অপরূপ, সুন্দরতম প্রান্তদেশের উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গের শিল্পসম্ভার, ভূষিত ঝালর ও জন্তুর মূর্তি দিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে হস্তীযূথ নিম্নতম পীঢ়ার নিম্নাংশে। দেখি অঙ্গে নিয়ে আছে পিরামিড অংশ একের পর এক নয়টি পীঢ়া, তার উপর একটি প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠের উপর আবার অনুরূপ সাতটি পীঢ়া, তার উপর বেঁকী। রচিত হয় পীঢ়ার গাত্রে মূর্তি দিয়ে যুদ্ধের দৃশ্য। যুদ্ধ করেন পদাতিক সৈন্যগণ, হস্তে নিয়ে অসি আর ধনুর্বাণ। দেখি অশ্ব আর হস্তীও, কেউ পৃষ্ঠে নিয়ে আরোহী, কেউ আরোহী-বিহীন, ভূষিত তাদের অঙ্গ বহুমূল্য ভূষণে।

দেখি, চতুর্থ পীঢ়ার অঙ্গে রচিত কয়েকটি উদ্গত ক্ষুদ্র পীঢ়া দেউল, তাদের ফাঁকে ফাঁকে কপাট। উর্ধ্বে উদ্গত শীলার উপরে জগমোহনের সিংহ, বীর বিক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরের একটি কপাটের অঙ্গে শোভা পায় একটি শিবলিঙ্গ। তাঁর সামনে উপবিষ্ট দুই পূজারী, নিযুক্ত শিবপূজায়। দক্ষিণের ছয়টি কপাটের অঙ্গে, মূর্তি দিয়ে বর্ণিত হয় রামায়ণের ও মহাভারতের কাহিনী। দেখি মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন পাণ্ডবগণ। অপরূপ এই দৃশ্যটি নিখুঁত।

নিম্নের দক্ষিণের কপাটের অঙ্গেও চারিটি মূর্তি। তাদের মধ্যে দুজনের হস্তে শোভা পায় ধনুর্বাণ। রাম আর লক্ষ্মণ তাঁরা। লঙ্কেশ রাবণের কারাগার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন সীতাদেবীকে। সঙ্গে আছেন একজন পরিচারিকা। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

জগমোহন দেখে, আমরা নাটমন্দির দেখতে যাই। দাঁড়িয়ে আছে আড়াই ফুট উঁচু ভিত্তির উপর। উনিশ ফুট তার বাঢ়ের উচ্চতা। ক্রমনিম্ন হয়ে আসে তার নয়টি খিলানযুক্ত ছাদ। নাই শীর্ষদেশে শ্রী, আমলক, কলসও নাই। বাহান্ন ফুট স্কোয়ার চতুষ্কোণ এই নাটমন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে চারিটি সমকোণি স্তম্ভ; দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভগুলি প্রায় ছ'ফুট উঁচু চতুষ্কোণ স্তম্ভমূলের উপর, নাই তাদের অঙ্গে কোন শিল্প সম্ভার।

দেখি বিভক্ত হয়ে আছে শিখারা দশটি বন্ধনী দিয়ে, তাকের অঙ্গে রচিত হয়েছে ক্ষুদ্র দেউলের শ্রেণী।

দেখি, নাট-মন্দিরের প্রতিটি প্রাচীরের পাশে তিনটি করে দ্বার। পুর্বদিকের দ্বার দিয়ে ভোগমণ্ডপে উপনীত হতে হয়, পশ্চিমের দ্বার দিয়ে জগমোহনে, সংযুক্ত উত্তর পূর্ব দ্বার দেবতার বাহন বৃষভের মন্দিরের সঙ্গে। দেখি, উত্তর আর দক্ষিণের কেন্দ্রস্থলের দ্বারের তাকের উপর নবগ্রহের মূর্তি। তাদের উপরে বেতাল আর লক্ষ্মী। দাঁড়িয়ে আছে চারিটি যৌবন মদোন্মত্তা পরমা সুন্দরী নারীও তাকের উপরে। তাদের উপরে দুই কপাটের অঙ্গে দুই বেতাল, নিযুক্ত নাটমন্দির উত্তোলনে। নাই কোন কারুকার্য দ্বারের পার্শ্বদেশে, নাই শীর্ষদেশেও কোন শিল্পসম্ভার, নাই নাটমন্দিরের গাত্রেও, সমৃদ্ধিশালী নয় ভাস্করের হস্তর স্পর্শে। দেখি অলঙ্কৃত বাজুর অঙ্গও কত মূর্তি দিয়ে, মূর্তি কত নর নারীর। অশ্লীল এই মূর্তিগুলি, অশোভনও দ্বারের বাজুর অঙ্গে। দেখি, পীঢ়া দিয়ে অলঙ্কৃত উত্তর দিকের কেন্দ্রস্থলের দরজাটির দুই পাশ। বিষ্ণু আর শিব দাঁড়িয়ে আছেন, দুই দ্বারে, প্রহরী তাঁরা মন্দিরের।

সেখান থেকে, ভোগমণ্ডপে উপনীত হই। সমসাময়িক নাটমন্দিরের, তিন ফুট উচ্চ মঞ্চের উপর ভোগমণ্ডপটি দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ষে নিয়ে কলস, কর্পূরী, শ্রী আর বেঁকী। মঞ্চের গাত্রে, ক্ষোদিত দুই সারিতে পীঢ়া আর স্তম্ভ, তাদের ফাঁকে ফাঁকে মূর্তি—মূর্তি কত নর আর নারীর, আছে তারা বিভিন্ন আর

বিচিত্র অশ্লীল ভঙ্গিতে, ভঙ্গি কত মৈথুনের। চতুষ্কোণ ভোগমণ্ডপটি অধিকার করে আছে ছাপ্পান্ন ফুট আড়াই ইঞ্চি স্কোয়ার পরিধি। সাড়ে বিয়াল্লিশ স্কোয়ার তার ভিতরের আয়তন। বাঢ়ের উচ্চতা সাড়ে তের ফুট।

রচিত হয়েছে দুইটি কারুকার্যবিহীন গবাক্ষ ভোগমণ্ডপের পূর্বদিকের সম্মুখ ভাগে, কেন্দ্রস্থলের দ্বারের দুইপাশে, দুইটি করে উত্তর আর দক্ষিণের সম্মুখ ভাগেও।

ভোগমন্দির দেখে, আমরা সোপান অতিক্রম করে, একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উপস্থিত হই। বুকে নিয়ে আছে এই কক্ষটি একটি লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি। কালাপাহাড় ধ্বংসে পরিণত করেছেন এই মূর্তিটিকে, অঙ্গে নিয়ে আছে মূর্তিটি তাঁর অত্যাচারের চিহ্ন।

ভোগমন্দিরের বিপরীত দিকে, দু'ফুট মঞ্চের উপর সাত ফুট ব্যাস বিশিষ্ট প্রস্তরস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভ বৃষ আর গরুড়, বাহন শিবের আর বিষ্ণুর মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী যুগ্ম দেবতা হরিহরের। দ্রাবিড়স্থানে, শীর্ষে নিয়ে থাকে এই স্তম্ভ শুধু বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের মূর্তি ; বিষ্ণু-মন্দিরের বিপরীত দিকে। শৈব-মন্দিরে বসে থাকেন বৃষ বা নন্দী, শিবের বাহন, মন্দিরের বিপরীত দিকে, গর্ভগৃহে বিরাজিত দেবতার দিকে মুখ করে।

সেখান থেকে নাটমন্দিরের ভিতর দিয়ে আমরা বৃষভের মন্দিরে উপনীত হই। একটি পীঢ়া দেউল, ক্ষুদ্রতর নির্মিত এই মন্দিরটিও পরবর্তী কালে। বুকে নিয়ে আছে তার গর্ভগৃহ একটি উপবিষ্ট মহামহিমময় বৃষভের মূর্তি। অপরূপ, জীবন্ত এই মূর্তিটি, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের, দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে।

বার হ'য়ে এসে ঘুরে ঘুরে দেখি বিমানের অঙ্গের শিল্পসম্ভার। রচিত হয় স্তম্ভযুক্ত গবাক্ষ তার দক্ষিণের সম্মুখভাগে, পূর্বদিকের সম্মুখভাগের গাত্রেও হয়। তার কপাটের অঙ্গে একটি সূর্যদেবতার মূর্তি ক্ষোদিত। চার-অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করে অগ্রসর হন দেবতা সবিতা, সঙ্গে নিয়ে সারথি অরুণ। উত্তরদিকের সম্মুখভাগের রাহপগের অঙ্গে কয়েকটি বিষ্ণুর মূর্তি দেখি। পশ্চিম-দিকের সম্মুখভাগে গবাক্ষের দুই পার্শ্বে, দুই কপাটের অঙ্গে দুইটি ময়ূর-বাহনে চতুর্ভুজ কার্তিকেয়র মূর্তি দেখি। হস্তে নিয়ে আছেন দেব-সেনাপতি খড়্গ, কমণ্ডলু, ত্রিশূল আর ডমরু।

সেখান থেকে গোয়ালিনী মন্দিরে যাই। দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দিরটি জগমোহনের উত্তরদিকে, অঙ্গে নিয়ে আছে তার শীর্ষদেশের গম্বুজ বহু উদ্গত স্তম্ভ। অনুরূপ এই মন্দিরটির শীর্ষদেশ বিমানের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত সাবিত্রীর মন্দিরের শীর্ষদেশের। দেখি, একে একে লক্ষ্মী-নৃসিংহ বিশ্বকর্মা, সাবিত্রীদেবী, চণ্ডেশ্বর, নিশাপার্বতী ও একাম্রনাথের মন্দির। তারপর ভগবতীর মন্দিরে উপনীত হই। পরিচিত পার্বতীর মন্দির নামেও, দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি উত্তর-পশ্চিম কোণে, নির্মিত হয় পরবর্তী কালে। ক্ষুদ্রতর সংস্করণ লিঙ্গরাজের মন্দিরের, বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও বিমান, জগমোহন, নাট-মন্দির আর ভোগমন্দির। অঙ্গে নিয়ে আছে অনবদ্য সুন্দরতম অলঙ্করণ, সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার ও জীবন্ত মূর্তিসম্ভার—শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার স্থপতির আর ভাস্করের প্রতীক তাঁদের শাশ্বত কীর্তির। দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে তার অঙ্গের পুষ্পঝালর। পুষ্পের ফাঁকে ফাঁকে ক্ষোদিত হয় কত অনুপম মূর্তি, মূর্তি কত দেবদেবীর। অপরূপ শিল্পসম্ভারে অলঙ্কৃত তাদের কুলুঙ্গির অঙ্গের চন্দ্রাতপ, কিন্তু নাই তাতে দিকপতিদের মূর্তি, অপসারিত হয়েছে সেগুলি অত্যাচারীর নির্মম হস্তে, ধ্বংসে পরিণত হয়েছে কিছু কালের করালেও। গর্ভগৃহে দেবী পার্বতী পুজিতা হন। অপরূপ এই দেবীর মূর্তিটিও বিস্ময় জাগায় মনে। ভক্তিভরে দেবীকে প্রণতি জানাই।

শ্রদ্ধা নিবেদন করি উড়িষ্যার মহা অভিজ্ঞ স্থপতি আর মহা পারদর্শী ভাস্করকে, যাঁরা নির্মাণ করেন এই মহামহিমময় লিঙ্গরাজের মন্দির, সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির ভারতের, প্রকৃষ্টতমও, জানাই তার নৃপতিদেরও, অমর তাঁরা ইতিহাসের পাতায়। অমর ভুবনেশ্বরও, বুকে নিয়ে আছে লিঙ্গরাজ। ফিরে আসি পাণ্ডার গৃহে, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও হয়নি ম্লান, অক্ষয় হয়ে আছে মনের মন্দিরে।

তার পরের দিন আমরা সকালে উঠে চা-পান ও সঙ্গের আনা খাবার খেয়ে মন্দির দর্শনে রওনা হই। যান আরও অনেক যাত্রী। আমরা অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে উপস্থিত হই। মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে মহাপবিত্র বিন্দু সরোবরের পূর্ব-তটে। লিঙ্গরাজের মন্দির থেকে অর্ধ ফারলং দূরে।

তার অঙ্গের শিলালেখ থেকে জানা যায় বাংলার রাজা অরিবর্মার মন্ত্রী
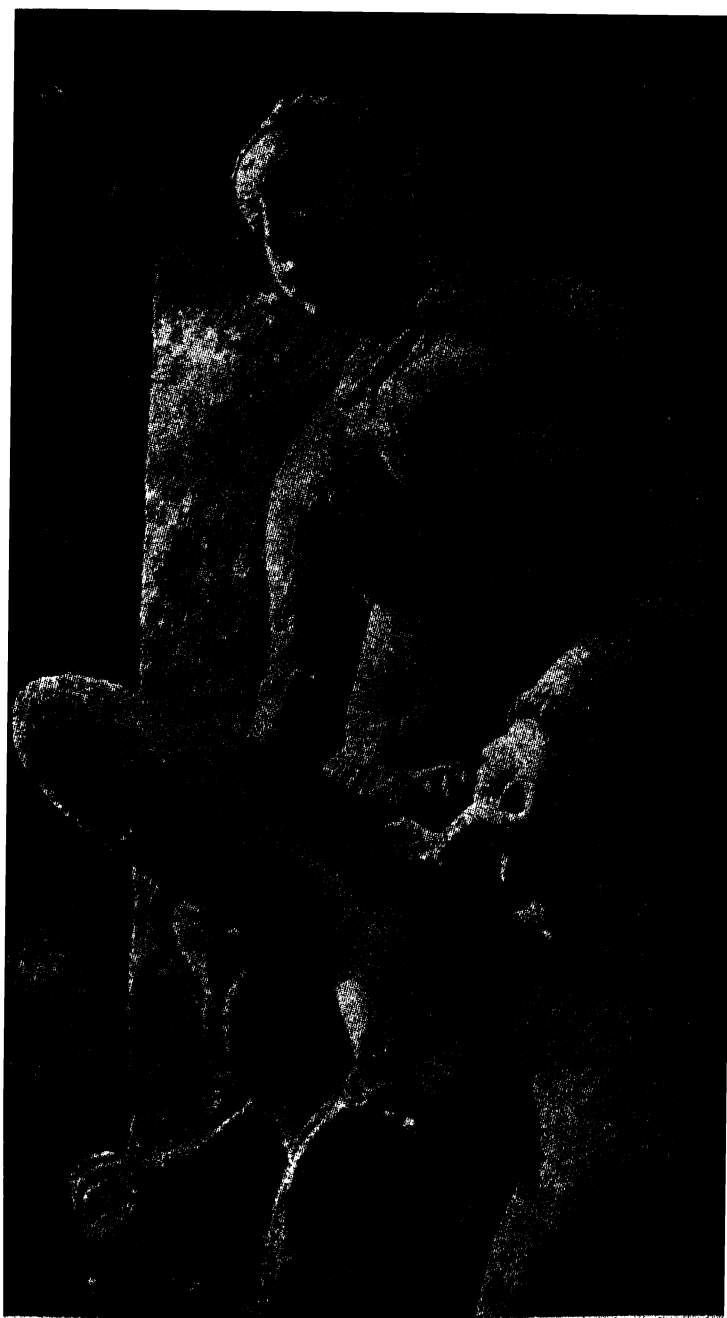
১। সুরসুন্দরী : নিযুক্তা নূপুর বন্ধনে।
পার্শ্বনাথের মন্দির, খাজুরাহো : মধ্যপ্রদেশ

২। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির।
পুরুষোত্তমক্ষেত্র : কলিঙ্গ

৩। বিশ্বনাথের মন্দির। কাশীধাম: উত্তরাপথ।
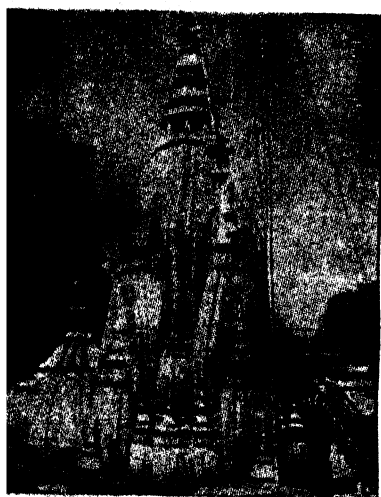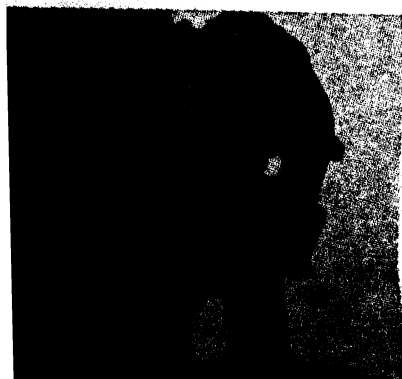
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বিশিষ্ট জ্যোতিষী ভবদেব ভট্ট এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন, প্রতিষ্ঠা করেন একটি সরোবরও। খুব সম্ভব সেই সরোবরই বিন্দু সরোবর।

অধিরোহণ করেন তিনি বিক্রমপুরের সিংহাসনে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। ভবদেব ভট্টের বন্ধু ও গুণগ্রাহী বাঙালী শ্রীবাচস্পতি এই শিলালেখটি উৎকীর্ণ করেন। উল্লিখিত আছে এই শিলালেখে ভবদেব ভট্ট একাম্রকাননে, পরিচিত ভুবনেশ্বর নামেও, একশত আটটি মন্দির নির্মাণ করেন। তাই মনে হয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়, এক বাঙালী ব্রাহ্মণ নির্মাণ করেন।

অপর একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় উড়িষ্যার গঙ্গ বংশীয় রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের বিধবা কন্যা চন্দ্রিকাদেবী ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। রক্ষিত আছে নাকি সেই শিলালিপি ইংলণ্ডের যাদুঘরে। বৈষ্ণব মন্দির, পূজিত হন এই মন্দিরের বিমানের গর্ভগৃহে অনন্ত আর বাসুদেব সঙ্গে নিয়ে ভগ্নী সুভদ্রা, জগন্নাথ, বলভদ্র আর সুভদ্রা তাঁদের শৈলী বিগ্রহ। লীলাক্ষেত্র ছিল একাম্র-কানন (ভুবনেশ্বর) অনন্ত আর বাসুদেবের শিবের আগমনের পূর্বে। তাই পূজিত হন এখানে অনন্ত আর বাসুদেবও। আছে এই মন্দিরেও অন্ন ও ভোগের ব্যবস্থা লিঙ্গরাজের মন্দিরের মত।

বিন্দু সরোবরের কেন্দ্রস্থলে ঘাটের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের প্রবেশ পথ। বিন্দু সরোবরের পরম পবিত্র জল স্পর্শ করে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করি। সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ভুবনেশ্বরের, সর্বাধিকখ্যাত এই বিন্দু সরোবর বিস্তৃত হয়ে আছে এক হাজার তিনশ ফুট দীর্ঘ ও সাতশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, বেষ্টিত হয়েছিল প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর আর সোপানের শ্রেণী দিয়ে।

ধ্বংসে পরিণত হয়েছে প্রাচীর, নিশ্চিহ্ন হয়েছে সোপানের শ্রেণীগুলিও, কালের নির্মম হস্তে। আবার নতুন করে নির্মিত হচ্ছে প্রাচীর, হচ্ছে সোপানের শ্রেণীও। সরোবরের কেন্দ্রস্থলে একশত দশ ফুট দীর্ঘ একশত দশ ফুট প্রস্থ একটি প্রস্তর নির্মিত জগতি। লেখা আছে পুরাণে, সংগৃহীত হয় তীর্থবারি সমস্ত তীর্থ থেকে বিন্দু বিন্দু করে সংগ্রহ করেন দেবাদিদেব মহাদেব, তৈরী হয় একটি সরোবর। খ্যাতিলাভ করে সেই সরোবর বিন্দু সরোবর নামে। তাই মহাপবিত্র এই সরোবর। সুসজ্জিত নৌকাবিহারে, উপনীত হন এই সরোবরের

কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত জগতিতে প্রতিদিন, লিঙ্গরাজের বিজয়বিগ্রহ, সঙ্গে নিয়ে বাসুদেব, কপিলেশ্বর ও পার্বতী দেবী, যান বাইশ দিন, করেন চন্দন স্নান। এই সরোবরের পশ্চিমে বিশ্রাম ঘাট, উত্তরে উত্তরেশ্বর, দক্ষিণে অগ্নিকোণে ত্রিশূল ও পূর্বে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের বিপরীত দিকে মণিকর্ণিকা ঘাট। মহাপবিত্র এই মণিকর্ণিকা ঘাটও সমপর্যায়ে পড়ে পবিত্রতায় আর খ্যাতিতে কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটের, তাই সমবেত হন এই ঘাটে প্রতিদিন শত শত তীর্থযাত্রী, করেন স্নান আর তর্পণ। এই বিন্দু সরোবরে স্নান করে পবিত্র দেহে যাত্রীদের প্রথমে অনন্ত বাসুদেবকে দর্শন করতে হয় ও তারপর লিঙ্গরাজ প্রভৃতি অষ্টমূর্তি।

বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির আর ভোগ-মন্দির। নাটমন্দির আর ভোগমন্দির নির্মিত হয় পরবর্তী কালে। তৈরী হয় একটি রসুই ঘর আর ক্ষুদ্র মন্দিরও প্রাঙ্গণের কোণে বেষ্টিত হয় সারা প্রাঙ্গণ দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে।

পঞ্চরথ দেউল এই মন্দিরের বিমানটি, একটি সুউচ্চ ভিত্তি বা পৃষ্ঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বিভক্ত সেই ভিত্তি দুই থাকে তল আর ক্ষুর পৃষ্ঠে, ষোল ফুট তার বাড়ের উচ্চতা। অপরূপ এই বিমানের অঙ্গের অলঙ্করণ, সূক্ষ্মতম।

দেখি, পুর্বদিকে, রাহপগের অঙ্গে, গভীর কুলুঙ্গির ভিতর, দাঁড়িয়ে আছেন চতুর্ভুজ বামন, বিষ্ণুর অবতার। ভগ্ন তাঁর মস্তক, ধ্বংসে পরিণত তাঁর পদদ্বয় আর হস্তদ্বয়। অবশিষ্ট দুইটি হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন শঙ্খ আর চক্র। তাঁর দুই পাশে দুই পরমা রূপবতী বিবসনা নারী দাঁড়িয়ে আছেন। ঊর্দ্ধে মালা হস্তে উডন্ত অপ্সরার দল। পল্লব দিয়ে রচিত হয়েছে তাঁর মস্তকের উপরের চন্দ্রাতপ। বাজুর অঙ্গে জালির কাজ। অলঙ্কৃত কত বিভিন্ন কত ঝালরের সূক্ষ্ম কাজ দিয়েও।

অপসারিত হয়েছে পূর্বদিকের কুলুঙ্গির পাশ্বদেবতার মূর্তি। দক্ষিণ দিকের কুলুঙ্গির ভিতর বরাহ অবতারে বিষ্ণু লঙ্ঘন করেন অনন্তকে। অনন্ত কৃতাঞ্জলি-পুটে বসে আছেন, তাঁর মস্তকে শোভা পায় শিরোভূষণ। তাঁদের মস্তকের উপর শোভা পায় পল্লবে রচিত চন্দ্রাতপ আর নিচে উড়ন্ত হংস। শীর্ষদেশে কীর্তিমুখ। দেখি মুগ্ধ হয়ে।

দেখি নিম্ন বারাণ্ডিতে অনর্থ পগের অঙ্গে দিকপতিরা দাঁড়িয়ে আছেন, সঙ্গে নিয়ে বাহন। দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের পত্নীরাও, অনুরূপ বাহন সঙ্গে নিয়ে উর্দ্ধ বারাণ্ডির অঙ্গে। জগমোহনের অঙ্গেও অনুরূপ দিক্‌পতি আর তাঁদের স্ত্রীর মূর্তি দেখি। আছেন তাঁরা সারি দেউলে আর সপ্ত মাতৃকার মন্দিরেও।

লিঙ্গরাজের মন্দিরের মত, রচিত হয় বিমানের সংলগ্ন তিনটি দ্বিতল ঘণ্টা, শ্রী, পীঢ়া দেউলও, উত্তরে, পূর্বে আর দক্ষিণে। অবশিষ্ট আছে তাদের মধ্যে শুধু দক্ষিণের আর উত্তরের দেউলের ভিত্তি।

পঞ্চরথ দেউল এই মন্দিরের জগমোহনও, দাঁড়িয়ে আছে বিমানের মত তল আর ক্ষুর পৃষ্ঠের উপর। ক্ষুর পৃষ্ঠের অঙ্গে, কুলুঙ্গির ভিতর, শোভা পায় লক্ষ্মীর মূর্তি, মূর্তি বামন আর বেতালেরও। বাঢ়ের উচ্চতা বার ফুটের উপর। দেখি, উত্তব দিকে, রাহ পগের অঙ্গে পাঁচটি ক্ষুদ্র উদ্‌গত স্তম্ভ। অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি কত নর আর নারীর মূর্তি। তাদের উপরে অপরূপ ক্ষুদ্র উদগত স্তম্ভের অঙ্গে, নাগ আর নাগিনীর মূর্তি দেখি, শিরে নিয়ে আছে তারা পাঁচটি করে ফণা। দেখি অলঙ্কৃত স্তম্ভের পগের উদগত স্তম্ভের অঙ্গ সূক্ষ্মতম লতা পল্লবে। তাদের শীষদেশে, রাহপগের অঙ্গে হস্তীযূথ আর অশ্বের শোভাযাত্রা। বাহকেরা বহন করে নিয়ে যায় একটি পাল্‌কিও। মুগ্ধ হয়ে দেখি, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের।

সেখান থেকে, নাটমন্দিরে যাই। এই নাট মন্দিরটিও নির্মিত হয় পরবর্তী কালে। দ্বিতল এই নাটমন্দিরের পীঢ়া অংশ, বিভক্তও দুই থাকে, দাঁড়িয়ে আছে ছাব্বিশ ফুট সাত ইঞ্চি দীর্ঘ আর ছাব্বিশ ফুট সাত ইঞ্চি প্রস্থ পরিধি নিয়ে, বাঢ়ের উচ্চতা আট ফুট। দক্ষিণ দিকের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে কেন্দ্রস্থলের দ্বার দিয়ে, আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। রচিত হয় তিনটি করে দরজা উত্তর আর দক্ষিণ দিকে, দেখি মেঝের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি ক্ষুদ্র গরুড় স্তম্ভ।

নাটমন্দির দেখে ভোগ মন্দিরে উপস্থিত হই। পীঢ়া দেউল এই ভোগ মণ্ডপটি, শীর্ষে নিয়ে আছে কলস আর আমলক, বুকে নিয়ে আছে পাঁচটি পীঢ়া দাঁড়িয়ে আছে তল আর ক্ষুর পৃষ্ঠের উপর। নাই কোন শিল্পসম্ভার তাদের অঙ্গে, পীঢ়া দিয়ে অলঙ্কৃত তার বারাণ্ডি।

আছে এই ভোগমণ্ডপে তুইটি দ্বার। দেখি, পূর্বদিকের দ্বারের তুই পাশে, উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর তুইটি বিষ্ণুমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। বামদিকেরটির আননে শোভা পায় গুম্ফ, তার এক হস্তে চক্র ও দ্বিতীয় হস্তে সে ধারণ করে একটি মালা, তৃতীয় হস্তে শঙ্খ, চতুর্থ হস্তে গদা। মূল্যবান তার শিরোভূষণ। তার কণ্ঠে শোভা পায় মুক্তার হার, বাহুতে বাজু, মণিবন্ধে কঙ্কণ, পায়ে মল। অনুরূপ দক্ষিণ পাশের মূর্তিটিও, বসনে আর ভূষণে। কিন্তু নাই তার আননে গুম্ফ, হস্তে ধৃত নয় মালা ও, স্থাপিত তার হস্ত গদার উপর। ভগ্ন দক্ষিণ দ্বারের প্রবেশপথের বাম পাশের মূর্তিটি তার মস্তকে কোন শিরোভূষণও নাই। অনুরূপ এই মূর্তিটিও পূর্বদিকের প্রবেশপথের বাম পাশের মূর্তির মালার পরিবর্তে তাঁর দক্ষিণ হস্তে শোভা পায় একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। অনুরূপ গঠনে আর ভূষণে দক্ষিণ পাশের মূর্তিটি, পদ্মের পরিবর্তে তাঁর দক্ষিণ হস্তে শোভা পায় একটি পুষ্পমাল্য।

অনবদ্য এই মূর্তিগুলি দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। শ্রেষ্ঠ দান উড়িষ্যার ভাস্করের। ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, সারি দেউল অভিমুখে রওনা হই।

দাঁড়িয়ে আছে সারি দেউল নির্মিত পরবর্তী যুগে একটি অপ্রশস্ত গলির মধ্যে। লিঙ্গরাজের মন্দিরের উত্তর দিকের বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসে এই গলিটি বিন্দু সরোবরে এসে যুক্ত হয়েছে। শৈবমন্দির, বিগ্রহ শিবলিঙ্গ বুকে নিয়ে আছে শুধু বিমান আর জগমোহন-তুইটি সপ্তরথ দেউল। দেখি কপাটের অঙ্গে গজলক্ষ্মীর মূর্তি। রচিত হয় স্তম্ভযুক্ত গবাক্ষ ও জগমোহনের উত্তর আর দক্ষিণ দিকে, শোভিত হয় তাদের অঙ্গ অপরূপ মূর্তি সম্ভার দিয়ে। সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম, কিন্তু তাদের উপরের কুলুঙ্গির অঙ্গের অলঙ্করণ, অলঙ্কৃত তাদের তুই পাশ কলস আর পুষ্পলতা দিয়ে, অতুলনীয় দক্ষিণের কুলুঙ্গির অঙ্গের মূর্তিসম্ভারের সৌন্দর্য, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

দেখি প্রকোষ্ঠের সারি দিয়ে বিভক্ত জগমোহনের পিরামিডাকৃতি অংশ তুইটি ভাগে, নিম্নাংশ বুকে নিয়ে আছে ছয়টি পীঢ়া, পাঁচটি উর্ধ্বাংশ।

দেখি তাদের অঙ্গে, সারি সারি কত জন্তুর মূর্তি, কত হংসের কত মৃগের কত হস্তীর। সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত তারা অপর্যাপ্ত। বারাণ্ডির অঙ্গে, কুলুঙ্গির ভিতর দিকপতিদের মূর্তি দেখি। সঙ্গে নিয়ে আছেন দিকপতিরা তাঁদের

বাহন। তাঁদের পত্নীরাও আছেন। অনুরূপ এই মূর্তিগুলি, অনন্ত বাসুদেবের মূর্তির, পড়ে সমপর্যায়েও গঠন সৌষ্টবে আর সজীবতায়। দেখি কত বিভিন্ন সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম লতাপুষ্প ও কত বিচিত্র পুষ্পলতা। অতুলনীয় তারাও। নিদর্শন শ্রেষ্ট স্থাপত্যের, এক সুন্দরতম সৃষ্টির। স্থপতিকে আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্দির থেকে বার হ'য়ে আসি।

বৈতাল দেউলে উপনীত হই। পরিচিত কপালিনীর মন্দির নামেও। দাঁড়িয়ে আছে বৈতাল দেউল ভুবনেশ্বর গ্রামের কেন্দ্রস্থলে বুকে নিয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, পৃথক হ'য়ে আছে উড়িষ্যার অন্য সমস্ত মন্দির থেকে, অঙ্গে নিয়ে আছে দ্রাবিড়, বৌদ্ধ আর নাগর স্থাপত্যের সংমিশ্রণ। নির্মিত এই মন্দির সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে, কর-বংশের রাজারা নির্মাণ করেন। রচিত হয়েছে দুই থাকে তার অর্ধগোলাকৃতি শীর্ষদেশ বা মস্তক, মহাবলিপুরমের রথের অনুকরণে। নির্মাণ করেন সেই রথ দ্রাবিড় স্থানের পল্লব নৃপতিরা চতুর্থ শতাব্দীতে। শীর্ষে নিয়ে আছে মস্তক তিনটি আমলক শিরে নিয়ে কপূ́রী, কলস আর ত্রিশূল, দুই প্রান্তে ও কেন্দ্রস্থলে একটি, প্রতীক নাগর স্থাপত্যের। নির্মিত হয়েছে জগমোহনের ছাদের উপর মন্দিরের পূর্ব গাত্রে বিমানের সংলগ্ন একটি ত্রিকোণাগ্র চুড়া, আকৃতি তার দ্রাবিড় গোপুরমের মত, বুকে নিয়ে আছে বৌদ্ধ ধর্ম মন্দিরের শ্রেষ্ঠ প্রতীক উন্নততর চৈত্য গবাক্ষ, অঙ্গে নিয়ে নারায়ণের মূর্তি, শীর্ষে নিয়ে নটরাজনের তাণ্ডব নৃত্যের দৃশ্য।

ক্ষুদ্রতর এই মন্দিরটি পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু বিস্তৃত হয়ে আছে আঠার ফুট প্রস্থ, পঁচিশ ফুট দীর্ঘ পরিধি নিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে একটি সুউচ্চ মঞ্চের উপর, বেষ্টিত হয়ে আছে নিচু প্রাচীর দিয়ে। রচিত হয়েছে একটি তোরণ, পরবর্তী কালে।

প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে, সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের চাতালে উঠে, বিমানের কাছে উপস্থিত হই। দেখি বারাণ্ডির উর্ধ্বদেশে ক্ষুদ্র কুলুঙ্গির ভিতর সারি-সারি কেশর যুক্ত জোড়া সিংহ। দেখি, একই সমতাতে অগভীর কক্ষের ভিতর জোড়া হস্তীর সারিও। সুষ্ঠু গঠন এই মূর্তিগুলির। তাদের উপরে অনেকগুলি পদক, অঙ্গে নিয়ে সূর্যদেবতার মুখমণ্ডল, তাদের উপরে ঝালর। ঝালরের উপরে, গভীর প্রকোষ্ঠের ভিতর, প্রণয়াশক্ত নর ও নারীর মূর্তি, দাঁড়িয়ে

আছে তারা বিভিন্ন ও বিচিত্র ভঙ্গীতে, নিবেদন করছে পরস্পরকে প্রেম। বিকশিত তাদের অন্তরের ভাষা তাদের আননে তাদের নয়নে প্রতিফলিত।

দেখি, বৈতালের মস্তকের নিচে শোভাযাত্রায় অগ্রসর হয় হস্তীপৃষ্ঠে সৈনিকের দল। দেখি কত সুক্ষ্ম জালির কাজও।

দেখি রচিত হয়েছে পাঁচটি বৃহৎ কুলুঙ্গি বিমানের পশ্চিম গাত্রে; কেন্দ্রস্থলের-টিতে চতুর্ভুজ হর বিরাজ করেন সঙ্গে নিয়ে পার্বতী। তাঁর এক হস্তে জপমালা, দ্বিতীয় হস্তে কমণ্ডলু, তৃতীয় হস্তে তিনি ধারণ করেন একটি মুকুর, চতুর্থে বস্ত্রখণ্ড।

দেখি, উত্তরের গাত্রে কুলুঙ্গির ভিতর এক অপরূপ অষ্টভুজা, মহিষমর্দিনীর মূর্তি। হস্তে নিয়ে আছেন মহিষমর্দিনী, অসি ত্রিশূল, ঢাল, সর্প, সডকি ধনুক, তীর আর খড়গ।

দেখি, উত্তরের গাত্রে, কেন্দ্রস্থলে, কুলুঙ্গির ভিতর একটি ভৈরবীর মূর্তি, উত্তরের গাত্রে, অষ্টভুজা দুর্গার মূর্তি। অপরূপ এই মূর্তি দুইটিও, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। দেখি, উত্তরের গাত্রে, দুইটি কুলুঙ্গির ভিতরে দুইটি সুবিশাল প্রস্ফুটিত পদ্মও। সবগুলিই সুন্দরতম দান উড়িষ্যার ভাস্করের। সুন্দরতম আর প্রকৃষ্ট-তম কিন্তু বিমানের পূর্ব গাত্রের অলঙ্করণ, বুকে নিয়ে আছে দ্রাবিড় গোপুরম আর বৌদ্ধ চৈত্য গবাক্ষ, শ্রেষ্ঠ প্রতীক দ্রাবিড় আর বৌদ্ধ স্থাপত্যের তাদের অপরূপ সুসামঞ্জস্য আর সংমিশ্রণ। অঙ্গে নিয়ে আছে চৈত্য গবাক্ষ নারায়ণের মূর্তি, শীর্ষে নিয়ে আছে নটরাজনের মূর্তি, তাণ্ডব নৃত্য করেন নটরাজ অপরূপ তাঁর নৃত্যের ছন্দ, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের, এক অমর কীর্তি। স্তব্ধ হয়ে দেখি। নাই কোন শিল্প সম্ভার, প্রবেশ পথের শীর্ষদেশে, দ্বারের বাজুতেও নাই। নাই নবগ্রহের মূর্তিও।

জগমোহনে উপনীত হই। অনুরূপ এই জগমোহনটি পরশুরামেশ্বরের আকৃতিতে, বুকে নিয়ে আছে চারি কোণে চারিটি রেখ দেউল। নাই এই দেউল পরশুরামেশ্বরের জগমোহনে। অঙ্গে নিয়ে আছে জগমোহন জালির পল্লব। জগমোহনের সম্মুখে, পূর্বদিকে একটি ক্ষুদ্র পীঢ়া দেউল। তার ভিতরে একটি যূপ। আবদ্ধ হ'ত এই স্তম্ভে যজ্ঞীয় পশু। পূর্বে হত এই মন্দিরে পশুবলি। গর্ভগৃহে এই মন্দিরের বিগ্রহ কপালিনী পূজিতা হন। তার প্রাচীরের

গাত্রে সপ্তমাতৃকা ও আরও পনেরটি তান্ত্রিক দেবীমূর্তি বিরাজ করেন। অন্যতম মূর্তি দুর্গার এই কপালিনী সমপর্যায়ে পড়েন তন্ত্রে বর্ণিত চামুণ্ডার মূর্তির। ভীষণ দর্শনা এই মূর্তিটি, বিস্মিত হয়ে দেখি। মূর্তি দেখি অর্ধ নারীশ্বরের আর সপ্তাশ্ব আরোহণে সূর্যেরও। তান্ত্রিক পীঠে পরিণত হয় ভুবনেশ্বরও। গড়ে ওঠে এই মন্দিরে, উড়িষ্যার প্রাচীনতম প্রধান তন্ত্র পীঠ। দেবীকে প্রণতি জানিয়ে ধীরে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি।

বিচিত্র এই মন্দিরের পরিকল্পনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ব্যতিক্রম অন্য মন্দিরের সঙ্গে, কিন্তু বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটি, উড়িষ্যার স্থপতির প্রকৃষ্টতম দান, বহু সাধনার দান উড়িষ্যার ভাস্করেরও। তাই সমপর্যায়ে পড়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ মন্দিরের সঙ্গে, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন।

স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, আমরা মোহিনী ঠাকুরানীর মন্দির অভিমুখে রওনা হই। এই মন্দিরটিও বিন্দু সরোবরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীতে কর-বংশের রানীমোহিনী নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি। অন্যতম আর প্রকৃষ্টতম সেখানকার একটি পীঢ়া ও ছয়টি রেখ দেউলের।

অনুরূপ এই মন্দিরটিও পরশুরামেশ্বরের, একটি রেখ দেউল, বুকে নিয়ে আছে একটি জগমোহনও।

নিশ্চিহ্ন হয়েছে জগমোহনের ঊর্ধ্বাংশ কালের করালে। বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটি স্তম্ভ, চারিটি বৃহৎ ও দুইটি ক্ষুদ্র। পৃথক করা হয়েছে স্তম্ভ দিয়ে মন্দিরের কেন্দ্রস্থলকে চারিদিকের গলিপথ থেকে, অনুরূপ বৌদ্ধ চৈত্যের অভ্যন্তর ভাগের। নাই কোন অলঙ্করণ মন্দিরের গাত্রে, অঙ্গে নিয়ে আছে শুধু তার আভাস, শুধু রেখা।

দেখি পশ্চিমেশ্বরের মন্দির, একটি ত্রিরথ দেউল, দাঁড়িয়ে আছে সরোবরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। অনুরূপ এই মন্দিরটিও পরশুরামেশ্বরের ; নির্মাণ পদ্ধতিতে, অঙ্গে নিয়ে আছে একটি কুম্ভ আর লতাপল্লব। নির্মিত এই মন্দিরটিও সপ্তম শতাব্দীতে।

তারপর মার্কণ্ডেশ্বরের মন্দির দেখি। একটি ত্রিরথ দেউল, দাঁড়িয়ে আছে সরোবরের পশ্চিম পাড়ে, দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। সঙ্গে নিয়ে আছে জগমোহন,

নিশ্চিহ্ন তার উপরাংশও। এই মন্দিরটিও পরশুরামেশ্বরের মন্দিরের অনুকরণে সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত হয় অঙ্গে নিয়ে অনুরূপ সুন্দরতম অলঙ্করণ আর মূর্তির সম্ভার। প্রথিত তার জঙ্ঘা, বুকে নিয়ে পার্শ্বদেবতাদের মূর্তি মৃত্তিকার অন্তরালে।

কিন্তু দেখা যায় তার অঙ্গের সূক্ষ্মতম জালি, হস্তীর শ্রেণী, বিস্মিত হই দেখে তার অঙ্গের অপরূপ ঝালরের কাজ।

দেখি বুকে নিয়ে আছে সরোবরের উত্তর পাড় ও কয়েকটি মন্দির, শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে উত্তরেশ্বর, একটি পঞ্চরথ রেখ দেউল, নির্মিত সপ্তম শতাব্দীতে। সঙ্গে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও একটি জগমোহন, নির্মিত পরশুরামেশ্বরের জগ-মোহনের অনুকরণে। কিন্তু নাই কোন শিল্প সম্ভার এই রেখ দেউলের অঙ্গে জগমোহনের অঙ্গেও নাই, বেষ্টিত হয়ে আছে সমস্ত মন্দিরটি একটি প্রাচীর দিয়ে।

দাঁড়িয়ে আছে উত্তরেশ্বরের দক্ষিণে আরও আটটি রেখ দেউল। গোত্রহীন তারা, সমৃদ্ধশালী নয় তাদের অঙ্গ কোন অলঙ্করণ দিয়েও।

সেখান থেকে চিত্রকারিণীর মন্দিরে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি লিঙ্গরাজের মন্দিরের উত্তর দিকে উত্তর প্রবেশ পথের পশ্চিমে। একটি সপ্তরথ দেউল, সঙ্গে নিয়ে আছে একটি সপ্তরথ জগমোহন, বেষ্টিত হয়ে আছে একটি প্রাচীর দিয়ে। শোভা করে আছে তার সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণের চারিকোণ চারিটি ক্ষুদ্র মন্দির। সুন্দর নয় তাদের অঙ্গের অলঙ্করণ।

দেখি তার পশ্চিমে তিনটি রেখ দেউল, দেখি একটি অর্ধ ভগ্ন পঞ্চরথ রেখ দেউলও পরিচিত যমেশ্বরের মন্দির নামে। নির্মিত পরবর্তী যুগে, বুকে নিয়ে আছে যমেশ্বর একটি পঞ্চরথ মোহন। দেখি দুইটি লিঙ্গরাজের প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে, উত্তর প্রবেশ পথের নিকটে, পরিচিত তারা কাশীনাথ আর ভুবনেশ্বর নামে।

সহস্রলিঙ্গ সরোবরের তীরে উপনীত হই, পরিচিত দেবীপধারা নামেও। এই সরোবরটি লিঙ্গরাজের মন্দিরের পূর্বদিকে অবস্থিত। বেষ্টিত হয়ে আছে সরোবরটি একশটি মন্দির দিয়ে, অক্ষত তাদের মধ্যে সাতাত্তরটি। অনুরূপ তাদের মধ্যে একটি রাজারানীর মন্দিরের নির্মাণ পদ্ধতিতে ও পরিকল্পনায়।

দেখি, লিঙ্গরাজের মন্দিরের পুর্ব প্রবেশ পথেও একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মন্দির। অনুরূপ এই মন্দিরটি লিঙ্গরাজের মন্দিরের পরিকল্পনায়, নির্মাণ পদ্ধতিতে আর অঙ্গের অলঙ্করণে, নাই এই মন্দিরের কোন মোহন, বিরাজ করেন না কোন শিবলিঙ্গ ও তার গর্ভগৃহে।

দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকি। পথে পড়ে বৈত্যনাথ, একটি সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ। দাঁড়িয়ে আছে লিঙ্গটি একটি বটবৃক্ষের পাশে, উন্মুক্ত আকাশের নিচে, একটি প্রস্তরে গঠিত সুউচ্চ মঞ্চের উপর। উল্লিখিত আছে, শিবপুরাণে এই লিঙ্গটির কথা।

তার দক্ষিণে মৈত্রেশ্বরের মন্দির দেখি। একটি পঞ্চরথ দেউল, সঙ্গে নিয়ে আছে একটি পঞ্চরথ জগমোহন। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি শুধু পার্শ্ব দেবতার মূর্তি।

দাঁড়িয়ে আছে তার দক্ষিণে, একাম্র ক্ষেত্রে, ভুবনেশ্বরের দক্ষিণ সীমায় কপিলেশ্বরের মন্দির, বেষ্টিত হয়ে আছে প্রাচীর দিয়ে। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির আর ভোগমন্দির। নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি উড়িষ্যার গজপতি বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কপিলেশ্বর দেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে। একটি সম্পূর্ণ মন্দির উড়িষ্যার কিন্তু সমৃদ্ধশালী নয় তার অঙ্গ সুন্দরতম অলঙ্করণ দিয়ে। আছে একটি কুণ্ডও এই মন্দিরের দক্ষিণ পাশে, লেখা আছে তার কথা শিবপুরাণে। অতি নির্মল ও স্বাস্থ্যকর এই কুণ্ডের জল। সঙ্গী হন কপিলেশ্বর দেবের বিজয় বিগ্রহ লিঙ্গরাজের চন্দন যাত্রায়।

সেখান থেকে আমরা মুক্তেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে মুক্তেশ্বর উড়িষ্যার সুন্দরতম মন্দির, উজ্জ্বলতম রত্ন কলিঙ্গের ভাস্করের আর স্থপতির, তাঁদের অনুপম সৃষ্টি লিঙ্গরাজের মন্দিরের উত্তর পূর্ব দিকে অর্ধ মাইল দূরে, সিদ্ধারণ্যের ভিতরে, প্রকৃতির এক সুগম্ভীর পরিবেশে, এক অলৌকিক লীলা নিকেতনে। চারিদিকে ধানের ক্ষেত, বিস্তৃত তাদের সবুজ অঞ্চল দিগন্তে, দাঁড়িয়ে আছে তাদের মাঝে মাঝে এক একটি নিঃসঙ্গ মহীরুহ, উন্নত করে শির। তাদের মাঝখানে মালভূমিতে সিদ্ধারণ্য, বুকে নিয়ে আছে ঘনবন বীথি, আর লতাগুল্ম। তাদের বক্ষ ভেদ করে, সর্পিল গতিতে নৃত্যের ছন্দে, ছুটে চলে এক কলনাদিনী নির্ঝর।

সৃষ্টি হয় কত কুণ্ড তার চলার পথে। মহাপবিত্র সেই কুণ্ডের জল। রহস্যময়, অলোকসুন্দর এই পরিবেশ। তাই মহামহিমময় এই মন্দিরটিও, বুকে নিয়ে আছে যা কিছু সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ উড়িষ্যার স্থপতির আর ভাস্করের তাঁদের প্রকৃষ্টতম দান সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাঙ্ময় তার অঙ্গের প্রতিটি প্রস্তর তাঁদের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে, প্রাণময় তাঁদের হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্যে, অনুপম তাঁদের মনের সীমাহীন মাধুর্যে। সম্পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে তাঁদের স্বপ্ন, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি প্রস্তরগাত্রে, পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের দরবারে। হয় বিশ্বজিৎ।

অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে কেশরী বংশের নৃপতিরা নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি। প্রায় চার ফুট উঁচু মঞ্চের উপর, পশ্চিমদিকে মুখ করে, দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি, বুকে নিয়ে বিমান আর জগমোহন। বিস্তৃত হয়ে আছে মঞ্চটি সাতাত্তর ফুট দীর্ঘ আর সাড়ে বত্রিশ ফুট পরিধি নিয়ে। বেষ্টিত হয়ে আছে মন্দিরটি সওয়া চার ফুট উঁচু প্রাচীর দিয়ে। সুন্দর এই প্রাচীরের অঙ্গের অলঙ্করণও। ক্ষোদিত হয় সারি সারি কুলুঙ্গি অথবা কপাট, তাদের অঙ্গে বন্ধনী, বন্ধনীর শীর্ষদেশে মস্তকাবরণ, তার কেন্দ্রস্থলে ক্ষুদ্র থাক। দেখি কুলুঙ্গির ভিতর আর কপাটের অঙ্গে কয়েকটি অপরূপ সুষ্ঠু গঠন মূর্তিও। বিস্ময়কর দক্ষিণ পশ্চিম প্রবেশ পথের প্রাচীরের গাত্রের চারিটি মূর্তি ; আছে তাদের দুইটি করে মস্তক।

প্রাচীর থেকে অল্প দূরে, জগমোহনের প্রবেশদ্বারের বিপরীত দিকে উচ্চ আয়তক্ষেত্র মঞ্চের উপর, দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের অপরূপ, সুন্দরতম পনের ফুট উঁচু তোরণটি। দুলতেন এই তোরণে, মন্দিরের বিগ্রহ দেবতা, দোলযাত্রার সময়। বুকে নিয়ে আছে তোরণটি, দুই পাশে, দুইটি স্তম্ভ। চতুষ্কোণ তাদের মূল, ষোল কোণ দণ্ড, তাদের শীর্ষদেশে শোভা পায় এক একটি আমলক শিলা, শিলার উপর অনবদ্য দল বিশিষ্ট প্রস্ফুটিত পদ্ম ; তাদের শীর্ষদেশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান। খোদিত হয় উড়িষ্যার মন্দিরের প্রতীক, স্তম্ভমূলের অঙ্গে আর দণ্ডের গাত্রে, শীর্ষে নিয়ে আমলক আর কলস। অলঙ্কৃত দণ্ডের শীর্ষদেশের চারিদিক অনুপম "স্ক্রলের" আর ঝালরের কাজ দিয়েও। অলঙ্কৃত খিলানের অঙ্গও তিনটি অনুপম স্ক্রলের কাজ দিয়ে। তাদের কেন্দ্রস্থলে, আর দুই প্রান্তে, শোভা

পায় মনুষ্য মস্তক। মাঝখানে দুইটি অর্ধশায়িত অপরূপ বিবসনা নারী মূর্তি। রহস্যময় তাদের শয়নের ভঙ্গি। মুখ বাড়িয়ে আছে দুইটি অপরূপ দর্শন মকরও, খিলানের দুই প্রান্ত থেকে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই অনুপম সুন্দরতম তোরণটি পূর্বাভাষ কোণারকের মহামহিমময় তোরণের, অন্যতম শ্রেষ্ঠ তোরণ ভারতের, দেখি, তার অঙ্গের অলঙ্করণও।

প্রবেশ করি মন্দির প্রাঙ্গণে। পঞ্চরথ দেউল, নির্মিত এক বিশিষ্ট বেলে পাথর দিয়ে রাজারানী নামে পরিচিত। দেখে বিস্মিত হই বিমানের আর জগমোহনের গাত্রের গ্রন্থি, ঝালরের আর স্ক্রলের কাজ। সুন্দরতম, সূক্ষ্মতম ও বর্ণনাতীত।

জগমোহনে উপনীত হই। ছাব্বিশ ফুট উঁচু এই জগমোহনটি, দাঁড়িয়ে আছে বিমানের সংলগ্ন হয়ে। রচিত হয় তার উত্তর আর দক্ষিণ দেওয়ালে দুইটি অপরূপ জালির গবাক্ষ। হীরকাকৃতি তাদের ছিদ্রগুলি, বেষ্টিত হয়ে আছে তারা তিনটি চৌকাঠ দিয়ে। অঙ্গে নিয়ে আছে প্রথম চৌকাঠ স্ক্রলের কাজ, দ্বিতীয়টি প্রস্ফুটিত পদ্ম, তৃতীয়টি লতা, তাদের বেষ্টন করে আছে উদ্‌গত স্তম্ভ, বুকে নিয়ে কত বানরের দৃশ্য। কোথাও বানরকে নিচের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় একটি বৃহৎ কাঁকড়া, কোথাও বিলম্বিত বানর বৃক্ষের শাখা থেকে। কোথাও আকর্ষণ করে আছে বানর অপর একটি বানরকে, রক্ষা করছে তাকে শত্রুর হাত থেকে, কোথাও বা রুদ্ধ করছে তার পতন। কোথাও বা দুইটি বানর বিরক্ত করছে একটি মকরকে, কোথাও মকরের পৃষ্ঠে উপবেশন করে আছে দুইটি বানর। কোথাও বা নিযুক্ত বানর তার সঙ্গীর মস্তকের উকুন বাছায়। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই গবাক্ষ দুটি, দেখি তাদের অঙ্গের অলঙ্করণ। প্রবেশ-পথে উপনীত হই। দেখি, সুন্দরতম শিল্পসম্ভারে অলঙ্কৃত এই প্রবেশ পথের শীর্ষদেশও। কিন্তু খোদিত হয় নাই নবগ্রহের মূর্তি, বসে আছেন শুধু মহালক্ষ্মী একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর, সঙ্গে নিয়ে তাঁর দুইটি বাহন। ঊর্ধ্বে, কানিসের অঙ্গে, মালা হস্তে উড়ন্ত গন্ধর্বের মূর্তি দেখি। ক্ষোদিত দেখি দ্বারের দুই পাশে গঙ্গা, যমুনা নন্দী আর মহাকালের মূর্তি। দেখি অনুরূপ মূর্তি বিমানের প্রবেশদ্বারের দুই পাশেও। দ্বারের দুই প্রান্তদেশে, দুইটি উদগত স্তম্ভের অঙ্গে, অপরূপ সূক্ষ্মতম স্ক্রলের আর ঝালরের কাজ, দাঁড়িয়ে আছে

তাদের নিচে, বৃক্ষের তলে একটি করে পরমা রূপবতী নারী। স্বল্পবসনা, যৌবন মত্তা পীনোন্নত তাদের বক্ষ, অপরূপ তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গীটি। উর্ধ্বে মন্দির উত্তোলনে নিযুক্ত কয়েকটি বামন। মুগ্ধ হই দেখে। দেখি অনুরূপ অলঙ্করণে ভূষিত উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গ আর জালির গবাক্ষের দুই পাশও। চৌকাঠের দুই পাশে কেশরযুক্ত সিংহের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট নর। দাঁড়িয়ে আছে সিংহটি একটি অবনত হস্তীর উপর। প্রবেশপথ দেখে, আমরা দেখতে থাকি, দক্ষিণ দিক থেকে জগমোহনের গায়ের শিল্প-সম্পদ, তার অঙ্গের সুন্দরতম সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ। দেখি বুকে নিয়ে আছে দ্বিতীয় উদ্গত স্তম্ভটি কয়েকটি ক্ষুদ্র হস্তী, তাদের শীর্ষদেশে বামনের মূর্তি, পদতলে দুইটি পরমাসুন্দরী নারীমূর্তি। দাঁড়িয়ে আছে তৃতীয় উদ্গত স্তম্ভটি একটি অগভীর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ভিতর, বুকে নিয়ে আছে নারীমূর্তি, দাঁড়িয়ে আছে নারীটি একটি উন্মুক্ত দ্বারের সম্মুখে। বুকে নিয়ে আছে পরবর্তী উদ্গত স্তম্ভ দুইটি অজানা জন্তুর মূর্তি, দাঁড়িয়ে আছে জন্তুগুলি দুইটি হস্তীর পৃষ্ঠের উপর, শুণ্ডে ধারণ করে আছে, হস্তী দুইটি স্তম্ভ। অঙ্গে নিয়ে আছে পঞ্চফণাযুক্ত নাগিনীর মূর্তি, বেষ্টিত নাগিনীদের পুচ্ছ স্তম্ভ দণ্ডে। দেখি, অনুরূপ সাতাশটি জন্তু জগমোহনের আর বিমানের অঙ্গে। তাদের মধ্যে চৌদ্দটি নাগের অবশিষ্ট নাগিনীর মূর্তি। হস্তে নিয়ে আছে নাগেরা— কেউ মালা, কেউ প্রস্ফুটিত পদ্ম, কেউ একটি দীর্ঘ বীণা, কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে কৃতাঞ্জলিপুটে। নাগিনীদের হস্তে শোভা পায় পদ্ম, ঝালর দিয়ে আবৃত আধার, শঙ্খ অথবা চামর।

ভূষিত চতুর্থ উদ্গত স্তম্ভটি দ্বিতীয়ের অনুরূপ অলঙ্করণে, পঞ্চমটি তৃতীয়ের। প্রান্তদেশের, ষষ্ঠ উদগত স্তম্ভটি বুকে নিয়ে আছে একটি নারীমূর্তি, মূর্তি গণেশের আর বামনের।

দক্ষিণ সম্মুখ ভাগে, অঙ্গে নিয়ে আছে সপ্তম উদ্গত স্তম্ভটি একটি নাগের মূর্তি, অষ্টমটি দ্বিতীয়ের অনুরূপ, নবমটি নাগিনীর মূর্তি, দশমটি দ্বিতীয়ের অনুরূপ, একাদশটি নাগিনীর মূর্তি। বুকে নিয়ে আছে দ্বাদশ উদ্গত স্তম্ভটি ক্ষুদ্র অজানা জন্তুর মূর্তি, একটি পলা খচিত ঝালর, একটি মূর্তি, একটি মৃগ, উপবিষ্ট মৃগটি একটি বৃক্ষের নিচে, আর একটি ক্ষুদ্র নারী মূর্তি। অপরূপ এই উদগত স্তম্ভগুলি, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের, কীর্তি এক মহাগৌরবময় যুগের।

বিমানে উপনীত হই। ক্ষোদিত কত মুনি ঋষির মূর্তি বিমানের অঙ্গে, কেউ ধ্যানে মগ্ন, কেউ নিযুক্ত বাণী প্রচারে। দেখি নিযুক্ত একটি মুনি লিঙ্গ স্নানে, সঙ্গে নিয়ে শিষ্যের দল। ধ্যানে মগ্ন একটি ঋষি, তাঁর শিরে শোভা পায় শিরোভূষণ। হাঁটু গেড়ে বসে আছে তাঁর সামনে কয়েকটি নারী, বাদকেরা বাজনা বাজাচ্ছে। আসন পেতে দিচ্ছেন একটি মুনি তাঁর গুরুকে। অনুরূপ চতুর্থটি প্রথমটির। দেখি পাত্র থেকে জল সিঞ্চন করছেন একটি ঋষি শিবের লিঙ্গের উপর, আরও দুইটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, হস্তে নিয়ে জল ভরতি পাত্র। দেখি একটি ঋষি নিযুক্ত লেখায়, তাঁর দুই পাশে কৃতাঞ্জলিপুটে দুই শিষ্য দাঁড়িয়ে আছেন। দেখি একটি নর অঞ্চল নিংড়ে জল দিচ্ছে একটি লিঙ্গের মস্তকের উপর। দেখি, উপাসনা করছেন শিবকে মুনি ঋষিরা, বই পড়ে শোনাচ্ছেন শিষ্যদের, শিষ্যদের শিরে শোভা পায় শিরোভূষণ। গুরুদেব শিষ্যদের নিকট বাণী প্রচার করছেন, একটু দূরে এক শিষ্য অধ্যয়নে নিযুক্ত। অনবদ্য এই মূর্তি-গুলিও শ্রেষ্ঠ দান উড়িষ্যার ভাস্করের।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি, দক্ষিণ রাহপগের গাত্রে পাড়ের অঙ্গে একটি মৃগয়ার দৃশ্য, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় মৃগরা, কারও দৃষ্টি নিবদ্ধ পশ্চাতে দণ্ডায়মান ধনুর্বাণ হস্তে শিকারীর প্রতি, কারও সন্মুখ পানে। দেখি, উত্তরের সম্মুখ ভাগে একটি হস্তীর দৃশ্যও।

দেখি কত বিভিন্ন আর বিচিত্র স্ক্রলের কাজ, কত সুন্দরতম ঝালর আর সূক্ষ্মতম ফাঁদগ্রন্থি দিয়ে অলঙ্কৃত মন্দিরের রেখ অংশ। দেখি, কত অপরূপ গঠনোন্নত যক্ষ মূর্তিও, তারা নাগের পুচ্ছের উপর, দাঁড়িয়ে আছে, উন্মুক্ত দ্বারের সন্মুখে। কত শার্দুলের মূর্তিও দেখি। শ্রদ্ধা নিবেদন করি স্থপতিকে আর ভাস্করকে। দেখি, মরিচি কুণ্ডও। মহাপবিত্র এই কূপের জল। অশোক অষ্টমীর পূর্বরাত্রে এই কুণ্ডে স্নান করলে, মৃতবৎসা ও বন্ধ্যা স্ত্রীরা লাভ করেন সন্তান।

সপ্তর্ষিদের দেখে, সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছেন সপ্তর্ষিগণ, প্রস্তরের বুকে, মুক্তেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে, একটি সুউচ্চ মঞ্চের উপর, বৃক্ষের নিচে। শ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যে সূর্যদেবতা, দাঁড়িয়ে আছেন পূর্বদিকে মুখ করে, সাড়ে তিন ফুট দীর্ঘ, দেড় ফুট প্রস্থ প্রস্তরের অঙ্গে। দ্বিভুজ এই

মূর্তিটি, ভগ্ন তার উভয় বাহুই। নাই কোন শিরোভূষণ, রচিত হয়েছে একটি জ্যোতির চক্র তাঁর মস্তকের চতুর্দিকে। নাই তাঁর কণ্ঠে কোন হার, যজ্ঞোপবীতও নাই। অভিনব কিন্তু তাঁর বসন পরিধারণের ভঙ্গিটি। তাঁর দুই পাশে দাঁড়িয়ে ঊষা, তীর নিক্ষেপে উদ্যত। পদতলে সপ্তাশ্বের মূর্তি।

সমসাময়িক মুক্তেশ্বরের দাঁড়িয়ে আছে সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরটি মুক্তেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে। একটি পঞ্চরথ দেউল এই মন্দিরটি সঙ্গে নিয়ে আছে জগমোহন। সমৃদ্ধিশালী নয় এই মন্দিরের অঙ্গ ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে, দাঁড়িয়ে আছে নিরাভরণ হয়ে, বুকে নিয়ে ষোল ফুট উঁচু বিমান আর চব্বিশ ফুট উঁচু জগমোহন।

সেখান থেকে আমরা গৌরীর মন্দিরে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি কেদার কুণ্ডের পশ্চিমে কেদার গৌরীতে। নির্মিত হয় এই মন্দিরটি সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে, নির্মাণ করেন কর-বংশীয়া মহারানী গৌরী দেবী। অন্যতম প্রসিদ্ধ স্থান ভুবনেশ্বরের এই কেদার গৌরী বুকে নিয়ে আছে দুইটি নির্ঝরিণী, পরিচিত গৌরী ও দুগ্ধকুণ্ড নামে। গৌরী কুণ্ডে স্নান ও দুগ্ধ কুণ্ডের জল পান করে, মুক্তিলাভ করে মানুষ বহু ব্যাধি থেকে। তাই সমবেত হয় এখানে প্রতিদিন বহু স্বাস্থ্যকামী, স্নান করেন গৌরী কুণ্ডের পবিত্র জলে, দূর হয় তাঁদের রোগ যন্ত্রণা। অবসান হয় ব্যাধির।

রাজারানী প্রস্তরে নির্মিত এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, স্বকীয় নির্মাণ পদ্ধতি পরিচিত গৌরীচর নামে। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে এই মন্দিরের আদি জগমোহন। বিভিন্ন তার পঞ্চরথ বিমানের আকৃতি আর গঠন পদ্ধতি।

দেখি, বিমানের কেন্দ্রস্থলের দুই পাশে কুলুঙ্গির ভিতরে গঙ্গা ও যমুনা দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে আছেন মকর বাহনে গঙ্গা আর কূর্ম বাহনে যমুনা উত্তরের সম্মুখ ভাগেও। দেখি দিকপালের মূর্তিও, অনুরূপ মুক্তেশ্বরের মন্দিরের দিকপালের মূর্তির।

দেখি বাঢ় আর রেখের সংযোগ স্থল থেকে, উর্ধ্বে উঠে গিয়েছে একের পর এক ক্ষুদ্র রেখ দেউল, সন্ধিস্থলে নিয়ে প্রকোষ্ঠ। তাদের উপরে বাঢ়ের আকৃতির দ্বিগুণ উর্ধ্বে, রচিত হয়েছে রেখের চতুর্দিকে একটি ছাঁচ। অলঙ্কৃত সেই ছাঁচের

অঙ্গ পদ্মলতা ও সূক্ষ্মতম জালির কাজ দিয়ে। প্রকোষ্ঠের উপরেও একটি আয়ত ক্ষেত্র ছাঁচ। তার উপরে, দুই থাকে, ক্রম হ্রস্বায়মান হয়ে উঠেছে মন্দিরের শীর্ষদেশ। নাই সেখানে কোন শ্রী, আমলকও নাই। দেখি মস্তক বার করে আছে সিংহ ও রাহপগ বা কেন্দ্রস্থলের উদ্গত স্তম্ভের বুক থেকে। নাই এই বৈশিষ্ট্য উড়িষ্যার অন্য কোন মন্দিরে।

দেখি অন্তর্হিত হয়েছে দিকপতি আর পার্শ্ব দেবতার মূর্তিগুলি। কিন্তু অক্ষত রয়েছে নাগ আর নাগিনীর। বিমানের পূর্ব ও পশ্চিম সম্মুখ ভাগে, নাগ আর নাগিনীর শীর্ষদেশে বামনাকৃতি বেতালরা উপবিষ্ট। দেখি মুক্তেশ্বরের মন্দিরের মত, দাঁড়িয়ে আছে উন্মুক্ত দ্বারের সামনে, অপরূপ ভঙ্গিতে একটি পরমারূপবতী নারীও। কোণক পগের অঙ্গে, মন্দির উত্তলনে নিযুক্ত বামনের দল। পদকের বুকে নরমূর্তি, শার্দূলের মূর্তিও দেখি। রচিত এই বিমানের বাঢ়টিও মুক্তেশ্বরের বিমানের বাঢ়ের অনুকরণে।

মুক্তেশ্বর আর তার নিকটের গৌরীকুণ্ডের আসে-পাশের কয়েকটি ক্ষুদ্র মন্দির ও পীঢ়দেউল দেখে, আমরা কেদারেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হই। একটি পঞ্চরথ দেউল এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে বিমান আর জগমোহন। কেশরী-বংশের রাজারা এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন, অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে। কেদারেশ্বর দেখে, পরশুরামেশ্বরের মন্দিরে যাই। গোত্রহীন অন্য মন্দিরগুলি অনলঙ্কৃতও, লাভ করে নাই ভাস্করের হস্তের স্পর্শ। শুনি এদেরই এক পীঢ়া দেউলে আদি কবি বাল্মীকি বাস করতেন। জন্মগ্রহণ করেছিলেন নাকি এখানেই, এক ক্ষুদ্র মন্দিরে, শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব ও কুশ। দেখি গৌরী কুণ্ডের উত্তর ও পশ্চিম কোণে একটি পীঢ়া দেউলে হনুমান বিরাজ করেন।

পরশুরামেশ্বর অন্যতম প্রাচীনতম মন্দির ভুবনেশ্বরের, দাঁড়িয়ে আছে সিদ্ধরণ্যের পশ্চিমে, মহাপবিত্র কেদার কুণ্ড থেকে এক ফার্লং দূরে, কেদার গৌরী যাওয়ার পথে, বুকে নিয়ে আছে আপন বৈশিষ্ট্য। নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি উড়িষ্যার কর-বংশের নৃপতিরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে। আয়ত ক্ষেত্র এই মন্দিরের জগমোহন, নয় পিরামিডাকৃতি, শীর্ষে নিয়ে আছে ক্রম নিম্নমান ছাদ, দাঁড়িয়ে আছে ছাদ ছয়টি স্তম্ভের উপরে। ব্যতিক্রম অন্য জগমোহনের

আকৃতি আর গঠন পদ্ধতির সঙ্গে। তার পশ্চিম দিকে আর দক্ষিণে দুইটি প্রবেশদ্বার, ছাদের অঙ্গে আঠারটি গবাক্ষ, প্রবেশ পথ আলো বাতাসের।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখি বৌদ্ধ চৈত্যের মত, বিভক্ত তার পঁচিশ ফুট দীর্ঘ ও আঠার ফুট প্রস্থ অভ্যন্তর ভাগ, দুই সারি সমান্তরাল এক প্রস্তর স্তম্ভ দিয়ে, কেন্দ্রস্থলে আর গলিপথে। দাঁড়িয়ে আছে দেড়ফুট উঁচু পৃষ্ঠের বা তলা পত্তমের উপর।

দেখি শীর্ষে নিয়ে আছে জগমোহনের পশ্চিম প্রবেশ পথ, গজলক্ষ্মীর মূর্তি, তার দক্ষিণে মূর্তি দিয়ে রচিত হয়েছে শিবলিঙ্গ পূজার দৃশ্য, বামে পোষা হাতীর সাহায্যে বুনো হাতী ধরার। রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ বুনো হস্তীর একটি পদ, একটি শিকারী রজ্জু দিয়ে তার পিছনের পদ বন্ধনে নিযুক্ত। সম্মুখে দীর্ঘ বল্লম হস্তে, অপর একটি শিকারী হস্তী পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। অপরূপ সুষ্ঠু গঠন এই হস্তী দুইটি, জীবন্ত, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। দ্বারের দুই পাশে, প্রাচীরের গাত্রে, দুইটি জালির গবাক্ষ, অঙ্গে নিয়ে আছে গবাক্ষ দুইটি, নৃত্যের দৃশ্য। নৃত্য করে কত নর্তক, বিভিন্ন তাদের নৃত্যের ছন্দ, নৃত্য করে তালে তালে, কেউ বীণা বাজায়, কেউ ডমরু, কেউ হস্তে ধারণ করে আছে বসনের প্রান্ত। তাদের উপরে, বাঢ়ের অঙ্গে, মূর্তি কত হস্তীর, দাঁড়িয়ে আছে তারাও বিভিন্ন আর বিচিত্র ভঙ্গীতে। দেখি, কৌপীন ধারী সন্ন্যাসীদের শিব পূজার দৃশ্যও। উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গে কুম্ভ আর লতাপুষ্প খোদিত।

অনুরূপ দক্ষিণের প্রবেশ পথের অলঙ্করণ, কিন্তু শীর্ষে নিয়ে আছে প্রবেশ পথ গণেশের মূর্তি, তাঁর দক্ষিণে আর বামে, চতুর্ভুজ নন্দী ও দ্বিভুজ মহাকালের মূর্তি। দ্বারের এক পাশে একটি জালির গবাক্ষ, অনুরূপ অলঙ্করণে অলঙ্কৃত।

নাই কোন দ্বার উত্তর দিকে, রচিত হয়েছে একটি মাত্র গবাক্ষ; অনুরূপ অলঙ্করণে অলঙ্কৃত সেই গবাক্ষটির অঙ্গও। উত্তর পশ্চিম কোণে একটি গণেশের মূর্তি, দেখি। নাই অন্য কোন মন্দিরে এমন অপরূপ, সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত গণপতির মূর্তি। দেখি মুগ্ধ হয়ে। ক্ষোদিত হয় তার সংলগ্ন, সপ্ত মাতৃকার মূর্তি, সাতটি কপাটের অঙ্গে, তাদের কারও হস্তে শোভা পায় ত্রিশূল, কারও ত্রিশূল আর কুঠার প্রাচীনতম সপ্ত মাতৃকার মূর্তি উড়িষ্যার, বিস্মিত হয়ে দেখি। বিরাজ করেন জালির গবাক্ষের দক্ষিণে, বৃহৎ কপাটের অঙ্গে, নয়টি দেব দেবী,

তার বামে ছয়টি দেব-দেবীর মূর্তিও, শ্রেষ্ঠ দান, উড়িষ্যার প্রাচীনতম ভাস্করের।

বিমানে উপনীত হই। একটি ত্রিরথ দেউল এই বিমানটি, দাঁড়িয়ে আছে ধরিত্রীর বুকের উপর, রচিত হয় নাই কোন পৃষ্ঠ। বিভক্ত এই বিমানের বাঢ় শুধু দুইটি অংশে, আকৃতিতেও সামন্তরিক, ঘনক নয়। বিভক্ত বাঢ় আর রেখের সংযোগস্থল গভীর প্রকোষ্ঠ আর অভিক্ষেপ দিয়ে। নিচু এই রেখের উচ্চতাও, তাই মহিমময়, বলদৃপ্ত।

দেখি অন্য মন্দিরের মত মুখ বাড়িয়ে বসে নাই কোন সিংহ, বিমানের অঙ্গে আমলকশীলা আর ঘাড় চক্রের মাঝখানে দেউল চারণীর দলও নাই। উপনীত হই পূর্ব দিকে। দেখি, পূর্ব সম্মুখ ভাগে বাঢ়ের অঙ্গে তিনটি বৃহৎ কুলুঙ্গি তৈরী হয়েছে, একটি রাহা পগের অঙ্গে, কেন্দ্রস্থলে ও দুই প্রান্তদেশে, কোণক পগের অঙ্গে, দুইটি। ক্ষুদ্রতর প্রান্তদেশের কুলুঙ্গি দুইটি। অপসারিত হয়েছে প্রান্তদেশের কুলুঙ্গির ভিতরের দিকপালের মূর্তিগুলিও। কেন্দ্রস্থলের কুলুঙ্গিতে, কারুকার্য খচিত চন্দ্রাতপের নিচে, সিংহাসনে বসে আছেন দেব সেনাপতি কার্তিকেয়। তাঁর বাহন ময়ূর বিনাশ করছে একটি সর্পকে। দুই প্রান্তে বাঢ় আর রেখের সংযোগস্থলে, দুইটি আমলকশীলা। দেখি, অলঙ্কৃত রেখের গাত্র কোণক পগের অঙ্গ পর্যায়ক্রমে আমলকশীলা আর মনুষ্য মস্তক দিয়ে।

দেখি, অনুরূপ অলঙ্করণে অলঙ্কৃত বিমানের উত্তর আর দক্ষিণ সম্মুখ ভাগও। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতের অপসারিত হয়েছে সমস্ত মূর্তিগুলিই তাদের অঙ্গের কুলুঙ্গির ভিতর থেকে। অবশিষ্ট আছে শুধু দক্ষিণের সম্মুখ ভাগের কেন্দ্রস্থলের কুলুঙ্গির ভিতরের গণেশের মূর্তিটি, মঞ্চের উপর উপবিষ্ট গণেশ।

দেখি, অলঙ্কৃত কুলুঙ্গির ভিতরের সর্বোচ্চ চন্দ্রাতপের অঙ্গ আর বাঢ়ের সর্বোচ্চ পাড়ের অঙ্গ কত শোভন গঠন ময়ূরের মূর্তি দিয়ে। পাড়ের নিকটে, দীর্ঘ অনুভূমিক প্রকোষ্ঠের ভিতর প্যানেলের অঙ্গে, দণ্ডায়মান নর ও নারীর মূর্তি। তাদের পিছনে জালির কাজ। সবার উপরে ঝালরের কাজ।

দেখি, বিমানের উত্তর গাত্রে, কুলুঙ্গির ভিতর, একটি অপরূপ শিকারের দৃশ্য। এক অশ্বারোহী সড়কিবিদ্ধ করছেন একটি ব্যাঘ্রকে, অপর এক

অশ্বারোহী একটি হস্তীকে, তৃতীয় অশ্বারোহী সিংহের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করছেন, হস্তে নিয়ে ঢাল।

দক্ষিণের গাত্রে, তোরণের প্রবেশ দ্বারে, একটি গণেশের মূর্তি দেখি। তাঁর বামে একটি গন্ধর্ব, তাঁর পায়ের উপরে একটি অপ্সরা উপবিষ্ট, দুই হাত দিয়ে ধারণ করে আছে অপ্সরা একটি ফলে ভরতি পাত্র। দক্ষিণে, একটি নর পাত্রের ভিতর থেকে পুষ্পমাল্য বার করছে। তার পিছনে একটি নর স্কন্ধে নিয়ে জামের গুচ্ছ, তার পিছনেও এক নর খেজুর নিয়ে। সবার পিছনে এক মুনি, নিযুক্ত মালা জপে, একখণ্ড বস্ত্র দিয়ে আবদ্ধ তাঁর পদদ্বয়। অপরূপ এই দৃশ্যটি, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

বিশিষ্ট এই মন্দিরের অঙ্গের অলঙ্করণ, ভাস্করের সুন্দরতম দান, অনুপম, রমণীয়, সুরুচি সম্পন্ন। সমপর্যায়ে পড়ে মুক্তেশ্বরের মন্দিরের গাত্রের অলঙ্করণের। কিন্তু মুক্তেশ্বরের মন্দিরের মত, নাই এই মন্দিরে শার্দূলের মূর্তি, অলঙ্কৃত নয় তার অঙ্গ পলা খচিত ঝালরের কাজ দিয়েও। কিন্তু অনবদ্য, মহিমময়, এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে উড়িষ্যার স্থপতির শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম দান।

আমরা একে একে কোটী তীর্থেশ্বর, একটি পঞ্চরথ দেউল, ও তীর্থেশ্বর দেখে একটি অর্ধ ভগ্ন গোত্রহীন মন্দিরের সামনে উপনীত হই। অনুরূপ এই মন্দিরটি পরশুরামেশ্বরের গঠনে আর অঙ্গের শিল্প সম্ভারে, তার দ্বিতীয় সংস্করণ, সমসাময়িকও। দেখি, অপসারিত তার সারা অঙ্গের কুলুঙ্গির ভিতর থেকে সমস্ত পার্শ্ব দেবতার মূর্তিগুলি, অবশিষ্ট আছে শুধু উত্তরের গাত্রের পার্বতীর মূর্তিটি, পরিচায়ক তার পূর্ব গৌরবের, নিদর্শন তার ঐতিহ্যেরও। দাঁড়িয়ে আছে বিন্দু সরোবরের তীরে ও অনুরূপ একটি মন্দির, অনুরূপ আকৃতিতে আর অঙ্গের অলঙ্করণে।

দেখি, কোটীশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে দুইটি পীঢ় দেউল, তার পাশেই একটি রেখ দেউল, পরিচিত সুবর্ণেশ্বর নামে। রাজারানীর মন্দিরে উপনীত হই।

দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরতম মহামহিমময় রাজারানীও, সঙ্গে নিয়ে জগমোহন, সিদ্ধারণ্যের পূর্বদিকে, এক ফার্লং দূরে, বেষ্টিত হয়ে আছে, দিগন্ত

প্রসারী ঘন সবুজ ক্ষেত্রে, প্রকৃতির এক রমণীয় পরিবেশে, পৃথক হয়ে আছে অন্য মন্দির থেকে। দাঁড়িয়ে আছে রাজারানী, নিঃসঙ্গ, একাকী। নির্মিত এই মন্দিরটির সারা অঙ্গ রক্তবর্ণের সূক্ষ্মতম রাজারানী প্রস্তর দিয়ে। তাই পরিচিত রাজারানী নামে। নাই এই মন্দিরের গর্ভ গৃহে কোন বিগ্রহ। খুব সম্ভব নির্মিত হয় এই মন্দিরটি শৈব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, কিন্তু বিঘ্ন হয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায়। উড়িষ্যার গঙ্গ-বংশের রাজারা দশম অথবা একাদশ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। নির্মিত হয় পরবর্তী যুগে। রেখ পঞ্চরথ দেউল এই মন্দিরের বিমানটি, দ্বিতল, দাঁড়িয়ে আছে দুই থাকে বিভক্ত পৃষ্ঠের উপর।

দুই অংশে বিভক্ত এই বিমানের বাঢ় ও—জঙ্ঘা ও বারাণ্ডিতে। বিভক্ত জঙ্ঘা সাতটি ছাঁচে, বৃহত্তর তাদের মধ্যে কেন্দ্রস্থলের ছাঁচটি। বুকে নিয়ে আছে দ্বিতীয় জঙ্ঘা ক্ষুদ্র রেখ দেউলের প্রতীক।

দেখি, অপরূপ, রমণীয় এই বিমানের অঙ্গের অলঙ্করণও, নিদর্শন সুন্দরতম সৃষ্টির, কীর্তির এক মহাগৌরবময় যুগের। দেখি, পৃষ্ঠের উপরে, অলঙ্কৃত করেন ভাস্কর মন্দিরের নিম্নতম প্রদেশ, সুন্দরতম পদক দিয়ে, তাদের কারও অঙ্গে দেবদেবীর মুখ, কারও মানুষের। বেষ্টিত সেই পদকগুলি সুন্দর স্ক্রলের পাড দিয়ে। তাদের উপরে রচিত হয় তিন থাকে কার্নিস। তার উপরে জালির অভিক্ষেপ। অভিক্ষেপের উপরে প্রস্ফুটিত পদ্ম। তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে উদ্গত স্তম্ভগুলি। তাদের কেন্দ্রস্থলে কত বিভিন্ন লতা পল্লব, কত বিচিত্র পুষ্প।

দেখি, এই বিমানের রেখের অঙ্গে ফাঁদগ্রন্থি, দেখি সুন্দরতম পুষ্পের ভূষণ আর সূক্ষ্মতম পলাযুক্ত ঝালরের কাজও, অনুরূপ মুক্তেশ্বরের বিমানের, পড়ে সমপর্যায়েও। অনবদ্য সুষ্ঠু গঠন, সুচারু সম্পন্ন, রহস্যময় কিন্তু এই মন্দিরের মূর্তিগুলি, প্রক্ষিপ্ত তারা মন্দিরের গাত্র থেকে, শ্রেষ্ঠ দান উড়িষ্যার ভাস্করের, নিদর্শন তদের সুন্দরতম সৃষ্টির, প্রতীক এক অমর কীর্তির।

অপসারিত হয়েছে মন্দিরের পিছনের কুলুঙ্গির ভিতরের মূর্তি। কিন্তু বুকে নিয়ে আছে তার দুই পাশের দুইটি অষ্ট কোণ স্তম্ভ অনবদ্য সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্প সম্ভার। অঙ্গে নিয়ে আছে তাদের দুই পাশের উদ্গত স্তম্ভও অপরূপ ঝালরের কাজ, বৈশিষ্ট্য উড়িষ্যার মন্দিরের।

দেখি, সুন্দরতম এই মন্দিরের কেন্দ্রস্থলের কুলুঙ্গিগুলির দুই পাশের অষ্টকোণ স্তম্ভের অঙ্গের স্ক্রলের কাজ আর তাদের অঙ্গের অলঙ্করণ, সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত তাদের পাশের উদগত স্তম্ভের শীর্ষদেশের নাগ আর নাগিনীর মূর্তিগুলিও। কিন্তু অপসারিত হয়েছে ভিতরের পার্শ্বদেবতার মূর্তিগুলি।

দেখি মেষ বাহনে একটি শ্মশ্রু সমন্বিত অগ্নির মূর্তি, সামনে নিয়ে জ্বলন্ত হোমাগ্নির কুণ্ড। দেখি, বৃষ বাহনে মহাদেবকেও। তাঁর এক হস্তে একটি পাশ অপর হস্তে রজ্জু, তাঁর দুই পাশে দুই অনুচর দাঁড়িয়ে আছে। দেখি দাঁড়িয়ে আছে কত নর আর নারী কত বিভিন্ন ভঙ্গিতে। দক্ষিণের সম্মুখ ভাগে, দেখি, দাঁড়িয়ে আছে কত পীনোন্নত বক্ষা যৌবনমদমত্তা নারী বৃক্ষের নিচে। ভূষিত তাদের অঙ্গ সূক্ষ্মতম মসলিনের বসনে, পরিদৃশ্যমান তাদের অঙ্গ সৌষ্ঠব তাদের বসনের অন্তরাল থেকে। সঙ্গে নিয়ে আছে তারা ময়ূর আর বানর। ওষ্ঠে ধরে আছে ময়ূর তাঁদের অঙ্গের ভূষণ। দেখি, একটি অপরূপ মাতৃমূর্তিও। বাম হস্ত দিয়ে তিনি ধারণ করে আছেন তাঁর শিশু সন্তানকে দক্ষিণ হস্ত বুলিয়ে দিচ্ছেন তার পৃষ্ঠে। অনবদ্য তাঁর গ্রীবার ভঙ্গিটি, বিকশিত তাঁর আনন আর নয়ন তাঁর অন্তরের অপরিসীম বাৎসল্য রসের অভিব্যক্তিতে। অনুপম দ্বিতীয় মাতৃমূর্তিটিও দুই হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করে আছেন মাতা তাঁর সন্তানের মস্তক। প্রতিফলিত তাঁর আননে আর নয়নে তাঁর অন্তরের ভাষা।

দেখি, পশ্চিম সম্মুখভাগে একটি ভীষণ দর্শন বটুক ভৈরবের মূর্তি। তাঁর দক্ষিণ হস্তে শোভা পায় একটি অসি, বাম হস্তের অসি দিয়ে তিনি ছেদন করেন একটি দানবের মস্তক। শূন্যে প্রক্ষিপ্ত তাঁর অঙ্গের যজ্ঞোপবীত। তাঁর দক্ষিণে একটি নারী দাঁড়িয়ে আছে, বামে একটি নর, তাঁর অনুচরবৃন্দ।

অপরূপ এই মূর্তিগুলি উড়িষ্যার ভাস্করের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রতীক, সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের।

জগমোহনে উপস্থিত হই। দেখি দুইটি অপরূপ স্তম্ভযুক্ত গবাক্ষ দিয়ে আলোকিত জগমোহন। বুকে নিয়ে আছে প্রতিটি গবাক্ষ পাঁচটি করে স্তম্ভ। অলঙ্কৃত তাদের দুই পাশের স্তম্ভের অঙ্গ কত অপরূপ নাগ আর নাগিনীর মূর্তি দিয়ে, দাঁড়িয়ে আছে তারা, স্থাপিত তাদের পুচ্ছ তিনটি অজানা জন্তুর পৃষ্ঠের উপর। দাঁড়িয়ে আছে জন্তুগুলি তিনটি ক্ষুদ্র হস্তীর উপর। প্রবেশদ্বারের

দুই পাশের স্তম্ভের অঙ্গেও দেখি, অপরূপ নাগ আর নাগিনীর মূর্তি। শীর্ষে নিয়ে আছে তারা সাতটি ফণা। চৌকাঠের উপরে নবগ্রহের মূর্তি, লিন্‌টেলের উপরে মহালক্ষ্মীর। দেখি, দাঁড়িয়ে আছে তিনটি সিংহ, জগমোহনের উত্তর, দক্ষিণ আর পূর্ব গাত্রে। জীবন্ত এই মূর্তিগুলি।

দেখি, সুন্দরতম এই জগমোহনের দ্বারের অঙ্গের অলঙ্করণও, বুকে নিয়ে আছে বিভিন্ন লতা আর পদ্মলতা। দুই পাশের উদগত স্তম্ভের নিম্নতম প্রদেশে শোভা পায় নন্দীর আর মহাকালের মূর্তি। সঙ্গে নিয়ে আছেন মহাকাল একটি নারী। অনবদ্য এই জগমোহনের অঙ্গের অলঙ্করণ ও, সুন্দরতম, শ্রেষ্ঠ দান উড়িষ্যার ভাস্করের, মুগ্ধ হয়ে দেখি। স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, ভাস্করেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হই।

দাঁড়িয়ে আছে জগমোহন বিহীন ভাস্করেশ্বর, মেঘেশ্বরের পশ্চিমে। বিভিন্ন এই মন্দিরের গঠন প্রণালী, বিভিন্ন পরিকল্পনা। নির্মিত হয় এই মন্দিরটি দ্বাদশ শতাব্দীতে, নির্মাণ করেন গঙ্গ-বংশের রাজারা। দ্বিতল এই মন্দিরটি, পীঢ়-দেউল, শীর্ষে নিয়ে আছে নয়টি পীঢ়, পীঢ়ের শীর্ষ দেশে রচিত হয় আমলক আর কলস। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি আটচল্লিশ ফুট স্কোয়ার একটি চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর, তার চূড়ার বর্হি আয়তন সাড়ে একত্রিশ ফুট। দেখি, নাই প্রবেশ পথের শীর্ষ দেশে নবগ্রহের মূর্তি, লিন্‌টেলের উপর গজলক্ষ্মীর মূর্তি ও নাই, দাঁড়িয়ে নাই তার চূড়ার অঙ্গে চারিটি সিংহও। দেখি, তার দক্ষিণ ও উত্তর গাত্রে কুলুঙ্গির ভিতর গণেশ আর পার্বতীর মূর্তি। গর্ভগৃহে, একটি নয় ফুট উঁচু অতিকায় শিব লিঙ্গ মেঝে ভেদ করে উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে।

অনতিদূরে, মেঘেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হই। সপ্তরথ দেউল, দাঁড়িয়ে আছে মেঘেশ্বর একাম্র ক্ষেত্রের পূর্ব সীমায়, একটি সুপ্রশস্ত বাঁধান প্রাঙ্গণের মধ্যে সঙ্গে নিয়ে জগমোহন। শীর্ষে নিয়ে আছে পঞ্চাশ ফুট উঁচু বিমান, বেষ্টিত হয়ে আছে প্রস্তরে রচিত প্রাচীর দিয়ে। দেখি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি বৃষ স্তম্ভ, শীর্ষচ্যুত হয়ে ধরিত্রীর বুকে আশ্রয় নিয়েছে তার বৃষটি মন্দিরের একপ্রান্তে। প্রাঙ্গণের উত্তর প্রান্তে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী। দেখি, নাই কোন পৃষ্ঠ এই বিমানের, জগমোহনেরও নাই। দাঁড়িয়ে আছে তারা তলাপওয়ের উপর। দেখি, নিম্ন বারাণ্ডির অঙ্গে কুলুঙ্গির ভিতর দিকপাল ও দিকপতিদের

মূর্তিও। অপসারিত হয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকটি মূর্তি, কয়েকটি স্থানচ্যুতও হয়েছে। সুন্দরতম এই মূর্তিগুলিও দাঁড়িয়ে আছে কত বিভিন্ন সুচারু ভঙ্গীতে। দেখি, অলঙ্কৃত বিমানের গাত্র ও কত বিভিন্ন লতাপল্লব আর পুষ্প দিয়ে, লতার ফাঁকে ফাঁকে মনুষ্যানন। ভূষিত কত জন্তুর মূর্তি দিয়েও, মূর্তি গণ্ডারের, হরিণের বানরের আর ময়ূরের। মূর্তি দিয়েই রচিত হয় কত কাহিনীও। দেখি মুগ্ধ হয়ে বিমানের পূর্ব গাত্রের কেন্দ্রস্থলের কুলুঙ্গির ভিতরদেব-সেনাপতি কার্তিকেয়র একটি অপরূপ মূর্তি। উপবিষ্ট কার্তিকেয় তাঁর বাহন ময়ূরের পৃষ্ঠের উপর।

জগমোহনে উপস্থিত হই। পীঢ় দেউল এই জগমোহনটি। তার প্রবেশ পথের দুই পাশে; অর্ধ বৃত্তাকার স্তম্ভের অঙ্গে, একটি অপরূপ নাগ দম্পতি দাঁড়িয়ে আছে, শিরে নিয়ে সপ্তফণা। দেখি মুগ্ধ হয়ে এক প্রকৃষ্ট সৃষ্টি কলিঙ্গের ভাস্করের। দেখি দ্বারের শীর্ষ দেশে নবগ্রহের মূর্তিও, চৌকাঠের উপর লক্ষ্মীর মূর্তি। নাই কোন শিল্প সম্ভার জগমোহনের দুইটি স্তম্ভ যুক্ত গবাক্ষের অঙ্গে। অপরূপ কিন্তু জগমোহনের প্রাচীরের গাত্রের হরগৌরীর মূর্তিটি। ত্রয়ানন, অষ্টভুজ এই হর বসে আছেন এক মহামহিমময় মূর্তিতে, পাশে নিয়ে গৌরী। অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান উড়িষ্যার ভাস্করের। দক্ষিণ গাত্রে একটি হনুমানের মূর্তিও দেখি।

অঙ্গের উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়, গৌতম গোত্রীয় স্বপ্নেশ্বর এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন, নির্মিত হয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে, ১১৯০ থেকে ১১৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ছিলেন তিনি উৎকলের চোড় গঙ্গ বংশের অধিপতিদের মহাসামন্ত। বিবাহ হয় তাঁর ভগ্নী সুরমা দেবীর উড়িষ্যার চোড় গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতার পুত্র রাজা রাজদেবের সঙ্গে। অধিরোহণ করেন তিনি উড়িষ্যার সিংহাসনে ১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে।

সমপর্যায়ে পড়ে এই মন্দিরটি ভুবনেশ্বরের শ্রেষ্ঠ মন্দিরের সঙ্গে, অঙ্গের অলঙ্করণে আর মূর্তি সম্ভারে। স্থপতি ও ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্দির থেকে বার হ'য়ে আসি।

সব শেষে আমরা প্রসিদ্ধ ব্রহ্মেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গরাজের মন্দির থেকে প্রায় এক মাইল দূরে, উত্তর পূর্ব কোণে, পবিত্র পঞ্চকোষীর ভিতরে। উল্লিখিত আছে একাম্র পুরাণে, লিঙ্গরাজের মন্দির থেকে কিছু দূরে একটি মন্দির নির্মাণ করবার জন্য শঙ্কর ব্রহ্মাকে আদেশ

করেন। দেব স্থপতি বিশ্বকর্মাকে দিয়ে ব্রহ্মা এই মন্দিরটি নির্মাণ করান। তাই পরিচিত এই মন্দিরটি ব্রহ্মেশ্বর নামে। সভা কবি পুরুষোত্তম রচিত মন্দিরের অঙ্গের উৎকীর্ণ শিলালেখ থেকে জানা যায়, মাতা কলাবতীর আদেশে কলিঙ্গাধিপতি কেশরী শ্রেষ্ঠ উদয়াটক, পরিচিত উদ্যোত কেশরী নামেও, এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। ছিলেন তিনি কেশরী বংশের জন্মেজয় থেকে সপ্তম পুরুষ। এই জন্মেজয়ই কেশরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাশক্তিশালী যযাতী কেশরীর পিতা, তাই নির্মিত হয় এই মন্দিরটি নবম শতাব্দীতে।

দাঁড়িয়ে আছে ব্রহ্মেশ্বর সঙ্গে নিয়ে জগমোহন চার ফুট উঁচু ভিত্তির উপর পুর্ব দিকে মুখ করে, একটি সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে, বেষ্টিত হয়ে আছে দুইটি প্রাকারে। আজ অবশিষ্ট আছে বহিঃ প্রাকারের কিছু চিহ্ন। ভিতরের প্রাকারের চারি কোণে দাঁড়িয়ে আছে চারিটি মন্দির, দক্ষিণ প্রান্তে পবিত্র সরোবর।

পঞ্চ রথ দেউল এই মন্দিরের বিমান, বিভক্ত পাঁচটি ভূমিতে। দেখি, অঙ্গে নিয়ে আছে বাঢ়ের উপরিস্থিত প্রথম ভূমির প্রতিটি পগ রেখ দেউলের প্রতীক। অলঙ্কৃত কোণক পগের কেন্দ্রস্থল ঝালরের কাজ দিয়ে, তার চারিদিকে জন্তর মূর্তি। দেখি নাই এমন অলঙ্করণ কোণকপগের অঙ্গে অন্য কোন মন্দিরে। বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের। কেন্দ্রস্থলের রাহাপগের অঙ্গে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি সিংহ একটি অবনত হস্তীর পৃষ্ঠের উপর। হস্তীর পাশে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। রাহাপগের অঙ্গে বনলতার বন্ধনী। দেখি অনুরূপ সিংহের মূর্তি কোণক আর অনর্থ পগের অঙ্গেও। দেখি উচ্চ বারাণ্ডির অঙ্গে, কুলুঙ্গির ভিতর, নর ও নারীর মূর্তি। অনবদ্য তাদের গঠন সৌষ্ঠব, অতুলনীয় সুন্দরতম তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গী। দেখেছি অনুরূপ দেবদেবীর মূর্তি মেঘেশ্বরের বারাণ্ডির অঙ্গেও। দেখি, অপসারিত হয়েছে কেন্দ্রস্থলের পার্শ্ব দেবতার মূর্তিগুলি।

দেখি নিম্নতম প্রদেশে, দুইটি অপরূপ, পরমা সুন্দরী নারী মূর্তি, দুইটি কুলুঙ্গির ভিতর, শীর্ষে নিয়ে চন্দ্রাতপ। দেখি শিব আর ভৈরবের মূর্তিও। অলঙ্কৃত পশ্চিম গাত্র একটি চামুণ্ডার মূর্তি দিয়ে। কেন্দ্রস্থলের পাড়ের অঙ্গে একটি মুনি শিষ্যদের তত্ত্বকথা শোনান। দেখি কত দেব দেবীর মূর্তিও। কিন্তু নর আর নারীর মূর্তিই শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের অলঙ্করণে—মধ্যমণি।

শোভন গঠন, জীবন্ত তারা, সজ্জিত বিভিন্ন বহুমূল্য বসনে আর ভূষণে। তাদের কারও হস্তে শোভা পায় বাদ্য যন্ত্র, কারও প্রসাধনের দ্রব্য, কেউ হস্তে নিয়ে আছে কত বিভিন্ন যন্ত্র—ইঙ্গিৎ উড়িষ্যার তৎকালীন সামাজিক জীবনের ধারার।

দেখি উত্তর আর দক্ষিণ গাত্রে পাঁচটি দণ্ডায়মান মূর্তি। বৃহত্তম মূর্তি এই মন্দিরের। নাই কোন নাগিনীর মূর্তি। উত্তর পশ্চিম কোণে, রাহা আর কোণক পগের সন্ধিস্থলে, একটি পরমা রূপবতী নারী মূর্তি। দাঁড়িয়ে আছে নারী যৌবন মদমত্তা, লীলায়িত তার গ্রীবা, পীনোন্নত তার বক্ষ, দাঁড়িয়ে আছে লাস্যময়ী। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

জগমোহনে উপস্থিত হই। পঞ্চরথ দেউল এই জগমোহনটিও, বুকে নিয়ে আছে দুইটি স্তম্ভযুক্ত গবাক্ষ, অঙ্গে নিয়ে পাঁচটি মূর্তি। সুন্দরতম তাদের মধ্যে উত্তর দিকের নারী মূর্তিটি, নিবদ্ধ তার দৃষ্টি একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের প্রতি।

দেখি, প্রবেশ পথের দুই পাশের, চৌকাঠের অঙ্গও অলঙ্কৃত বৃহৎ মূর্তি দিয়ে, মূর্তি দুই দ্বার পালের, হস্তে নিয়ে অসি। বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত তাঁদের সর্বাঙ্গ, দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা বীর বিক্রমে, আরোহণ করে আছেন কাল্পনিক জন্তু। ছাদের ঠিক নিচে, দেখি, মৃগ, হস্তী ও রাজহংসের সারি, অগ্রসর হচ্ছে তারা শোভা যাত্রায়, স্বল্প ব্যবধানে।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখি, মূর্তি দিয়ে রচিত হয়েছে কত কাহিনী প্রাচীরের গাত্রে। পূজারীরা একটি শিব লিঙ্গকে পূজা করছে। ভক্তেরা কৃতাঞ্জলিপুটে এক সাধুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ধ্যানমগ্ন সাধু। দেখি মাতা সন্তানকে স্তন্য পান করাচ্ছেন, নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি শিশুর মুখের প্রতি, উদ্ভাসিত তাঁর আনন তাঁর অন্তর নিহিত করুণার মাধুর্যে, প্রদীপ্ত। অপরূপ এই মূর্তিটিও মুগ্ধ হয়ে দেখি। দেখি অগ্রসর হচ্ছে অশ্বারোহী সৈন্যের দল, কত পদাতিক সৈন্যও, সজ্জিত বিভিন্ন অস্ত্রে শস্ত্রে। কেন্দ্রস্থলে, ছাদের অঙ্গে একটি অপরূপ, সুন্দরতম প্রস্ফুটিত পদ্ম, বিলম্বিত পদ্মটি ছাদের অঙ্গ থেকে। সুন্দরতম এই ছাদের অলঙ্করণ, প্রকৃষ্টতম দান উড়িষ্যার মহা অভিজ্ঞ ভাস্করের।

অনুরূপ ব্রহ্মেশ্বর মুক্তেশ্বরের, বিমানের আর জগমোহনের অঙ্গের মূর্তিসম্ভারে আর অলঙ্করণে, পড়ে সমপর্যায়েও। তাই বুকে নিয়ে আছে ব্রহ্মেশ্বরও শ্রেষ্ঠ

নিদর্শন উড়িষ্যার স্থপতির শ্রেষ্ঠ প্রতীক উড়িষ্যার ভাস্করেরও, তাঁদের সুন্দরতম মহামহিমময় দানের. তাঁদের ঐতিহ্যেরও।

অমর হয়ে আছে ব্রহ্মেশ্বর, মুক্তেশ্বর, লিঙ্গরাজ, অনন্ত বাসুদেব, আছে পরশুরামেশ্বর, বৈতাল দেউল আর রাজারানীও, ইতিহাসের পাতায়। অমর হ'য়ে আছে একাম্রকানন,—ভুবনেশ্বর, মন্দির নগর ভারতের, বুকে নিয়ে আছে অক্ষয় কীর্তি—কীর্তি কত মহাগৌরবময় যুগের। অমরত্ব লাভ করেন উড়িষ্যার কর, কেশরী আর চোড় গঙ্গবংশের নৃপতিরা, করেন তার মহা অভিজ্ঞ স্থপতি আর সুনিপুণ ভাস্করও, জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা উড়িষ্যায় যুগে যুগে। তাঁদের সকলকে প্রণতি জানিয়ে পরিত্যাগ করি ভুবনেশ্বর, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি যা আজও অক্ষয় হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়, হয় নাই ম্লান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র

১। জগন্নাথ দেবের মন্দির ২। বিমলাদেবীর মন্দির

পরের দিন ভোরে উঠে, শ্রেষ্ঠ তীর্থ তীর্থরাজ সমুদ্রে স্নান করে, পবিত্র হয়ে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে উপনীত হই। বিরাজিত তার উত্তর কূলে শ্রীক্ষেত্র, শঙ্খাকৃতি পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, নিমজ্জিত তার উদয় ভাগ সমুদ্রের জলে, স্পর্শ করে সমুদ্রের জল, তাই তীর্থ শ্রেষ্ঠ এই সমুদ্র পরিচিত তীর্থরাজ নামে। অবস্থান করেন এই শঙ্খের নাভিদেশে অক্ষয় বট, সমুদ্রতীর থেকে অক্ষয় বট পর্যন্ত স্থান অন্তর্বেদী নামে খ্যাত, মহাপবিত্র ভূমিও, মুক্তি লাভ করে জীব এখানে মৃত্যু হলে।

মালব দেশ, পূণ্যভূমি অবন্তী, অলঙ্কৃত করেন তার সিংহাসন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন। ব্রহ্মার পঞ্চম পুরুষ ; জন্মগ্রহণ করেন তিনি সত্য যুগে সূর্যবংশে। পরম রূপবান, মহাপরাক্রমশালী, সত্যনিষ্ঠ, প্রিয় ভাষী, জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ এই নৃপতি, পুত্র নির্বিশেষে প্রজা পালন করেন। অনুষ্ঠিত হয় রাজসূয় আর অশ্বমেধ যজ্ঞও, পরিণত হন তিনি সার্বভৌম সম্রাটে। একদিন উপনীত হন তাঁর রাজসভায় এক তীর্থযাত্রী। তিনি বহু তীর্থ পর্যটন করেন। অবগত তিনি তাদের মাহাত্ম্যের বিষয়ও। বলেন, প্রসিদ্ধ ওড্রদেশে, দক্ষিণ সাগর কূলে অবস্থিত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রই, সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ভারতের। দাঁড়িয়ে আছে সেখানে নীলগিরি। বেষ্টিত হয়ে আছে নীলগিরি ঘনবন বীথিতে, বুকে নিয়ে আছে মহাপবিত্র কল্পবৃক্ষ। বিস্তৃত সেই বৃক্ষ এক ক্রোশ পরিধি নিয়ে। বিদূরিত হয় তাঁর ছায়া স্পর্শে ব্রহ্ম হত্যার পাপ। তার পশ্চিম দিকে রৌহিণ নামে একটি কুণ্ড, পরিপূর্ণ কারণ জলে। মোক্ষ লাভ হয় জীবের এই কুণ্ড দর্শনে। কুণ্ডের পূর্বতীরে নীলকান্ত মণিময়, ভগবান বাসুদেবের মূর্তি বিদ্যমান। রৌহিণ কুণ্ডের পবিত্র জলে স্নান করে, পুরুষোত্তম বাসুদেবের বিগ্রহ দর্শন করলে সহস্রাশ্বমেধের ফল পায় জীব, দেহান্তে, মোক্ষ লাভ হয়। কুণ্ডের পশ্চিম দিকে, শবর দীপক

নামে একটি শ্রেষ্ঠ আশ্রম, বিরাজ করেন সেখানে সাক্ষাৎ জগন্নাথ, শঙ্খ, চক্র, গদা ধারণ করে, মোক্ষ লাভ করে জীব তাঁর দর্শনেও।

তীর্থযাত্রীর কথা শুনে, রাজার অন্তঃকরণে, নীলকান্ত মণিময় বাসুদেবের দর্শনের বাসনা জাগে, বাস করতে মহাপবিত্র শ্রেষ্ঠ তীর্থ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে।

প্রেরিত হন প্রথমে রাজ পুরোহিতের ভ্রাতা, বিদ্যাপতি। সঙ্গে নিয়ে অনুচরবৃন্দ। পুষ্পক রথে আরোহণ করে, তিনি শবরদীপকে উপনীত হন। দেখেন, এক বৃদ্ধ শবর পর্বতের অভ্যন্তর থেকে নির্গত হচ্ছেন। চন্দনে বিভূষিত তাঁর ললাট। তিনিই শবররাজ বিশ্বাবসু। শবররাজের নিকটে গিয়ে বিদ্যাপতি তাঁর সেখানে আগমনের কারণ জানান। বলেন, প্রেরিত হয়েছি আমি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক, দর্শন অভিলাষী ভগবান নীলমাধবের।

শবররাজ তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে অর্চনা করেন। তারপর, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে, রৌহিণ কুণ্ডের পূর্ব দিকে উপনীত হন। অতিক্রম করেন এক প্রস্তর ও কণ্টকাকীর্ণ তিমিরাবৃত সুদুর্গম গিরিসঙ্কট। রৌহিণ কুণ্ডের পূর্ব দিকে কল্পান্তকাল স্থায়ী সুবৃহৎ অক্ষয়বট, কেন্দ্রস্থলে নিকুঞ্জাভ্যন্তরে দেবাদিদেব জগন্নাথ বিরাজ করেন।

চরিতার্থ হন বিদ্যাপতি রৌহিণ কুণ্ড, অক্ষয়বট ও জগন্নাথকে দর্শন করে। সার্থক হয় তাঁর জীবন। করেন অসংখ্য স্তুতি। বলেন হে পরাৎপর, হে সর্বব্যাপিন্ তুমি প্রকৃতি পুরুষের অতীত, এবং চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের পরিণাম, পরম পদার্থ, তোমাকে নমস্কার। বলেন, হে জগৎপতে! একমাত্র তুমিই শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণেতিহাস প্রতিপাদিত কর্মকলাপ দ্বারা আরাধ্য পদার্থ। বলেন হে বিভো, তোমা হতেই সমুদ্ভূত সমস্ত জগৎ, তুমিই তার একমাত্র আধার, আবার তোমার জঠরেই, প্রলয়ের কালে, সে সুখে অধিষ্ঠান করে,—তোমাকে নমস্কার। প্রণতি জানান তাঁর কত বিভিন্ন স্বরূপকে, কত সীমাহীন বিভূতিকে। শেষে তাঁর চরণ কমলে শরণ নিয়ে, তাঁকে ভবদুঃখরাজি থেকে পরিত্রাণ করতে বলেন।

এদিকে সমাগত হয় সন্ধ্যা। শেষে রাত্রির অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে দিগন্ত। শবররাজের আমন্ত্রণে বিদ্যাপতি তাঁর গৃহে, রাত্রি যাপন করেন। রজনী প্রভাতে তীর্থরাজ সাগর সলিলে, অবগাহন করে মাধবকে প্রণাম করে, অবন্তীপুরী অভিমুখে যাত্রা করেন।

বিদ্যাপতির মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হয়ে, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, সপরিবারে, আত্মীয়স্বজন, পাত্রমিত্র, সভাসদ ও সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে এক শুভক্ষণে দ্রুতগামী রথ আরোহণে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র অভিমুখে রওনা হন। সঙ্গে যান দেবর্ষি নারদও।

বহুপথ অতিক্রম করে, তাঁরা ওড্র দেশে উপনীত হন। সঙ্গী হন তাঁদের সসৈন্যে ওড্ররাজও। ক্রমে, তাঁরা একাম্রকাননে উপনীত হন। বিরাজ করেন এই একাম্রকাননে বিষ্ণুর আদেশে, পবিত্রতীর্থ বারাণসী পরিত্যাগ করে এসে সহস্র লিঙ্গম ত্রিভুবনেশ্বর মহাদেব। ত্রিভুবনেশ্বর কপোতেশ্বর মহাদেব দর্শন করে, তাঁরা নীলকণ্ঠের নিকটে সমাগত হন।

এমন সময় স্পন্দিত হতে থাকে নৃপতির বাম অঙ্গ আর বাম চক্ষু। ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয় তাঁর অন্তঃকরণ। দেবর্ষিকে সেই কথা জানান। বলেন দেবর্ষি নারদ, সব শুভ কাজেই কিছু না কিছু বিঘ্ন থাকে। বিদ্যাপতির দর্শনের পরের দিন সন্ধ্যাকালেই নীলেন্দ্র মণিময় ভগবান নীলমাধব কাঞ্চন বালুকায় আবৃত হয়ে, পাতালে প্রবেশ করেছেন। তাই সম্ভব নয় আপনার তাঁর দর্শন। বিফল হবে যাত্রা। মূর্ছিত হয়ে, ভূতলে নিপতিত হন নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করে। হন সংজ্ঞাহীন। শেষে দেবর্ষির যত্নে, চেতনা ফিরে পেয়ে বিলাপ করতে থাকেন।

দেবর্ষি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, দর্শন হবে আপনার নীলমাধবের দারুময় চারিমূর্তি, পূর্ণ হবে মনস্কাম। সফল হবে আপনার মনোরথ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে। শোকাবেগ সংবরণ হলে, মহারাজ নারদের সঙ্গে নীলকণ্ঠ মহাদেব দর্শন করেন। উপনীত হন তাঁরা নীলগিরির শীর্ষদেশে। এইখানেই বিরাজ করতেন সাক্ষাৎ ভগবান জগন্নাথ। ভক্তি ভরে তাঁকে প্রণতি জানান, নিযুক্ত হন স্তব আর স্তুতিতে। তাঁর স্তুতিতে সন্তুষ্ট হন ভগবান। আকাশবাণী হয় দেবর্ষি নারদের কথামত কাজ করলে, তাঁর মনস্কামনা সফল হবে। তখন সুরু হয় তাঁর সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। সাহায্য করেন তাঁকে ইন্দ্রাদি দেবগণ, লাগে সহস্র বৎসর।

যজ্ঞ সমাপনান্তে, একদিন শেষ রাত্রিতে নৃপতি স্বপ্ন দেখেন। দেখেন, ক্ষীর সমুদ্রের কেন্দ্রস্থলে, একটি স্ফটিক নির্মিত শ্বেতদ্বীপ। সেই দ্বীপে, অসংখ্য

কল্পবৃক্ষে পরিবেষ্টিত হয়ে, রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট অক্ষয় বিষ্ণু। তাঁর দক্ষিণ পাশে লক্ষ্মী দেবী। সম্মুখে, কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে পিতামহ পদ্মযোনি ব্রহ্মা। স্বপ্নের ভিতরই নৃপতি স্তুতি করেন দেবতা বিষ্ণুকে। প্রভাতে, নারদকে স্বপ্নের কথা বলেন। নারদ বলেন, পূর্ণ হবে নৃপতির অভিলাষ দশদিনের মধ্যেই।

একদিন নৃপতি লোক মুখে অবগত হন ভেসে এসেছে একটি বৃক্ষ সমুদ্র সৈকতে স্নান গৃহের নিকটে। নিহিত তার অগ্রভাগ সমুদ্র গর্ভে। কৃষ্ণবর্ণ সেই বৃক্ষ, চিহ্নিত শঙ্খ চক্রাদি চিহ্নে। আমোদিত তার অঙ্গের সুগন্ধে চতুর্দিক। বিস্মিত হন নৃপতি। জিজ্ঞাসা করেন নারদকে বৃক্ষের পরিচয়।

বলেন দেবর্ষি, আপনার স্বপ্নে দেখা, বিষ্ণুর অঙ্গচ্যুত রোমই এই বৃক্ষ। এই বৃক্ষ দিয়েই নির্মিত হবে স্বপ্নে দর্শিত মূর্তি, দর্শন হবে ভগবানের। তাঁরা সমুদ্র তীরে উপনীত হয়ে বিস্মিত হয়ে দেখতে থাকেন সেই অপরূপ বৃক্ষটিকে আর ভাবতে থাকেন, কেমন করে রচনা করা হবে ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি। শেষে পূজা করেন সেই দারু ব্রহ্মকে। আবার আকাশবাণী হয় ভগবান নিজেই তাঁর স্বরূপ নির্মাণ করে, মহাবেদীতে আবির্ভূত হবেন। এখন এই দারু ব্রহ্মকে এক পক্ষ কাল বেদীগৃহে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে রাখ। শীঘ্রই উপনীত হবেন এক দীর্ঘ হস্ত, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ। তাঁকে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে, বাইরে থেকে দ্বার রুদ্ধ করে দেবে, নিষিদ্ধ দ্বিতীয় ব্যক্তির সেই গৃহে প্রবেশ। আর যতদিন না ভগবান আবির্ভূত হন ততদিন মুখরিত কর গৃহের বহির্ভাগ, ঢক্কা নিনাদে। উপনীত হন রাজসমীপে সত্যই বৃদ্ধ পুরুষের বেশে স্বয়ং নারায়ণ। বলেন নির্মাণ করব আমি দিব্য দারু দিয়ে তোমার স্বপ্নে দর্শিত ভগবানের মূর্তি। তারপর প্রবেশ করেন বেদীগৃহে রুদ্ধ হয় দ্বার, শুরু হয় বাজনাও। অতিবাহিত হয় কিছুদিন, আমোদিত হয় চতুর্দিক এক অপরূপ দিব্য গন্ধে, হয় পুষ্পবৃষ্টিও। মুখরিত হয় আকাশ বাতাস এক সুমধুর দিব্য সঙ্গীতে। দেবতারাও আসেন, উপনীত হন বেদীর সম্মুখে, নিযুক্ত হন ভগবানের স্তবে। শেষে পঞ্চদশ দিবসে, উন্মুক্ত হয় দ্বার, প্রকাশিত হন গৃহের অভ্যন্তরে, রত্নময় বেদীর উপরে দারুময় জগন্নাথ, বলরাম, মধ্যে নিয়ে ভগ্নী সুভদ্রা, বামে সুদর্শন চক্র, হন দারু ভগবান। ভূষিত হন জগন্নাথ নীল বর্ণের পট্টবস্ত্রে, বলরাম শ্বেত আর সুভদ্রা কুঙ্কুমবর্ণের।

তারপর সুরু হয় সহস্র হস্ত উচ্চ, সহস্র হস্ত বিস্তৃত এক মহামহিমময় মন্দির নির্মাণ, নীলগিরির শীর্ষদেশে, অক্ষয় বটের বায়ু কোণে। নির্মাণ করেন সহস্র শিল্পী, নিযুক্ত করেন তাঁদের নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন। পরিসমাপ্তি হয় মন্দির নির্মাণ, নারদের পরামর্শে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে, ব্রহ্মাকে আনবার জন্য মহারাজ রথারোহণে স্বর্গে উপনীত হন। প্রজাপতি ব্রহ্মাই প্রতিষ্ঠা করবেন এই মন্দিরের বিগ্রহ। প্রতিষ্ঠিত হবেন জগন্নাথ, সঙ্গে নিয়ে বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্র।

ইতিমধ্যে মহাপ্রলয় হয় ধরিত্রীতে। মৃত্যু হয় নৃপতির স্ত্রী পুত্রের তাঁর সৈন্য সামন্তের। ধ্বংসে পরিণত হয় তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্যও। প্রোথিত হয় তাঁর নির্মিত মন্দির ও বালুকার অতল গর্ভে, অন্তর্হিত হয়ে যায় একেবারে। নিমজ্জিত হয় সমুদ্রের বালুকার গর্ভে সারা নীলাচল। কালক্রমে; পরিণত হয় নীলাচল এক ভীষণ হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে। একদিন গাল রাজা অশ্বারোহণে, মৃগয়া করতে, সেই বালুকাময় ও জঙ্গলাকীর্ণ তটভূমির উপর দিয়ে শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে অগ্রসর হন। হঠাৎ রুদ্ধ হয় তাঁর অশ্বের গতি, রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয় তার পা। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে, তার পায়ের নিচের বালুকা খনন করে, নৃপতি দেখেন, আবদ্ধ অশ্বের পদ, মন্দিরের শীর্ষদেশে অবস্থিত একটি বিষ্ণু চক্রে। বিস্মিত হন নৃপতি। ভাবেন নিশ্চয়ই প্রোথিত আছে এখানে কোন বৃহৎ মন্দির। নিযুক্ত করেন বহুলোক মন্দির উদ্ধারের কাজে। শেষে, তাদের অক্লান্ত চেষ্টায় অপসৃত হয় বালুকারাশি, সম্পূর্ণ নির্মুক্ত হয় বালুকার গর্ভ থেকে এক সুউচ্চ, মহামহিমময় মন্দির। কিন্তু নাই সেই মন্দিরের গর্ভগৃহে কোন বিগ্রহ। বহু অনুসন্ধান করেও গালরাজা জানতে পারেন না কে এই মন্দিরের নির্মাতা, আর পূজিত হতেন এখানে কোন দেবতা। শেষে, মাধবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে, তিনি নিজের রাজ্যে ফিরে যান।

কয়েকদিন স্বর্গলোকে বাসের পর, নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন একদিন নারদের সঙ্গে ব্রহ্মা সমীপে উপস্থিত হয়ে, ভক্তিভরে প্রণাম করে, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেন। সম্মত হন ব্রহ্মা। বলেন যদিও মাত্র কয়েকদিন তুমি এখানে যাপন করেছ, অতীত হয়েছে বহুশত বৎসর পৃথিবীতে। সঙ্ঘটিত হয়েছে একটি মহাপ্রলয়ও, মৃত্যু বরণ করেছে তাতে তোমার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, তোমার সৈন্যসামন্ত। অক্ষত আছে শুধু তোমার নির্মিত মন্দির আর

সেই চারিমূর্তি। বলেন, ফিরে যাও তুমি ধরাধামে, সঙ্গে নিয়ে যাও দেবতাদের, গিয়ে সংগ্রহ কর পূজার সমস্ত উপকরণ; আমিও তোমাদের অনুগমন করছি।

নৃপতি সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে এসে, দেবগণ আর পূজার উপকরণ সঙ্গে নিয়ে নীলাচলে উপনীত হয়ে দেখেন, প্রতিষ্ঠিত একটি মাধবের বিগ্রহ তাঁর নির্মিত মন্দিরে। অক্ষয় বটের নিকটে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করে তিনি স্থাপন করেন মাধবের মূর্তিটি সেই মন্দিরে।

ক্রুদ্ধ হন গাল রাজা শ্রী মন্দির থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মূর্তিটির অপসারণের সংবাদ পেয়ে। উপনীত হন সেই স্থানে বহু সৈন্য সামন্ত সঙ্গে নিয়ে। শোনেন, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নই নির্মাণ করেছিলেন এই মন্দিরটি। অবগত হন ব্রহ্মা কর্তৃক মন্দিরে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার কথাও। প্রশমিত হয় তাঁর ক্রোধ, নিযুক্ত হন অনুচরদের নিয়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজে। সহায়ক হন নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের, হন তাঁর আজ্ঞাবহ। দেবতারাও নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। সুরবৃন্দে পরিবেষ্টিত হয়ে, সিংহাসনে আরোহণ করে, সুররাজের ন্যায় মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিরাজ করেন, সঙ্গে নিয়ে প্রজাবৃন্দ। মুখরিত হয় আকাশ বাতাস দিব্য দুন্দুভি, বেণু, মুরজ আর বীণার সুমধুর তানে। আবির্ভূত হন ভগবান কমলযোনি ব্রহ্মা শত কাঞ্চন হংস বাহিত রথে আরোহণ করে। দুই পাশে তাঁর গঙ্গা যমুনা। ছত্রধারী তাঁর চন্দ্রসূর্য। বেষ্টিত তিনি গৌতমাদি মহর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি আরও কত মুনি ঋষি দিয়েও।

রক্ষিত ছিল গুণ্ডিচা গৃহে ভগবানের দারুময় চারিমূর্তি। প্রথমে পরিমার্জিত ও রঞ্জিত করেন তাঁদের ব্রহ্মা, বিভূষিত করেন বহুমূল্য পট্টবস্ত্রে আর বিভিন্ন মূল্যবান অলঙ্কারে। রচিত হয় তিনটি সুন্দরতম রথও তাঁদের শ্রীমন্দিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। চিহ্নিত হয় ভগবানের রথ গরুড়ধ্বজ রূপে, বলরামের তালধ্বজ আর সুভদ্রার পদ্মধ্বজ রূপে। তারপর রথারোহণে তাঁরা মন্দিরে আনিত হন, অভিষিক্ত হন সমুদ্রের জলে। প্রতিষ্ঠা করেন তাঁদের শ্রীমন্দিরে প্রজাপতি পদ্মযোনি ব্রহ্মা। হতে থাকে পুষ্প বৃষ্টি। বিস্মিত হয়ে দেখেন সেই দৃশ্য ত্রিলোকবাসীরা—দেবতারা, মুনি ঋষিরা আর ধরা বাসীরা।

পরিনির্বাণ লাভ করেন যুগাবতার বুদ্ধ ৪৮৬ খ্রীষ্ট পূর্বে। লাভ করেন তাঁর একটি দন্ত কলিঙ্গাধিপতি। নির্মাণ করেন তিনি এই স্থানে, সেই দন্তের

উপরে, একটি মহিমময় স্তূপ। প্রাচীনতম বৌদ্ধ স্তূপ ভারতের। বিস্তৃত হয় বৌদ্ধ প্রতিপত্তি, বৌদ্ধ ধর্ম কলিঙ্গ দেশে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে স্থানান্তরিত হয় সেই দন্ত পাটলিপুত্রতে। পরে আবার ফিরিয়ে আনা হয় সেই মহাপবিত্র দন্ত কলিঙ্গ দেশে। ৩১১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলে নিয়ে যাওয়া হয় সেই দন্ত।

দাঁড়িয়ে আছে এইখানেই জগন্নাথ দেবের মন্দির, মহামহিমময় মূর্তিতে, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উড়িষ্যার স্থপতির আর ভাস্করের। কলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ অনন্ত বর্মণ চোড়গঙ্গ নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি, রাজত্ব করেন তিনি ১০৭৬ থেকে ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কেউ বলেন নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি ৩০।৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অনিয়াক ভীম দেব, পরিচিত অনঙ্গ ভীম দেব নামেও, ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। দাঁড়িয়ে আছে জগন্নাথ দেবের মন্দিরটি সমুদ্র থেকে এক মাইল দূরে, শীর্ষে নিয়ে দুইশত ফুট সুউচ্চ শিখারা বা চূড়া, সঙ্গে নিয়ে জগমোহন, নাটমন্দির আর ভোগমন্দির এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের ভিতর, বেষ্টিত হয়ে আছে চব্বিশ ফুট উঁচু, বাইশ ফুট প্রস্থ দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে মহামহিমময় জগন্নাথের মন্দির উন্নত করে তার গগনচুম্বী শির, পরিদৃশ্যমান তার চূড়া বহুদূর থেকে। তার উত্তর দক্ষিণে ছ'শ ছেষট্টি ফুট, পূর্ব পশ্চিমে ছ'শ সাতাশি ফুট দীর্ঘ প্রাচীর। পরিচিত এই প্রাচীরটি মেঘনাদ নামে। তার চার প্রবেশ পথে চারিটি দ্বার। পূর্বে প্রধান বা সিংহদ্বার, তার দুই পাশে, বীর বিক্রমে দুইটি অতিকায় সিংহ দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরে হস্তীদ্বার, পশ্চিমে খাঞ্জা আর দক্ষিণে অশ্বদ্বার।

মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে, সুবিশাল অঙ্গনের মধ্যে, দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রস্তর স্তম্ভ—পরিচিত অরুণ স্তম্ভ নামে। চৌত্রিশ ফুট উঁচু, ষোল কোণ এই স্তম্ভটি নির্মিত কৃষ্ণ প্রস্তর দিয়ে, দাঁড়িয়ে আছে সোওয়া এগার ফুট উচ্চ একটি স্তম্ভ মূলের উপর, শীর্ষে নিয়ে আছে পদ্ম, পদ্মের উপর অরুণ। দাঁড়িয়ে ছিল এই স্তম্ভটি কোণারকের প্রসিদ্ধ সূর্য মন্দিরের সম্মুখ ভাগ আলো করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর, প্রথম ভাগে মহারাষ্ট্রেরা সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসে, এখানে স্থাপন করেন। রচিত হয় একটি ভিতর অঙ্গন ও, পরিধি তার চারিশত কুড়ি ফুট দীর্ঘ আর তিনশত পনর ফুট প্রস্থ। বুকে নিয়ে আছে এই অঙ্গন অসংখ্য ক্ষুদ্র মন্দির।

বিমানে উপনীত হই। পঞ্চরথ দেউল এই বিমানটি সাড়ে এগার ফুট তার জঙ্ঘার উচ্চতা পাঁচ ভাগে বিভক্ত, পাঁচ ফুট উঁচু একটি পৃষ্ঠের (ভিত্তির) উপর থক হয়ে আছে নয়টি ভূমিতে, শীর্ষে নিয়ে আছে আমলক, কলস আর চক্র। খি বারাণ্ডির অঙ্গে পীঢ় দেউলের প্রতীক। দেখি, কুলুঙ্গির ভিতরে দিক তিদের মূর্তিও, জঙ্ঘার কেন্দ্রস্থলে, অসুরদের।

দেখি, দাঁড়িয়ে আছে একটি শার্দূল, পিছন দিকে মুখ করে কোণক আর নর্থপগের সন্ধিস্থলে, অবনত হস্তীর উপর। তার শিরে শোভা পায় কেশর, ানেনে গুম্ফ, ঊর্ধ্বে প্রক্ষিপ্ত তার লোমশ কর্ণদ্বয়। দেখি, একটি শার্দূলের মূর্তি নর্থ আর রাহাপগের সন্ধিস্থলে, হস্তীর মস্তক বিশিষ্ট এই শার্দূলটি। দাঁড়িয়ে াছে একটি সিংহ জগমোহন আর বিমানের সংযোগ স্থলেও, একটি অবনত স্তীর উপর। হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট একটি নর, হস্তে ধারণ করে আছে াগাম।

দক্ষিণ সম্মুখ ভাগে উপনীত হই। দেখি. অনবদ্য সুন্দরতম আর জীবন্ত বদেবীর মূর্তি দিয়ে অলঙ্কৃত বিমানের সর্বাঙ্গ। রাহাপগের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে াছেন রাহু। তাঁর নিচে জগনাথ উপবিষ্ট, সঙ্গে নিয়ে ভ্রাতা বলরাম আর গ্নী সুভদ্রা, তাঁদের প্রায় ত্রিশ ফুট নিচে মারুতি, পবনন্দন, দাঁড়িয়ে আছেন, স্তে নিয়ে একটি বৃক্ষকাণ্ড। তার কিছু নিচে দক্ষিণে মূর্তি দিয়ে রচিত হয় ালীয় দমনের দৃশ্য, দমন করেছেন শিশু কৃষ্ণ দুর্দান্ত কালীয়কে, বামে গরুড় হনে নারায়ণ। সেইখান থেকেই সম্মুখ পদদ্বয় বিস্তৃত করে একটি িংহ দাঁড়িয়ে আছে একটি অবনত হস্তীর পৃষ্ঠের উপর। হস্তীর ঠিক নিচে, সিংহ আর লক্ষ্মী বসে আছেন, তাঁদের দুই পাশে দুই দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে। রসিংহের জানুর উপর স্থাপিত হিরণ্যকশিপুর দেহ, নিযুক্ত তিনি দীর্ঘ নখর িয়ে, তার উদর বিদীর্ণ করতে। তাঁদের নিচে অষ্টভুজ হরি ও হরের মূর্তি, াদের পাশে বলরাম উপবিষ্ট। আরও দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণ, হস্তে ধারণ করে আছেন িরি গোবর্ধনকে। মারুতির নিচেও একটি সিংহ অবনত হস্তী পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে াছে, প্রক্ষিপ্ত তার সম্মুখ পদদ্বয় শূন্যে। তার পাশে দুই রেখ দেউলের প্রতীক, াদের বামে রামকে সঙ্গে নিয়ে বানর সৈন্য; দক্ষিণে, ঊর্ধ্বে লঙ্কাধীশ দশানন, রণ তাঁর দুই পাশে দুই প্রতিহারী। এক কোণে, নিভৃতে একাকিনী সীতা

উপবিষ্টা, তাঁকে প্রণতি জানাচ্ছেন ভক্ত শ্রেষ্ঠ হনুমান। বাঢ়ের দক্ষিণ গাত্রে, শ্রীচৈতন্য ও গণেশের মূর্তি দেখি, জঙ্ঘার অঙ্গে অসুরদের।

উত্তর সম্মুখ ভাগে উপনীত হই। দেখি বিমানের গাত্রে, উপবিষ্ট রাম সঙ্গে নিয়ে হনুমান আর বানর সৈন্য। দেখি এক অপরূপ নরসিংহ মূর্তিও, তাঁর দক্ষিণে ব্রহ্মা, বামে নারদ ঋষি। সুন্দরতম উত্তর গাত্রের মারুতির মূর্তিটিও, দাঁড়িয়ে আছেন মারুতি অর্ধ নির্গত সিংহের উপর। দেখি অলঙ্কৃত বিমানের পশ্চিম গাত্রও, দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য নয় এই মূর্তিগুলি, পড়ে না সমপর্যায়েও অঙ্গ সৌষ্ঠবে আর গঠন গরিমায়।

ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দিরের মত, বিমানের তিনদিকে উত্তরে, দক্ষিণে আর পশ্চিমে, তিনটি দ্বিতল পীঢ় দেউল নির্মিত হয়, রূপ ধারণ করে তারা বিমানের তিনদিকের রাহাপগের অঙ্গের গভীর কুলুঙ্গির ভিতরে অবস্থিত, বামন, বরাহ আর নরসিংহ দেবের জগমোহনের। সাড়ে এগার ফুট এই সব দ্বিতল পীঢ় দেউলের নিম্ন তলের উচ্চতা।

দাঁড়িয়ে আছেন চতুর্ভুজ বরাহ দক্ষিণ রাহাপগের অঙ্গে কুলুঙ্গির ভিতর। ধারণ করে আছেন তিনি এক হস্তে একটি চক্র, দ্বিতীয় হস্তে একটি নারীকে, তৃতীয় হস্তে বরদামুদ্রা, ভগ্ন তাঁর চতুর্থ হস্ত। উর্ধ্বে বিলম্বিত কীর্তিমুখ। বহুমূল্য সূক্ষ্ম কারুকার্যে শোভিত বসনে সজ্জিত বরাহ, অনুরূপ এই বসন লিঙ্গরাজের মন্দিরের পার্শ্বদেবতার অঙ্গের বসনের।

দাঁড়িয়ে আছেন নরসিংহ, নররূপী সিংহ, পশ্চিমের কুলুঙ্গির ভিতরে, গর্ভগৃহের পিছনে। চতুর্ভুজ তিনিও, দুই হস্ত দিয়ে তিনি জানুর উপরে শায়িত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করতে নিযুক্ত, তাঁর তৃতীয় হস্তে শোভা পায় চক্র, চতুর্থে গদা। তাঁর কণ্ঠে শোভা পায় মুক্তার মালা। সুন্দরতম সূক্ষ্মতম কারুকার্য সমন্বিত তাঁর অঙ্গের বসনও, বিলম্বিত নাই কোন কীর্তিমুখ তাঁর শিরের উপর। অপরূপ সুন্দরতম, এই মূর্তিগুলি, অন্যতম শ্রীকৃষ্ণের দশাবতারের মূর্তির, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের, কীর্তি এক মহা গৌরবময় যুগের, প্রতীক চরম উৎকর্ষের, পূর্ণ পরিণতির দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে দ্বার অতিক্রম করে ভিতরে মণিকোঠায় প্রবেশ করি। দেখি গর্ভগৃহে, রত্ন বেদীর উপর বিরাজ করেন

সাক্ষাৎ ভগবান দারুরূপী জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, সঙ্গে নিয়ে সুদর্শন চক্র, লক্ষ্মী আর সরস্বতী। তাঁদের পিছনে নীলমাধব। ষোল ফুট দীর্ঘ, তের ফুট প্রস্থ ও চার ফুট উচ্চ এই রত্ন বা ডাল বেদীটি নির্মিত কৃষ্ণ প্রস্তর দিয়ে, বুকে নিয়ে আছে লক্ষ শালগ্রাম শিলা।

দেখি নাই এমন রূপ ভগবানের অন্য কোন মন্দিরে, পূজিত হন না কোন হিন্দু মন্দিরে বিগ্রহ সঙ্গে নিয়ে ভ্রাতা ও ভগ্নী। পাণ্ডার নির্দেশে দারুময় রূপে বিরাজিত ভগবানকে পূজা দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি।

সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে জগমোহনে উপস্থিত হই। পঞ্চরথ পীঢ় দেউল এই জগমোহনটিও দাঁড়িয়ে আছে সওয়া ছ-ফুট উচ্চ পৃষ্ঠের উপর। পাঁচ ভাগে বিভক্ত তার বাঢ়ের অঙ্গও। যুক্ত হয়েছে তার পশ্চিমদ্বার নাটমন্দিরের সঙ্গে, পুর্ব দ্বার দিয়ে বিমানে উপনীত হতে হয়। দক্ষিণ প্রবেশ পথের, দুই দিকের বৃত্তাকার স্তম্ভের শীর্ষদেশে নবগ্রহের মূর্তি দেখি, নাই লিন্‌টেলের উপর গজলক্ষ্মীর মূর্তি, অলঙ্কৃত নয় তার প্রবেশ পথ সুন্দরতম অলঙ্করণে, তাই সমপর্যায়ে পড়ে না উড়িষ্যার অন্য বিখ্যাত মন্দিরের জগমোহনের। দেখি দুই সারি পীঢ় দিয়ে ভূষিত জগমোহনের পিরামিডাকৃতি অংশ, সন্ধিস্থলে প্রকোষ্ঠের শ্রেণী, এক এক সারিতে ছয়টি করে পীঢ় দেউলের প্রতীক। পগের ফাঁকে ফাঁকে, প্রকোষ্ঠের ভিতর শার্দূলের মূর্তি। রচিত হয় ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ভিতর, প্রস্তরের অঙ্গে, মূর্তি দিয়ে কামশাস্ত্র। দৃশ্য কত সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য মৈথুনেরও। অশ্লীল এই মূর্তিগুলি, অশোভনও, কামনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

জগমোহনের উত্তর দিকে মন্দিরের তোষাখানা বা রত্নভাণ্ডার। আছে এই রত্নভাণ্ডারে বহুকোটি টাকা মূল্যের মণি, মুক্তা, পলা, হিরে ও মূল্যবান অলঙ্কার। জগমোহন দেখে আমরা নাটমন্দিরে উপনীত হই। নির্মিত নাটমন্দিরটি পরবর্তীকালে, বিভিন্ন তার অঙ্গের প্রস্তরও। দেখি, পীঢ় মোহন এই নাটমন্দিরটি, অনুরূপ ভুবনেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ লিঙ্গরাজের নাটমন্দিরের, পরিকল্পনায় আর নির্মাণ পদ্ধতিতে। পুর্ব পশ্চিমে সাতষট্টি ফুট প্রস্থ এই নাটমন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে চার সারিতে ষোলটি স্তম্ভ, এক এক সারিতে চারিটি করে, বিভক্ত হয়ে আছে স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে কেন্দ্রস্থলে আর গলিপথে। তাদের উপরে নির্মিত হয় মন্দিরের অনুভূমিক

খিলানযুক্ত ছাদ, তার চার কোণে চারিটি মকরের মুখ। প্রাচীরের গাত্রে, একদিকে কাঞ্চী বিজয়ের অভিযানের দৃশ্য। উপবিষ্ট পুরীর অধিপতি এক বেগবান অশ্বের পৃষ্ঠে, অপর দিকে দশ অবতারের দৃশ্য। কেন্দ্রস্থলে দ্বারে দণ্ডায়মান অতিকায় শিব আর ব্রহ্মা, মহামহিমময় মূর্তিতে। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের। নাই অন্য কোন অলঙ্করণ। এইটিই একমাত্র স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ উড়িষ্যার, ব্যতিক্রম তার স্থাপত্য পদ্ধতির। গরুড় স্তম্ভকে প্রণতি জানিয়ে, বার হয়ে আসি, দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভটি দেবতার দিকে মুখ করে।

ভোগমণ্ডপে উপস্থিত হই। জগমোহনের মত পঞ্চরথ পীঢ় দেউল এই ভোগমণ্ডপটিও, নির্মিত পীতবর্ণ বেলে পাথর আর গিরিমাটি দিয়ে, দাঁড়িয়ে আছে সওয়া ছয় ফুট পৃষ্ঠের উপর। অলঙ্কৃত তার অঙ্গ হস্তীর শোভা যাত্রার দৃশ্য দিয়ে, তাদের মাঝে এক একটি অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে আছে। দেখি, অলঙ্কৃত পৃষ্ঠের ভিত্তির অঙ্গও কত মূর্তি সম্ভার দিয়ে—মূর্তি কত সুন্দর মকরের, কত অপরূপ রাজহংসের, কত অমিত বিক্রম শার্দুলের, দাঁড়িয়ে আছে পরস্পরের সঙ্গে পৃষ্ঠদেশ স্থাপন করে। দেখি কত অনবদ্য নাগিনীর মূর্তিও, শীর্ষে নিয়ে আছে নাগিনী সপ্তফণা। দেখি কুলুঙ্গির ভিতরে, উদ্গত স্তম্ভের কেন্দ্রস্থলে, দেবদেবীর মূর্তি। দেখি মূর্তি কত অশ্লীল অশোভন সুস্পষ্ট কামনার প্রকাশেরও, কিন্তু নাই কোন অশোভন মূর্তি বিমানের অঙ্গে। দেখি, অঙ্গে নিয়ে আছে ভিত্তি পীঢ় দেউলের প্রতীক, অলঙ্কৃত হয়ে আছে সূক্ষ্মতম জালির কাজ দিয়েও।

দেখি, বিভক্ত বাঢ় পাঁচ অংশে। জঙ্ঘার অঙ্গে দেখি স্ক্রলের কাজ। দেখি, নাগস্তম্ভ আর রেখ-দেউলের প্রতীকও, শোভিত রেখের শীর্ষদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীর্তিমুখ দিয়ে। দেখি, বারাণ্ডির অঙ্গে ষোল কোণ উদ্গত স্তম্ভ, অলঙ্কৃত তাদের গাত্র সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম পলাযুক্ত ঝালরের কাজ দিয়ে। তার কুলুঙ্গির ভিতরে, অপরূপ মূর্তির সম্ভার, মূর্তি দিয়ে বর্ণিত হয় কত কাহিনী, কাহিনী কত পুরাণের।

পূর্ব গাত্রে, বামপ্রান্তে দেখি, কুলুঙ্গির ভিতরে দোল যাত্রার দৃশ্য। দেখি উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ দোলনায়, তাঁকে দোলান হচ্ছে একটি স্বর্ণ নির্মিত শৃঙ্খল দিয়ে। অপরূপ সূক্ষ্মতম ঝালর দিয়ে আবদ্ধ দোলনাটি। দেখি বৃষভ বাহনে শিবকে। অনবদ্য এই মূর্তিটিও, জীবন্ত। অনুপম শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে ধেনু চরানোর দৃশ্যটিও,

সঙ্গী তাঁর রাখাল বালকেরা। শ্রীকৃষ্ণ বঙ্কিম ঠামে দাঁড়িয়ে বেণু বাজাচ্ছেন, উৎকীর্ণ হয়ে শুনছে সেই বাঁশীর সুর ধেনুরা, নিবদ্ধ তাদের দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। অপরূপ শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষেকের দৃশ্যও। তার নিচে শ্রীকৃষ্ণের নৌকা বিহারের দৃশ্য ; চালনা করে সেই নৌকা ব্রজের গোপিনীরা, বিস্তৃত তাদের অক্ষি তারকা, বিস্রস্ত তাদের অঙ্গের বসন, বিশৃঙ্খলিত তাদের কুন্তল, নৌকা বাহনের পরিশ্রমে। সুন্দরতম এই দৃশ্যটি, শ্রেষ্ঠ দান উড়িষ্যার ভাস্করের। দেখি দেবরাজ ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে ঐরাবত আর হস্তীযূথ।

উপনীত হই উত্তর গাত্রে। দেখি অপরূপ সুন্দরতম অলঙ্করণে অলঙ্কৃত উত্তর গাত্রের বারাণ্ডির অঙ্গ, তার কুলুঙ্গির দুই দিকের ষোল কোণ উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গ আর শীর্ষদেশ। দেখি, মূর্তি দিয়ে বর্ণিত কত পুরাণের কাহিনীও। শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম তাদের মধ্যে সীতার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহের দৃশ্য, দৃশ্য শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আর ঐরাবত আরোহণে সুরপতি ইন্দ্রের অভিযানের।

সবগুলিই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের, সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের, রচনা করেন ভাস্কর উজাড় করে দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য, মিশিয়ে দিয়ে মনের সবখানি মাধুর্য, তাই লাভ করে তারা শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বের ভাস্কর্যের দরবারে, হয় বিশ্বজিৎ।

রচিত হয় তিন সারিতে পীঢ়, ভোগমণ্ডপের শীর্ষদেশে, পিরামিডাকৃতি অংশে, পৃথক করা হয় তাদের প্রকোষ্ঠ দিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে প্রতিটি সারির শীর্ষদেশে একটি করে সিংহ। সর্বনিম্ন সারিতে সিংহের ঠিক নিচে একটি কুলুঙ্গি, ভিতরে নিয়ে মূর্তি। ভোগ মণ্ডপের পূর্ব ও উত্তর গাত্রে দুইটি প্রবেশ পথ। অনবদ্য, সুন্দরতম শিল্প সম্ভারে ভূষিত এই ভোগমণ্ডপের প্রবেশ পথ দুইটিও, অনুরূপ এই অলঙ্করণ কোণারকের সূর্যমন্দিরের মোহনের অঙ্গের অলঙ্করণের। প্রতিটি দ্বারের এক পাশে ছয়টি করে সুষ্ঠু গঠন মূর্তি, তাদের মধ্যে পাঁচটি বৃহৎ একটি ক্ষুদ্রতর। শীর্ষদেশে দুইটি উদ্গত স্তম্ভ, তাদের উপরে বেলে প্রস্তরে রচিত নবগ্রহের মূর্তি। দুই প্রান্তে দুইটি সুন্দরতম মকরের মূর্তি। দেখি মুগ্ধ হয়ে এক অমর কীর্তি উড়িষ্যার ভাস্করের, প্রতীক তাদের চরম উৎকর্ষের, পূর্ণ পরিণতির। প্রণতি জানাই স্থপতিকে, নিবেদন করি শ্রদ্ধার

অঞ্জলি ভাস্করকেও। পূর্বদ্বার অতিক্রম করে, ভিতরে প্রবেশ করি। দেখি সংযুক্ত দ্বার দিয়ে ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, জগমোহন ও মণিকোঠার সঙ্গে। অপর দিকে তার রন্ধনশালা। নিবেদিত হয় শুধু ছত্র ভোগ এই ভোগমন্দিরে, অন্যসব ভোগ মণিকোঠায়। অপর্যাপ্ত এই ভোগের পরিমাণ, বিপুল, বয়ে নিয়ে আসা হয় সহস্র পাত্র পূর্ণ করে রন্ধনশালা থেকে, প্রস্তুত হয় সেখানে ২৪৩টি উনুনে।

দেখি একে একে আরও কয়েকটি মন্দির, দাঁড়িয়ে আছে অঙ্গনের ভিতর, দেখি যা কিছু আছে দর্শনীয়ও। অক্ষয় বটে উপনীত হই। মহাপবিত্র এই অক্ষয় বট, ভগবানের বপু স্বরূপ, অবস্থিত শঙ্খের নাভিদেশে। যখন সংঘটিত হয় মহা প্রলয়, বিনষ্ট হয় চরাচর, ধ্বংসে পরিণত হয় ত্রিভুবন, হয় না কোন ক্ষতি অক্ষয় বটের, অক্ষয় হয়ে থাকে অনন্ত দেবরূপী অক্ষয় বট। মহাবিষ্ণুর সুখশয্যারূপী অনন্ত দেব, পাতাল থেকে নির্গত হয়ে অক্ষয় বটের রূপ ধারণ করে এখানে অবস্থান করেন। কল্পতরু তিনি, পূর্ণ করেন ভক্তের অভিলষিত কামনাও। লাভ করে তারা তাঁর করুণায়—কেউ ধন, কেউ যশ, কেউ পতি, কেউ পুত্র কেউ বা কন্যা—যে যেমন প্রার্থনা করে। অঞ্চল পেতে বসে থাকে তাঁর তলায় নারীরা অভীষ্ট কামনা পূর্ণ হওয়ার আশায়। তার নিচে পাষাণ মূর্তি পরিগ্রহ করে, বটবৃক্ষ অবস্থান করেন। যে বট বৃক্ষের উপর মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বালকমূর্তি দর্শন করেছিলেন আর যাঁর উদরের মধ্যে তিনি প্রবেশ করে আবার বহির্গত হয়েছিলেন, এই সেই পুণ্যবটবৃক্ষ। আমরা অক্ষয় বট স্পর্শ করে, গণেশ, সত্যনারায়ণ ও সত্যভামার মূর্তি দর্শন করে ও পূজা দিয়ে, লক্ষ্মীর মন্দিরে উপনীত হই। তাঁরাও বিরাজ করেন এক একটি পৃথক মন্দিরে।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির জগন্নাথদেবের মন্দিরের অন্তর্গত এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ। সমসাময়িক এই মন্দিরটি মূলমন্দিরের, গঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা চোড়গঙ্গই নির্মাণ করেন এই মন্দিরটিও। অঙ্গে নিয়ে আছে এই মন্দিরটির জগমোহনের নিম্নাংশ ও উদ্গত স্তম্ভ অনবদ্য সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, তার অঙ্গের কুলুঙ্গি সুন্দরতম অলঙ্করণ। শ্রেষ্ঠ কীর্তি তারা উড়িষ্যার স্থপতির, প্রকৃষ্টতম সৃষ্টি তার

ভাস্করের, পড়ে সমপর্যায়েও পুরীর শ্রেষ্ঠ মন্দিরের, অঙ্গের অলঙ্করণে। এক একটি সম্পূর্ণ বেলে পাথর দিয়ে এই জগমোহনের প্রাচীরগুলি নির্মিত হয়। দেখি একটি প্রাচীরের গাত্রে কেন্দ্রস্থলে, উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গে, দু'পাশের সূক্ষ্মতম স্ক্রলের কাজের মধ্যে, দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ ভঙ্গীতে, দুইটি পরমা রূপবতী নারী। পাড়ের অঙ্গে ক্ষুদ্র মনুষ্য মূর্তি, মূর্তি একদল নারীরও আর কত জন্তুর। সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম এই পাড়ের স্ক্রলের কাজ, বিস্তৃতও। তাদের উপরে তিনটি বৃহৎ ও একটি ক্ষুদ্র হস্তী, পৃষ্ঠে নিয়ে মাহুত। তাদের সামনে দুইটি দ্রুতগামী নর, স্কন্ধে নিয়ে গদা, তাদের আগে আগে অগ্রসর হয় একটি অশ্বারোহী, বহুমূল্য ভূষণে সজ্জিত এই অশ্বের অঙ্গ, অশ্বের পিছনে একটি পত্র-পল্লবে শোভিত বৃক্ষ। অশ্বারোহীর আগে গমন করে তিনটি নর ও দুইটি নারী স্কন্ধে নিয়ে গদা, তাদের বিপরীত দিকে মুখ করে এক নৃপতি একটি বৃহৎ সিংহাসনে উপবিষ্ট, হেলায়িত তাঁর স্কন্ধ দেশ একটি উপাধানের উপর। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সাতটি পুরুষ, বিভিন্ন তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গী, কারও হস্তে শোভা পায় ছত্র, কেউ হস্তে ধারণ করে আছে চামর। তাদের এক দিকে, কুলুঙ্গির ভিতর তিনটি নারী অপর দিকে দুইটি নারী দ্বারপাল। দেখি, প্রতিটি গাত্রে প্রক্ষিপ্ত বন্ধনীর অঙ্গে, গজলক্ষ্মীর মূর্তি। তাঁর দুই পাশে দাঁড়িয়ে দুই হস্তী কলস থেকে শুঁড় দিয়ে জল তুলে নিয়ে, তাঁর মস্তকে সিঞ্চন করছে। দেখি, নাগ আর ষষ্ঠ ফণাযুক্ত নাগিনীর মূর্তিও, প্রতিটি গাত্রে, দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা এক একটি অবনত হস্তীর উপর। অপরূপ এই দৃশ্যগুলি, সুন্দরতম দান উড়িষ্যার ভাস্করের, দেখি মুগ্ধ হয়ে। দেখি অলঙ্কৃত তার নাট মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রও কত সুন্দর চিত্র দিয়ে, চিত্র দশাবতারের, চিত্র কত দেব-দেবীরও। গর্ভগৃহে প্রবেশ করি। বিরাজ করেন সেখানে সিংহাসনে মহালক্ষ্মী, সজ্জিত তিনি বহুমূল্য বসনে আর ভূষণে। আছে তাঁরও পৃথক রত্ন ভাণ্ডার, রক্ষিত আছে সেই ভাণ্ডারে বহুমূল্য রত্নালঙ্কার। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি তাঁর অপরূপ রূপ। দেবীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে ও পূজা দিয়ে বিমলা-দেবীর মন্দিরে উপনীত হই।

দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দিরটি জগমোহনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। বুকে নিয়ে আছে চারিটি অংশ। পতিত হয় উৎকলে সতীর

নাভিদেশ, বিরাজ করেন এখানে বিমলারূপে মহাদেবী, তাঁর ভৈরব জগন্নাথ। পরিচিত হয় পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বিরাজ-ক্ষেত্র নামেও। পীঠস্থান ভারতের তান্ত্রিকদের। উল্লিখিত আছে এই মন্দিরের নাম মৎস্যপুরাণে, আছে কপিল সংহিতা আর উৎকল খণ্ডেও। আশ্বিন মাসে, মহাষ্টমী তিথিতে এখানে ছাগবলি হয়। বুকে নিয়ে নাই কোন শিল্পসম্ভার এই মন্দিরটি, সমৃদ্ধশালী নয় ভাস্করের হস্তের স্পর্শে। গর্ভগৃহে প্রবেশ করে, স্তব্ধ হয়ে দেখি দেবীর অপরূপ রূপ। ভূষিত তিনিও বহুমূল্য বসনে আর অলঙ্কারে। আছে তাঁরও পৃথক রত্ন ভাণ্ডার, পরিপূর্ণ বহুমূল্য রত্ন অলঙ্কারে। ভক্তি ভরে দেবীকে পূজা করে, আমরা মুক্তি মণ্ডপে উপনীত হই।

দাঁড়িয়ে আছে মুক্তি মণ্ডপ একটি স্তম্ভযুক্ত, আটত্রিশ ফুট স্কোয়ার চতুষ্কোণ মণ্ডপ, জগমোহনের দক্ষিণ দিকে। ষোড়শ শতাব্দীতে নৃপতি প্রতাপরুদ্রদেব এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন নৃসিংহদেবের মন্দিরের নিকটে। বিরাজ করেন তার অন্তর্বেদীর চারিদিকে মঙ্গলা, সর্বমঙ্গলা, লম্বা, কালরাত্রি মরীচিকা আর চণ্ডরূপা। এই মণ্ডপে বসে সুধী ও মনীষিগণ শাস্ত্র আলোচনা করেন। কোটি গুণ ফলদান করে, এই স্থানে অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম, মৃত্যু হলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। সমৃদ্ধিশালী এই মণ্ডপটিও, শিল্পীর হস্তের সুনিপুণ স্পর্শে। দেখি, তার পশ্চিমে, জলক্রীড়া মণ্ডপে একটি অপরূপ প্রস্ফুটিত পদ্ম।

তারপর রৌহিণ কুণ্ডের পবিত্র জল স্পর্শ করে আমরা একে একে চন্দনগৃহ, নৃসিংহ মন্দির, ভূষণ্ডিকাক, সূর্য, বটেশ্বর, বটকৃষ্ণ, মার্কণ্ডেয় ও মঙ্গলার মন্দির ও দেবদর্শন করি। অবস্থিত রৌহিণ কুণ্ড শঙ্খের নাভিদেশে, পরিপূর্ণ কারণ বারিতে। প্রলয় কালে বাড়ে যখন সমুদ্রের জল, বর্ধিত হয় কুণ্ডের কারণ বারিও, আবার লীন হয়ে যায় কুণ্ডেই। তাই পরিচিত এই কুণ্ড রৌহিণ কুণ্ড নামে, মহাপবিত্র তার জল। এই কারণ বারি পান করেই শুক পক্ষী শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপ প্রাপ্ত হন। সর্বপাপ বিমুক্ত হয় জীব নৃসিংহ দেব দর্শন করলে।

পূর্বদিকে উপস্থিত হই, দেখি একে একে, মন্দিরে শ্রীচৈতন্য, রাধাশ্যাম, রাধাকৃষ্ণ ও বদরি নারায়ণ, দেখি ভাণ্ডার আর পুরাতন রন্ধন শালাও। উত্তর দিকে পৌছে সূর্য নারায়ণের মন্দিরে উপনীত হই। নাই

কোন শিল্প বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের অঙ্গে। পুজিত হন এই মন্দিরে সূর্য দেবতা। বিমানের অঙ্গে; সূর্য ও চন্দ্রের অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তি। স্তম্ভমূলে সূর্য নারায়ণের মূর্তি সঙ্গে নিয়ে সপ্ত অশ্ব। কোণারকের প্রখ্যাত সূর্য মন্দির থেকে স্থানান্তরিত হয় এই মূর্তিগুলি এই মন্দিরে, সপ্তদশ শতাব্দীতে, উড়িষ্যাধিপতি নরসিংহের আদেশে।

সেখান থেকে পাতালেশ্বর মন্দিরে উপনীত হই। বুকে নিয়ে আছে পাতালেশ্বরের প্রকৃষ্টতম শিল্প সম্ভার। রচিত হয় তার গর্ভগৃহ, অঙ্গনের নিচে, উপনীত হতে হয় সেই গর্ভগৃহে সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে। বিরাজ করেন একটি শিবলিঙ্গ সেই গর্ভগৃহে। লিঙ্গ দর্শন করে, আমরা একে একে কৃষ্ণ, জগন্নাথ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মাখন চোরা, গোপীনাথ, বড় গণেশ ও রাধাকৃষ্ণের মন্দির দেখে, বর্হিপ্রাঙ্গণে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে সেখানেও কত অসংখ্য মন্দির, দেখি একে, একে। আনন্দবাজারে উপনীত হই। এইখানে ভোগ বিক্রি হয়। দেখি সাজান আছে কত অসংখ্য ভোগ থরে-থরে। সেখান থেকে বৈকুণ্ঠ পুরীতে যাই। দ্বিতল এই গৃহটি বাসস্থান মন্দিরের পুরোহিতদের, আবাসস্থল মন্দিরের দাতাদেরও। অনুষ্ঠিত হয় এইখানে যাত্রীদের আটকিয়া বন্ধন উৎসব।

ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বার হ'য়ে আসি। চোখের সামনে ভাসতে থাকে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের অঙ্গের অনবদ্য সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, ভেসে ওঠে তার অঙ্গের সুষ্ঠু গঠন মূর্তিসম্ভারও, প্রাণময় তারা সুনিপুণ স্থপতির হস্তের স্পর্শে, বাঙময় মহা অভিজ্ঞ ভাস্করের হৃদয়ের ঐশ্বর্যে আর মনের মাধুরীতে। তাই লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন, বিশ্বজিৎ হয়। প্রণাম জানাই উড়িষ্যার গঙ্গবংশের নৃপতিদের, অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরা ভারতের, শ্রদ্ধা নিবেদন করি তার স্থপতিকে আর ভাস্করকে, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের মন্দিরে, চিররাত্রি চিরদিন।

পরের দিন ভোরে উঠে লোকনাথ মহাদেবের মন্দিরে উপনীত হই। শৈব মন্দির লোকনাথ, দাঁড়িয়ে আছে পুরী শহরের পশ্চিম প্রান্তে, প্রকৃতির এক নয়নাভিরাম পরিবেশে, জগন্নাথ দেবের মন্দির থেকে প্রায় দু' মাইল দূরে। বিরাজ করেন তার গর্ভগৃহে একটি শিবলিঙ্গ, অবগাহিত হন সেই লিঙ্গ একটি

নির্ঝরের জলে, বিরামহীন সেই অবগাহন। এই মন্দিরটি পরবর্তীকালে নির্মিত হয়।

সীতাদেবীর উদ্ধারের জন্য স্বর্ণলঙ্কায় যাওয়ার পথে শ্রীরামচন্দ্র নীলাচলের পশ্চিমে, শবর দীপকের বনে উপনীত হন। বাসনা জাগে তাঁর মনে শিব পূজা করবার, তাই শিব অভাবে শবর প্রদত্ত একটি লাউকে শিবরূপে প্রতিষ্ঠা করে, পূজা করেন। পরিণত হয় সেই লাউ লাউনাথে বা লোকনাথে। মহাতীর্থে পরিণত হয় লোকনাথও। অনুষ্ঠিত হয় এখানে প্রতি বৎসরে, শিবরাত্রি তিথিতে, একটি মহামেলা, সমবেত হন সেই মেলায় দেশ বিদেশের যাত্রী।

লোকনাথ মহাদেব দর্শন করে আমরা গুণ্ডিচা বাড়ীতে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি কোণারকে যাওয়ার পথে, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের নিকটে, বুকে নিয়ে আছে বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির আর ভোগমন্দির, বেষ্টিত হয়ে আছে কুড়ি ফুট উঁচু চারিশত বত্রিশ ফুট দীর্ঘ আর তিনশত একুশ ফুট প্রস্থ প্রাচীর দিয়ে। দুইটি প্রবেশ পথও রচিত হয়েছে, পরিচিত সিংহ আর বিজয় দ্বার নামে। বিমানের উচ্চতা পঁচাত্তর ফুট। গুণ্ডিচা ছিলেন জগন্নাথ দেবের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী। রচিত হয়েছে একটি সুউচ্চ মঞ্চ বিমানের গর্ভগৃহে। রথ যাত্রার সময়, জগন্নাথের মন্দির থেকে নির্গত হয়ে, নিজের নিজের রথে আরোহণ করে এসে জগন্নাথ দেব, বলরাম আর সুভদ্রা সেই মঞ্চে অবস্থান করেন। দেখি, অলঙ্কৃত মন্দিরের বাইরের প্রাচীরের গাত্র সুন্দর মূর্তি সম্ভার দিয়ে। মূর্তি উড়িষ্যার নৃপতির বিজয় অভিযানের, মূর্তি দশ অবতারের, আরও কত দেব দেবীর। ভিতরে কার্নিসের উপরে, পর্যায়ক্রমে রাধা ও কৃষ্ণের মূর্তি, দৃশ্য রাস যাত্রার। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি।

গুণ্ডিচা মন্দির দর্শন করে আমরা ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে উপস্থিত হই। দেবর্ষি নারদের পরামর্শে সহস্র বৎসর ধরে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, দান করেন ব্রাহ্মণদের সহস্র কোটী গাভী। খনিত হয় ধরিত্রীর বুকে তাদের পদাঘাতে, একটি খাত। গাভী উৎসর্গের সময় পড়ে ব্রাহ্মণদের হস্তচ্যুত জলবিন্দু সেই গর্তে, পূর্ণ হয় খাত জলে, পরিণত হয় এক বৃহৎ সরোবরে, পরিচিত ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর নামে। পবিত্রতম সরোবর ভারতের, চারিশত পঁচাশি ফুট দীর্ঘ ও তিনশত ছিয়ানব্বই ফুট প্রস্থ তার পরিধি।

সেখান থেকে আমরা মার্কণ্ডেশ্বর মন্দিরে যাই। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি মার্কণ্ডেশ্বর সরোবরের দক্ষিণ পারে। কঠোর তপস্যা করেন মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, লাভ করেন সপ্তকল্প পরিমিত পরমায়ু। সংঘটিত হয় মহাপ্রলয়, জলমগ্ন হয় পৃথিবী, প্লাবিত হয় ধরিত্রী, মৃত্যু বরণ করে মানুষ, করে সমস্ত জীবজন্তু, বিনষ্ট হয় বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, বিলুপ্ত হয় চরাচর সেই মহাপ্লাবনে। কিন্তু মৃত্যুহীন মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আপন তপোপ্রভাবে, দেবতার বরে। ভাসতে থাকেন তিনি অসীম জলরাশির উত্তাল তরঙ্গ মালার সঙ্গে আর ভাবতে থাকেন কোথায় মিলবে আশ্রয়, কোন্‌খানে, কোন্‌দেশে। সীমাহীন ক্লান্তিতে আর কষ্টে অবসন্ন তাঁর দেহ, মুহ্যমান তাঁর অন্তঃকরণ। এমনই করে তিনি উপনীত হন শ্রীক্ষেত্রে। দেখেন দাঁড়িয়ে আছে নীলপর্বতের শীর্ষে একটি বটবৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে অক্ষয় হয়ে, হয়ে আছে অমর। বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয় তাঁর অন্তঃকরণ, বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভাবতে থাকেন কেমন করে সম্ভব হয় এই বটবৃক্ষের বেঁচে থাকা, কেন নিমগ্ন হয় না বৃক্ষ সমুদ্রের অতল তলে।

এমন সময় তাঁর কানে ভেসে আসে একটি বালক কণ্ঠের ডাক। সেই বৃক্ষের উপর থেকে সে বলে, হে মহর্ষি! তুমি আমার কাছে এস, এখানে এলেই তোমার আশ্রয় মিল্‌বে, লাঘব হবে তোমার সমস্ত কষ্টের, ভীতিশূন্য হবে তোমার অন্তঃকরণ। একবার নয়, তিনবার তিনি শোনেন সেই আহ্বান। শেষে, অতিকষ্টে তিনি উপনীত হন বৃক্ষমূলে। দেখেন, প্রতিষ্ঠিত সেখানে ভগবানের নীলেন্দ্র নীল মাধব মূর্তি। তিনি স্তব স্তুতি করেন সেই মূর্তির। ভগবান তাঁর স্তবে সন্তুষ্ট হন। আদেশ করেন তাঁকে বৃক্ষোপরি শায়িত সর্ব-কালাত্মা বালকের মুখের ভিতর দিয়ে উদরে প্রবেশ করে, সেখানে অবস্থান করতে। ভগবানের আদেশে মহর্ষি বৃক্ষের উপর আরোহণ করেন, দেখেন সত্যিই শায়িত সেখানে এক অতিসুন্দর বালক মূর্তি। তাকে স্তব ও স্তুতি করে, তিনি মুখগহ্বর দিয়ে, তাঁর উদরে প্রবেশ করেন। বিস্মিত হয়ে দেখেন, অবস্থিত সেই উদরের ভিতর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব মানব, জীব, জন্তু পাহাড় পর্বত সরিৎ ও সিন্ধু, অবস্থান করে বৃক্ষলতাও। এক শ্রেষ্ঠ আশ্রয় স্থলে পরিণত হয় সেই উদর। ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন মহর্ষি সেই উদরের ভিতর, কিন্তু পৌঁছাতে পারেন না কুক্ষিতে। শেষে, উদর থেকে বায়

হয়ে এসে, বটবৃক্ষ থেকে অবতরণ করে, ভগবানের আদেশে সেই বৃক্ষমূলে চিরকাল অবস্থান করতে থাকেন।

তিনিই, ভগবানের আদেশে, সুদর্শন চক্র দিয়ে নির্মাণ করেন মার্কণ্ডেশ্বর সরোবর, অক্ষয় বটের বায়ুকোণে। মহাতীর্থে পরিণত হয় সেই সরোবর। স্নান করেন এই সরোবরে, বারুণী তিথিতে, কত পুণ্য লোভাতুর তীর্থযাত্রী।

প্রতিষ্ঠিত হন এই সরোবরের তীরেই মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেব। নির্মাণ করেন তাঁর পাষাণ মন্দির মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। দর্শনে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে জীব।

বুকে নিয়ে আছে মার্কণ্ডেশ্বরের এখনকার মন্দিরটি বিমান, জগমোহন, নাট মন্দির ও ভোগমন্দির, ভূষিত হয়ে আছে সুন্দর অলঙ্করণে। অলঙ্কৃত তার বিমানের গাত্রের কুলুঙ্গির অঙ্গ কার্তিকেয়, গণেশ আর পার্বতীর মূর্তি দিয়ে। সুন্দরতম তাদের মধ্যে গণেশের মূর্তিটি, মুগ্ধ হয়ে দেখি।

মার্কণ্ডেশ্বরের ছত্রাকার লিঙ্গ দর্শন ও সরোবরের পবিত্র জল স্পর্শ করে, আমরা নরেন্দ্র সরোবরে উপনীত হই। জগন্নাথদেবের মন্দিরের, উত্তর পূর্ব দিকে, অর্ধমাইল দূরে, এই সুবৃহৎ সরোবরটি বিস্তৃত হয়ে আছে, আটশত তিয়াত্তর ফুট পরিধি নিয়ে। রচিত হয় তার চতুর্দিকে সোপানের শ্রেণী, কেন্দ্রস্থলে, দ্বীপের উপরে, কয়েকটি ক্ষুদ্র মন্দির। এই খানে স্নান যাত্রার সময় অবস্থান করেন শ্রীশ্রীজগন্নাথ। তার পাশেই জগন্নাথ বল্লভের উদ্যান দেখি। বহু বিস্তৃত এই উদ্যানটি, সুপরিকল্পিত, নয়নাভিরামও। বামহস্তে মহা প্রসাদ গ্রহণ করেন, পুরীর এক নৃপতি। শেষে, প্রায়শ্চিত্ত করেন আপনার হস্ত কেটে। ভগবৎ কৃপায়, সোনার আকৃতিতে পরিণত হয় সেই হস্ত, পরিগ্রহ করেন বৃক্ষের মূর্তি তিনি নিজে, অঙ্গে নিয়ে সেই সোনা, অবস্থান করেন এই উদ্যানে। এই খানেই মহাপ্রভুর শিষ্য রামানন্দ রায় বাস করতেন।

সেখান থেকে শ্বেতগঙ্গা ও শ্বেতমাধব দেখতে যাই। ক্ষুদ্রতর এই সরোবরটি, আয়তনে দুইশত ফুট দীর্ঘ একশত চুরাশি ফুট প্রস্থ, জগন্নাথ দেবের দক্ষিণে, অক্ষয়বট ও সমুদ্র তটের মধ্যে অবস্থিত। পরিচিত শ্বেত গঙ্গা নামে, নিকটবর্তী

শ্বেত মাধবের নামানুসারে, এই সরোবরে স্নান করে, শ্বেতমাধবের মূর্তি দর্শন করলে, জীব মোক্ষ লাভ করে।

ত্রেতাযুগ। শতবৎসর অনশনে থেকে, শ্বেতরাজ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্গে জগন্নাথ দেবের পূজা ও অর্চনায় নিযুক্ত থাকেন। সন্তুষ্ট হন দেবতা। তাঁর বরে ভগবানের স্বরূপ লাভ করেন শ্বেত নৃপতি। ভগবানের আদি অবতার, মৎস্য মূর্তির সঙ্গে, নির্মল স্ফটিকের মত, শ্বেতরূপে শ্বেতগঙ্গা সরোবরের নিকটে অবস্থান করেন। মহাপূণ্য লাভ হয় তাঁর দর্শনে।

পরের দিন ভোরে উঠে, চক্রতীর্থে শ্রীচন্দ্রনারায়ণ দর্শন করে আমরা স্বর্গদ্বারে উপনীত হই। দেখি নিমাই চৈতন্যের মঠ আর নানক পন্থীর মঠ, দেখি আর যা কিছু আছে দর্শনীয়, বালুসাইয়ে উপস্থিত হয়ে গোবর্ধন মঠ দেখি। স্বর্গদ্বারের অর্ধ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে আছে এই মঠটি। মন্দিরের ভিতরে জগদগুরু শঙ্করাচার্যের শ্বেত প্রস্তর মূর্তি। মূর্তি দেখি, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, বরাহ, ইন্দ্রাণি, চামুণ্ডা, চণ্ডিকা আর কৃষ্ণারও। এখানে বেদ অধ্যাপনা হয়। দেখি একে একে, টোটা গোপিনাথ, হরিদাস মহাপ্রভুর সমাধি, সিদ্ধবকুল আর গম্ভীরা, সবগুলিই বুকে নিয়ে আছে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অক্ষয় কীর্তি। গম্ভীরা তাঁর পুরীর আবাসস্থল, বাস করতেন তিনি কাশী মিশ্রের গৃহে, পুজা করতেন তাঁর স্থাপিত বিগ্রহ রাধাকান্ত দেবকে। তাই পরিচিত গম্ভীরা রাধাকান্ত মঠ নামেও। এখান থেকে তিনি প্রতিদিন যেতেন স্বর্গদ্বারে সমুদ্রে স্নান করতে। পথে পড়তো ভক্ত প্রধান হরিদাস স্বামীর ঝোপড়া। আজ নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই ঝোপড়া, দাঁড়িয়ে আছে সেখানে সিদ্ধ বকুল, বুকে নিয়ে তাঁর স্মৃতি। একদিন দাঁতন করতে করতে তিনি উপস্থিত হন হরিদাস স্বামীর গৃহে। প্রোথিত করেন দাঁতনের অগ্রভাগ হরিদাসের অঙ্গনে। কালক্রমে সেই দাঁতন রূপ পরিগ্রহ করে এক বকুল বৃক্ষের, শেষে পরিণত হয় সেই বৃক্ষ এক পত্র পুষ্পে শোভিত মহীরুহে। একদিন, রথ যাত্রার সময় ভগ্ন হয় শ্রীজগন্নাথ দেবের রথচক্র। আদেশ করেন পুরীর অধিপতি, সেই বকুল বৃক্ষ কেটে নিয়ে এসে, তার তক্তা দিয়ে রথচক্র নির্মাণ করবার। বারণ করেন পাত্র মিত্রেরা, নিষেধ করেন পাণ্ডারাও, বলেন শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি বুকে নিয়ে আছে এই বৃক্ষ, উচিত হবে না এই বৃক্ষ কাটা, হবে না শোভনও। কিন্তু অবুঝ নৃপতি, শোনেন

না তিনি কোন অনুরোধ, গ্রাহ্য করেন না কারও মিনতি। নিজেই লোকজন সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন হরিদাসের প্রাঙ্গণে, বকুল বৃক্ষের নিকটে। কর্তিত হয় বৃক্ষ তাঁর আদেশে। কিন্তু শুধুই ছাল, নাই কোন কাণ্ড ছালের অন্তরালে, অদৃশ্য হয়েছে কোন মন্ত্রবলে। বিস্মিত হন নৃপতি, বিস্ময় জাগে সঙ্গের লোকজনের মনেও। বিফল হয়ে ফিরে যান নৃপতি, রক্ষা পায় বৃক্ষ কর্তনের হাত থেকে। আজও অঙ্গে নিয়ে আছে বৃক্ষ পাঁচশত বৎসরের এক আশ্চর্য কাহিনী, পরিণত হয়ে আছে এক পত্র পুষ্প সমন্বিত মহীরুহে, পরিচিত সিদ্ধ বকুল নামে।

হরিদাসকে দর্শন দিয়ে, সমুদ্রে স্নান সমাপনান্তে, তিনি উপনীত হতেন টোটা গোপীনাথে, তাঁর প্রিয়তম বিগ্রহ। তাকে ভক্তিভয়ে পুজা করতেন। আবার পুজা করতে করতেই লীলা শেষে, তিনি লীন হয়ে যান এই টোটা গোপীনাথের সঙ্গে। আজও অঙ্গে নিয়ে আছেন, তার চিহ্ন টোটা গোপীনাথ। কেউ বলেন মিশে যান তিনি তীর্থরাজের উত্তাল তরঙ্গে, কেউ শ্রীজগন্নাথ দেবের অঙ্গে।

সেখান থেকে তিনি উপস্থিত হতেন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে। নাট মন্দিরের প্রান্ত দেশে, গরুড় স্তম্ভের নিকটে দাঁড়িয়ে, দর্শন করতেন দেবতাকে। আজও বুকে নিয়ে আছে প্রাচীরের গাত্র, তাঁর অঙ্গুলির ছাপ, রক্ষিত আছে মেঝেতে অঙ্কিত পদচিহ্নও মন্দির প্রাঙ্গণে।

আবার দেহান্তে, হরিদাস স্বামীকে বয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি সমাধিস্থ করেন তাঁকে সমুদ্রের সৈকতে। মহাপবিত্র এই সমাধিও। মহাপবিত্র গম্ভীরাও বুকে নিয়ে আছে কত সাধু মহাত্মার চরণধুলি, অনুরণিত তার আকাশ আর বাতাস কত মহাপুণ্য স্মৃতিতে। বুকে নিয়ে আছে নিভৃত গম্ভীর, অলোক-সুন্দর রহস্যময় পরিবেশ তাই বুঝি পরিচিত গম্ভীরা নামে। এইখান থেকেই আবার নতুন করে আবিষ্কৃত হন শ্রীশ্রীজগন্নাথ, দারুরূপী ভগবান, আবিষ্কার করেন যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেব, প্রচারিত হয় তাঁর মহিমা দিকে দিকে, মহিমা তাঁর নিজেরও। প্রণতি জানাই যুগাবতারকে, নিবেদন করি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকেও, অমর তাঁরা ইতিহাসের পাতায়।

পুরীধাম, শ্রেষ্ঠ তীর্থ ভারতের, তার নীলাচলে বিরাজ করেন সাক্ষাৎ ভগবান জগন্নাথ, সঙ্গে নিয়ে বলরাম আর সুভদ্রা। মহাপবিত্র তার পথ, ঘাট, কত অসংখ্য দেব দেবীর পাদস্পর্শে। মহাপুণ্য তার সমুদ্রতীর, তার প্রতিটি বালুকণা

কত মুনি ঋষি আর সাধু মহাত্মাদের চরণ ধূলিতে। তাই মুখর হয় জগন্নাথ ক্ষেত্র সারা বছর যাত্রীর কোলাহলে, প্রকম্পিত হয় তার আকাশ বাতাস, কত উৎসবে, শ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান তাদের মধ্যে রথযাত্রা।

নির্মিত হয় প্রতিবৎসর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার জন্য তিনটি পৃথক রথ। পঁয়ত্রিশ ফুট প্রস্থ ও আটচল্লিশ ফুট উচ্চ প্রতিটি রথ, ষোল চাকা বিশিষ্ট, প্রতিটি চক্রের ব্যাস সাত ফুট করে। আনিত হন তাঁরা সেই রথারোহণে দুই মাইল দূরবর্তী উদ্যান গৃহে, মন্দিরে। শোভিত সেই উদ্যান বিভিন্ন বৃক্ষে আর লতা পুষ্পে, বেষ্টিত তার চারিদিক পনর ফুট উঁচু প্রাচীর দিয়ে। নিযুক্ত হয় চার হাজার ভৃত্য পরিচিত দৈত্য নামে, আদিম অধিবাসী তারা উড়িষ্যার। তাদের সাহায্যে, রজ্জু বন্ধনে, জগন্নাথ দেব ও বলরামকে রথে ওঠান হয়। পাণ্ডারা, নিজেরা, রথে আরোহণ করেন, সঙ্গে নিয়ে ভগ্নী সুভদ্রা দেবীকে। তারপর রাজার উপস্থিতিতে, সুরু হয় রথ টানা, টানেন চারি হাজার দুইশত লোক। আছেন তাদের মধ্যে নৃপতি, আছেন পুরোহিত আর পাণ্ডার দল। যোগদান করেন কত যাত্রী, কত মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কত ভিখারী, কত বলিষ্ঠ পুরুষ, কত অন্ধ আর আতুরও। অগ্রসর হয় রথ অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়ে, সঙ্গে নিয়ে এক জন সমুদ্র। অতি ধীর মন্থর, সর্পিল তাদের গতি, উপনীত হয় তারা উদ্যান বাটীতে। চতুর্থ রজনীতে মিলন হয় এইখানে জগন্নাথ দেবের লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে, অনুষ্ঠিত হয় হরপঞ্চমী উৎসব। সমাপ্ত হয় দেবতার রথযাত্রা। অতি-বাহিত হয় সপ্ত দিবস, তাঁদের রথারোহণে মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়, পরিসমাপ্তি হয় পুনঃযাত্রাও। অদ্ভুত এই দৃশ্য, পরম বিস্ময়কর, সমবেত হন পুরীধামে দশলক্ষাধিক যাত্রী, দান করেন দেবতাকে কত মহার্ঘ উপঢৌকন, কত অর্থ, ধন্য হন এই দৃশ্য দর্শন করে, হন পুণ্যবানও, সার্থক হয় তাঁদের জীবন।

ধন্য হয় আমাদের জীবনও, সফল হয় মনস্কাম; তীর্থরাজের পবিত্র সলিলে অবগাহন করে, আর জগন্নাথ দেব ও তাঁর মন্দির দর্শন করে। অঙ্গে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের, এক অক্ষয় কীর্তি এই মহাভারতের অভিজ্ঞ শিল্পীর। অমর হয়েছেন শিল্পীরা ইতিহাসের পাতায়, অমরত্ব লাভ করেছে পুরী ধাম, মহা সৌভাগ্যশালী হয়েছে ভারতবর্ষ, লাভ করেছে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের শিল্পের দরবারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কোণার্ক

সূর্যমন্দির

পরের দিন ভোরে উঠে, সমুদ্রে স্নান ও জলযোগ সমাপন করে, আমরা স্টেশন ওয়াগনে চড়ে কোণার্ক অভিমুখে রওনা হই। দেখতে যাই কোণার্কের মহাপ্রসিদ্ধ সূর্যমন্দির, দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দিরটি পুরী থেকে একত্রিশ মাইল দূরে। সুপ্রসিদ্ধ কোণার্ক কোণারক নামেত।

শহর অতিক্রম করে, আমাদের মোটর একটি প্রান্তরের ভিতর উপনীত হয় দুপাশে সবুজ ক্ষেত, মাঝে মাঝে কলাগাছের ঝাড় আর নারিকেলের কুঞ্জ। ক্রমে রূপ নেয় সেই প্রান্তর বাংলা মায়ের গ্রাম্য পরিবেশের। দেখি কত আম কাঁঠালের গাছ, কত ঘন বেণুবন, কত সুপুরির বৃক্ষ, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। একটি নদী অতিক্রম করে উপনীত হই বালুকাময় প্রান্তরে, শেষে, উপস্থিত হই কোণার্কের মন্দিরের সামনে।

ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের আর পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের মত, দাঁড়িয়ে আছে কোণার্কের মন্দিরও মহামহিমময় মূর্তিতে, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের অন্যতম পবিত্র ভূমে চন্দ্রভাগা তীরে অর্কক্ষেত্র বা পদমণ্ডলে। তার উত্তরে অর্ধমাইল দূরে, শীর্ণকায়া চন্দ্রভাগা, দক্ষিণ পূর্বে দু'মাইল দূরে বঙ্গোপসাগর। প্রাচী নদী থেকে উৎপন্ন এই চন্দ্রভাগা। প্রাচীর বুকের উপর গড়ে উঠেছিল কত মহা-সমৃদ্ধিশালী নগর, কত মহিমময় মন্দির দিয়ে শোভিত করা হয়েছিল সেই সব নগর। তাই বুকে নিয়ে আছে কোণার্ক, মহামহিমতম মন্দির বিশ্বের, অঙ্গে নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প সম্ভার, বৃহত্তম আর সুন্দরতম মন্দির। পরিচিত মন্দিরের বিগ্রহ সূর্যদেবতা কোণার্ক নামে। বর্ণিত কিন্তু ব্রহ্ম পুরাণে তিনি কোণাদিত্য বলে। পরিচিত কোণার্ক মৈত্রেয় কানন নামেও, উল্লিখিত রবি-ক্ষেত্র বা সূর্যক্ষেত্র বলেও। তাই মহাপবিত্র এই কোণার্ক প্রাচীনতম যুগ থেকে। লেখা আছে কপিল সংহিতাতে শাম্বই প্রথমে নির্মাণ করেন এখানে,
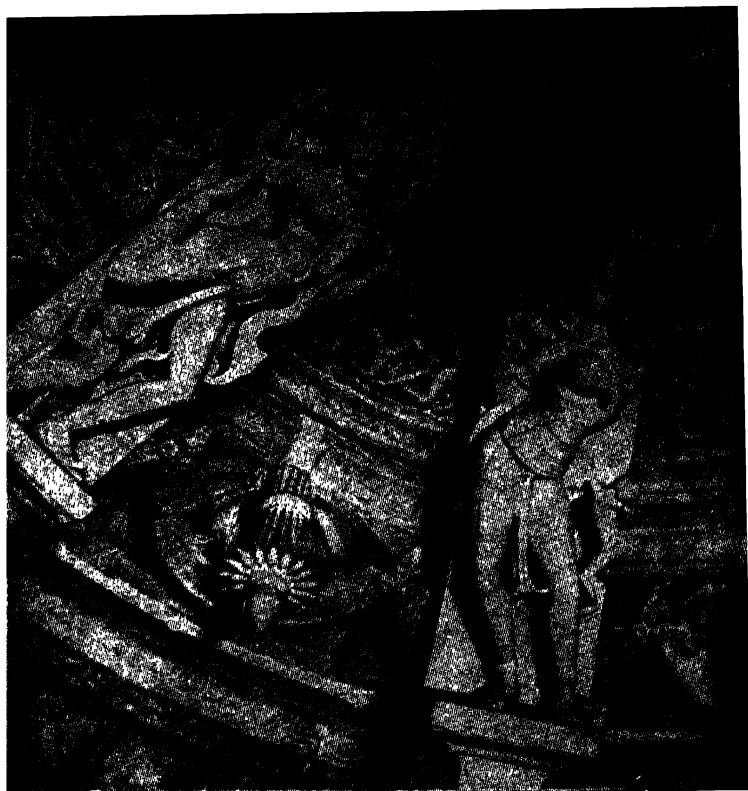
৬। দেবীমূর্তি। মণ্ডপ বিমল বশাহী মন্দির : অর্বুদ।- সৌরাষ্ট্র
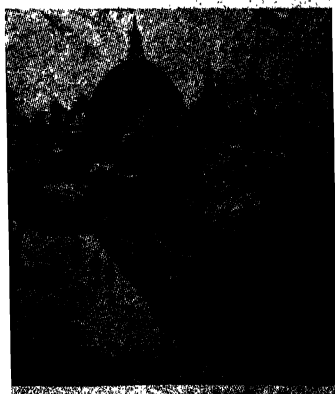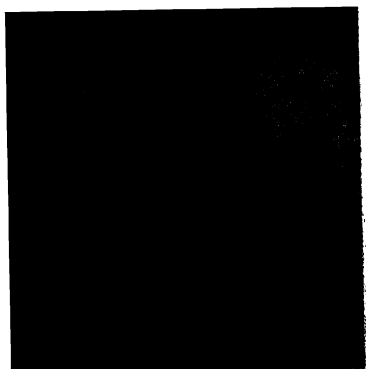
৯। মিথুন ও সুরসুন্দরী। দেবী জগদম্বার মন্দির, খাজুরাহো : মধ্যদেশ

১০। সোমনাথের মন্দির। সোমনাথ পত্তন : সৌরাষ্ট্র

এই মৈত্রেয় কাননে, সূর্যমন্দির। খনিত হয় শ্রীমঙ্গলা, শ্রীশলমালিবন্ধ আর সূর্য গঙ্গা নামে তিনটি পবিত্র সরোবরও। বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে জাম্ববতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন শাম্ব, এক পরম রূপবান পুরুষ। একদিন, তাঁর অজ্ঞাতে দেবর্ষি নারদ তাঁকে নদীর তীরে নিয়ে আসেন। স্নানে নিযুক্তা ছিলেন সেই নদীতে শ্রীকৃষ্ণের ষোলশ পত্নী। মুগ্ধা হন তাঁরা তাঁর রূপে, আকৃষ্টা হন তাঁর যৌবনে। এমন সময় উপনীত হন শ্রীকৃষ্ণও। শাম্বকে সেখানে উপস্থিত দেখে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে অভিশাপ দেন। মারাত্মক গুটিতে তাঁর সর্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলে, পরিণত হন তিনি এক কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ রোগীতে, অন্তর্হিত হয় তাঁর অসামান্য রূপ, বিফল হয় তাঁর যৌবন। বলেন, শাম্ব নন তিনি অপরাধী, বলেন নারদের প্ররোচনায় তাঁর অজ্ঞাতে তিনি সেখানে এসেছেন, তাই নির্দোষ তিনি। মিনতি করেন শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য, প্রার্থনা করেন তাঁকে ব্যাধিমুক্ত করবার জন্য, ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁর রূপ আর যৌবন। সন্তুষ্ট হন শ্রীকৃষ্ণ, বলেন শাম্বকে, মৈত্রেয় কাননে গিয়ে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর দেব দিবাকর, সূর্যদেবের তপস্যায় নিযুক্ত থাকতে। তিনিই শুধু সক্ষম তাঁকে এই দারুন ব্যাধি হতে মুক্তি দিতে।

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে, শাম্ব চন্দ্রভাগা তীরে মৈত্রেয় কাননে উপনীত হয়ে সূর্যের তপস্যায় নিযুক্ত হন। অতিবাহিত হয় দ্বাদশ বৎসর, সন্তুষ্ট হন দেব দিবাকর তাঁর কঠোর তপস্যায়; তাঁর সামনে উপনীত হয়ে, তাঁকে তাঁর একুশটি নাম বলতে বলেন। বলেন দেবতা, তবেই মুক্ত হবেন শাম্ব তাঁর এই কাল ব্যাধি থেকে। উত্তর দেন শাম্ব, বলেন একে একে সূর্যের এক বিংশতি নাম।

পরের দিন প্রত্যুষে, চন্দ্রভাগা নদীতে, শাম্ব অবগাহনে নিযুক্ত, দেখেন স্বচ্ছ জলের নিচে, এক পদ্মবৃন্তের উপর শায়িত দেব দিবাকরের মূর্তি। তিনি সেই মূর্তিকে জল থেকে উত্তোলন করেন, তারপর একটি মন্দির নির্মাণ করেন, প্রতিষ্ঠা করেন সেই সূর্যমূর্তি সেই মন্দিরে, নির্মিত হয় প্রথম সূর্য মন্দির কোণার্কে, মহাতীর্থে পরিণত হয় কোণার্কও। আজও প্রতিবৎসর মাঘ মাসে, শুক্লা সপ্তমী তিথিতে সমবেত হন এখানে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী, পুণ্যলোভাতুর, স্নান করেন পবিত্র চন্দ্রভাগার জলে। তারপর, পবিত্র দেহে ও

মনে দুই মাইল দূরবর্তী সমুদ্রের তীরে উপনীত হয়ে, উপাসনা করেন উদয় ভানুকে, প্রণতি জানান সমুদ্রের গর্ভ থেকে উত্থিত জবাকুসুম সঙ্কাশংকে, সবিতা দেবতাকে। সেখান থেকে উপনীত হন কোণার্কের সূর্য মন্দিরে।

প্রাঙ্গণের প্রান্তে একটি প্রকোষ্ঠে রক্ষিত নবগ্রহের মূর্তিকে পূজা ও অর্চনা করেন। তাঁদের সঙ্গীতে আর কলকোলাহলে মুখরিত হয় কোণার্কের মন্দির প্রাঙ্গণ, হয় মন্দির আর তার প্রতিটি প্রস্তর খণ্ড, বুকে নিয়ে কত অসংখ্য প্রেমের কাহিনী, কাহিনী কত বিজয় অভিযানেরও, প্রকম্পিত হয় তার আকাশ বাতাস। নিশি অবসানে, ফিরে যান তাঁরা নিজের নিজের আলয়ে। অতিক্রম করে যান বালুকাময় প্রান্তর; আবার মূক হয় কোণার্ক, নিস্তব্ধ হয় তার মন্দির প্রাঙ্গণ, নিভৃতে শূন্য বুক নিয়ে পড়ে থাকে মন্দিরের বিরাট ধ্বংস স্তূপ। চিহ্ন নাই শাম্বের তৈরী সেই মন্দিরের, নিশ্চিহ্ন হয়েছে কালের করালে, অদৃশ্য হয়েছে পবিত্র সরোবর তিনটিও। দাঁড়িয়ে আছে তার পরিবর্তে উঁচু-নিচু বালুর স্বর্ণ পাহাড়ের মধ্যে, চতুর্দিকে বালুকারাশি পরিবেষ্টিত হয়ে, পিরামিডের আকৃতিতে ধ্বংসস্তূপ এক মহামহিমময় মন্দিরের, হয়ত অসম্পূর্ণ রূপ দানের ভারতের এক মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির এক সুন্দরতম, অসম্ভাব্য মহিমময় পরিকল্পনার, প্রতীক এক মহা প্রতিভাশালী স্থপতির, সর্ব শ্রেষ্ঠ, আর মহাগৌরবময় অনুপম সৃষ্টির, নিদর্শন এক পৃথিবীর বৃহত্তম আর সুন্দরতম মন্দিরের, পরিচিত ব্ল্যাক প্যাগোডা নামেও।

উড়িষ্যার চোড় গঙ্গ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা নরসিংহ দেব এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। অলঙ্কৃত করেন তিনি উড়িষ্যার সিংহাসন ১২৩৮ থেকে ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে অক্ষত অবস্থায় কয়েকটি প্রস্তর খণ্ড অঙ্গে নিয়ে অপরূপ শিল্প সম্ভার, রচিত সেগুলি মন্দিরের শীর্ষদেশ অলঙ্করণের জন্য। তাই কোন কোন মনীষী মনে করেন ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে, সম্পূর্ণ রূপ পাওয়ার আগেই ভেঙ্গে পড়ে এই মন্দিরটির বিমানের উপরাংশ, হয় না পরিসমাপ্তি মন্দিরের নির্মাণ, থেকে যায় অসম্পূর্ণ অবস্থায়। তথাপি সার্থক তাঁদের প্রচেষ্টা, সফল তাঁদের উদ্যম, রেখে যান কোণার্কের বুকে চরম উৎকর্ষের নিদর্শন ভারতের স্থপতির আর ভাস্করের, তাঁদের বহুশত বৎসরের সাধনার পূর্ণ পরিণতির, প্রতীক এক অক্ষয় কীর্তির, হন তাঁরা বিশ্বজিৎ।

কিংবদন্তী কিন্তু অন্য কথা বলে। ছিল নাকি এই মন্দিরের শীর্ষদেশে একটি চুম্বক প্রস্তর বা কুম্ভ পাথর, তাই সম্ভব ছিল না, সমুদ্রের তীর দিয়ে কোন জাহাজের অগ্রসর হওয়া, আকর্ষিত হত চলন্ত জাহাজ, আবদ্ধ হত বেলাভূমিতে। এমনি করেই একদিন বেলাভূমিতে আকর্ষিত হয় একটি সমুদ্রগামী জাহাজ। তার মুসলমান নাবিকেরা জাহাজ থেকে অবতরণ করে, নিঃশব্দে উপনীত হয় মন্দিরের নিকট। তারপর মন্দির আক্রমণ করে, তার শীর্ষদেশে উপস্থিত হয়ে, চুম্বক প্রস্তরটি সঙ্গে নিয়ে যায়। কলুষিত হয় মন্দির, বিগ্রহ বুকে নিয়ে পলায়ন করেন পুরোহিত, আশ্রয় নেন এসে পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে। পরিত্যক্ত হয় মন্দির, জনশূন্য হয় কোণার্ক, পরিণত হয় এক ভীষণ শ্বাপদ ও ভয়াল সর্প সঙ্কুল অরণ্যে। ক্রমে, অযত্নে, অবহেলায় আর কালের করালে, ধ্বংসে পরিণত হয় মন্দিরও, চূর্ণ বিচূর্ণ হয় প্রথমে তার বিমানের অগ্রভাগ, শেষে সম্পূর্ণ বিমানটি আশ্রয় নেয় ধরিত্রীর বুকে। অকালে পরিসমাপ্তি হয় এক সম্পূর্ণ, মহামহিমময়, মন্দিরের আয়ু, বুকে নিয়ে অনবদ্য, সুন্দরতম সৃষ্টি, এক অমূল্য সম্পদ ভারতের। মহাক্ষতিগ্রস্থ হয় ভারত।

কেউ বলেন, কলুষিত হয় মন্দির সুলেমান কররানীর, সেনাপতি; বিধর্মী কালাপাহাড়ের হস্তের স্পর্শে, আক্রমণ করেন তিনি কোণার্কের সূর্যমন্দিরটি, পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের আক্রমণের পর। পরিত্যক্ত হয় মন্দির, বিগ্রহ বুকে নিয়ে পুরোহিতেরা পুরীতে এসে আশ্রয় নেন।

আবার কেউ দোহাই দেন ভূমিকম্পের। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ভগ্ন হয় মন্দিরের চূড়া, পরিত্যক্ত হয় মন্দির।

প্রচলিত আছে এক নিদারুণ করুণ কাহিনীও, এই মন্দিরের সৃষ্টি ও পতন সম্বন্ধে, লুক্কায়িত সেই কাহিনী প্রতিটি কলিঙ্গবাসীর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে। স্থান লাভ করে তাদের কাব্যে, তাদের সঙ্গীতে, নৃত্যে আর নাটকে। বিষয়বস্তু তাদের মনীষীদের গবেষণারও। লাভ করে কোণার্কের মন্দির সর্বাধিক জনশ্রুতি, শ্রেষ্ঠ খ্যাতি কলিঙ্গের মন্দিরের মধ্যে। মহাপরাক্রমশালী হন চোড় গঙ্গ বংশের নৃপতিরা, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, বিধ্বস্ত যখন সারা উত্তর ভারত বিধর্মী মুসলমান বিজেতাদের আক্রমণে, তাদের অধীনতা স্বীকার করেন মগধ, বঙ্গদেশ আর দক্ষিণ ভারতের অধিপতিরা, ব্যতিক্রম শুধু কলিঙ্গ,

ব্যাহত করেন মুসলমান আক্রমণ অনঙ্গভীমদেব, করেন তাঁর পুত্র চোড়গঙ্গ শ্রেষ্ঠ নরসিংহদেবও। জ্বালিয়ে রাখে স্বাধীনতার অম্লান দীপ শুধু কলিঙ্গ।

বাসনা জাগে নরসিংহদেবের অন্তঃকরণে তাঁর বিজয়ের অভিযান চিরস্মরণীয় করবার, নির্মাণ করবার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কলিঙ্গের চার মণ্ডলের অন্যতম মহাপবিত্র অর্কক্ষেত্রে, এমন একটি মন্দির, যার কাছে ম্লান হয়ে যাবে তাঁর পূর্বসূরী ও পূর্বপুরুষদের সমস্ত কীর্তি, সুরু হয় যে কীর্তি মহাপবিত্র খণ্ডগিরিতে, সুরু করেন প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি চেদিবংশের খারবেল, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে, চলে প্রায় অব্যাহতগতিতে দীর্ঘ বারোশ' বছর, চালান কর, কেশরী আর চোড়গঙ্গ বংশের নৃপতিরা মহাপবিত্র শিবক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরে আর বিষ্ণুক্ষেত্রে পুরীধামে। নির্মিত হয় কত শত মন্দির, বুকে নিয়ে মহামহিমময় সুউচ্চ বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির আর ভোগমন্দির, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম অলঙ্করণ, সূক্ষ্মতম বিভিন্ন লতাপল্লব আর জীবন্ত মূর্তির সম্ভার, মূর্তি দেবতার ও দেবীর, মূর্তি অসুরদের, মূর্তি কত জন্তুরও, হস্তীর, সিংহের আর ব্যাঘ্রের, বানরের রাজহংসের ময়ূরের আর মকরের, ব্যয় করতে তাঁর বিস্তীর্ণ রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরের রাজস্ব। নিযুক্ত হন সারা উড়িষ্যা থেকে বারশ' স্থপতি, মহা অভিজ্ঞ তাঁরা, সুনিপুণও, অভ্যস্থ মন্দির নির্মাণের কাজে বংশ পরম্পরায়। পুরোধা হন তাঁদের বিষ্ণু মহারানা, সর্বশ্রেষ্ঠ কলিঙ্গ স্থপতি। সঙ্গে থাকে কত অসংখ্য শ্রমিক। মন্ত্রী শিব সামন্তরাই নিযুক্ত হন পরিদর্শক, পরিদর্শন করেন মন্দির নির্মাণ। মূর্ত হয় তাঁদের স্বপ্ন মন্দিরের প্রতিটি প্রস্তরের অঙ্গে, হয় অপরূপ। অতিবাহিত হয় দীর্ঘ ষোড়শ বৎসর কিন্তু সম্পূর্ণ হয় না মন্দির, স্থাপন করা যায় না মহিমময় বিরাট আমলক শিলাখানি মন্দিরের শীর্ষদেশে, গ্রীবার উপরে। নাই নিদ্রা প্রধান স্থপতি বিষ্ণুরানার চোখে, অন্তর্হিত তাঁর মনের সমস্ত শান্তি। নিয়ত ভাবেন কি উপায়ে স্থাপিত হবে আমলক শিলাখানি মন্দিরের চূড়ায়। এদিকে, অধীর নৃপতি নরসিংহদেব, মহাক্রুদ্ধও তাঁদের অসমর্থতায়, অক্ষমতায় মন্দিরের সম্পূর্ণ রূপদানে। সৃষ্টি হয় এক মহা অনিশ্চয়তা আর দারুণ আতঙ্কের পরিবেশ, প্রতিফলিত হয় সব স্থপতির অন্তঃকরণে।

এমন সময় উপনীত হয় সেখানে জামের ঝুড়ি মস্তকে নিয়ে এক ষোড়শ-

বর্ষীয় যুবক, প্রতিভাদীপ্ত তার আনন, সুগঠিত তার অঙ্গ। জাম বিক্রয়ের ছলে সে এসেছে পিতৃ সন্ধানে এই কোণার্কে। যখন সে মাতৃগর্ভে, তখন তার পিতা কার্য উপলক্ষে গৃহ থেকে নির্গত হন, অতিক্রম করে ষোড়শ বৎসর কিন্তু তিনি গৃহে ফিরে আসেন না। ক্রমে পরিণত হয় বালক এক মহা অভিজ্ঞ ও সুনিপুণ স্থপতিতে, কিন্তু দর্শন মেলে না তার পিতার, জানে না সে তিনি কোথায় আছেন। শেষে, একদিন মাতার কাছ থেকে অবগত হয় তার পিতৃ পরিচয়, শোনে নিযুক্ত তিনি কোণার্কের মন্দির নির্মাণে, তিনিই প্রধান স্থপতি এই মহামহিমময় মন্দির নির্মাণের। বাসনা জাগে তার অন্তঃকরণে পিতার অনুসন্ধানে যাত্রা করবার। কিন্তু নিষেধ করেন মাতা। এক মাত্র পুত্রের বিচ্ছেদের আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় পরিপূর্ণ হয় তাঁর অন্তঃকরণ, বলেন দুরতিক্রম্য এই পথ, বিপদসঙ্কুলও, উচিত হবে না বালকের পক্ষে একাকী অতিক্রম করা, হবে না যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু অবুঝ বালক, শোনে না মাতৃ-নিষেধ, মানে না কোন যুক্তি। শেষে অপারগ হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দেন মাতা, সঙ্গে দেন ঝুড়িভর্তি নিজেদের গাছের জাম। বিশিষ্ট এই জামের আকৃতি, ফলে না অন্য কোন বৃক্ষে, তাই বলেন মাতা, তার পুত্রত্বের পরিচায়ক হবে এই জাম। হলও তাই। মিলন হল পিতা পুত্রে কোণার্কে দীর্ঘ ষোড়শ বৎসর পরে। পুত্রের পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হন পিতা; তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান অসম্পূর্ণ মন্দিরে। কথাচ্ছলে, ব্যক্ত করেন তাঁর ব্যর্থতার কথাও। মহা অভিজ্ঞ পুত্র, পরিদর্শন করে মন্দিরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত, ভিত্তি থেকে চূড়া পর্যন্ত, জানতে পারে কোথায় আছে ত্রুটি, কেন স্থাপন করা যাচ্ছে না আমলক শিলাখানি মন্দিরের চূড়ায়। উদ্ভাবন করে উপায়ও, নিবেদন করে পিতার কাছে। পিতা পুত্রের উপদেশ শোনেন, সেই রাত্রিতেই স্থাপিত হয় আমলক শিলা মন্দিরের শীর্ষদেশে, সম্পূর্ণ হয় মন্দির নির্মাণও, নৃপতি নরসিংহদেবের নির্ধারিত দিবসে, রক্ষিত হয় বারোশ' স্থপতির জীবন। উত্তীর্ণ হত যদি নির্ধারিত দিবস, অসম্পূর্ণ থেকে যেত যদি মন্দির, জীবনান্ত হত উড়িষ্যার মহাঅভিজ্ঞ বারশ' স্থপতির, নিযুক্ত মন্দির নির্মাণের কাজে।

পরদিন ঘোষণা করেন প্রধান স্থপতি অন্য স্থপতিদের কাছে মন্দির সম্পূর্ণ

হওয়ার কথা, বলেন, পুত্র গৌরবে গৌরবান্বিত পিতা, সম্পূর্ণ হয়েছে মন্দির তাঁর মহাঅভিজ্ঞ পুত্রের নির্দেশে, বলেন, তারই প্রাপ্য এই মন্দিরের সম্পূর্ণরূপ দানের গৌরব। কিন্তু মিনতি করেন তাঁরা, বলেন এই কথা যেন প্রকাশ না হয়। রাজা যদি শোনেন বালক এই মন্দিরের সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছে, অসমর্থ হয়েছে যে কাজে তাঁর নিযুক্ত বারোশ' মহাঅভিজ্ঞ স্থপতি তা হলে, ক্রুদ্ধ হবেন রাজা তাঁদের বিফলতায়, রাজরোষে প্রাণান্ত হবে সকলের, বাদ যাবেন না তাঁদের পুরোধা, প্রধান স্থপতিও। উচিত হবে না এতগুলি লোকের প্রাণ বিসর্জন, এক ক্ষুদ্র বালককে গৌরবান্বিত করবার জন্য, হবে না যুক্তিসঙ্গতও। এই কথা শুনে হতাশায় ও আতঙ্কে পরিপূর্ণ হয় পিতা ও পুত্রের অন্তঃকরণ। মনস্থ করে মহা প্রতিভাশালী পুত্র নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে, রক্ষা করতে পিতার আর বারোশ' মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির জীবন। সকলের অগোচরে সে আরোহণ করে মন্দিরের শীর্ষদেশে, সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে নিকটস্থ চন্দ্রভাগার বুকে, তলিয়ে যায় তার অতল গর্ভে। মৃত্যুবরণ করে এক মহা-প্রতিভাদীপ্ত বালক, এক অসামান্য অভিজ্ঞ স্থপতি, পিতার ও দশের জীবন রক্ষার জন্য, অকালে পরিসমাপ্তি হয় এক মহাউজ্জ্বল ভবিষ্যতের, এক সীমাহীন সম্ভাবনার। রক্ষা পায় স্থপতিরা রাজরোষের হাত থেকে, কিন্তু পায়না তাদের নির্মিত মহামহিমময় মন্দিরটি, অঙ্গে নিয়ে তাদের মূর্ত স্বপ্ন, তাদের সুন্দরতম দান, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের। কুপিত হন দেবতা, অভিশপ্ত হয় মন্দির, ভূপতিত হয় মন্দিরের চূড়া। দাঁড়িয়ে থাকে মন্দির—প্রেতাত্মা, ধ্বংস-স্তূপ এক মহামহিমময় সুন্দরতম কীর্তির। দাঁড়িয়ে থাকে রথ অঙ্গে নিয়ে চব্বিশটি চক্র আর সপ্তাশ্ব, কিন্তু রুদ্ধ হয় তার অসীমের গতি, পরিত্যাগ করে যান বালকের রক্তে কলুষিত, অভিশপ্ত মন্দির দেবতা সবিতা, চলে যান আকাশে।

পঞ্চমুখ এই মন্দিরের প্রশংসায়, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফজল। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, মন্দির দর্শনের পর, তিনি আইন-ই আকবরীতে লেখেন সাধ্য নাই নিষ্ঠুরতম, বিরুদ্ধ সমালোচকেরও এই মন্দির থেকে দৃষ্টি অপসারিত করা, সন্তুষ্ট নয় যারা কোন কিছুতেই, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে নিবদ্ধ হবে তাদের দৃষ্টিও এই মহামহিমময় মন্দিরের প্রতি। থাকতো যদি তখন অসম্পূর্ণ এই মন্দিরটি

অবশ্যই লিপিবদ্ধ করতেন সে কথা তিনি তাঁর গ্রন্থে। মুখর এই মন্দিরের প্রশংসায়, মনীষী ফার্গুসন, স্যার জন মার্শাল, স্টেলা ক্রামরিস, ঋষি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এ কে. কুমারস্বামী আর পার্শী ব্রাউনও। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে, স্টার্লিং এই মন্দিরটি দেখেন, দর্শন করেন মনীষী ফার্গুসনও ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। দাঁড়িয়ে ছিল তখনও বিমানটির কিছু অংশ, উচ্চতা তার একশ কুড়ি ফুট। কিন্তু সম্পূর্ণ ভূপতিত বিমানটি, বুকে নিয়ে কণ্টক বৃক্ষ আর লতাগুল্ম, যখন মনীষী ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি দর্শন করেন।

আসে আবিষ্কারের প্রেরণা। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্ণচন্দ্র মুখার্জি উদ্ধার করেন বিমানের ভিত্তির অর্ধাংশ, অংশ কিছু ভোগ মণ্ডপেরও, ভূগর্ভ থেকে। সুরু হয় উদ্ধারের কাজ পূর্ণ উদ্যমে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, লাভ করে বিমান আর ভোগমণ্ডপ তাদের বর্ত্তমান রূপ, সংস্কৃত হয় জগমোহনও, হয় রূপবান।

গাড়ী থেকে নেমে সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে বিস্তীর্ণ বালুকাময় প্রাঙ্গণ পার হয়ে, মূল মন্দিরের সামনে উপস্থিত হই। দেখি, বিস্ময়ে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে, স্তব্ধ হয়ে দেখি, স্থপতির এক অপরূপ, মহামহিময় পরিকল্পনা। নাই এমন পরিকল্পনা অন্য কোন সূর্য মন্দিরে, দেখি নাই মার্ত্তণ্ডের মন্দিরে কাশ্মীরে, নির্মাণ করেন কাশ্মীর শ্রেষ্ঠ ললিতাদিত্য, নবম শতাব্দীতে। নাই গুজরাটের মধেরাতেও, নির্মিত ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে। মহাবৈশিষ্ট্য এই পরিকল্পনা উড়িষ্যার স্থপতির, তার চরম উৎকর্ষের, পূর্ণপরিণতির। বপন করেন যে বীজ উড়িষ্যার স্থপতি বহুশত বৎসর আগে, মহানদী তীরে মহাপবিত্র চক্রমণ্ডলে একাম্রকাননে ভুবনেশ্বরে, পরিণত হয় মহীরূহে লিঙ্গরাজের সুমহান মন্দিরে, আর মহাতীর্থ শঙ্খমণ্ডলে তীর্থরাজতীরে নীলাচলে জগন্নাথদেবের সুমহান মন্দিরে, রূপ ধারণ করে সেই বীজ মহামহীরূপের চন্দ্রভাগা তীরে, পুণ্যতীর্থ অর্কক্ষেত্রে বা পদমণ্ডলে, কোণার্কের মহামহিমময় সূর্য মন্দিরে। সব সীমানার গণ্ডি অতিক্রম করে তাঁদের কল্পনা, হয় অন্তহীন, রেখে যান তার মহামহিমময় সুন্দরতম প্রকাশ, জীবন্ত প্রতিমূর্তি আর অলোকসুন্দর রূপ অনন্তের বুকে। রচনা করেন সূর্যমন্দির রথের আকারে, সেই সপ্তাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করেই দেবদিবাকর পরিক্রমণ করেন বিশ্ব, দূরীভূত হয় অন্ধকার, আলোয় উদ্ভাসিত হয় দিগন্ত।

শেষ হয় তাঁর পৃথিবী পরিক্রমা, রুদ্ধ হয় রথের গতি, বিশ্রাম করেন তিনি দিনের শেষে, ধীরে ধীরে রাত্রি নেমে আসে ধরিত্রীর বুকে। আবার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয় দিক্‌বলয়, হয় চরাচর। উড়িষ্যার মহা অভিজ্ঞ ঋষি স্থপতি রচনা করেন তাঁর সীমাহীন, কল্পনাতীত পরিকল্পনা ঋক্‌বেদের এই সূর্য বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে, বলেন পার্শী ব্রাউনও। মূর্ত হয় সেই পরিকল্পনা প্রস্তরের অঙ্গে, মহাসমৃদ্ধশালী হয় তাঁদের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে, হৃদয়ের ঐশ্বর্যে আর মনের মাধুরীতে, রূপ পরিগ্রহ করে এক মহামহিমময় মন্দিরে, বিকশিত হয় তার সর্বাঙ্গে, হয় জীবন্ত, বাঙময় হয়, হয় অপরূপ। শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন স্থপতি অমরত্ব লাভ করে উড়িষ্যা, মহাসৌভাগ্যশালী হয় ভারত।

তাই রচিত হয় দুই থাকে মন্দিরের বিমানের ভিত্তি, একটি সাড়ে যোল ফুট উচু, সুপ্রশস্ত মঞ্চের আকারে, সম্মুখে নিয়ে বারোটি অতিকায় প্রমাণ আকৃতির রথচক্র, এক এক দিকে ছয়টি করে প্রতীক তারা বারো মাসের শুক্ল পক্ষের। চালনা করে সেই রথ সাতটি অশ্ব দেবদিবাকরের রথ চালক। সপ্তাশ্ব তারা, মহাপরাক্রমশালী, বহুমূল্য বসনে আর ভূষণে সজ্জিত। নিযুক্ত তারা মন্দিরে বিরাজিত দেবতার সুমহান রথ চালনায়। বিস্তৃত তাদের অক্ষি তারকা, ঘর্মাক্ত তাদের কলেবর, সুপরিস্ফুট তাদের সর্বাঙ্গে বিপুল পরিশ্রমের চিহ্ন। দশফুট প্রতিটি রথচক্রের ব্যাস, আট ইঞ্চি তাদের ধারের বিস্তৃতি, অঙ্গে নিয়ে আছে আটটি করে মোটা পাকি। অলঙ্কৃত তাদের সর্বাঙ্গও বিভিন্ন সুন্দরতম অলঙ্করণে। পাকির অঙ্গে শোভা পায় বৃত্তাকার পদক, বৃহত্তম অংশে, মূর্তি দিয়ে মৈথুনের দৃশ্য রচিত। ভুষিত অক্ষদণ্ড পদক দিয়ে, পদকের ভিতর গজলক্ষ্মীর মূর্তি, তাঁর দুই পাশে দাঁড়িয়ে দুই হস্তী শুণ্ড দিয়ে তাঁর মস্তকে জল-সিঞ্চন করছে। অলঙ্কৃত তারা স্ক্রলের কাজ আর ঝালর দিয়েও। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাদের অঙ্গের অলঙ্করণ, এক সুন্দরতম সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের। দেখি অঙ্গে নিয়ে আছে জগমোহনের সম্মুখ ভাগের ভিত্তির উত্তর আর দক্ষিণ দিকও চারিটি করে আটটি রথচক্র, অনুরূপ আকৃতিতে ও অঙ্গের শিল্প সম্ভারে। রচিত হয়েছে প্রধান সোপান শ্রেণীর উত্তর আর দক্ষিণ দিকেও দুইটি করে, চারিটি অনুরূপ রথচক্র, প্রতীক বারো মাসের কৃষ্ণ পক্ষের।

নির্মাণ করেন উড়িষ্যার মহাঅভিজ্ঞ স্থপতি সেই সপ্তাশ্ব চালিত রথচক্র যুক্ত

সুউচ্চ মঞ্চের উপর, মন্দিরের সুমহান, জগমোহন। একশত ফুট উচ্চ এই জগমোহনটি, বিস্তৃত হয়ে আছে একশ ফুট পরিধি নিয়ে, তার সম্মুখে মন্দিরের মহামহিমময়, অত্যুচ্চ, অভ্রভেদী দু'শ পঁচিশ ফুট উঁচু বিমান। বিমানের গাত্রে, রাহা পগের অঙ্গে, কুলুঙ্গির ভিতরে, মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী তিনটি মহামহিময় সূর্যের ক্লোরাইটের মূর্তি। প্রমাণ আকৃতির এই দেবতার মূর্তিগুলিও, অনবদ্য গঠন সৌষ্ঠবে, জীবন্ত প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের। বিস্তৃত কুলুঙ্গির সম্মুখে একটি করে উন্মুক্ত অলিন্দ, রচিত হয় তাদের নিচেও তিনটি ক্ষুদ্র মন্দির, সংযুক্ত সোপানের শ্রেণী দিয়ে অলিন্দের সঙ্গে।

প্রধান সোপান শ্রেণীর বিপরীত দিকে, কিছু দূরে, সুউচ্চ মঞ্চের উপর রচিত হয় মহান নাট মন্দির। চতুষ্কোণ এই নাট মন্দিরটি, শীর্ষে নিয়ে আছে পিরামিডাকৃতি চূড়া, দাঁড়িয়ে আছে পৃথক হয়ে, বৈশিষ্ট্য কোণার্কের, ব্যতিক্রম উড়িষ্যার অন্য নাট মন্দিরের সঙ্গে, নির্মিত তারা বিমানের আর জগমোহনের সংলগ্ন। নির্মাণ করেন তাঁরা আরও অনেক সুন্দর ক্ষুদ্র মন্দির, নির্মিত হয় একটি খাওয়ার ঘরও। সমৃদ্ধিশালী করেন তাদের একটি স্তম্ভ দিয়ে, রচিত হয় নাট মন্দির আর দেউলের অন্তর্বর্তী প্রদেশে। বেষ্টন করেন প্রাচীর দিয়ে একটি আটশত পঁয়ষট্টি ফুট দীর্ঘ, পাঁচশত চল্লিশ ফুট প্রাঙ্গণ তার তিন দিকে তিনটি প্রবেশ পথ, দ্বার মন্দিরের—সিংহ, হস্তী আর অশ্বদ্বার, দুই পাশে নিয়ে সিংহ, হস্তী ও অশ্বের মূর্তি।

অলঙ্কৃত করেন উড়িষ্যার মহাঅভিজ্ঞ ভাস্কর তাদের বহিরাঙ্গের প্রতিটি অংশ কত সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম, সীমাহীন অলঙ্করণে, কত বিভিন্ন আর বিচিত্র শিল্প সম্ভারে, রচনা করেন তাঁদের হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়ে মিশিয়ে দেন মনের অপরিসীম মাধুরী। রচনা করেন দিনের পর দিন বছরের পর বছর, তাদের অঙ্গে কত বিভিন্ন সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম লতাপুষ্প কত অপরূপ স্ক্রলের আর ঝালরের কাজ। ভূষিত করেন কত সুষ্ঠু গঠন, মূর্তি দিয়েও, মূর্তি কত হস্তীর, কত অশ্বের, কত সিংহের কত অজানা পৌরাণিক জন্তুর। মূর্তি কত মৃগের, কত রাজহংসের, কত ময়ূরের, আর কত মকরের। গড়েন কত মূর্তি, মূর্তি অর্ধনারীর ও অর্ধ সর্পের, মূর্তি নাগ আর নাগিনীর, মূর্তি কত অতিকায় বীভৎস দর্শন দৈত্যের কত ভীষণ দর্শন অসুরেরও। বর্ণনা করেন তার গাত্রে

মূর্তি দিয়ে কত কাহিনী, কাহিনী কত রামায়ণের আর মহাভারতের, কাহিনী কত পুরাণেরও। দৃশ্য কত বিজয় অভিযানের, কত যুদ্ধ যাত্রার, কত রণাঙ্গনেরও। সুন্দরতম এই মূর্তিগুলি মহিমময় অনবদ্য তাদের গঠন সৌষ্ঠব, অপরূপ তাদের প্রকাশ ভঙ্গি। ভূষিত তাঁরা বহুমূল্য অলঙ্কারেও—শিরে স্বর্ণ মুকুট, কুঞ্চিত কুন্তলে টায়রা, কর্ণে হীরের কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তার মালা, বাহুতে জড়োয়ার বলয়, মণিবন্ধে স্বর্ণকঙ্কণ, কটিদেশে জড়োয়ার চন্দ্রহার, পায়ে মল। রচনা করেন প্রস্তরের অঙ্গে এক মহাসৌন্দর্যের প্রস্রবণ।

আবার মূর্তি দিয়েই রচিত হয় কত প্রেমের কাহিনী, দৃশ্য কত প্রেম নিবেদনের, কত প্রেমিকার প্রেমাস্পদের কাছে আত্মসমর্পণের কত মিলনেরও। দৃশ্য কত উলঙ্গ কামনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের, কত মৈথুনেরও তাদের পূর্ণ পরিণতির। প্রতীক তারা তন্ত্রের আর তান্ত্রিক মতবাদের। পরিণত হয় কোণার্কের মন্দিরের অঙ্গ উড়িষ্যার তান্ত্রিক ধর্মের পাদপীঠে, রূপ পরিগ্রহ করে কুৎসিত দর্শন নরকের। এই সময়েই তান্ত্রিক মতবাদ প্রসার লাভ করে সারা উড়িষ্যায়, তারই মূর্ত বিকাশ বুকে নিয়ে আছে কোণার্কের মন্দির। বলেন তাঁরা, বীভৎসতার ভিতর দিয়েই মহাসুন্দরকে লাভ করা যায়, মৈথুনের ভিতর দিয়ে ভগবানকে, তাই মৈথুনই তান্ত্রিক সাধনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। কিন্তু স্পর্শ করতে পারে না ভগবানের দেহ, অগ্রসর হ'তে পারে না তাঁর কাছে তাই নাই কোন মৈথুনের দৃশ্য গর্ভগৃহে, বিরাজ করেন সেখানে নিভৃতে নির্জনে, এক রহস্যময় পরিবেশে, মন্দিরের দেবতা। বুকে নিয়ে আছে অনুরূপ মৈথুনের দৃশ্য বুণ্ডেল খণ্ডের খাজুরাহের মন্দির, আছে মাদুরার নায়কদের তৈরী মীণাক্ষীর মন্দিরের অঙ্গেও। পরিণত হয় কোণার্কের মন্দির এক মহা সৌন্দর্যের প্রস্রবণে বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য আর চরম বীভৎসতা ও সীমাহীন অশ্লীলতার দৃশ্য। তাই রচিত হয় এক অলোকসুন্দর রহস্যলোক কোণার্কে, রচনা করেন মহাঅভিজ্ঞ ভাস্কর তাঁর সূক্ষ্মতম বাটালির সাহায্যে আর সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে। বাঙময় হয় তার মন্দিরের অঙ্গের প্রতিটি প্রস্তর খণ্ড হয় রূপময়, লাভ করেন স্থপতি আর ভাস্কর শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের দরবারে; হন বিশ্বজিৎ।

বিমানে উপস্থিত হই। বুকে নিয়ে আছে শুধু বাড়ের কিছু অংশ। দাঁড়িয়ে

আছে বিমানটি, ভগ্ন তার সর্বাঙ্গ, কর্তিত তার শিরা উপশিরা, অর্ধ প্রোথিত হয়ে আছে বালুকার গর্ভে। দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংস স্তূপ এক মহামহিমময় সৃষ্টির উড়িষ্যার স্থপতির আর ভাস্করের, এক সুন্দরতম কীর্তির, কীর্তির এক মহা গৌরবময় যুগের, বুকে নিয়ে পূর্ব গৌরবের নিদর্শন। তেত্রিশ ফুট তার ভিতরের আয়তন, ঋজু হয়ে উঠে যায় তার ছাদ, ৩০ ফুট উঁচুতে। তার তিনদিকে, কেন্দ্রস্থলে, তিনটি প্রবেশ পথ। সংযুক্ত সোপানের শ্রেণী দিয়ে। শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম তাদের মধ্যে, পূর্বদিকের প্রধান প্রবেশ পথটি, বুকে নিয়ে আছে স্থপতির এক সুমহান মহা প্রতিভাশালী কল্পনার অনবদ্য, সুন্দরতম রূপদান। খোদিত তার সোপানের শ্রেণীর অঙ্গে, একদিকে তিনটি ও অপর দিকে চারিটি মহাপরাক্রমশালী অশ্ব। প্রতীক তারা দেব দিবাকরের সপ্তাশ্বের, মহা-পরাক্রমশালী সজ্জিত বহুমূল্য ভূষণে, উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত তাদের সম্মুখ পদদ্বয়, উদ্যত তারা রথ ও চক্র সমন্বিত মন্দির স্কন্ধে নিয়ে আকাশে উড়ে যেতে, উপনীত হ'তে স্বর্গ লোকে, সঙ্গে নিয়ে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সবিতা। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। দেখি অলঙ্কৃত তার ভিত্তিও বিভিন্ন শিল্প সম্ভারে। নিম্ন বারাণ্ডিতে উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গে নাগ ও নাগিনীর মূর্তি; মূর্তি শার্দুলের আর দেউলেও। তাদের ফাঁকে ফাঁকে প্যানেলের গাত্রে মূর্তি কত নরের, কত নারীর, দাঁড়িয়ে আছে তারা বিভিন্ন ভঙ্গীতে। শোভন সুন্দর এই মূর্তিগুলি। উর্ধ্ব বারাণ্ডির অঙ্গে বিভিন্ন মৈথুনের দৃশ্য। দেখি কত সূক্ষ্ম জালির কাজও।

সোপান অতিক্রম করে উত্তর দিকের কেন্দ্রস্থলের কুলুঙ্গির সম্মুখে উপনীত হই। দেখি ভাল করে সূর্যের মূর্তিটি। তার শিরে শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ, কর্ণে কুণ্ডল, কটিদেশে কোমর বন্ধ, অঙ্গে বহুমূল্য, সূক্ষ্ম কারুকার্য সমন্বিত বসন। আরোহণ করে আছেন সূর্য মহামহিমময় মূর্তিতে এক মহা পরাক্রমশালী অশ্ব পৃষ্ঠে। সজ্জিত সেই অশ্বটি বহুমূল্য ভূষণে, দেখা যায় জিনের অগ্রভাগ। একটি সম্পূর্ণ প্রস্তর কেটে এই মূর্তিটি নির্মিত। তাঁর দুই পাশে, দেউলের সংলগ্ন হয়ে, দুই সহচর দাঁড়িয়ে, ভগ্ন তাদের হস্তদ্বয় কালের করালে, তাঁরা এক হস্তে ধারণ করেছিল অসি অপর হস্তে ঢাল। তাঁদের মাঝে দুই শ্মশ্রুযুক্ত ক্ষুদ্র মূর্তি। দেউলের শীর্ষদেশে দু'টি রূপবতী বিলোল লোচনা, লাস্যময়ী নারী, অপরূপ, শোভন তাঁদের দাঁড়াবার ভঙ্গীটি। সবার

উপরে এক চন্দ্রাতপ অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম অলঙ্করণ। চন্দ্রাতপের শীর্ষদেশে বামে চতুর্ভুজ ব্রহ্মার মূর্তি, দক্ষিণে, চতুর্ভুজ বিষ্ণুর, উপবিষ্ট তাঁরা পদ্মাসনে। ঊর্ধ্বে, ত্রিপত্র খিলানের অঙ্গে সারি সারি অপরূপ নারীমূর্তি, নিযুক্তা তাঁরা সংগীতে, হস্তে নিয়ে কত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, বীণা, সেতার, বাঁশী, করতাল আরও কত যন্ত্র। তাদের উপরে উড়ন্ত অপ্সরা, কেউ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটি নরকে, কারও হস্তে শোভা পায় ফুলের মালা। সবার উপরে, শোভা পায় কীর্তিমুখ, দুইটি নর ধারণ করে আছে কীর্তিমুখকে। অপরূপ সুষ্ঠু গঠন এই মূর্তিগুলিও, শ্রেষ্ঠ কীর্তি উড়িষ্যার ভাস্করের।

পশ্চিমের সোপান অতিক্রম করে, দক্ষিণের কেন্দ্রস্থলের কুলুঙ্গির সামনে উপনীত হই। আছে পূর্ব দিকেও একটি সোপানের শ্রেণী। দেখি, সিংহাসনে উপবিষ্ট সাড়ে উনিশ ফুট উঁচু মহামহিমময় সূর্যমূর্তি। তাঁর শিরেও বহুমূল্য শিরোভূষণ, কণ্ঠে মুক্তার মালা, বাহুতে হীরা মুক্ত খচিত তাগা, মণিবন্ধে স্বর্ণ কঙ্কণ। কটিদেশে ঝালরযুক্ত চন্দ্রহার, নিবদ্ধ তার তারকা সম্মুখ ভাগে। ভূষিত তিনি বহুমূল্য সূক্ষ্ম শিল্প সম্ভারে অলঙ্কৃত বসনেও, বিলম্বিত সেই বসন তাঁর জানু পর্যন্ত। তাঁর বামে সিংহাসনের উপর রক্ষিত তাঁর হস্তের অসি। ভগ্ন তাঁর উভয় হস্তই, খুব সম্ভব হস্তে ধারণ করেছিলেন তিনটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। অপরূপ শিল্প সম্পদে অলঙ্কৃত সিংহাসনের অঙ্গও। বিভক্ত সূক্ষ্ম উদ্গত স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে, অসংখ্য কপাটে, শোভিত কপাটের অঙ্গ অপরূপ নারী মূর্তি দিয়ে, কেউ নিযুক্তা সংগীতে, হস্তে নিয়ে বীণা, মুরলী আর করতাল, কেউ নৃত্য করেন, অনবদ্য তাদের নৃত্যের ছন্দ। শোভা পায় সপ্তাশ্ব চালিত রথ আরোহণে অরুণের মূর্তিও। দিবাকরের পদতলে, উপবিষ্ট তাঁর সারথি। সুন্দরতম লাগামের অঙ্গের ভূষণও। দিবাকরের দুই পাশে, তিন ফুট উঁচু দুই পার্শ্বচর দাঁড়িয়ে আছে, হস্তে নিয়ে আছে দক্ষিণ দিকের পার্শ্বচরটি, একটি অসি ও ঢাল, বামেরটি ধারণ করে আছে ধনুর্বাণ। শীর্ষে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, অনুরূপ উত্তরের গাত্রের সূর্য মূর্তির উপরি ভাগের।

দক্ষিণ দিকের সোপান অতিক্রম করে, পশ্চিমের কেন্দ্রস্থলের কুলুঙ্গির সম্মুখের সতের ফুট দীর্ঘ অলিন্দে উপস্থিত হই। আছে পূর্ব দিকেও

একটি সোপানের শ্রেণী। অলিন্দের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র কক্ষ, বুকে নিয়ে আছে তার প্রবেশ পথের শীর্ষদেশ নবগ্রহের মূর্তি। কুলুঙ্গির ভিতরে একটি অতিকায় সূর্য দাঁড়িয়ে আছেন সিংহাসনের উপর মহামহিমময় মূর্তিতে। বহুমূল্য বসনে সজ্জিত তাঁর অঙ্গও, পায়ে চর্ম পাদুকা, পৌঁছেছে সেই পাদুকা তাঁর হাঁটু পর্যন্ত। তাঁর শিরেও শোভা পায় মূল্যবান শিরোভূষণ, কর্ণে হীরের কুণ্ডল বাহুতে জড়োয়ার তাগা, মণিবন্ধে স্বর্ণ কঙ্কন। দক্ষিণের ও উত্তরের সিংহাসনের অনুরূপ অলঙ্করণে অলঙ্কৃত তাঁর সিংহাসনের অঙ্গও। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি এই সূর্য মূর্তি তিনটি, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের, প্রতীক এক অমর কীর্তির।

সোপান অতিক্রম করে, বিমানের গর্ভগৃহে উপনীত হই। দেখি বুকে নিয়ে আছে গর্ভগৃহের পশ্চিম প্রান্ত একটি সিংহাসন। প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু এই সিংহাসনটি অঙ্গে নিয়ে আছে সুন্দরতম অলঙ্করণ। তার শীর্ষদেশে একটি ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড। এই প্রস্তর খণ্ডে হেলান দিয়েই সিংহাসনে উপবেসন করতেন মন্দিরের বিগ্রহ দেবতা, কোণার্ক। তার পাদদেশে কপাটের গাত্রে, অপরূপ, সুষ্ঠুগঠন হস্তীর সারি দেখি। ঊর্দ্ধদেশে, তিনটি অধিক্ষেপণ, তার নিচে গভীর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের দুই পাশে নাগর পদ্ধতিতে নির্মিত স্তম্ভ, সুষ্ঠু গঠন এই স্তম্ভগুলিও, অঙ্গে নিয়ে আছে সূক্ষ্ম শিল্প সম্ভার। প্রকোষ্ঠের ভিতরে মূর্তি দিয়ে রচিত কত কাহিনী কত সুঃখ দুঃখের কত আশা আকাঙ্খার, কত আনন্দ উৎসবের, চিত্র কত উড়িষ্যার সামাজিক জীবনেরও। দেখি কত যৌবন পুষ্ট, পীনোন্নত বক্ষা রূপবতী নারীকেও, কারও হস্তে পুজার অর্ঘ্য, কেউ নিযুক্তা চামর ব্যজনে, কেউ হস্তে নিয়ে আছে বাদ্যযন্ত্র, কেউ কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে আছে। পূজারিণী তারা, অপরূপ তাদের দেহ বল্লরী, ভক্তি প্রণত তাদের নয়ন, বিকশিত তাদের আননে তাদের অন্তরের অপরিসীম শ্রদ্ধা, হিল্লোলিত তাদের সর্বাঙ্গে। অনবদ্য জীবন্ত দুই প্রান্তের দুইটি সিংহের মূর্তিও। তাদের নিচে, স্ক্রলের কাজ, বুকে নিয়ে মূর্তি কত জন্তুর কত খরগোসের, কত ব্যাঘ্রের, কত মৃগের আর কত হস্তীরও। দেখি স্তব্ধ হয়ে শ্রেষ্ঠ কীর্তি এক উড়িষ্যার ভাস্করের, এক তুলনাহীন সুন্দরতম সৃষ্টি। প্রণতি জানাই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, জানাই উড়িষ্যার মহা অভিজ্ঞ ভাস্করকেও।

ধীরে ধীরে নির্গত হয়ে, জগমোহনে উপনীত হই। পঞ্চরথ দেউল এই

জগমোহনটিও, দাঁড়িয়ে আছে একই ভিত্তির উপর মহামহিমময় মূর্তিতে, অঙ্গে নিয়ে আছে চল্লিশ ফুট উঁচু ঋজু বাঢ়, শীর্ষে নিয়ে আছে পীঢ় দেউল, পিরামিডাকৃতি চূড়া। দাঁড়িয়ে আছে উর্ধ্বে তুলে একশ ফুট উঁচু শির।

বিভক্ত বাঢ় পাঁচ ভাগে—জঙ্ঘা, বারাণ্ডি, বন্ধন, উর্ধ্ব বারাণ্ডি আর উর্ধ্ব জঙ্ঘাতে। ভূষিত তার প্রতিটি অঙ্গ বিভিন্ন, অনবদ্য, সুন্দরতম অলঙ্করণে শোভিত কত বিভিন্ন মৈথুনের দৃশ্য দিয়েও। দেখি শোভন নাগ স্তম্ভের ফাঁকে ফাঁকে কত দেউলের প্রতীক, প্রান্তদেশে, সূক্ষ্মতম স্ক্রলের কাজ, অপরূপ। বারাণ্ডির অঙ্গে শার্দূলের মূর্তি। দুই পাশের উদ্গত স্তম্ভের মধ্যে মূর্তি দিয়ে রচিত কত প্রণয়ের কাহিনী, দৃশ্য কত প্রেম নিবেদনের, কত সুস্পষ্ট কামনার, দৃশ্য কত মৈথুনেরও। কিন্তু সুষ্ঠ গঠন এই উদ্গত স্তম্ভগুলি বুকে নিয়ে আছে অনবদ্য, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্প সম্ভার, নিদর্শন প্রকৃষ্টতম সৃষ্টির।

তার পীঢ়ই বা পিরামিডাকৃতি চূড়াই শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য কোণার্কের জগমোহনের, কিন্তু বিস্তৃততর এর পরিকল্পনা, জটিলতর রচনা কৌশল, উন্নতর নির্মাণ পদ্ধতি আর সুন্দরতর ও বিস্তৃততর অঙ্গের অলঙ্করণ—তাই মহামহিমময়, প্রতীক এক শ্রেষ্ঠ কীর্তির, নিদর্শন সৃষ্টির এক চরম উৎকর্ষের, এক মহা-গৌরবময় যুগের। বিভক্ত পিরামিডাকৃতি অংশ তিনটি ক্রমহ্রস্বায়মান থাকে, বুকে নিয়ে প্রথম দুইটি থাক ছয়টি করে পীঢ়, সকলের উপরের থাকে, পাঁচটি পীঢ়ের সমষ্টি। রচিত হয় প্রতিটি সন্ধিস্থলে সুপ্রশস্ত মঞ্চের শ্রেণী, বুকে নিয়ে বৃহৎ নারী মূর্তি সম্ভার। মূর্তি কত বিদ্যাধরীর। জীবন্ত এই মূর্তিগুলি অনবদ্য তাঁদের অঙ্গ সৌষ্ঠব, যৌবন পুষ্ট, পীনোন্নত চঞ্চল তাঁদের বক্ষ, বৃত্তাকার নিতম্ব। খোঁপার আকারে বিন্যস্ত তাঁদের কুন্তল, সজ্জিত তাঁরা বহুমূল্য ভূষণে। তাঁদের কর্ণে শোভা পায় হীরের কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তার মালা, মণিবন্ধে স্বর্ণ কঙ্কণ। ভূষিত তাঁরা বহুমূল্য মস্‌লিনের বসনেও, দেখা যায় তাঁদের অঙ্গের প্রতিটি সুন্দরতম রেখা, তাঁদের পায়ের অনবদ্য গঠন সৌষ্ঠব তাঁদের বসনের অন্তরাল থেকে। নিযুক্ত তাঁরা বাদ্যযন্ত্র বাদনে কেউ বাজান মৃদঙ্গ, কেউ বীণা, কেউ বেণু, কেউ করতাল। নেমে আসেন তাঁরা স্বর্গ থেকে, সঙ্গীত দিয়ে আবাহন করেন সূর্য দেবতাকে। নাই এই মূর্তির সম্ভার উড়িষ্যার অন্য কোন মন্দিরে, সমৃদ্ধিশালী নয় সংগীতজ্ঞের মূর্তি দিয়ে। তাই মহিমময় এই মূর্তিগুলি,

অপরূপ। খোদিত হয় একটি শিবের মূর্তিও, কেন্দ্রস্থলের প্রবেশ পথের শীর্ষদেশে, নিচের দুইটি থাকের পীঢ়ার অঙ্গে মূর্তি দিয়ে রচিত হয় যুদ্ধ যাত্রার দৃশ্য—বিজয় অভিযানে অগ্রসর হন কত অশ্বারোহী সৈন্য, যান হস্তী পৃষ্ঠে চড়েও। সফল হয় নৃপতি নরসিংহদেবের বাসনা। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের, তার পূর্ণ পরিণতির। তাই লাভ করেন তিনি শ্রেষ্ঠত্বের আসন।

রচিত হয় পিরামিডের শৃঙ্গ বা শীর্ষদেশ বাঁশরী আকারে, তার উপরে বেঁকী, শ্রী, কর্পূরী ও আমলক। বুকে নিয়ে আছে জগমোহনের চারদিক, চারিটি দ্বার, পশ্চিমের দ্বার দিয়ে বিমানে উপনীত হতে হয়। রুদ্ধ জগমোহনের দ্বার, নিষিদ্ধ তার ভিতরে প্রবেশ, তাই সম্ভব নয়, তার ভিতরের অলঙ্করণ দর্শন করা। তাদের বিষয় অবগত হওয়াও। অনুপম কিন্তু পূর্ব প্রবেশ পথের বহিরাঙ্গের অলঙ্করণ। মসৃণ ক্লোরাইট প্রস্তরের রচিত এই প্রবেশ পথ। সাজান উড়িষ্যার মহাঅভিজ্ঞ আর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর তার সর্বাঙ্গ, কত বিভিন্ন সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম লতাপুষ্প দিয়ে, ভূষিত করেন কত অনবদ্য নিরুপম ঝালরের আর স্ক্রলের কাজ দিয়ে। অলঙ্কৃত করেন তাঁদের কত সুষ্ঠু গঠন জীবন্ত মূর্তি সম্ভার দিয়েও, মূর্তি কত জন্তুর, মূর্তি কত মহামহিমময় নরের কত পীনোন্নত, চঞ্চল বক্ষা, রূপবতী নারীরও। উজাড় করে দেন হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য, মিশিয়ে দেন মনের সীমাহীন মাধুর্য, রচনা করেন নিখুঁত, চিরনবীন এক অলোকসুন্দর স্বপ্নলোক, এক রহস্যপুরী অঙ্গে নিয়ে কত সৌন্দর্যের প্রস্রবণ। লাভ করেন তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে। দেখে মনে হয় এইমাত্র পরিসমাপ্তি হয়েছে তাদের সম্পূর্ণ রূপদান মুক্তি লাভ করেছে তারা সুনিপুণ ভাস্করের বাটালীর হস্ত থেকে। সমপর্যায়ে পড়ে তারা শ্রেষ্ঠ গথিক অলঙ্করণের, লেখেন স্টার্লিং সাহেব, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। প্রবেশ পথের শীর্ষদেশে নবগ্রহের মূর্তি। বাম দিক থেকে জোড়াসন হয়ে বসে আছেন তাঁরা এক একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর—রবি (সূর্য), চন্দ্র (সোম) মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু আর কেতু। দন্ত বিকশিত করে রাহু শুধু হাসেন, ঊর্ধ্বাঙ্গে রূপ পরিগ্রহ করেন তিনি একটি বিকট আকার দৈত্যের, সর্পাকার তাঁর নিম্নাঙ্গ এক কেতু ছাড়া সকলেরই শিরে শোভা পায় মুকুটাকার শিরোভূষণ। অপরূপ

এই মূর্তিগুলি বিশিষ্ট তাদের মধ্যে রাহু আর কেতুর মূর্তি, তারাও শ্রেষ্ঠ দান উড়িষ্যার সুনিপুণ ভাস্করের—মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। স্থপতি ও ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা নাটমন্দিরে উপনীত হই।

কেউ বলেন নাট মন্দির নয়, দাঁড়িয়ে আছে ভোগমন্দির, সময় হয় নাই নাট মন্দির নির্মাণ করবার। পৃথক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাট মন্দিরও, মহামহিমময় মূর্তিতে, মূল মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথের বিপরীত দিকে, প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে, মহাসমৃদ্ধশালী হয়ে আছে নির্মাণ কুশলতায় আর সর্বাঙ্গের অলঙ্করণে। অধিকার করেছিল শূন্য স্থানের কেন্দ্রস্থল একটি কীর্তি স্তম্ভ, পরিচিত অরুণ স্তম্ভ নামে, শীর্ষে নিয়ে সারথি অরুণের মূর্তি। স্থানান্তরিত হয়েছে সেই স্তম্ভটি পুরীতে, জগন্নাথ দেবের মন্দিরে। দেখি রচিত হয় নাট মন্দিরের চতুর্দিকে পশ্চিমে, পূর্বে, উত্তরে ও দক্ষিণে চারিটি ছোট বড় সোপানের শ্রেণী, যুক্ত হয় নাট মন্দিরের সঙ্গে, দীর্ঘতম তাদের মধ্যে পশ্চিম দিকের সিঁড়িটি। দাঁড়িয়ে আছে পূর্বদিকের সিঁড়ির দুই প্রান্তে নিচু মঞ্চের উপর, দুইটি মহাপরাক্রমশালী সিংহ, দুইটি অবনত হস্তীর পৃষ্ঠের উপর, তার পদতলে শায়িত একটি নরদেহ। সিংহ দুইটির কণ্ঠে লৌহ শিকল, বিলম্বিত একটি করে ঘণ্টা, সেই শিকলের সঙ্গে।

একটি সুউচ্চ তলাপত্তমের উপর নাটমন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে। তিন থাকে বিভক্ত সেই ভিত্তি। দুই ফুট উঁচু প্রথম থাকটি, দ্বিতীয়টি সাড়ে নয় ফুট, সাড়ে চার ফুট তৃতীয়টির উচ্চতা। দেখি, দ্বিতীয় থাকের অঙ্গে কত নারীমূর্তি, নিযুক্তা তাঁরা বাদ্য বাদনে, হস্তে নিয়ে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গে পীঢ় দেউলের প্রতীক। মূর্তি দেখি হস্তী যূথের মূর্তি কত মকরেরও। অলঙ্কৃত সূক্ষ্মতম জালির কাজ দিয়েও। অঙ্গে নিয়ে আছে সর্বোচ্চ থাকও, সুন্দরতম অলঙ্করণ। দেখি, কত হস্তীর শোভাযাত্রা, দেখি, কত যৌবনপুষ্ট, নারী মূর্তিও, লাস্যময়ী তারা, দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন ভঙ্গীতে। দেখি, শোভিত কত বিভিন্ন সুন্দরতম লতাপুষ্পেও, কত প্রস্ফুটিত পদ্ম দিয়েও, অনুপম সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের। নির্মিত হয় এই অলঙ্কৃত ভিত্তির উপর, একটি চতুষ্কোণ সভাগৃহ (কক্ষ), পরিধি তার দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সাড়ে আটচল্লিশ ফুট, তার ভিতরের আয়তন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় সাড়ে ছত্রিশ ফুট। বুকে নিয়ে আছে

নাটমন্দিরটি দশ ফুট উচ্চ চতুষ্কোণ স্তম্ভ। দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভগুলি এক একটি স্তম্ভ মূলের উপর, নাই কোন শিল্প সম্ভার স্তম্ভ মূলের অঙ্গে। বিভক্ত স্তম্ভ মূলের উপরাংশ, তিনটি ছাঁচে। খোদিত হয় কপাটের অঙ্গে হস্তীমূর্তি সর্ব নিম্ন ছাঁচে। তার উপরে ঋজু হয়ে উঠে যায় সূক্ষ্মতম স্ক্রলের আর ঝালরের কাজ। দেখি, অলঙ্কৃত স্তম্ভের অঙ্গ, কত বঙ্কিম গ্রীব, পীনোন্নত বক্ষা নারী মূর্তি দিয়েও, দাঁড়িয়ে আছে নারী এক একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের সামনে। তাদের উপর আবার অনুপম স্ক্রলের আর পলাযুক্ত ঝালরের কাজ। রচিত হয় স্তম্ভও, অঙ্গে নিয়ে উড়িষ্যার, প্রকৃষ্টতম স্থাপত্যের নিদর্শন।

দেখি, বাইরের প্রাচীরের গাত্রও, অলঙ্কৃত কত সুষ্ঠু গঠন জীবন্ত মূর্তিসম্ভার দিয়ে, বিনষ্ট হয়েছে মূর্তিগুলি কালের করালে, বিকৃত হয়েছে তাদের রূপ। দেখি কত অপরূপ নারীমূর্তি, নিযুক্ত পাখোয়াজ বাদনে, দেখি প্রস্ফুটিত পদ্মের ছড়াছড়ি প্রাচীরের সর্বাঙ্গে। নাই কোন ছাদ, এই নাটমন্দিরের উপরে, জানা যায় না আদৌ নির্মিত হয়েছিল কিনা কোন ছাদ।

নাটমন্দির দেখে, আমরা যাদুঘরে উপনীত হই। ঘুরে ঘুরে দেখি একে একে ক্লোরাইটের মূর্তিগুলি রক্ষিত তার মেঝের উপর। ছিল এই মূর্তিগুলি বিমানের অঙ্গে। দেখি, আড়াই ফুট উঁচু একটি অপরূপ গঙ্গামূর্তি, উপবিষ্টা গঙ্গাদেবী একটি মকরের উপর, বিস্তৃত তার দীর্ঘ পুচ্ছ, বিকশিত তার বীভৎস দন্ত। গঙ্গার শিরে শোভা পায় বহুমূল্য মুকুট, কর্ণে হীরের কুণ্ডল, মণিবন্ধে স্বর্ণ কঙ্কণ, কণ্ঠে মুক্তার মালা।

দেখি, মেষ বাহনে দেবতা অগ্নিকেও। তাঁর ওষ্ঠে গুম্ফের রেখা বিলম্বিত তাঁর দীর্ঘ শ্মশ্রু, লম্বোদর তিনি। তাঁর দু'পাশে পাত্রের ভিতর থেকে নির্গত হচ্ছে অগ্নি। প্রায় তিন ফুট উঁচু এই মূর্তিটি। মহিষ মর্দিনীকেও দেখি। প্রায় তিন ফুট উঁচু, বাম প্রান্তে পার্বতী মহিষাসুর বধে নিযুক্তা, তাঁর পাশেই জগন্নাথ আর একটি শিবলিঙ্গ। তাঁদের সামনে বহুমূল্য ভূষণে আর বসনে সজ্জিত এক নৃপতি কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মাঝখানে একজন মস্তক বিহীন পুরুষ। তাঁদের উপরে শোভা পায় একটি অপরূপ চন্দ্রাতপ, দুই থাকে রচিত এই চন্দ্রাতপটি, নিচের থাকে দাঁড়িয়ে আছেন কত নর আর নারী।

দেখি, অধ্যয়নে নিযুক্ত এক ব্যক্তি, অপসারিত তার মস্তক কালের করালে, তার সামনে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীর দল। তাদের নিচে, উপবিষ্ট কয়েকটি নর ও নারী, সর্বনিম্নে, একটি হস্তীর সামনে কয়েকটি পুরুষ দণ্ডায়মান, একটি মহাপরাক্রমশালী অশ্বও দাঁড়িয়ে আছে, সজ্জিত হয়ে আছে বহুমূল্য ভূষণে।

দেখি, শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে, সীতাদেবীর বিবাহ। তিন অংশে বিভক্ত এই দৃশ্যটি। প্রথম অংশে রাজর্ষি জনক, সম্প্রদান করেন কন্যা জানকীকে শ্রীরাম চন্দ্রের হস্তে। কেন্দ্রস্থলে, রাজগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ উপবিষ্ট। দ্বিতীয় অংশে, নৃত্য করে তিনটি নর্তকী অনবদ্য ছন্দে, স্থাপিত তাদের হস্ত পরস্পরের স্কন্ধের উপর। উপভোগ করে এই নৃত্য কয়েকটি বানর। সর্বনিম্নাংশে নিযুক্তা সীতার সখীবৃন্দ বাজনা বাদনে, কারও হস্তে শোভা পায় পাখোয়াজ, কেউ বেণু বাজান, কেউ করতাল। দেখি শোভাযাত্রা বরযাত্রীরও, তাদের পিছনে অগ্রসর হয় একটি হস্তী ও একটি অশ্ব। অনবদ্য, জীবন্ত এই হস্তী মূর্তিটি, মহাপরাক্রমশালী অশ্বটিও, সজ্জিত বহুমূল্য ভূষণে, অঙ্গে নিয়ে আছে জিন ও পাদানি।

দেখি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বিষ্ণুকেও, হস্তে নিয়ে বরদা মুদ্রা। তাঁর দক্ষিণে উমা বামে মহেশ্বর। অলঙ্কৃত সিংহাসনের পাদদেশেও লতাপুষ্প দিয়ে, দুই প্রান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দুই পরমা রূপবতী নারী পুজারিণী দাঁড়িয়ে আছেন। প্রায় তিন ফুট উঁচু এই মূর্তিটি।

তার পাশেই পাঁচ ফুট উঁচু দেবদিবাকর দাঁড়িয়ে আছেন মহামহিমময় মূর্তিতে। পদতলে উপবিষ্ট সারথি অরুণ, নিযুক্ত সপ্তাশ্বযুক্ত রথ চালনায়। অশ্বের পৃষ্ঠে বহুমূল্য জিন, অলঙ্কৃত সুন্দরতম কারুকার্য দিয়ে। বাম হস্তে অরুণ ধারণ করে আছেন অশ্বের লাগাম, দক্ষিণ হস্তে চাবুক। দিবাকরের দুই পাশে দুই পার্শ্বচর দণ্ডায়মান, হস্তে নিয়ে ঢাল আর অসি, তাঁদের মাঝখানে দুই খর্বাকৃতি ঋষি। উর্ধ্বে দুই পাশে দুই পরমা রূপবতী নারী দাঁড়িয়ে আছেন। অপরূপ তাঁদের দাঁড়াবার ভঙ্গি। তাঁদের উপরে দুইটি উড়ন্ত অপ্সরা। দেবতার দুই প্রান্তে, কর্ণের নিকটে দুইটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। দক্ষিণের পদ্মের পাশে, একজন অশ্বারোহী, হস্তের অসি দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত। স্থাপিত তার পাদুকা শোভিত পদদ্বয় পাদানির ভিতরে। দিবাকরের শিরে শোভা পায় বহুমূল্য

মুকুট, অঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ, কণ্ঠে মুক্তার মালা, বাহুতে জড়োয়ার তাগা, মণিবন্ধে স্বর্ণ কঙ্কণ। ছিল এই মূর্তিটি, রামচণ্ডির বা রামচন্দ্রের মন্দিরে, অলঙ্কৃত করেছিল, তার কুলুঙ্গির অঙ্গ, এখন এখানে স্থানান্তরিত হয়েছে। তুলনাহীন এই মূর্তিগুলি জীবন্ত, ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে আর হৃদয়ের ঐশ্বর্যে, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের, বুকে নিয়ে আছে প্রতীক এক অমর কীর্তির।

শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক, সুন্দরের পূজারী উড়িষ্যার ভাস্করদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে, আমরা রামচণ্ডি বা রামচন্দ্রের মন্দিরে উপস্থিত হই। ক্ষুদ্রতর কিন্তু সম্পূর্ণ এই মন্দিরটি, দাঁড়িয়ে আছে কোণার্কের মন্দিরের দক্ষিণ পূর্বে, অধিকার করে আছে অঙ্গণের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ, বুকে নিয়ে আছে বিমান আর জগমোহন। অঙ্গে নিয়ে আছে তার বিমান আর জগমোহন অনুরূপ সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ। মুগ্ধ হয়ে দেখি কয়েকটি অপরূপ মকরের মূর্তি খোদিত তাদের অঙ্গেও। দেখি দৃশ্য কত বিজয়ের অভিযানেরও, অভিযানের কত অশ্বারোহী সৈন্যের, শোভাযাত্রা কত হস্তীরও রচিত মূর্তি দিয়ে। মহাপরাক্রমশালী অমিত বিক্রমশালী, এই যুদ্ধের অশ্বগুলি। সর্বশ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে কোণার্কের মন্দিরের জগমোহনের অঙ্গের যুদ্ধাশ্বটি, সজ্জিত বহুমূল্য ভূষণে, তার আগে আগে চলে একটি লোক। নিরুদ্ধ বিক্রমে সম্মুখের দুই পদ উর্ধ্বে বিক্ষিপ্ত করে দাঁড়িয়ে থাকে অশ্বটি। অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য উড়িষ্যার স্থপতির আর ভাস্করের, তাদের সুন্দরতম দান, শ্রেষ্ঠ কীর্তি, শ্রেষ্ট কীর্তি ভারতের ভাস্করেরও। মহা সৌভাগ্যশালী হয় ভারতবর্ষ বুকে নিয়ে এমন প্রবল পরাক্রান্ত যুদ্ধাশ্ব।

দাঁড়িয়ে আছে প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পূর্ব কোণেও একটি অট্টালিকা, খুব সম্ভব একটি যাত্রীদের বাসস্থান রূপে ব্যবহৃত হত। নাই কোন নির্মাণ কুশলতা এই অট্টালিকার অঙ্গে, সমৃদ্ধিশালী নয় ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শেও।

সেখান থেকে আমরা প্রসিদ্ধ অতিকায় হস্তী দুইটি দেখতে যাই। দাঁড়িয়ে আছে হস্তীদ্বয় কোণার্কের মন্দিরের উত্তর দিকে। নির্মিত এক একটি সম্পূর্ণ প্রস্তর খণ্ড কেটে, একেবারে জীবন্ত হয়ে আছে। দেখে মনে হয়, মূর্তি নয়, দাঁড়িয়ে আছে সত্যিকারের হস্তী। সর্বশ্রেষ্ঠ হস্তী, উড়িষ্যার ভাস্করের, সর্বশ্রেষ্ঠ

ভারতেরও, শ্রেষ্ঠ বিশ্বের, মুখর মনীষী হ্যাভেল পঞ্চমুখ, এই হস্তীর ও জগমোহনের গাত্রের যুদ্ধাশ্বটির প্রশংসায়। বলেন হ্যাভেল, লেখা থাকতো যদি তাদের অঙ্গে নির্মাণ করেছেন এই মূর্তিগুলি শ্রেষ্ঠ রোমান অথবা গ্রীক স্থপতি, গৌরবান্বিত হত ইউরোপের আর আমেরিকার শ্রেষ্ঠ যাদুঘরগুলি তাদের বুকে নিয়ে, ধন্য হত গ্রীক আর রোমান ভাস্কর—সার্থক হত দর্শন কত দর্শনঅভিলাষীর, কত যাত্রীর, সফল হত তাদের জীবন। তিনি বলেন, রচনা করেন ভারতের মহা-অভিজ্ঞ ভাস্কর এই মূর্তিগুলি উজাড় করে দিয়ে তাঁদের হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য, অন্তরের অপরিসীম তেজ, তাই নিদর্শন তারা তাঁদের এক মহাগৌরবময় সক্ষমতার সফলতার বিশ্বের এক গৌরবময় বিজয় অভিযানের দৃশ্য রচনা করবার। তাই শ্রেষ্ঠ তারা বিশ্বের ভাস্কর্যের দরবারে, বিশ্বজিৎ তাঁরা। পরাজয় স্বীকার করতে হয় এই ভারতবর্ষীয় এ্যাকিলিসদের (Achielles) কাছে এল্‌গিনের শ্বেত পাথরের অঙ্গে হোমারিক যুগের মহা মহান ভাস্কর্য—অসমর্থ তাঁদের পরাজয় করতে। সমপর্যায়ে পড়ে এই তুলনাহীন, মহামহিমময় যুদ্ধাশ্বগুলি ভেনিসের মহা অভিজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ভেরোসিয়োর (Veroe-chio's) শ্রেষ্ঠ কীর্তির সঙ্গেও।

সবশেষে নবগ্রহের মূর্তিটি দেখতে যাই। মহাপ্রসিদ্ধ এই মূর্তিটি, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের। অলঙ্কৃত করেছিল এই মূর্তিটির সমষ্টি বিমানের দ্বারের শীর্ষদেশ। রচিত এই মূর্তিগুলি একটি সম্পূর্ণ ক্লোরাইট প্রস্তর খণ্ডের অঙ্গ খোদিত করে. ওজন তার ৭৪২ মণ। দ্বিখণ্ডিত করেন এই প্রস্তর খণ্ডখানি পঞ্চাশ বছর পূর্বে পূর্তবিভাগ, মূর্তিগুলিকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সক্ষম হন না নিয়ে যেতে। রক্ষিত এখন অর্ধাংশ, বুকে নিয়ে নবগ্রহের মূর্তি, প্রাঙ্গণ সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে। দেখি, অনুরূপ এই মূর্তিগুলি জগমোহনের প্রবেশ পথের শীর্ষদেশের নবগ্রহের মূর্তির, কিন্তু সুন্দরতর তাদের অঙ্গের সৌষ্ঠব, বৃহত্তর তাদের আকৃতি, সজীবতর প্রতিটি মূর্তি। উপবিষ্ট তাঁরা নিজের নিজের বাহনের উপর। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাস্করের এই অনবদ্য কীর্তি। প্রণতি জানাই দেবতাকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করি ভাস্করকে। প্রণতি জানান হাজার হাজার পুণ্যকামী এই কল্যাণদাতৃ নবগ্রহ মূর্তিকেই প্রতি বৎসর মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে, পবিত্র হয়ে আসেন তাঁরা চন্দ্রভাগায় স্নান করে।

ফিরবার পথে দেখি, একটি অতিকায় সিংহও, অলঙ্কৃত করে ছিল এই সিংহটি একশ সত্তর ফুট উঁচু বিমানের শীর্ষদেশ, ওজন তার বারোশ ষাট মণ। দেখি একটি পঁয়ত্রিশ ফুট দীর্ঘ ছত্রিশ ইঞ্চি ব্যাস লোহার কড়িও, নব্বই টন তার ওজন। অলঙ্কৃত করেছিল এই দীর্ঘতম ভারতের লৌহ কড়িটিও বিমানের অঙ্গ। পড়ে আছে অযত্নে ও অবহেলায় এই কড়িটি বালুকার মধ্যে দীর্ঘ সাত শত বৎসর, কিন্তু আজও অকলঙ্ক তার বুক। সবগুলিই উড়িষ্যার স্থপতির বিশাল কীর্তির নিদর্শন, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

বুকে নিয়ে ছিল কোণার্ক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উড়িষ্যার স্থপতির আর ভাস্করের তাদের চরম উৎকর্ষের পূর্ণ পরিণতির, কত মহাসৌন্দর্যের প্রস্রবণ, মূর্তি কত অতিকায় দেবদেবীর, কত সুষ্ঠু গঠন নরের, কত বঙ্কিমগ্রীব লাস্যময়ী, যৌবন মদমত্তা পীনোন্নত বক্ষা, আয়তলোচনা পরমারূপবতী নারীরও। অঙ্গে নিয়ে ছিল কত প্রবল পরাক্রান্ত সিংহের মূর্তি, মূর্তি কত হস্তীর শ্রেণীর আর অশ্বের, কত সুন্দরতম মকরের, কত জীবন্ত হস্তীর। অলঙ্কৃত ছিল কত বিভিন্ন অনবদ্য লতাপল্লবে, কত বিচিত্র সুন্দরতম পুষ্পে, কত প্রস্ফুটিত পদ্মফুল দিয়েও। ভূষিত ছিল কত সূক্ষ্মতম অপরূপ ঝালরের স্ক্রলের আর জালির কাজ দিয়েও। রচিত হয়েছিল তার অঙ্গে মূর্তি দিয়ে কত জীবন সংগীত, কত প্রেমের কাহিনী, দৃশ্য কত প্রেম নিবেদনের, কত প্রেমাস্পদের নিকট আত্ম সমর্পণের। কত মৈথুনের দৃশ্য, কত লুক্কায়িত কামনার অস্পষ্ট ইঙ্গিত, কত উন্মুক্ত লালসার সুস্পষ্ট প্রকাশও। রচিত হয়েছিল তার প্রস্তরের অঙ্গে সম্পূর্ণ কামশাস্ত্র, বর্ণিত হয়েছিল তান্ত্রিক ধর্মের মতবাদ, তান্ত্রিক ধর্মের এক মহাপাদপীঠে পরিণত হয়েছিল কোণার্কের মন্দির। আসত দলে দলে যাত্রী, তন্ত্রধর্ম মতবাদী, সারা উড়িষ্যা থেকে, আসত ভারতের সব প্রান্ত থেকেও, নিভৃতে নির্জনে যাপন করত রাত্রি, চরিতার্থ হত সেই দৃশ্য দেখে, পূর্ণ হত তাদের মৈথুনের কামনা, যা লুক্কায়িত ছিল অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, পরিতৃপ্ত হত তাদের নিরুদ্ধ বাসনা হত তারা কামজয়ী, মুক্ত হত লালসা থেকেও। প্রভাতে পবিত্র অন্তঃকরণে, পূত দেহে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দেব দিবাকরকে ভক্তিভরে পুজা দিয়ে গৃহে ফিরে যেত। আসতো কত শিক্ষার্থীও, মহাঅভিজ্ঞ হ'ত তন্ত্রবিদ্যায়। আজও মুখর তার চারিপাশের বালুকণা তাদের উলঙ্গ কামনার অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাসে।

আবার বুকে নিয়ে আছে তারা কত পরিতৃপ্তির ইতিহাসও, কাহিনী কত পূর্ণ মনস্কামের, কত অস্পষ্ট আর সুস্পষ্ট কামনার। আবার তাদেরই অন্তরালে ধীরে ধীরে লুক্কায়িত হতে চলেছে এই দৃশ্যগুলি, এই মতবাদ, হয়ত সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে যাবে একদিন, অদৃশ্য হয়ে যাবে মহাসমুদ্রের বালুকার অতল গর্ভে। তাই অলঙ্কৃত কোণার্কের মন্দিরের সর্বাঙ্গ—তার প্রতিটি প্রস্তরের অঙ্গ, পরিগ্রহ করে রূপ, লাভ করে বাণী, হয় রূপময়, বাঙময়ও হয়, হয় অপরূপ।

আজও দাঁড়িয়ে আছে কোণার্ক-বিচূর্ণিত, বিধ্বস্ত, বিচ্ছিন্ন কোণার্ক—প্রেতাত্মা এক মহাগৌরবময় সৃষ্টির, কিন্তু মহামহিমময়, বুকে নিয়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তাই আসে দলে দলে দর্শন অভিলাষী, আসে হাজারে, হাজারে, সারা বিশ্ব থেকে আসে, বরণ করে এক পরম সুন্দরকে, নিবেদন করে শ্রদ্ধার অঞ্জলি ডালি উজাড় করে দিয়ে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় স্মৃতি যা উজ্জ্বল হয়ে থাকে মনের মন্দিরে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মন্দিরের প্রতি, ক্রমে প্রসারিত হয় সেই দৃষ্টি, অতিক্রম করে দিগন্ত প্রসারী বালুকাময় প্রান্তর, মহাসমুদ্র অতিক্রম করে উপনীত হয় এক রহস্যলোকে, পৌঁছায় সূর্যলোকে। দেখি সপ্তাশ্বযুক্ত রথে উপবিষ্ট দেব দিবাকর তাঁর সম্মুখে বন্দিনী রাত্রি। নিযুক্তা রাত্রি বন্ধন থেকে মুক্ত হতে। তাঁর সারা অঙ্গে ফুটে ওঠে বন্ধন মুক্তির প্রচেষ্টার চিহ্ন। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পাই পাণ্ডার ডাকে—দেখি, পশ্চিম গগনে অস্তযান দেব দিবাকর, একে একে অদৃশ্য হয়ে যায় তাঁর সপ্তাশ্ব দিক্ চক্রবালের অন্তরালে, শেষে অন্তর্হিত হয়ে যায় একেবারে। ধীরে, সন্তর্পণে, নিঃশব্দ পদক্ষেপে, নেমে আসে রাত্রি, ছেয়ে ফেলে ধরিত্রীর বুক, এক গাঢ় অন্ধকারের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায় কোণার্কের মন্দির, অন্তর্হিত হয় বালুকাময় প্রান্তর, সমাচ্ছন্ন হয় দিগন্ত।

ধীরে ধীরে মোটরে উঠে বসি, কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—

"জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।"

ফিরে আসি পুরীতে। কিন্তু আজও অক্ষয় হয়ে আছে মনের মণিকোঠায় কোণার্কের স্মৃতি, হয় নাই ম্লান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গ

(শতাব্দী অষ্টম-অষ্টাদশ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষ্ণুপুর

১। শ্যামরায়ের মন্দির ২। রাসমঞ্চ

৩। জোড় বাংলা ৪। মদনমোহনের মন্দির

অনেকদিন আগে, আমার এক পরমাত্মীয় তখন বিষ্ণুপুরে কর্মে নিযুক্ত। তাঁরই আমন্ত্রণে এক ছুটিতে বিষ্ণুপুরে যাই ও তাঁর গৃহে অতিথি হয়ে বন বিষ্ণুপুরে সপ্তাহকাল যাপন করি। তার পরেও বাসনা জেগেছে মনে বিষ্ণুপুর দর্শনের, কিন্তু সফল হয় নাই সেই বাসনা। রাঢ় দেশে, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে এই বিষ্ণুপুর অবস্থিত।

তখনও আর্যেরা উপনীত হন নাই ভারতের উত্তরাপথে, বাস করতেন বঙ্গে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক অথবা "অষ্ট্রিক" আখ্যাত "নিষাদ জাতি" নামেও। আদিম অধিবাসী তাঁরা বঙ্গের অষ্ট্রিক তাঁদের ভাষা, পৃথক আচার ব্যবহারও। বিভক্ত তখন বাংলাদেশ চারিটি জনপদে: বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ় ও সুহ্ম। বহুদিন পরেও স্বাধীনতার দীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল বঙ্গ মস্তক অবনত করে নাই তারা আর্যজাতির কাছে।

মহাপরাক্রমশালী হন পৌণ্ড্রক বাসুদেব, অধিপতি তিনি পুণ্ড্র দেশের (উত্তর বঙ্গের) আর বঙ্গের, বন্ধু তিনি প্রবল পরাক্রান্ত মগধ নৃপতি জরাসন্ধের, কিরাতদের সখা। অস্ত্রধারণ করতে হয় তাঁদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে মথুরাধিপতি যুগাবতার, স্বয়ং কৃষ্ণ বাসুদেবকে। নইলে অজেয় তাঁরা, সাধ্য ছিল না ভীমার্জুনের তাঁদের যুদ্ধে পরাস্ত করা। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমও এক পৌণ্ড্রাধিপকে পরাজিত করেন। তারপর, একে একে বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট আর সুহ্মের রাজারা তাঁর কাছে পরাজয় বরণ করেন। পরাজয় স্বীকার করেন মহাপরাক্রমশালী কর্ণের কাছেও বঙ্গ, সুহ্ম আর পুণ্ড্রের অধিপতিরা।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে কৌরব পক্ষে যোগদান করেন এক বঙ্গাধীপ, যুদ্ধ করেন বীর বিক্রমে, শেষে পরাজিত হন।

ইক্ষ্বাকু বংশের অযোধ্যাধিপতি দিগ্বিজয়ী রঘুর কাছেও পুণ্ড্র আর বঙ্গের নৃপতিরা পরাজয় বরণ করেন, অধীনতা স্বীকার করেন কোশল নৃপতিরও। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এই সকল পরাজয়।

উল্লিখিত আছে প্রাচীন সিংহলী গ্রন্থ মহাবংশে বঙ্গ ও রাঢ় দেশের নৃপতি সিংহবাহুর নির্বাসিত পুত্র বিজয়সিংহের বিজয় অভিযান উপনীত হয় তাম্রপর্ণীতে, বর্তমান লঙ্কায়। পরাজিত হন তাঁর কাছে সমসাময়িক লঙ্কাধীশ। প্রতিষ্ঠিত হয় সিংহরাজ বংশ লঙ্কায়, বিজয়সিংহ স্থাপন করেন। সিংহল নামে পরিচিত হয় লঙ্কাও। খুব সম্ভব, ঘটে এই ঘটনা ৪৮৬ খ্রীষ্ট পূর্বে; ঐদিনই মহানির্বাণ লাভ করেন গৌতম বুদ্ধ।

গৌতম বুদ্ধ ও চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর মহাবীরের পরিনির্বাণ লাভ করবার কিছুদিন পরেই, খ্রীষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগে শিশুনাগ বংশের মহানন্দের শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত পুত্র মহাপদ্মনন্দ আর্যাবর্তের সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করে, এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তাঁর কাছে পরাজিত হন কাশী, মিথিলা, বীতিহোত্র, ইক্ষ্বাকু, কুরু, পাঞ্চাল, হৈহয়, আর কলিঙ্গ দেশের নৃপতি। হন তিনি আর্যাবর্তের প্রথম একরাট্ বা একচ্ছত্র সম্রাট। অধিপতি হন আর্যাবর্তের পূর্ব-প্রান্তে অবস্থিত দুই প্রাচীন পরাক্রান্ত রাজ্যের—প্রাসিই (মগধের) আর গঙ্গারিড্ই (গঙ্গারাষ্ট্রের)। স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্রে। এই সময় থেকে গুপ্ত রাজবংশের পতন পর্যন্ত পূজিত হন মগধ রাজই উত্তরাপথের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে, একমাত্র রাজধানীতে পরিণত হয় পাটলিপুত্রও। গড়ে ওঠে তাকে কেন্দ্র করে ভারতের সভ্যতা, তার সংস্কৃতি আর কৃষ্টি। অবগত হন ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এই দুইটি মহাপরাক্রমশালী রাজ্যের কথা মাসিডন রাজ দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারও, উপনীত হন যখন তিনি বিপাশা তীরে, পঞ্চনদ অধিকার করে, ৩২৭ খ্রীষ্ট পূর্বে। গঙ্গা নদীই ছিল গঙ্গারিড্ই রাজ্যের পূর্ব সীমানা। মহা সমৃদ্ধিশালীও এই গঙ্গারাষ্ট্র বিভিন্ন শিল্পে আর বৈদেশিক বাণিজ্যে।

তার আগেরও এক ইতিহাস আছে। ইতিহাস খ্রীষ্টের জন্মের তিন সহস্র

বৎসর পূর্বের এক উন্নততর নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার আর সংস্কৃতির। নিবদ্ধ এই ইতিহাস সিন্ধু উপত্যকায় প্রখ্যাত সিন্ধু সভ্যতা নামে, প্রাচীনতম ইতিহাস ভারতেরও। আবিষ্কৃত হ'য়েছে তার বালুর অন্তরাল থেকে একাধিক নগর—প্রধান তাদের মধ্যে মোহেন্-জো-দাড়ো আর হরাপ্পা—তাদের ধ্বংসাবশেষ—ধ্বংসস্তূপ কত গৃহের, কত ভাণ্ডারের, কত স্নানাগারের আর দোকানের। অঙ্গে নিয়ে আছে গৃহগুলি একটি করে অঙ্গন, সংযুক্ত দ্বার দিয়ে, সেই অঙ্গন পাশের রাজপথে গিয়ে মেশে। বেষ্টিত হয় অঙ্গন কক্ষের শ্রেণী দিয়েও, বিভিন্ন তাদের আকৃতি। রচিত হয় পয়ঃপ্রণালীও, রাজপথের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। নিরাভরণ এই সব গৃহ, লাভ করে নাই ভাস্করের হস্তের স্পর্শ। আবিষ্কৃত হয়েছে কত পোড়ামাটির খেলনাও। কয়েকটি জলাধার, সর্বাঙ্গে নিয়ে চিত্রাঙ্কণ। একটি প্রস্তরের তৈরী বৃষ, একটি নারীমূর্তি, টেরা কোটা নৃত্য পরায়না পুত্তলিকা। আবিষ্কৃত হয়েছে কয়েকটি মোহরও, অঙ্গে নিয়ে কেউ অনুচ্চ-শৃঙ্গী বৃষ, কেউ গণ্ডার, কেউ মকর, কেউ মহিষ, কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ব্যাঘ্র, কেউ মৎস্য দম্পতি, কেউ হস্তী। বাস্তব তারা, পরিচায়ক শিল্পীর জৈব বিদ্যার অভিজ্ঞতারও। আবিষ্কৃত হয়েছে একটি মস্তক বিহীন বাঁদর মূর্তি, একটি চুনের পাথরের তৈরী নরের প্রতিমূর্তিও, একটি নৃত্যপরায়ন নরেরও। সুষ্টু গঠন, নিখুঁত, পুরুষোচিত এই মূর্তিগুলিও, বুকে নিয়ে আছে প্রাচীন ভারতের উন্নততর সৃষ্টির নিদর্শন, প্রতীক হয়ে আছে তার ঐতিহ্যের।

অতিবাহিত হয় তারপর সহস্র বৎসর, ২০০০ খ্রীষ্ট পূর্বে আর্যেরা প্রবেশ করেন ভারতবর্ষে, বসতি স্থাপন করেন একে একে সপ্ত সিন্ধুতে, ব্রহ্মবর্তে, মধ্যদেশে, বিদেহতে, অঙ্গে, মগধে, বঙ্গে, অবন্তীতে, সৌরাষ্ট্রে, আর সৌবীরে, অতিক্রম করে আসেন গান্ধার ও হিন্দুকুশ পর্বত, পার হ'য়ে আসেন খাইবার ও মালাকন্দ গিরিবর্ত্ম ও গোমল উপত্যকা। ক্রমে তাঁরা সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত পৌছান, উপনীত হন নর্মদা তীরে, বিন্ধ্যর সানুদেশে। শেষে বিন্ধ্য অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্যে ও দক্ষিণ ভারতে উপস্থিত হন। উল্লিখিত আছে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে মহা সমৃদ্ধিশালী ছিল আর্য দেশ স্থাপত্যে আর ভাস্কর্যে—মহা পারদর্শী ছিলেন আর্য স্থপতি আর ভাস্কর।

বিভক্ত হয় আর্যাবর্ত ষোলটি জনপদে খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অঙ্গ, (পূর্ব

বিহার) মগধ, (দক্ষিণ বিহার), কাশী, কোশল, (অযোধ্যা), বৃজি (উত্তর বিহার) মল্ল, (গোরখপুর), চেদি, (বুন্দেলখণ্ড) বৎস, (এলাহাবাদ) কুরু (দিল্লী) পাঞ্চাল (বেরিলি) মৎস্য (জয়পুর শূরসেন (মথুরা) অস্মক (গোদাবরী অঞ্চল), অবন্তী (মালব), গান্ধার (পেশোয়ার অঞ্চল), আর কম্বোজ (উত্তর কাশ্মীর)। তারা ষোড়শ মহাজনপদ নামে খ্যাত।

এই ষোলটি জনপদ থেকেই গড়ে ওঠে চারিটি মহাশক্তিশালী রাজ্য আর্যাবর্তে—অবন্তী, বৎস, কোশল আর মগধ। এই মগধেই বিম্বিসার রাজত্ব করেন। সমসাময়িক তিনি অবন্তিরাজ চণ্ড প্রদ্যোৎ মহাসেনার, কোশল নৃপতি মহাকোশল ও তাঁর পুত্র প্রসেনজিতের আর বৎসরাজ উদয়নের। অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হর্যঙ্ক বংশের প্রবল পরাক্রান্তও, তিনি অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে ৫৪৫ খ্রীষ্টপূর্বে। পঞ্চ শৈলমালায় বেষ্টিত গিরিব্রজে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী, বেষ্টিত হয় একটি প্রস্তরের প্রাকার দিয়েও। তিনি বিবাহ করেন কোশল নৃপতির দুহিতাকে আর বৈশালী নৃপতির কন্যাকে। লাভ করেন যৌতুক হিসেবে কাশী গ্রাম। তাঁর বিজয় অভিযান অতিক্রম করে অঙ্গ (পূর্ব বিহার)। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা উত্তরে নেপাল পর্যন্ত। তিনিই নির্মাণ করেন গিরিব্রজ শৈলমালার সানুদেশে একটি নতুন শহর, পরিচিত রাজগৃহ নামে, বর্তমান রাজগীর। মহাঅভিজ্ঞ তিনি রাজনীতিতে, সুশাসক, সুপণ্ডিতও, অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা আর রাজধানী কত মনীষী, তাঁরা দেশ বিদেশ থেকে আসেন।

যুগাবতার গৌতম বুদ্ধ, তথাগতও আসেন। পুত্র তিনি কপিলাবস্তুর নৃপতি শাক্য শুদ্ধোদনের, মাতা তাঁর মায়াদেবী, ৫৬৭ খ্রীষ্ট পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিমগ্ন থাকেন কঠোর ধ্যানে গয়ার নিকট উরুবিল্ব গ্রামে এক পবিত্র বট বৃক্ষের নিচে। লাভ করেন পরম জ্ঞান, পরম জ্ঞানী, তথাগত হন। প্রচার করেন বৌদ্ধ ধর্ম গঙ্গার উপত্যকায় তাঁর রাজত্বকালে। শোনান নীতির বাণী, বাণী সাম্যের আর অহিংসার, বাণী নির্বাণ লাভের উপায়েরও। ৪৮৬ খ্রীষ্ট পূর্বে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন।

প্রচার করেন তাঁর রাজত্বকালেই জৈন ধর্ম চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর মহাবীরও, শোনান অহিংসার বাণী, বাণী সৎভাবে জীবন যাপনেরও। তিনি জন্মগ্রহণ

করেন ৫৪০ খ্রীষ্ট পূর্বে বৈশালীর নিকট কুন্দ গ্রামে এক ক্ষত্রিয় বংশে, তাঁর পিতার নাম সিদ্ধার্থ। মাতা তাঁর লিচ্ছবী বংশের ত্রিশলা। হন তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, ত্রিশ বৎসর বয়সে। নিযুক্ত থাকেন কঠোর তপস্যায়, লাভ করেন কৈবল্য, করেন সিদ্ধি, হন জিন। পরিচিত হন নিগ্রর্ন্থ নামে।

পরিণত বয়সে নিহত হন বিম্বিসার পুত্র অজাত শত্রু কর্তৃক। মহা পরাক্রমশালী বিম্বিসারের পুত্র অজাশত্রুও। তিনি অধিকার করেন অবন্তী, জয় করেন বৈশালী। পরিণত হয় মগধ আর্যাবর্তের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যে, মহা সমৃদ্ধিশালীও হয়। মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র উদয়ন বা উদয়ী অজাতশত্রুর মৃত্যুর পর, করেন একে একে আরও তিন রাজা এই বংশের। কীর্তিহীন তাঁরা সকলেই। খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতকের শেষ ভাগে, এই বংশের শেষ রাজাকে নিহত করে, মন্ত্রী শিশুনাগ অধিকার করেন মগধের সিংহাসন।

প্রতিষ্ঠিত হয় শৈশুনাগ বংশ মগধে। মহা পরাক্রমশালী এই শিশুনাগ ও, তিনি বৈশালীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পরাজিত হন তাঁর কাছে অবন্তীরাজ প্রদ্যোৎ। অবন্তী মগধের অধিকারে আসে।

তাঁর মৃত্যুর পর কালাশোক রাজত্ব করেন। আহূত হয় তাঁর রাজত্ব কালেই দ্বিতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন বৈশালীতে। নিহত হন এই বংশের শেষ রাজা মহাপদ্মের হস্তে, খ্রীষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতকের মধ্য ভাগে।

মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে ৩২০ খ্রীষ্ট পূর্বে। তাঁর কাছে পরাজয় বরণ করেন ধননন্দ, শেষ নৃপতি নন্দ বংশের। সহায়ক হন তাঁর এই বিজয় অভিযানে তক্ষশিলা নিবাসী এক কূট বুদ্ধি সম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পরিচিত কৌটিল্য বা চাণক্য নামে। প্রতিষ্ঠিত হয় মৌর্য বংশ মগধে। তাঁর মাতার নাম মুরা থেকেই এই বংশ মৌর্য বংশ নামে খ্যাতি লাভ করে। তিনি বিতাড়িত করেন পাঞ্জাব থেকে গ্রীকদের। পরাজিত হন তাঁর কাছে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের সেনাপতি সেলুকস। হিরাট, কান্দাহার আর কাবুল তাঁর অধিকারে আসে। তাঁর বিজয় অভিযান অতিক্রম করে একে একে উত্তর আর দক্ষিণ ভারত। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) থেকে আফগনিস্থান ও হিন্দুকুশ পর্যন্ত। পশ্চিম ভারতে সৌরাষ্ট্র

ও দক্ষিণ ভারতে মহীশূর পর্যন্ত। তিনি উত্তর ভারতের—উত্তরাপথের প্রথম সার্বভৌম সম্রাট হন। বাস করেন তাঁর রাজসভায় গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস। জৈন ধর্মে দীক্ষিত হয়ে পরিণত বয়সে শ্রাবণ-বেল-গোলাতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

তাঁর পুত্র বিন্দুসার অমিত-ঘাতক অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে তাঁর মৃত্যুর পরে। প্রেরিত হন তাঁর রাজসভায় ডিমাকোস নামে এক দূত, সিরিয়ার রাজা প্রেরণ করেন।

পিয়দর্শী (প্রিয়দর্শী) দেবানাম প্রিয় অশোক, শ্রেষ্ঠ নৃপতি এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূপতি, সর্বদেশের সর্বযুগেরও, অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে ২৭৩ খ্রীষ্ট পূর্বে। তিনি রাজত্ব করেন ২৩২ খ্রীষ্ট পূর্ব পর্যন্ত। প্রবল প্রতাপান্বিত তিনিও অনুসরণ করেন পিতামহের নীতি। কলিঙ্গ বিজয়ে অগ্রসর হন। বিজিত হয় কলিঙ্গ, নিহত হয় লক্ষাধিক লোক। এক সীমাহীন ধ্বংসের লীলা ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা উত্তরে কাবুল উপত্যকায় অবস্থিত যোনাস, কম্বোজ, গান্ধার ও তৎসংলগ্ন পার্বত্য প্রদেশ থেকে গোদাবরী ও কৃষ্ণার তীর পর্যন্ত। অন্ধ্র, মহীশূরের উত্তরে ইসিলা, সোপারা ও গির্ণার থেকে পশ্চিমে ধাউলি ও পূর্বে জাউগাড়া তাঁর অধিকারে আসে। উত্তর পূর্বে স্পর্শ করে তাঁর রাজ্যের সীমানা পশ্চিম এসিয়ার গ্রীক ও সিরিয়াধিপতি দ্বিতীয় অ্যাণ্টিকোসের রাজ্য, দক্ষিণে তামিলনাদে চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র ও কেরল পুত্রের। উপনীত হয় তাঁর বিজয় বাহিনী ভূস্বর্গ সুন্দরের রানী কাশ্মীর ও নেপালের নিভৃত, নির্জন উপত্যকায়, দেবতাত্মা হিমালয়ে, পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তর বঙ্গ) ও সমতাতের (পূর্ববঙ্গের) শস্যশ্যামল সমতল ভূমিতেও। আবিষ্কৃত হয়েছে শৈলমালার অঙ্গে তাঁর উৎকীর্ণ লিপি হাজারা জেলায় মানসারাতে, দেরাডুনে কালসিতে, নেপালের তরাই-এ নিসলি নগরে, উত্তর বিহারে চম্পারণ জেলায় রামপুরাতে। কিন্তু আবিষ্কৃত হয় নাই বাংলায় সম্রাট অশোকের কোন রাজাজ্ঞা, কোন নির্দেশ।

কলিঙ্গ বিজয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা মহারাজ অশোকের জীবনের, এক যুগসন্ধি, আনে সেই যুগ সন্ধি এক সুদূর প্রসারী পরিণতি তাঁর জীবনে, এক আমূল পরিবর্তন, প্রতিফলিত হয় সারা ভারতের ইতিহাসে—হয় প্রাচ্য জগতেও। তিনি অভিভূত হন যুদ্ধ ক্ষেত্রের দুঃখের দৃশ্য দেখে। এক গভীর অকৃত্রিম

অনুশোচনায় বিগলিত হয় তাঁর অন্তঃকরণ, এক সীমাহীন দুঃখে ছেয়ে ফেলে তাঁর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ। তিনি ধর্মাশোকে পরিণত হন, নিযুক্ত হন ধর্ম বিজয়ের অভিযানে। ঘটে এক মহা পরিবর্তন তাঁর রাজনীতিতে আর তাঁর পররাষ্ট্র নীতিতে সংঘটিত হয় তাঁর ধর্মনীতিতেও। শৈব অশোক দীক্ষিত হন বৌদ্ধ ধর্মে। পূজারী হন তিনি পরম জ্ঞানী তথাগত বুদ্ধের, হন সাম্যের, ধর্মের ও সংঘের। পরিণত হয় বৌদ্ধ ধর্ম সম্রাট অশোকের ধর্মে। সংঘে যোগদান করে তিনি শ্রমণের জীবন যাপন করেন। অধ্যয়ন করেন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, মহাজ্ঞানী হন বৌদ্ধ শাস্ত্রে। নিযুক্ত হন ধর্মযাত্রায়, কাটান একাদিক্রমে ২৫৬ রাত্রি, প্রচার করেন প্রজাসাধারণের কাছে, রাজ্যের প্রতিটি অধিবাসীর নিকট বুদ্ধের বাণী— বাণী সাম্যের, অহিংসার আর মৈত্রীর। শোনেন সেই বাণী রাজপুত্রেরা ও রাজকুমারীরা রাজ অন্তঃপুরের বধূরাও শ্রবণ করেন। উৎকীর্ণ হয় বুদ্ধের বাণী, হয় রাজার নির্দেশও শৈলমালার আর স্তম্ভের অঙ্গে। নির্মিত হয় কত নতুন প্রস্তর নির্মিত ধর্মস্তম্ভও বুকেনিয়ে রাজাজ্ঞা।

প্রেরিত হন ধর্মবিজয়ের প্রচারক রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, তার প্রতিটি গৃহে। প্রেরিত হন রাজ্যের বাইরে আর সুদূর বিদেশেও—দক্ষিণে তামিলনাদে, সিংহলে, গ্রীসে, মাসিডোনিয়াতে, সিরিয়াতে আর মিশরে, সুবর্ণভূমিতে; (ব্রহ্মদেশে)। প্রচারক যান জাভা ও সুমাত্রাতেও। পুরোধা হন সিংহলের প্রচারকদের রাজকুমার মহেন্দ্র ও রাজকুমারী সংঘমিত্রা। মহাসাফল্য মণ্ডিত হয় সম্রাট অশোকের ধর্মবিজয়ের অভিযান, তাঁর অশেষ, অক্লান্ত প্রচেষ্টা, তাঁর অতুলনীয় সীমাহীন উদ্যম লাভ করে পূর্ণ পরিণতি। বিশ্বের ধর্মে পরিণত হয় ভারত সম্রাট্ অশোকের ধর্ম, ধর্ম গঙ্গার উপত্যকার। এক মহামানবে পরিণত হন সম্রাট অশোক, এক যুগাবতারে।

তাঁর পুত্র কুনাল অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে তাঁর মৃত্যুর পর। মৃত্যু হয় কুনালের, তাঁর পুত্রেরা রাজত্ব করেন মগধে একে একে। দশরথই শেষ পরাক্রমশালী রাজা এই বংশের। প্রশমিত হতে থাকে মৌর্য ক্ষমতা, মৌর্য প্রতিপত্তি মগধে তাঁর মৃত্যুর পর, শেষে অস্তমিত হয়ে যায় একেবারে। সুঙ্গ পুষ্যমিত্র, সেনাপতি শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথের, অধিকার করেন মগধের সিংহাসন খ্রীঃ পূর্ব ১৮৭ অব্দে। স্থাপিত হয় সুঙ্গ বংশ।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা ভারতের মৌর্যেরা, সম্রাট অশোকও। নির্মিত হয় চুরাশি হাজার স্তূপ, বুকে নিয়ে বুদ্ধের স্মৃতি, শিরে নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ, তার শীর্ষদেশে ক্রম হ্রস্বায়মান ছত্র, নির্বাণের প্রতীক—প্রতীক বৌদ্ধধর্মেরও। নির্মিত হয় চৈত্য, বৌদ্ধ ধর্ম মন্দির ও এক প্রস্তর রেল বুদ্ধগয়ায়, রাজগৃহে, সাঁচীতে আর সোনারিতে, হয় একটি বিহার বা সংঘারামও—বাসস্থান বৌদ্ধ শ্রমণদের রাজগৃহে। মহারাজ অশোকই নির্মাণ করেন। তিনিই জীবন্ত শৈলমালার অঙ্গ কেটে নাগার্জুনি আর বরাবরের শৈলশিখরে নির্মাণ করেন আদি গুহামন্দির—কর্ণ কৌপর ও স্থদামা। অঙ্গে নিয়ে আছে সব গুলিই মহাপারদর্শী মৌর্য ভাস্করের সুন্দরতম দান, সূক্ষ্মতম ও প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণ, জীবন্ত মূর্তি সম্ভারও। প্রতীক হয়ে আছে তাঁদের মহিমময় সুন্দরতম কীর্তির। কিন্তু মসৃণ এক প্রস্তর স্তম্ভই, সম্রাট অশোকের শ্রেষ্ঠ দান ভারতীয় স্থাপত্যে, সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি, তাঁর শাশ্বত সৃষ্টি। ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুট উঁচু প্রতিটি স্তম্ভ। বুকে নিয়ে আছে তারা তথাগতের অহিংসার, শান্তির ও সাম্যের বাণী, অঙ্গে নিয়ে আছে রাজামুজ্ঞা, শীর্ষে নিয়ে আছে কেউ সিংহের মূর্তি, কেউ হস্তীর, কেউ অশ্বের, কেউ বৃষভের, রক্ষাকর্তা তারা চার প্রধান দিকের। সর্বশ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে সারনাথে আবিষ্কৃত এক প্রস্তর স্তম্ভটি, শিরে নিয়ে আছে চারিটি সিংহ, তাদের উপরে ধর্মচক্র—সুন্দরতম এই স্তম্ভটি মহামহিমময়।

পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র অধিকার করেন মালব। স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী পূর্ব মালবে বিদিশাতে। মহাকবি কালিদাসের রচিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের নায়ক এই অগ্নিমিত্র; মহাপরাক্রমশালী, পরাজিত করেন বিদর্ভ রাজাকে। পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর তিনি মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। হন এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী।

রাজত্ব করেন একে একে জ্যেষ্ঠ মিত্র, বসুমিত্র আর ভদ্রক। ভদ্রকের রাজসভায় তক্ষশীলার গ্রীক রাজা প্রেরণ করেন এক গ্রীক দূত পরিচিত হেলিয়োডোরাস নামে। দীক্ষিত হন তিনি বৈষ্ণব ধর্মে, নির্মাণ করেন একটি গরুড়ধ্বজ বিদিশাতে।

নির্মিত হয় কত স্তূপ, চৈত্য আর বিহার, সাঁচীতে বিদিশাতে, গোনর্দে, ভারহুতে, বুদ্ধ গয়াতে আর ভাজাতে অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, মহিমময়

মূর্তি সম্ভার আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ। শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে সাঁচীর তোরণ নিদর্শন এক মহাগৌরবময় যুগের অতুলনীয় অপরাজেয় সৃষ্টির, এক অবিনশ্বর কীর্তির; মনীষার বিস্ময়কর প্রকাশের। নির্মিত হয় গুহামন্দিরও বুকে নিয়ে সূক্ষ্মতম দান বহুশত বৎসরের সাধনার, মহাঅভিজ্ঞ সুঙ্গ স্থপতি আর ভাস্করের ভাজাতে, কার্লিতে আর নাসিকে। অভিনব বিদিশার হস্তী দন্তের অঙ্গের কারুকার্যও সুন্দরতম, সূক্ষ্মতমও। এই যুগেই জন্ম গ্রহণ করেন গোনর্দে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক পতঞ্জলি। পরিণত হয় বিদিশা, গোনর্দ আর ভারহুত ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি আর সাহিত্যের কেন্দ্রস্থলে, শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল হয় শিল্পেরও। রচিত হয় এক স্বর্ণ যুগ ভারতের ইতিহাসে, রচনা করেন সুঙ্গ রাজারা।

নিহত হন শেষ সুঙ্গরাজা দেবভূতি খ্রীঃ পূঃ ৭৩ অব্দে, তাঁর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বাসুদেবের হস্তে। অধিরোহণ করেন বাসুদেব মগধের সিংহাসনে। প্রতিষ্ঠিত হয় কাণ্ব বংশ। রাজত্ব করেন বাসুদেব পঁয়তাল্লিশ বৎসর। নিহত হন শেষ কাণ্ব রাজা সুশর্মণ অন্ধ্র সিমুকের হস্তে খ্রীঃ পূঃ ২৮ অব্দে। কিন্তু কোন প্রমাণ নাই সুঙ্গ আর কাণ্ব রাজাদের বঙ্গ অধিকারের। আবিষ্কৃত হয় নাই কোন প্রাচীন সুঙ্গ অথবা কাণ্ব খোদিত লিপি রাঢ়ে, গৌড়ে অথবা বঙ্গে। মিলেছে শুধু শিল্প শৈলীর নিদর্শন অঙ্গে নিয়ে সুঙ্গ সংস্কৃতি।

প্রাচীনতম জাতি ভারতের এই অন্ধ্ররা পরিচিত সাতবাহন নামেও, বাস করেন কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। তাঁরা রাজত্ব করেন দাক্ষিণাত্যে প্রবল প্রতাপে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত, দীর্ঘ চারিশত বৎসর। স্থাপিত হয় তাঁদের রাজধানী গোদাবরী তীরে প্রতিষ্ঠানে, দ্বিতীয় রাজধানী বৈজয়ন্তীতে তৃতীয় অমরাবতীতে। প্রতিষ্ঠিত হয় এক মহাশক্তিশালী সার্বভৌম সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত তার সীমানা কৃষ্ণা গোদাবরীর উপত্যকা থেকে নাসিক আর উজ্জয়িনী পর্যন্ত। ত্রিশ জন নৃপতি অধিরোহণ করেন সাতবাহন সিংহাসনে, শ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যে শ্রীসাতকর্ণী, গৌতমী পুত্র, বশিষ্ঠ পুত্র পুলুমায়ী আর যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী। বিস্তৃত হয় দাক্ষিণাত্যে, আর্যসভ্যতা, আর্য সংস্কৃতি। রচিত হয় এক বিস্ময়কর যোগসূত্র দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতায় আর উত্তর ভারতের আর্য-সভ্যতায়, রচনা করেন সাতবাহন রাজারা, অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য তাঁদের শাসনের। শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরাও, পৃষ্ঠপোষক বৌদ্ধস্থাপত্যের। নির্মাণ

করেন অনবদ্য স্তম্ভ, মহিমময় স্তূপ, চৈত্য, বিহার আর রেল অমরাবতীতে, যজ্ঞপেটাতে, নাসিকে, বিদিশাতে, কার্লিতে ও কানেরীতে। তাঁরাই নির্মাণ করেন সাঁচীর একটি অপরূপ তোরণও। বুকে নিয়ে আছে তারা মহাপারদর্শী অন্ধ্র স্থপতির আর মহাঅভিজ্ঞ অন্ধ্র ভাস্করের অতুলনীয় সাধনার দান, সাধনার বহুশত বৎসরের, তাঁদের মনীষার মহাবিস্ময়কর প্রকাশ, তাঁদের অপরাজেয় কীর্তির নিদর্শন, প্রতীক শাশ্বত অবিনশ্বর সৃষ্টির। মূর্ত হ'য়ে আছে তাঁদের হৃদয়ের অপরিসীম ঐশ্বর্যে আর মনের অন্তহীন মাধুর্যে, বাঙ্ময় হ'য়ে আছে।

পতন হয় সাতবাহনদের কুষাণরা প্রবল হন আর্যাবর্তে উত্তরা পথে, দ্বিতীয় শতাব্দীতে। শাখা তাঁরা ইউচি নামে এক যাযাবর জাতির, কদফিস তাঁদের নেতা। তাঁরা ব্যাক্‌ট্রিয়া অধিকার করে, হিন্দুকুশ অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। কাবুল, তক্ষশিলা ও গান্ধারের কিছু অংশ তাঁদের অধিকারে আসে। কণিষ্ক, এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি, অলঙ্কৃত করেন কুষাণ সিংহাসন ১২৫ খ্রীষ্টাব্দে। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা গান্ধার থেকে বিহার পর্যন্ত। তাঁর কাছে পরাজয় বরণ করেন উজ্জয়িনীর শক ক্ষত্রপরা, করেন বারাণসীর, পাটলিপুত্রের ও অযোধ্যার রাজারাও। তিনি অধিকার করেন কাশ্মীর. খোটান আর ইয়ারখন্দ। পৃষ্ঠপোষক তিনি ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের, অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষ, রচয়িতা তিনি "বুদ্ধ চরিত", সূত্রালঙ্কার, আর বসুমিত মহাবিভাসার। শোভিত করেন দার্শনিক নাগার্জুন আর আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রণেতা চরকও। নির্মিত হয় এক সুবিশাল মহামহিমময় চৈত্য তাঁর রাজধানী পুরুষপুরে, বর্তমান পেশোয়ারে। নির্মিত হয় বহু স্তূপ, চৈত্য আর সংঘারাম বুকে নিয়ে গান্ধার স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের সুন্দরতম নিদর্শন মথুরাতে। কণিষ্কের মৃত্যুর পর প্রশমিত হ'তে থাকে কুষাণ ক্ষমতা, কুষাণ প্রতিপত্তি, শেষে অস্তমিত হ'য়ে যায় একেবারে।

আবিষ্কৃত হ'য়েছে কয়েকটি কুষাণ বংশের রাজাদের প্রচলিত মুদ্রা বঙ্গে ও মগধের বিভিন্ন স্থানে, মেদিনীপুর জেলায় তমলুকে, বগুড়াতে আর মুর্শিদাবাদে। কিন্তু কোন অকাট্য প্রমাণ নাই বঙ্গের কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিকারে আসার। প্রমাণ নাই মগধেরও, কুষাণ শ্রেষ্ঠ কণিষ্কের রাজত্ব কালে। খুব সম্ভব হুবিষ্ক

ও বাসুদেবের রাজত্ব কালে মগধ কুষাণ সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। তাঁরাই নির্মাণ করেন বুদ্ধ-গয়ার মন্দির। বিভক্ত হয় বহু খণ্ডরাজ্যে কুষাণ সাম্রাজ্য খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে। জানা যায় না কে বা কোন রাজা অধিকার বিস্তার করেন বঙ্গে আর মগধে।

এই সময়েই রাজপুতানার মরুদেশের পুষ্করণার অধিপতি চন্দ্রবর্মা সপ্তসিন্ধুর মুখ ও বহ্লীক দেশ থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত জয় করেন। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পর্বত গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়, বিষ্ণুর উপাসক তিনি, তাঁর পিতার নাম সিংহ বর্মা। কুতুবমিনারের প্রাঙ্গণে অবস্থিত লৌহ স্তম্ভের অঙ্গের খোদিত লিপিতেও বর্ণিত হয় অনুরূপ কাহিনী এক চন্দ্ররাজার। তিনি স্থাপন করেন বিষ্ণুর ধ্বজা বিষ্ণুপাদগিরিতে। অতিক্রম করে তাঁর বিজয় অভিযান বঙ্গে, সিন্ধুর সপ্তমুখের পারে আর বহ্লীক দেশে। তিনিই খুব সম্ভব শুশুনিয়া পর্বত গাত্রের শিলালেখের চন্দ্রবর্মা। পরাজিত ও নিহত হন এই চন্দ্র বর্মাই গুপ্ত সম্রাট দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের হস্তে—উৎকীর্ণ আছে এলাহাবাদের দুর্গে, অশোকের শিলাস্তম্ভের অঙ্গে, তাঁর বিজয়ের কাহিনীতে, তাঁর প্রশস্তিতে। তাঁর সভাকবি হরিসেন এই প্রশস্তি রচনা করেন।

পতন হয় কুষাণদের, শ্রীগুপ্ত অধিকার করেন মগধের সিংহাসন। তাঁর পুত্র ঘটোৎকচ গুপ্ত রাজা হন। তাঁর পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, এক মহাপরাক্রমশালী রাজা, অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে হন মহারাজাধিরাজ। তিনি লিচ্ছবী রাজার কন্যা কুমার দেবীকে বিবাহ করেন। পাটলিপুত্র মগধের অধিকারে আসে। স্থাপিত হয় রাজধানী পাটলিপুত্রে। বাড়ে রাজ্যের সীমানা, বিস্তৃত হয় অযোধ্যায়, প্রয়াগে, বরেন্দ্রভূমি গৌড়ে, বিহারে আর উত্তর প্রদেশেও, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের শৌর্যে আর লিচ্ছবিদের সাহায্যে।

৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমাঙ্ক অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে। শ্রেষ্ঠ নৃপতি গুপ্তবংশের, তিনি অনুসরণ করেন মহাপদ্মনন্দ আর মৌর্য অশোকের পদাঙ্ক। তার কাছে পরাজয় বরণ করেন একে একে, রুদ্রদেব, মাতিল, নাগ দত্ত, চন্দ্রবর্মা, গজপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুৎ নন্দী ও বলবর্মণ। রাঢ় গুপ্ত রাজাদের অধিকারে আসে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই সমুদ্র গুপ্ত, একাধারে বিদ্যোৎসাহী, সুকবি, সুদক্ষ রাষ্ট্রনায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ, প্রতিফলিত হয়

তাঁর প্রচলিত চার রকমের মুদ্রায়। আবার স্থাপিত হয় এক সার্বভৌম সাম্রাজ্য আর্যাবর্তে।

তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, অলঙ্কৃত করেন মগধের সিংহাসন ৩৮০ থেকে ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি শক ক্ষত্রপদের পরাজিত করেন, অধিকার করেন উজ্জয়িনী, স্থাপিত হয় সেখানে দ্বিতীয় রাজধানী। সমতট বর্তমান কুমিল্লা তাঁর অধিকারে আসে। বিস্তৃত হয় রাজ্যের সীমানা আরব সাগরের উপকূল পর্যন্ত। পশ্চিম ভারত তাঁর অধিকারে আসে ও পশ্চিম উপকূলের পোতাশ্রয়গুলি। স্থাপিত হয় বাণিজ্য সম্পর্ক ভারতে আর ইউরোপে। উপনীত হয় তাঁদের বাণিজ্যপোত, রোমে, পারস্যদেশে, চীনেও যায়। মহাসমৃদ্ধিশালী হন গুপ্ত নৃপতিরা বৈদেশিক বাণিজ্যে। বিকশিত হয় ভারতের মনীষা নিত্য নতুন ক্ষেত্রে। উপনীত হয় ভারতের সভ্যতা, তার সংস্কৃতি ও কৃষ্টি উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। তিনিই কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য, অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা নব রত্ন, শ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যে মহাকবি কালিদাস। ভারত পরিদর্শনে আসেন চীন দেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, তাঁর রাজত্ব কালেই। তিনি বাস করেন রাজধানী পাটলীপুত্রে ৪০১ থেকে ৪১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মুখর তিনি তাঁর প্রশংসায়। লেখেন ধনে জনে পরিপূর্ণ ছিল ভারতবর্ষ, সুখের ছিল প্রজাদের জীবন। বলেন, শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল তাম্রলিপ্ত বর্তমান তমলুক। এখান থেকে বাণিজ্যপোত, পণ্য সম্ভারে ভরতি করে নিয়ে, বাণিজ্য করতে যেতো ভারতের বণিক সিংহলে, মালয়ে, যবদ্বীপে, ব্রহ্মদেশে, কম্বোজে চম্পাতে ও আরও অনেক সুদূর বিদেশে, সঙ্গে নিয়ে তাদের উন্নততর সভ্যতা আর সংস্কৃতি।

৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের, তাঁর পুত্র কুমার গুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে। অনুষ্ঠিত হয় অশ্বমেধ যজ্ঞ, তাঁর সার্বভৌমত্যের পরিচায়ক।

মহেন্দ্রাদিত্যের মৃত্যু হয় ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য আরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে। প্রবল পরাক্রান্ত তিনিও, প্রতিহত করেন হূনদের আক্রমণ, তারা মধ্য এসিয়া থেকে আসে। অপ্রতিহত থাকে গুপ্ত ক্ষমতা আর্যাবর্তে, অক্ষত থাকে তাঁদের রাজ্যের সীমানাও।

রাজত্ব করেন একে একে পুরুগুপ্ত, নরসিংহ গুপ্ত, দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত। কীর্তিহীন তাঁরা। অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের পুত্র বুধ গুপ্ত ৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, রাজত্ব করেন ৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিস্তৃত থাকে রাজ্যের সীমানা বঙ্গদেশ থেকে পূর্ব মালব পর্যন্ত।

রাজত্ব করেন পরবর্তী গুপ্ত রাজারা আরও একশত বৎসর। তাঁরাও কীর্তিহীন। স্বাধীনতা ঘোষণা করেন সৌরাষ্ট্রে বলভী মৈত্রক ভট্টারক। মান্দাসারে-মালবে স্বাধীন হন যশোধর্মন, কনৌজে মৌখরি ঈশান বর্মন, লৌহিত্য তীরে কামরূপে প্রাগজ্যোতিষে ভাস্কর বর্মন, গৌড় বঙ্গে শশাঙ্ক, বঙ্গে ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব সমতটে খড়্গ ও রাতেরা। থানেশ্বরে স্বাধীন হন পুষ্যভূতি বংশের প্রভাকর বর্ধন। পূর্ব মালবে তোরামান স্থাপন করেন এক স্বাধীন রাজ্য।

রাজত্ব করেন গুপ্ত রাজারা আর্যাবর্তে প্রবল প্রতাপে ৩২০ থেকে ৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, পরবর্তী গুপ্তরা ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় ভারত, উপনীত হয় ভারতের হিন্দু সভ্যতা হিন্দু সংস্কৃতি আর হিন্দু কৃষ্টি উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, হয় ভারতের সাহিত্য আর সঙ্গীতও। চরম উৎকর্ষ লাভ করে ভারতের বৌদ্ধ ও হিন্দু স্থাপত্য, ভাস্কর্য, আর চিত্র শিল্প, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, পায় সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম রূপ, হয় মহামহিমময়ও। লাভ করে ভারত শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের, ভাস্কর্যের ও শিল্পের দরবারে বিশ্বজিৎ হয়। রচিত হয় ভারতের দ্বিতীয় স্বর্ণযুগ।

রচিত হয় এলাহাবাদ প্রশস্তি, সমুদ্র গুপ্তের সভাকবি হরিসেন রচনা করেন, অপরূপ ভাষা মাধুর্যে। কবি বীর সেন অলঙ্কৃত করেন প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ সভা। অলঙ্কৃত করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভা মহাকবি কালিদাস, উজ্জ্বলতম রত্ন তিনি তাঁর সভার নবরত্নের, সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতের, সর্বশ্রেষ্ঠ কবি সর্বদেশের, সর্ব যুগেরও। তিনিই রচনা করেন মহাকাব্য রঘুবংশ, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, মহানাটক বিক্রমোর্বশী; অভিজ্ঞান শকুন্তলম, মালবিকাগ্নিমিত্রম, অমূল্য সম্পদ ভারতের, শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিশ্বসাহিত্যের। এই যুগেই শূদ্রক রচনা করেন মৃচ্ছকটিকা নাটক, বিশাখা দত্ত মুদ্রারাক্ষস।

এই যুগেই জন্ম গ্রহণ করেন মনীষী অনঙ্গ ও বসুবন্ধু মহাঅভিজ্ঞ বৌদ্ধ

দর্শনে। লিখিত হয় জ্যোতিষ দর্শন সম্বন্ধেও বহু মূল্যবান গ্রন্থ, জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, বরাহমিহির আর ব্রহ্মগুপ্ত রচনা করেন। খ্যাতি লাভ করেন বরাহের পত্নী ক্ষণাও জ্যোতিষ শাস্ত্রে। এই যুগেই অমর সিংহ রচনা করেন "অমরকোষ" খুব সম্ভব প্রাচীনতম অভিধান ভারতের। প্রণীত হয় আরও অনেক পুস্তক আরও অনেক গ্রন্থ, আলোচিত হয় সেই সব গ্রন্থে জীব বিদ্যা, গণিত আর রসায়ন। অনুদিত হয় এই সব পুস্তক ভারতের বাইরে বিভিন্ন ভাষায়। সারা এসিয়া মহাদেশের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় ভারত-কেন্দ্রস্থল সাহিত্যের আর সংস্কৃতির।

মহাপরাক্রমশালী গুপ্ত নৃপতিরা তাঁদের অধিকারে আসে পশ্চিম উপকূলের ভৃগুকচ্ছ আর সূর্পারক, আসে আরও অনেক বন্দর ভারতের। বয়ে নিয়ে যায় সেই সব বন্দর থেকে ভারতের বাণিজ্যপোত পণ্যের সম্ভার সুদূর বিদেশে—সিংহলে, ব্রহ্মদেশে, যবদ্বীপে, সুমাত্রায়, বর্ণিওতে, মালয়াতে, বালিতে আর কম্বোজে। পারস্য দেশে, গ্রীসে, রোমে আর চীন দেশেও যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় ভারতের সভ্যতা আর সংস্কৃতি। সেই সব দেশ থেকেও বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে বণিক আসে, সঙ্গে আনে তাদের সভ্যতা, তাদের সংস্কৃতি। বিনিময় হয় পণ্যে পণ্যে; পণ্যে স্বর্ণে ; হয় সভ্যতা আর সংস্কৃতিতেও। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় সুদূর প্রাচ্য আর পশ্চিমও ভারতীয় সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে আর কৃষ্টিতে। এক মহামিলন হয় প্রাচ্যে আর পাশ্চাত্যে।

নির্মিত হয় গুহামন্দিরও, এই গুপ্ত যুগেই, অজন্তায়, বাঘে, নাসিকে আর কানেরিতে। অঙ্গে নিয়ে আছে এই সব গুহামন্দির, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ। অলঙ্কৃত হয়ে আছে অজন্তার গুহামন্দির বুদ্ধের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীর চিত্র দিয়ে, চিত্র জাতকেরও, তাঁর পূর্ব জীবনের। চিত্র আছে সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ধারারও। অপরূপ এই চিত্র গুলিও, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের চিত্র শিল্পের দরবারে। তাঁরাই নির্মাণ করেন ঝাঁসিতে একটি শৈবমন্দির বুকে নিয়ে সুন্দরতম শিল্প সম্পদ আর জীবন্ত মহিমময় মূর্তিসম্ভার, প্রতীক এক মহাগৌরবময় যুগের সৃষ্টির। শ্রাবণ-বেলগোলাতে পবিত্র উদয়গিরির শীর্ষদেশেও নির্মিত হয় একটি জৈন মন্দির, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নির্মাণ করেন। অঙ্গে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও

সুন্দরতম অলঙ্করণ, সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে ভাস্করের মহাপারদর্শী হস্তের স্পর্শে আর মনের মাধুরীতে।

উপনীত হয় এই যুগেই মূর্তি শিল্পও উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি। পরিবর্তিত হয় গঠনের আদর্শও, কামজ থেকে কামাতীতে পরিণত হয়, অতীন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয়াতীতে রূপায়িত হয়। গঠিত হয় কত ধাতুর. তৈরী বুদ্ধ মূর্তি, কাশীর কাছে সারনাথে, কত হিন্দু দেবতা ও দেবীর মূর্তি মথুরাতে। মহিমময় এই মূর্তিগুলিও অনবদ্য গঠনে, অনুপম প্রকাশে বাঙ্ময় ভাস্করের হৃদয়ের ঐশ্বর্যে আর মনের মাধুর্যে। চরম উৎকর্ষ লাভ করে এই গুপ্ত যুগেই লৌহ নির্মিত শিল্পও। বুকে নিয়ে আছে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দিল্লীর চন্দ্ররাজার লৌহ স্তম্ভটি। কুমার গুপ্ত নির্মাণ করেন এই স্তম্ভটি, দাঁড়িয়েছিল মথুরায়। এখন স্থানান্তরিত হয়েছে কুতুব মিনারের প্রাঙ্গণে, দাঁড়িয়ে আছে আকাশের নিচে উন্নত করে শির শীর্ষে নিয়ে সহস্র বৎসরের জল, ঝড় ও ঝঞ্ঝা। কিন্তু আজও অক্ষত তার অঙ্গ, অমলিন। স্পর্শ করে নাই কলঙ্ক তার অকলঙ্ক দেহে ম্লান হয় নাই তার অঙ্গের মসৃণতা—এক মহাবিস্ময়কর প্রকাশ ভারতের মনীষার এক শাশ্বত সৃষ্টি এক অমর কীর্তি।

গড়ে ওঠে কত অসংখ্য মহিমময় মন্দির ভারতের বাইরে বৃহত্তর ভারতবর্ষে -আঙ্কোরভাটে, মালায়াতে, সুমাত্রাতে, যবদ্বীপে, আনামে, কম্বোডিয়াতে, শ্যামে আর সেলিবিসে বুকে নিয়ে গুপ্ত যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন, তার মহাঅভিজ্ঞ ভাস্করের আর চিত্র শিল্পীর মহাগৌরবময় দান। তারাও লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন জগৎ সভায়। হয় বিশ্বজিৎ।

মহাপরাক্রমশালী এই শশাঙ্ক, কীর্তিমান নৃপতি; সুরু করেন জীবন মহা সেন, গুপ্ত অথবা মালবাধিপতি দেবগুপ্তের মহাসামন্ত রূপে। স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ৬০৬ অব্দের পূর্বেই, স্থাপন করেন গৌড়ে এক স্বাধীন সার্বভৌম, পরাক্রান্ত রাষ্ট্র, উত্তরে তার পুণ্ড্র বর্ধন, পশ্চিমে বারাণসী দক্ষিণে কোঙ্গোদ বর্তমান গঞ্জাম। কর্ণসুবর্ণে, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটির নিকটে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী। পরাজয় বরণ করেন ও নিহত হন তাঁর হস্তে থানেশ্বর রাজ রাজ্যবর্ধনও। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ ও থানেশ্বরের সিংহাসনে অধিরোহণ

করেন। যুদ্ধে নিযুক্ত থাকেন শশাঙ্ক দীর্ঘকাল হর্ষবর্ধনের সঙ্গে। হর্ষবর্ধনকে সাহায্য করেন কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্মন। কিন্তু মৃত্যুকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে শশাঙ্কের স্বাধীনতা, অক্ষত থাকে তাঁর রাজ্যের সীমানাও, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায়। তাঁর নেতৃত্বাধীনে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রিক গগণে বাংলাদেশ অধিকার করে এক বিশিষ্ট স্থান। গড়ে ওঠে প্রথম গৌড়তন্ত্র বঙ্গে।

মহাপরাক্রমশালী এই হর্ষবর্ধন। তিনি স্থানান্তরিত করেন তাঁর নিজের রাজধানী কনৌজে। পরিণত হয় কনৌজ সভ্যতার ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে, মধ্যমণি হয় উত্তরাপথের হয় ভারতের। তারপর তিনি রাজ্য জয়ে নিযুক্ত হন। তাঁর বিজয় বাহিনী অতিক্রম করে একে একে পাঞ্জাব, মগধ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ। তিনি সকলোত্তরপথ নাথ হন। স্বাধীন থাকে কাশ্মীর, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, রাজস্থান আর কামরূপ, থাকে দক্ষিণ ভারত আর দাক্ষিণাত্যও। স্থাপিত হয় তাঁর রাজত্বের দিকে দিকে কত দাতব্য চিকিৎসালয়, কত বিশ্রামাগার কত সরাইখানা কত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও। নিজে সুসাহিত্যিক, তিনি রচনা করেন "নাগানন্দ" 'প্রিয়দর্শিকা" আর "রত্নাবলী" নাটক—বিশিষ্ট দান তারা সংস্কৃত সাহিত্যে। পৃষ্ঠপোষক শিক্ষা ও সাহিত্যের অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা কাদম্বরী ও হর্ষচরিত রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট, করেন চীন পরিব্রাজক হিউ-য়েন স্যাংও। তিনি ব্যয় করেন রাজস্বের এক চতুর্থাংশ শিক্ষার উন্নতিতে। প্রচুর তাঁর দান নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েও। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিণত হয় নালন্দা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে. শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান হয় শিক্ষার সংস্কৃতির আর কৃষ্টির। সুপণ্ডিত; সুসাহিত্যিক, রণনিপুণ, সদাশয়, দানশীল, প্রজাহিতৈষী এই হর্ষবর্ধন, অতুলনীয় ভারতের ইতিহাসে। শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাও, তিনিই নির্মাণ করেন শিরপুরের ইষ্টকের তৈরী মহামহিমময় লক্ষ্মণের মন্দিরটি। শ্রেষ্ঠ মন্দির ভারতের সুন্দরতম।

৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়, বিনষ্ট হয় গৌড়তন্ত্রের সংস্কৃতি, লাঘব হয় প্রতিপত্তি বৈদেশিক শত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে আর অন্তর্দ্বন্দ্বে। সিংহাসনে আরোহণ করেন না কোন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি, ক্ষণস্থায়ী তাঁদের রাজত্বও। কিছুদিনের জন্য কর্ণসুবর্ণ ভাস্কর বর্মনের অধিকারে আসে। শেষে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে, অরাজকতায় আর বিশৃঙ্খলায় ছেয়ে ফেলে বাংলার

আকাশ বাতাস, বিরাজ করে মাৎস্যন্যায় বাংলার দিকে দিকে বিস্তৃত হয় সারা উত্তরাপথের প্রাচ্য খণ্ডেও। সমবেত হন বাংলার রাষ্ট্রনায়কগণ। অধিরাজ রূপে নির্বাচিত হন গোপাল দেব তাদের মধ্য থেকে। স্থাপয়িতা এই গোপাল দেবই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ পাল রাজ বংশের গৌড়ে, বঙ্গে ও মগধে। তিনি দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র বপ্যটের পুত্র, লেখা আছে খালিমপুর লিপিতে। কেউ বলেন সূর্যবংশীয় তিনি, মান্ধাতা তাঁর পূর্ব পুরুষ। কেউ বলেন তিনি ক্ষত্রিয় বংশজাত কেউ কায়স্থ। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি ফিরিয়ে আনেন রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রভুত্ব বিস্তার করেন প্রায় সারা বঙ্গে, গৌড়ে আর মগধে।

মহাপরাক্রমশালী তাঁর পুত্র ধর্মপালদেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের অধিরোহণ করেন বঙ্গের সিংহাসনে ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন ৮১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুরু হয় গুর্জর-প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট আর পালবংশের দ্বন্দ্ব প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা উত্তর ভারতের আধিপত্য নিয়ে। প্রথমে গুর্জর—প্রতিহার বংশের বৎসরাজ আর পালরাজ ধর্মপাল পরস্পরের শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। ধর্মপাল পরাজিত হন। অবতীর্ণ হন আর্যাবর্তের রঙ্গমঞ্চে এমন সময় রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব। অতর্কিত এই আক্রমণ দুর্দমও। তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় ধর্মপাল ও বৎসরাজকে। পরাজিত বৎসরাজ রাজপুতানার মরুভূমিতে পলায়ন করেন, লাভ করেন নিরাপদ আশ্রয়। ধ্রুব ফিরে যান দাক্ষিণাত্যে নিজের দেশে। আবার অবতীর্ণ হন ধর্মপাল রঙ্গমঞ্চে। তাঁর বিজয়বাহিনী অতিক্রম করে আর্যাবর্ত। তিনি একে একে অধিকার করেন ভোজ; মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী আর গান্ধার রাজ্য। বিস্তৃত হয় তাঁর সার্বভৌম আধিপত্য সারা আর্যাবর্তে। তার পর তিনি কনৌজে উপনীত হন। তাঁর কাছে পরাজয় বরণ করেন কনৌজ রাজ ইন্দ্রায়ুধ। তিনি "উত্তরাপথস্বামী" নামে উল্লিখিত হন উদয়সুন্দরী কাব্যে। গুর্জর—প্রতিহার রাজ বৎস রাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর হন। তাঁর কাছে পরাজিত আর বিতাড়িত হন ধর্মপালের আশ্রিত চক্রায়ুধ। স্থাপিত হয় কনৌজে প্রতিহার আধিপত্য। এবারে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। তাঁর কাছে পরাজিত হন নাগভট্ট নতি স্বীকার করেন ধর্মপাল আর চক্রায়ুধ। গোবিন্দ ফিরে যান নিজের রাজত্বে। আবার অগ্রসর

হন ধর্মপাল দেব উত্তর ভারতের রঙ্গমঞ্চে। প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতিদের পরাজিত করে পুনঃস্থাপন করেন বাংলার সার্বভৌম আধিপত্য সারা আর্যাবর্তে। অক্ষত থাকে সেই আধিপত্য তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

নিবদ্ধ থাকে না তাঁর প্রতিভা শুধু রাজ্য জয়েই। পরম উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক তিনি বিদ্যার আর বিদ্যাচর্চার, নির্মিত হয় তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় অষ্টম শতাব্দীতে বাংলার প্রসিদ্ধতম বৌদ্ধ বিহার—সোমপুরী মহাবিহার। তাঁর অন্যতম কীর্তি বুকে নিয়ে আছে বিহারের অন্তর্গত বিক্রমশীলা মহাবিহার।

ধর্মপালের মৃত্যু হয়, তাঁর পুত্র দেবপাল দেব, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, অধিরোহণ করেন সিংহাসনে ৮১০ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রবল পরাক্রান্ত তিনিও, পিতৃ আদর্শে অনুপ্রাণিত, অভিলষিত সকল—উত্তরাপথ-স্বামীত্বের কীর্তি অর্জনেরও, সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই রাজ্য জয়ে অগ্রসর হন।

সহায়ক হন তাঁর মন্ত্রী দর্ভপাণি ও তাঁর পৌত্র কেদার মিশ্র। তাঁর বিজয় বাহিনী অতিক্রম করে হিমালয় থেকে বিন্ধ্যপর্বত, পূর্ব থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত। উত্তর ভারত তাঁকে প্রণতি জানায়, সন্তুষ্ট করে কর দিয়ে। তিনি সমুদ্রমেখলা রাজ্য ভোগ করেন। খুল্লতাত ভ্রাতা জয়পালের সাহায্যে তিনি পরাজিত ও রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন উৎকলাধীপকে। বিনাযুদ্ধে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা। তিনি খর্ব করেন হূন—উৎকল—দ্রাবিড় ও গুর্জর নাথদের দর্প। উপনীত হয় তাঁর বিজয় বাহিনী উত্তর পশ্চিমে কম্বোজ আর দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত। ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সামরিক খ্যাতি ভারতের দিকে দিকে উপনীত হয় ভারতমহাসাগরের দ্বীপেও। উপনীত হয় তাঁর বিজয় অভিযান সেতুবন্ধ রামেশ্বরেও, উল্লিখিত আছে মুঙ্গের লিপিতে। সর্বাধিক বিস্তৃত হয় পাল সাম্রাজ্যের সীমানা। প্রবল পরাক্রান্ত দেবপাল, মহাশক্তিশালী তাঁর সৈন্যবাহিনী—তুলনা হয় না তাদের সঙ্গে প্রতিহার আর রাষ্ট্রকূটের সৈন্য বাহিনীর, নিকৃষ্টতর তারা। তাঁর রাজত্ব কালেই নির্মিত হয় নালন্দায় একটি বিহার, সুমাত্রার অধিপতি, শৈলেন্দ্র বংশের বামদেব নির্মাণ করান। রাজ-অনুরোধে, বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেব পাল পাঁচটি গ্রাম দান করেন।

মৃত্যু হয় দেবপালের, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিগ্রহ পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নয় তাঁর রাজত্ব। পুত্র নারায়ণ পালকে সিংহাসন অর্পণ করে ৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। নারায়ণ পাল ৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু কীর্তিহীন তিনি। জয় করেন তাঁর সাম্রাজ্যের কিছু অংশ রাষ্ট্রকূট রাজ অমোঘবর্ষ আর প্রতিহার নৃপতি মিহির ভোজ। রাজত্ব করেন একে একে নারায়ণ পালের পুত্র রাজ্য পাল ৯০৮ থেকে ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আর পৌত্র দ্বিতীয় গোপাল ৯৪০ থেকে ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিস্তৃত থাকে পাল সাম্রাজ্য মগধ পর্যন্ত। কিন্তু প্রশমিত হয় তার প্রতিপত্তি। শেষে দ্বিতীয় গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্ব কালে লুপ্ত হয় মগধে পাল শাসন। প্রবল পরাক্রান্ত হন জেজাকভূক্তির চন্দেল্ল রাজারা আর কলচুরিরা (চেদিরা), আধিপত্য স্থাপন করেন পাল সাম্রাজের বিভিন্ন অংশে।

অধিরোহণ করেন বঙ্গের সিংহাসনে ৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহীপাল, রাজত্ব করেন ১০৩৮ পর্যন্ত। মহাপরাক্রমশালী তিনি, বিস্তার করেন তাঁর রাজ্যের সীমানা বারাণসী পর্যন্ত। পুনোরুদ্ধৃত হয় পাল রাজবংশের লুপ্ত গৌরব। কিন্তু অধিকার করেন তাঁর রাজ্যের কিয়দংশ চোল নৃপতি রাজেন্দ্র চোল। রাজত্ব করেন একে একে তাঁর পুত্র নয় পাল আর পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহ পাল। চেদিরাজ লক্ষ্মী কর্ণ এবং চালুক্য রাজ বিক্রমাদিত্য বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন তাঁদের রাজত্বকালে। রাজত্ব করেন তৃতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল ১০৭০ থেকে ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মহা অত্যাচারী তিনি। বিদ্রোহ ঘোষণা করে উত্তর বঙ্গের অত্যাচারিত প্রজাগণ কৈবর্ত নায়ক দিব্বোকের বা দিব্যের নেতৃত্বে। নিহত হন দ্বিতীয় মহীপাল, দিব্য আর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম একে একে উত্তরবঙ্গে রাজত্ব করেন। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নয় তাঁদের রাজত্ব। দ্বিতীয় মহীপালের ভ্রাতা রাম পাল ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ভীমকে পরাজিত করেন। পুনরুদ্ধার করেন পিতৃরাজ্য। বন্দী হন ভীম। তিনি ১১২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কীর্তিমান এই রামপাল, প্রবল পরাক্রান্তও, তিনি উদ্ধার করেন পিতৃরাজ্য বিদেশীদের হাত থেকে—বিস্তার করেন তাঁর আধিপত্য উড়িষ্যায় আর কামরূপে।

রামপালের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন একে একে কুমার পাল

(১১২০—২৫ খ্রীঃ), তৃতীয় গোপাল (১১২৫—১১৪০ খ্রীঃ) আর মদন পাল (১১৪০—১১৫৫ খ্রীঃ) পর্যন্ত। কীর্তিহীন তাঁরা, অক্ষম সুশাসনে, অযোগ্যও। স্বাধীনতা ঘোষণা করেন একে একে কামরূপে তাঁর সেনাপতি বৈদ্য দেব, পূর্ববঙ্গে ভোজবর্মা,। শেষে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় তাঁদের রাষ্ট্র কর্ণাট থেকে আগত সেন বংশের বিজয় সেনের আক্রমণে, কালিন্দী নদীর তীরের যুদ্ধে।

রাজত্ব করেন বাংলায় পাল বংশ দীর্ঘ চারিশত বৎসর। বাঙ্গালী তাঁরা, বরেন্দ্রী তাঁদের পিতৃভূমি—রেখে যান তাঁরা বাংলার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় স্থান, এক শাশ্বত, গৌরবময় কীর্তি। সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সারা আর্যাবর্তে বাঙালীর রাষ্ট্রিক প্রভাব, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি। সপ্তম শতকে শশাঙ্কের নেতৃত্বে সুরু হয় যে রাষ্ট্রিক সত্তা বঙ্গে ও মগধে, ব্যহত হয় সেই রাষ্ট্রিক সত্তা পরবর্তী একশত বৎসরের মাৎস্যন্যায়ে। পুণরুজ্জীবিত হয় সেই সত্তা পাল রাজাদের রাজত্বকালে, পরিণত হয় মহীরুহে। লাভ করে বাঙ্গালী তার নিজস্ব, স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, উপভোগ করে সেই রাষ্ট্র, দীর্ঘ চারিশত বৎসর, লাভ করে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রিক মর্যাদা ধর্মপাল, দেবপাল ও মহীপালের দিগ্বিজয়ে। "এই প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া একটা সামগ্রিক ঐক্য বোধ গড়িয়া উঠে—ইহাই বাঙ্গালীর স্বদেশ ও স্বাজাত্য বোধের মূলে—এবং ইহাই বাঙ্গালীর এক জাতীয়ত্বের ভিত্তি। পাল যুগের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ দান।" বলেন খ্যাতিমান ঐতিহাসিক "বাঙ্গালীর ইতিহাস" প্রণেতা, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়।

তাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বুকে নিয়ে আছে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদণ্ডপুরী ও সারনাথের বৌদ্ধ বিহারগুলি, নির্মিত হয় তাঁদের অর্থে অথবা পৃষ্ঠপোষকতায়-দান তাঁদের বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে—মিলনের ক্ষেত্র বিশ্বের বৌদ্ধের আর বৌদ্ধ সংস্কৃতির—পরিচায়ক বাংলার আর বাঙ্গালীর বৌদ্ধ জগতে প্রতিষ্ঠারও। তাঁরাই প্রেরণ করেন ধর্মপাল, শান্তি রক্ষিত, পদ্মনাভ, দীপঙ্কর অতীশ ও আরও কত মহাজ্ঞানী বৌদ্ধ প্রচারককে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য। পৃষ্ঠপোষক তাঁরা সাহিত্যেরও। অলঙ্কৃত করেন এই যুগেই বাংলার বুক আয়ুর্বেদ গ্রন্থ প্রণেতা চক্রপাণি দত্ত আর রামপাল চরিত লেখক সন্ধ্যাকর নন্দী। উপনীত হয় পাল যুগেই বাংলার স্থাপত্য আর ভাস্কর্যও উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, আবির্ভূত হন মহা অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ শিল্পী ধীমান ও তার পত্র বীটপালো। বাংলার

ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প আর সংস্কৃতি বিস্তৃত হয় তিব্বত থেকে—যবদ্বীপে, কম্বোজে লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন জগৎ সভায়।

জাতিতে কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ এই সেনবংশের নৃপতিরা। বসতি স্থাপন করেন এসে বাংলায়, নিযুক্ত হন পালরাজাদের অধীনে রাজকর্মচারী, উন্নীত হন সামন্তে। শেষে তাঁরা অধিকার করেন বাংলার সিংহাসন পালরাজাদের দৌর্বল্যের সুযোগ নিয়ে। স্থাপন করেন এই বংশ সামন্ত সেন ও তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন, কিন্তু প্রাধান্য লাভ করে এই বংশ হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেনের রাজত্ব কালে। তিনি রাজত্ব করেন ১০৯৫ থেকে ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি বিবাহ করেন শূর পরিবারের কন্যা বিলাস দেবীকে। বর্ধিত হয় তাঁর ক্ষমতা, বাড়ে প্রতিপত্তিও। পশ্চিম বঙ্গে বিজয়পুরে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী, সম্ভবতঃ দ্বিতীয় রাজধানী পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরে। পরাজয় বরণ করেন তাঁর কাছে গৌড়, কামরূপ আর কলিঙ্গরাজ, পরাজিত হন সামন্তরাজ বীর, নান্য, রাঘব আর বর্ধন। পূর্ববঙ্গ তাঁর অধিকারে আসে। অনুষ্ঠান করেন তাঁর মহিষী তুলাপুরুষ মহাদান বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারে।

রাজত্ব করেন তাঁর পুত্র বল্লাল সেন ১১৫৮ থেকে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। রচয়িতা তিনি "দানসাগর" আর "অদ্ভুত সাগর" নামে দুইখানি গ্রন্থের, উপনীত হয় তাঁর বিজয় অভিযান মগধে, মিথিলাতে আর গৌড়ে। তিনিই বঙ্গদেশে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক।

তার পুত্র লক্ষ্মণ সেন রাজত্ব করেন ১১৭৯ থেকে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। নদীয়া নগরে বা নদীয়াতে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী। তিনি জয় করেন পুরী, বারাণসী আর প্রয়াগ। স্থাপিত হয় তাঁর বিজয়-স্তম্ভ এইসব স্থানে। পরম বিদ্যোৎসাহী তিনি, পৃষ্ঠপোষক সাহিত্যের আর সংস্কৃতির, অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা মহাকবি জয়দেব। আবির্ভূত হন তাঁর রাজত্ব কালেই ধোয়ী কবিরাজ, উমাপতি ধর, আচার্য গোবর্ধন, হলায়ুধ আর শ্রীধর দাস। কবি তাঁরা, সাহিত্যিকও, মহাসমৃদ্ধিশালী হয় বঙ্গভাষা আর সাহিত্যও।

আক্রমিত হয় তাঁর রাজধানী নদীয়া দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তুরস্ক সেনানায়ক মুহম্মদ-বিন বখতিয়ার কর্তৃক, সঙ্গে তাঁর মুষ্টিমেয় অশ্বারোহী সৈন্য। আকস্মিক এই আক্রমণ, অতর্কিতও, পলায়ন করেন লক্ষ্মণ সেন,

পরিত্যাগ করে যান নদীয়া। স্থানান্তরিত হয় রাজধানীও পূর্ববঙ্গে। রাজত্ব করেন সেখানে তাঁর বংশধরেরা—বিশ্বরূপ সেন আর কেশব সেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, জ্বালিয়ে রাখেন স্বাধীনতার অনুজ্জ্বল ক্ষীণ প্রদীপ। বিনা বাধায় বখতিয়ার অধিকার করেন নদীয়া। সুরু হয় বাংলায় মুসলমানের আধিপত্য প্রশস্ত হয় তাদের প্রাধান্য বিস্তারের পথও বাংলাদেশে।

কলঙ্কিত এই সেনরাজ বংশের পরাজয় মুসলমান সেনানায়কের হস্তে, মসিলিপ্ত তাঁদের অবসানও বাংলার রঙ্গমঞ্চ থেকে, কিন্তু রেখে যান তাঁরা এক মহাগৌরবময় কৃতিত্ব, এক সীমাহীন ঐতিহ্য বাংলায় ইতিহাসের পাতায়। প্রতিফলিত হয় সেই ঐতিহ্য বৃহত্তর বাংলার ইতিহাসেও। মহাপরাক্রমশালী বিজয় সেন আর বল্লাল সেন সুশাসকও, প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রিক ঐক্য আর সংহতি পূর্ব ভারতে—হয় নাই পাল শ্রেষ্ঠ দেবপালের রাজত্বের পরে। পৃষ্ঠ-পোষক তাঁরা হিন্দুধর্মের, প্রতিপত্তি লাভ করে হিন্দুধর্ম সারা আর্যাবর্তে। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় সংস্কৃত সাহিত্য। উপনীত হয় সংস্কৃত ভাষাও উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায়। লাভ করেন সেন নৃপতিরা, করে বাংলা দেশও সর্বভারতীয় খ্যাতি ব্যাকরণে, ন্যায়দর্শনে, বিজ্ঞানের আলোচনায়, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক দর্শনে আর নতুন সাহিত্য রীতির প্রবর্তনে ও প্রচলনে।

বহু বিস্তৃত এই বাংলাদেশ, কিন্তু সমৃদ্ধশালী নয় মন্দির দিয়ে, বুকে নিয়ে সুন্দরতম অলঙ্করণ, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বাংলার স্থপতির আর ভাস্করের। তাই সমপর্যায়ে পড়ে না দক্ষিণের সঙ্গে, উত্তরের সঙ্গেও পড়ে না মন্দির সম্পদে। তার উপর আছে তার মৃত্তিকা, তার জলবায়ু, তার আবহাওয়া আর তার অপরিসীম উর্বরতা, সবগুলিই পরিপন্থী তার বুকের মন্দির নির্মাণের, তাদের স্থায়িত্বের, সংরক্ষণেরও। বুকে নিয়ে আছে তারা ধ্বংসের বীজ। তাই বেষ্টিত হয়ে আছে কত পরিত্যক্ত মন্দির লতাগুল্মে আর কণ্টক বৃক্ষে, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে আছে মন্দির তাদের অন্তরালে, পরিণত হয়ে আছে ধ্বংসস্তূপে। সহ্য করতে পারে নাই তারা কালের নির্মম অত্যাচারের আঘাত। ধ্বংসে পরিণত করেন কত মন্দির বঙ্গের মুসলমান বিজেতারাও, মহাসমৃদ্ধশালী তাঁরাও তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে, আপন কৃষ্টিতে, বুকে নিয়ে কত অনুপম অলঙ্করণ, কত সুন্দরতম কীর্তি, কত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কত গৌরবময় যুগের। গড়েন কত মহিমময় মসজিদ তাদের

ধ্বংসাবশেষ দিয়ে। এমনই করেই সিকান্দার শাহ নির্মাণ করেন মহাপ্রসিদ্ধ, মহিমময় আদিনা মস্‌জিদ, তাঁর নতুন রাজধানী পাণ্ডুয়াতে, সেন রাজাদের পরিত্যক্ত রাজধানী লক্ষ্মণাবতীর ধ্বংসাবশেষ দিয়ে। তিনি অলঙ্কৃত করেন বঙ্গের সিংহাসন ১৩৫৮ থেকে ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ত্রিবেণীতেও নির্মাণ করেন সিংহ বিক্রম জাফরখাঁ গাজী একটি মস্‌জিদ। অঙ্গে নিয়ে আছে এই মস্‌জিদটিও মহাঅভিজ্ঞ হিন্দু স্থপতির আর ভাস্করের কত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নিদর্শন, কত অনুপম কীর্তি।

সমৃদ্ধশালী নয় নদী মাতৃক বাংলাদেশ প্রস্তর সম্পদে, সুলভ এখানে পলিমাটি তাই গড়ে ওঠে তার মন্দির ইষ্টক দিয়েই, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম পোড়ামাটির কাজ,—দান বহুশত বৎসরের তার মহাঅভিজ্ঞ শিল্পীর আর ভাস্করের। অক্ষয় নয় এই ইষ্টকের তৈরী মন্দিরও, সমপর্যায়ে পড়ে না প্রস্তরে তৈরী মন্দিরের অমরত্বে। ব্যতিক্রম শুধু দক্ষিণ পশ্চিম প্রত্যন্ত প্রদেশ, ব্যতিক্রম রাজমহলের নিকটবর্তী মালদা জেলাও। দুষ্প্রাপ্য নয় সেখানে প্রস্তর, তাই নির্মিত হয় সেই সব স্থানে প্রস্তর দিয়ে মন্দির।

বিভক্ত এই বাংলার মন্দির নির্মাণ তিনটি সুনির্দিষ্ট যুগে। নিবদ্ধ প্রথম যুগ তার দক্ষিণ প্রত্যন্ত প্রদেশে—আবদ্ধ দুইটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে। প্রাচীনতম তাদের মধ্যে বুকে নিয়ে আছে উড়িষ্যার মধ্য যুগের স্থপতির আর ভাস্করের সীমাহীন অবদানের অনুকরণ তাদের সুস্পষ্ট ছাপ, তাদের বৈশিষ্ট্য। নির্মিত হয় মন্দির বুকে নিয়ে উড়িষ্যার পদ্ধতি ময়ূরভঞ্জে কিচিঙএ নির্মাণ করেন ভঞ্জ রাজারা একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ। নির্মিত হয় মন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনুকরণে, শীর্ষে নিয়ে শিখারা আর আমলক। সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে অর্ধ সমাপ্ত খাণ্ডিয়া দেউল, বুকে নিয়ে আছে তার মহিমময় প্রবেশ পথ, সুন্দরতম শিল্পসম্ভার। কিন্তু নাই কিচিঙ-এর দেউলে তোরণ—মুখমণ্ডপ বিবর্জিত এই দেউলগুলি—ব্যতিক্রম উড়িষ্যার দেউলের, বৈশিষ্ট্য ময়ূরভঞ্জের। নিকটতর হন গর্ভগৃহের দেবতা দর্শনার্থীর, উজ্জ্বলতর হয় ভিতরের জ্বলন্ত প্রদীপ, বিদূরিত হয় বাধাও। রচিত হয় মিলনসূত্র—উড়িষ্যার মন্দির নির্মাণ পদ্ধতির সঙ্গে দক্ষিণ বঙ্গের পদ্ধতির, রচনা করেন কিচিঙের স্থপতি আর ভাস্কর।

বুকে নিয়ে আছে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দির বা দেউল, বাংলার বর্ধমান আর বাঁকুড়া জেলাও আছে বরাকর, বিষ্ণুপুর আর বাহুলাড়া। কিচিঙের অনুকরণে নির্মিত এই মন্দিরগুলি, কিন্তু ক্ষুদ্রতর তাদের আয়তন, নিম্নতর তাদের শীর্ষদেশের চূড়া বা শিখারাও, উচ্চতায় চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের ব্যাসের তিন অথবা সাড়ে তিনগুণ। দ্বিতলও এই দেউলগুলি, বিভক্ত প্রতিটি তল সুবিন্যস্ত দুই সারি কার্নিস দিয়ে। এক অনবদ্য সমন্বয় হয় তাদের আয়তনে আর উচ্চতায়। নিম্নতলের তিনদিকে রচিত হয় সুন্দরতম কুলুঙ্গির আকারে প্রবেশ পথ, অঙ্গে নিয়ে অনবদ্য সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ, সম্মুখভাগে প্রক্ষিপ্ত প্রবেশ পথ। কিন্তু রচিত হয় না কোন তোরণ তাদের সম্মুখভাগে। হয়ত বুকে নিয়ে ছিল কেউ মুখমণ্ডপ, ধ্বংসে পরিণত হয়েছে সেই মুখমণ্ডপ, নিশ্চিহ্ন হয়েছে কালের নির্মম হস্তে। ঋজু হয়ে ঊর্ধ্বে ওঠে তাদের শিখারা বা চূড়া অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম অলঙ্করণ, কত অনবদ্য মূর্তি সম্ভার বৈশিষ্ট্য এই সব মন্দিরের।

নির্মিত হয় কোথাও একাধিক মন্দির, দাঁড়িয়ে থাকে সমষ্টিভুক্ত হয়ে। কোথাও বা দাঁড়িয়ে থাকে শুধু একটি মন্দির মহামহিমময় মূর্তিতে। বর্ধমানের বরাকরের বেগুনিয়া গোষ্ঠি পড়ে প্রথম পর্যায়ে। বুকে নিয়ে আছে বরাকর চারটি মন্দিরের সমষ্টি। প্রাচীনতম তাদের মধ্যে চতুর্থ দেউলটি, সমপর্যায়ে পড়ে ভুবনেশ্বরের পরশুরামের, অঙ্গের গঠনে আর শীর্ষদেশের চূড়ার আকৃতিতে, সমসাময়িকও। তাই নির্মিত হয় অষ্টম শতাব্দীতে। অপর তিনটি নবম ও দশম শতাব্দীতে নির্মিত হয়। পাল রাজারা নির্মাণ করেন।

বাঁকুড়ায় বাহুলাড়া গ্রামের সিদ্ধেশ্বরের মন্দির, বর্ধমানের দেউলিয়া গ্রামের মন্দির, দোহারের যণ্ডেশ্বর ও মল্লেশ্বরের মন্দির, সুন্দরবনের জটার দেউল, দিনাজপুরের রামগড়ের, রাজসাহীর নিমদীঘির আর চট্টগ্রামের মন্দির দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে। নির্মাণ করেন বাংলার মহা পরাক্রমশালী অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা পাল বংশের নৃপতিরা, রাজত্ব করেন তাঁরা প্রবল পরাক্রমে অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। তাঁরাই মন্দির দিয়ে অলঙ্কৃত করেন, মানভূমের তেলকুপির বুক। সবগুলিই রেখ বা শিখর দেউল, ঋজু হয়ে ঊর্ধ্বে ওঠে তাদের গর্ভগৃহের ছাদ, ঈষৎ বক্ররেখায় শিখরাকৃতিতে, শীর্ষে নিয়ে আমলক ও চূড়া, অঙ্গে নিয়ে বাংলার বৈশিষ্ট্য। প্রস্তর দিয়ে নির্মিত

১১। রথচক্র। সূর্য মন্দির, কোণার্ক : কলিঙ্গ
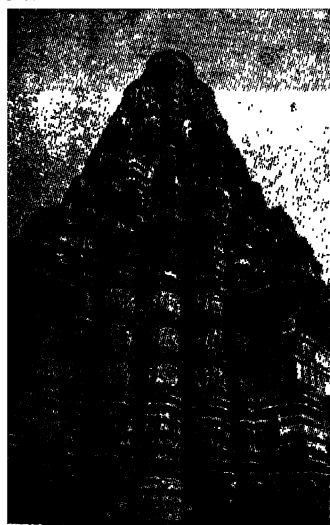
কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দির।
খাজুরাহো : মধ্যদেশ
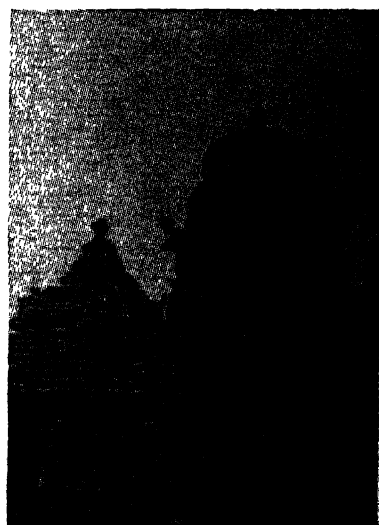
১৩। লিঙ্গরাজের মন্দির। ভুবনেশ্বর : কলিঙ্গ
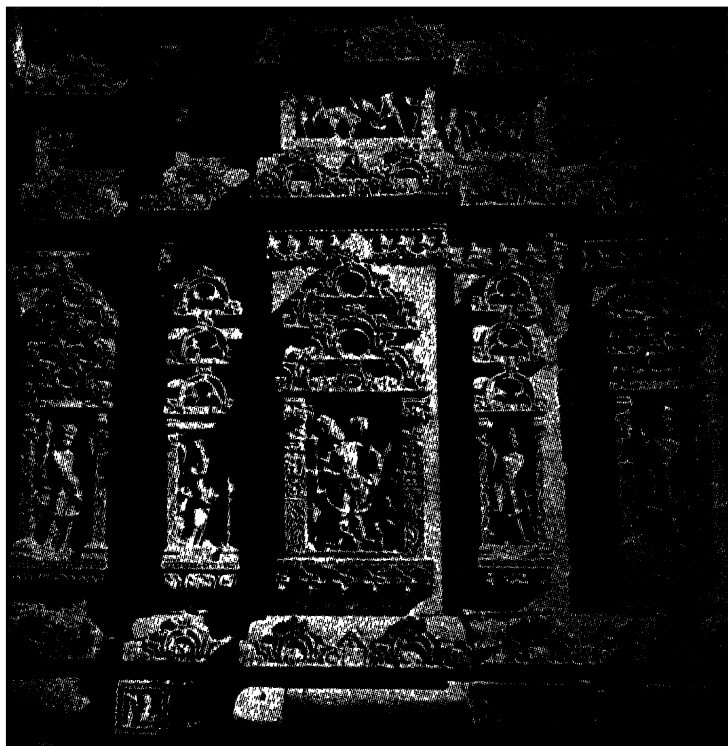
১৪। হরিহরের (২য়) মন্দিরের প্রাচীরগাত্র। ওশিয়া : রাজস্থান

১৫। রামায়ণের দৃশ্য। সুরুল : বঙ্গ
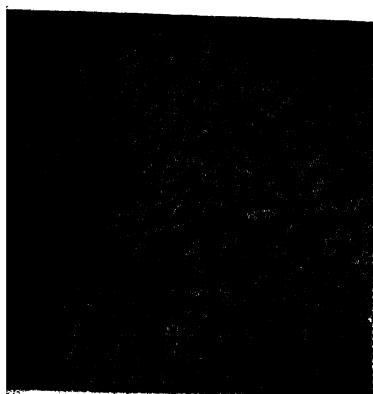
১৬। রামায়ণের দৃশ্য : বাণ্ডদেবের মন্দির

বরাকরের আর দোহারের দেউল, ইষ্টকের তৈরী অবশিষ্ট শ্রেষ্ঠ দেউলগুলি। অনুপম কিন্তু সিদ্ধেশ্বর অঙ্গের গঠনে আর সুষমায় মহাসমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে সর্বাঙ্গের সুন্দরতম অলঙ্করণে। নির্মিত হয় ভদ্র বা পীড় দেউলও প্রাচীন বাংলায়। বুকে নিয়ে আছে এক্তেশ্বরের মন্দির সুষ্ঠু নিদর্শন পীঢ় দেউলের।

গড়ে ওঠে একই সময়ে এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দিরও বাংলার দিকে দিকে বুকে নিয়ে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তার আপন স্বকীয়তা, মূর্ত প্রতীক তার আশা আকাঙ্খার তার বিশিষ্ট পরিবেশের, তার বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতেরও। ইষ্টক দিয়ে নির্মিত এই মন্দিরগুলি, বুকে নিয়ে আছে বাংলার নিজস্ব রূপ, অঙ্গে নিয়ে তার মহাপবিত্র মৃত্তিকা, তাই অপরূপ এই মন্দিরগুলি, বাংলার মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির মনের অপরিসীম মাধুর্যে আর সুনিপুণ ভাস্করের হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্যে।

আদিতে নির্মিত হয় এই মন্দিরগুলি, আদিম চতুষ্কোণ কুটীরের আকারে তার নির্ভুল অনুকরণে। ক্রমে রূপ পরিগ্রহ করে সেই মন্দির কাঠ আর বাঁশের তৈরী পূর্বপুরুষের আবাস গৃহের, তাঁদের চালা গৃহের শীর্ষে নিয়ে বক্রাকার কার্নিস আর ক্রম নিম্নমান ছাদ।

অতিক্রম করে তারা লোক শিল্প, কিন্তু উপনীত হতে পারে না সর্বোচ্চ শিখরে, লাভ করে না চরম পরিণতি, পায় না শ্রেষ্ঠত্বের আসন জগৎ সভায়। পল্লী কেন্দ্রীক বাঙ্গালী আর বাংলার সভ্যতা। তাই গড়ে ওঠে মন্দির, বাংলার বিভিন্ন পল্লীতে আর গ্রামে, বুকে নিয়ে অনুরূপ নির্মাণ পদ্ধতি আর আকৃতি, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম অলঙ্করণ। কিন্তু অভিনব এই মন্দিরগুলি, স্বতঃ স্ফুর্তও, সজীবতার মূর্তপ্রতীক। চতুষ্কোণ এই মন্দিরগুলি গঠনে, বুকে নিয়ে আছে ঋজু উল্লম্ব প্রাচীর। সমান্তরাল তাদের অঙ্গের অনুভূমিক রেখার শ্রেণী বঙ্কিম ও আনমিত ধনুকাকৃতিতে। বক্রাকার তাদের ছাদের শীর্ষদেশের আকৃতিও, বঙ্কিম ঢালু-কার্নিসের সারিও, অধিবৃত্তিক গঠনে। তাই নির্মিত হয় এই মন্দিরগুলি বাঁশের তৈরী খড়ের ছাদ বিশিষ্ট কুটীরের অনুকরণে। তাদের বঙ্কিম ছাদ আর বক্রাকার কার্নিস রুদ্ধ করে বাংলার অতিবর্ষণের বৃষ্টির জলের স্থিতি ছাদের উপরে, নিরুদ্ধ করে তাদের প্রবেশ মন্দিরের ভিতরে। তাই

উপযুক্ত এই মন্দিরের গঠন বাংলার জলবায়ুর, দেশোপযোগী এই গঠন, কালোপযোগী। বক্রাকার ছাদের উপরে নির্মিত হয় মন্দিরের সুউচ্চ মূল শিখর বা চূড়া। নির্মিত হয় চালা মন্দির দোচালা-চৌচালা ও আট চালা। বক্রাকার ছাদের শীর্ষদেশে নির্মিত হয় মূল শিখর, প্রতি তলায় চারিটি বক্রাকার ক্ষুদ্রতর শিখরও বর্গাকার নকশার ভিত্তিতে। রচিত হয় চারিকোণে। বর্ধিত হয় মন্দিরের তলা, বাড়ে ক্ষুদ্রতর শিখর বা অঙ্গ শিখরের সংখ্যাও—নির্মিত হয় বহু শিখরযুক্ত বা রত্ন মন্দির—পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, সপ্তদশরত্ন একবিংশতিরত্ন আর পঞ্চবিংশতিরত্ন মন্দির। বক্রাকার এই শিখরের আর অঙ্গ শিখরের ও অঙ্গের কার্নিসের আকৃতিও অনুভূমিক তাদের অঙ্গের অলঙ্করণ। মন্দিরের সম্মুখভাগে রচিত হয় তিনটি বহু পত্রাকৃতি খিলান ; বিভক্ত খর্বাকৃতি সুপ্রশস্ত স্তম্ভ দিয়ে। সূক্ষাগ্র এই সব খিলানের আকৃতি, অঙ্গে নিয়ে আছে অপর্যাপ্ত সুন্দরতম পোড়ামাটির অলঙ্করণ। স্তম্ভের আকার আর তার অঙ্গের অলঙ্করণ অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই সব মন্দিরের, নাই ভারতের অন্য কোন মন্দিরে, এমন খর্বাকৃতি অথচ সুপ্রশস্ত, স্তম্ভের শ্রেণী।

ভিতরে একটি মাত্র সুপ্রশস্ত কক্ষ রচিত হয়, পরিচিত ঠাকুর দালান বা ঠাকুর বাড়ী নামে, তার এক দিকে বেদী, বেদীর উপর বিরাজ করেন মন্দিরের বিগ্রহ দেবতা বা প্রতিমা। রচিত হয় দ্বিতলও। কিন্তু তাদের সর্বাঙ্গের সুন্দরতম ও সূক্ষ্মতম পোড়ামাটির অলঙ্করণই সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই সব মন্দিরের। রচিত হয় পোড়ামাটির ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রসারি, খোদিত হয় তাদের অঙ্গে কত বিভিন্ন অনবদ্য সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার কত সৌন্দর্য সুষমা, কত বিচিত্র জীবন্ত মূর্তি সম্ভারও। শোভিত হয় সেই সব অলঙ্কৃত পোড়ামাটির চিত্রসারি দিয়ে মন্দিরের সম্মুখভাগ, ভূষিত হয় তার প্রাচীরের গাত্র, অলঙ্কৃত হয় তার সর্বাঙ্গ। মূর্তি দিয়েই সম্মুখভাগে আর প্রাচীরের গাত্রে রচিত হয় কত কাহিনী—কাহিনী পুরাণের, কাহিনী রামায়ণের আর মহাভারতের, কত সামাজিক জীবন যাত্রার, চিত্র কত উৎসবের, কত সুখ দুঃখেরও। বুকে নিয়ে আছে এই পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দিরের কত অসংখ্য নিদর্শন বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত। শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে কান্তনগরের কান্তজীর নবরত্ন মন্দির, আর বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দির, নির্মিত ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। অমর, অক্ষয় কীর্তি তারা দিনাজপুরের

ঘোষবংশীয় রাজা ও বিষ্ণুপুরের মল্ল নৃপতিদের। খুব সম্ভব সমসাময়িক তারা, নির্মিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। বিষ্ণুপুরেই নির্মিত হয় এক-শিখর বিশিষ্ট মদনগোপালের মন্দির ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, মদনমোহনের মন্দির ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আর লালজীর মন্দির ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে—সবগুলিই মল্ল রাজারা নির্মাণ করেন।

নির্মিত হয় এক সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতিতে মন্দিরও বাংলাদেশে, বুকে নিয়ে তার একেবারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, পরিচিত জোড় বাংলা নামে। যুক্ত হয় দুইটি ইষ্টক দিয়ে তৈরী মন্দির, রূপ পরিগ্রহ করে বাঁশ আর খড় দিয়ে রচিত যুক্ত বাংলা গৃহের, শীর্ষে নিয়ে শুধু একটি মাত্র চূড়া বা শিখর। কিন্তু অভিন্ন এই মন্দিরের ভিতরের পরিকল্পনা অন্য মন্দিরের ভিতরের সঙ্গে, অভিন্ন তার বহিরাঙ্গের গঠন পদ্ধতি আর অলঙ্করণও। নির্মিত হয় একটি জোড়-বাংলা মন্দির বিষ্ণুপুরেও ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে, পরিচিত কৃষ্ণ রায় নামে। চতুষ্কোণ এই মহিমময় মন্দিরটি, চল্লিশ ফুট তার এক এক পাশের আয়তন বা পরিধি ত্রিশ ফুট উচ্চ ছাদ, তার শিরে শোভা পায় পঞ্চাশ ফুট উচ্চ শিখর, কেন্দ্রস্থলে একটি আট ফুট চৌরশ পবিত্র গর্ভগৃহ বা ঠাকুর বাড়ী। বেষ্টিত হয়ে আছে গর্ভগৃহটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের শ্রেণী দিয়ে। নির্মিত হয় একটি দ্বিতলে উঠবার সোপানের শ্রেণীও। বুকে নিয়ে আছে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার চৈতন্য মন্দিরও অনুরূপ নির্মাণ পদ্ধতি, পড়েও জোড়-বাংলার পর্যায়ে। নির্মিত হয় শিখর যুক্ত অষ্ট কোণাকৃতি মন্দিরও মুর্শিদাবাদের বড়নগরে, রাণীভবানী নির্মাণ করেন।

বুকে নিয়ে আছে রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরের বিরাট সুমহান ধ্বংসাবশেষও, হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের এক প্রকৃষ্টতম নিদর্শন, শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম কীর্তি পাল বংশের নৃপতিদের। এইখানেই অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে পাল শ্রেষ্ঠ ধর্মপালদেব নির্মাণ করেন একটি মহামহিমময়, সুবিশাল বিহার, পরিচিত ধর্মপাল বিহার বা সঙ্ঘারাম নামে। বিস্তৃত এই বিহারটি তিনশত একষট্টি ফুট দীর্ঘ ও তিনশত আঠার ফুট প্রস্থ ক্রুশাকৃতি পরিধি নিয়ে, অঙ্গে নিয়ে অধিকাংশ ইষ্টকের কাজ, উচ্চতা তার একশত ফুটেরও অধিক। রচিত হয় কত ছাদ, কত চতুষ্কোণ কক্ষ, বুকে নিয়ে বিগ্রহ, কত প্রতিমা,

কত মহাপবিত্রতার প্রতীক। উত্তর দিকের একটি সোপানের শ্রেণীদিয়ে উপনীত হতে হয় এই মহা পবিত্র, সুমহান বিহারের অলিন্দে। বেষ্টন করে সেই অলিন্দ সম্পূর্ণ বিহারটি। এই অলিন্দ দিয়েই চারিটি অতিরিক্ত গর্ভগৃহ যুক্ত হয়, রচিত হয় তারা ক্রুশের এক একটি বাহুতে। বিরাজ করেন এই সব গর্ভগৃহে এক একটি মহিমময় বিগ্রহের ধাতুময় মূর্তি, নির্মিত নিকটবর্তী বরেন্দ্র ধাতুর কারুশালাতে। আসতো দলে দলে হিন্দু, বৌদ্ধ আর জৈন তীর্থযাত্রী সমবেত হ'ত এই সব মন্দিরে। ধন্য হত তাদের জীবন এইসব সুন্দরতম, সুমহান, পবিত্রতম বিগ্রহ দর্শন করে আর পূজা দিয়ে।

ভূষিত করেন মহাপারদর্শী ভাস্কর, মহা অভিজ্ঞ তাঁরা তক্ষণ শিল্পে, তাদের ছাদের বহিরাঙ্গ আর প্রাচীরের গাত্র কত সুন্দরতম পোড়ামাটির অলঙ্করণ দিয়ে। রচিত হয় ফলকের অঙ্গে কত সুন্দরতম আর জীবন্ত মূর্তির সম্ভারও। মূর্তি দিয়েই বর্ণিত হয়, প্রাচীরের গাত্রে আর ছাদের অঙ্গে কত কাহিনী, কাহিনী রামায়ণের আর মহাভারতের, কাহিনী কত পুরাণের, কত শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অবতারের আর কত কিংবদন্তীরও। অবিচ্ছিন্ন এই অলঙ্করণ, সর্ববিস্তৃতও। মুল বা প্রধান বিহারের চতুর্দিকেও নির্মিত হয় কত অসংখ্য ক্ষুদ্রতর বিহারের শ্রেণী, কত সঙ্ঘারাম-বাসস্থান তারা কত শত বৌদ্ধ শ্রমণের, কত পুরোহিতের, কত বৌদ্ধ যাত্রীরও। মহামহিমন্বিত হয় বাংলাদেশেও, স্থাপত্যের মহিমময়ত্বে আর ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন জগৎ সভায়।

বুকে নিয়ে ছিল মালদার নিকটবর্তী, সেন রাজাদের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী, এই যুগেরই সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি, প্রকৃষ্টতম দান পাল আর সেন নৃপতিদের—তাঁদের যুক্ত প্রচেষ্টার আর পৃষ্ঠপোষকতার, দান বহুশত বৎসরেরও। গড়ে ওঠে কত মহিমময় মন্দির, কত সুন্দর রাজপ্রাসাদ, কত সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মিত কৃষ্ণ প্রস্তরে, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম নিদর্শন বাংলার স্থপতির আর ভাস্করের, বুকে নিয়ে প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণ। আসে ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, লক্ষ্মণাবতী আসে মুসলমান বিজেতার অধিকারে। সংহারের লীলা সঙ্গে নিয়ে আসে মুসলমান বিজেতা—ধ্বংসে পরিণত হয় লক্ষ্মণাবতী, বুকে নিয়ে কত অমূল্য সম্পদ, কত সুন্দরতম সৃষ্টি, কত শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাদের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে

রচিত হয় তাদের রাজধানী গৌড়। আজও বুকে নিয়ে আছে তার সাক্ষী মুসলমান বিজেতাদের তৈরী মস্‌জিদ, আর সমাধিমন্দির, অঙ্গে নিয়ে আছে সেন রাজাদের স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের গৌরবময় নিদর্শন, পরিচায়ক তাঁদের স্থাপত্য পদ্ধতিরও। খুব সম্ভব এই সব কালো রঙের প্রস্তর সংগৃহীত হয় নিকটবর্তী রাজমহল শৈলমালার বন্ধুর অঙ্গ থেকে। এমনই করেই পরিণত হয় কত হিন্দু মন্দির, কত হিন্দু রাজপ্রাসাদ মুসলমান বিজেতাদের মস্‌জিদে আর সমাধি মন্দিরে—গড়ে ওঠে বাংলার দিকে দিকে—গৌড়ে, মালদাতে আর পাণ্ডুয়াতে।

মর্ত্যভূমির ইন্দ্রপুরী বিষ্ণুপুর, স্মরতীর্থ, মল্লভূমির রাজধানী সাত মাইল পরিধি নিয়ে বিস্তৃত। আজও বুকে নিয়ে আছে কত মন্দির, কত সরোবর বা বাঁধ আর দুর্গ, গৌরবান্বিত হয়ে আছে আপন সংস্কৃতির দ্যুতিতে, মহিমন্বিত হয়ে আছে অভিনব স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের ঐতিহ্যে। তারা মহামূল্য দান তার স্বাধীন নৃপতিদের। অমর হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় বিষ্ণুপুর, অমরত্ব লাভ করেছেন তার নৃপতিরাও। তাঁরা অধিকার করে আছেন এক বিশিষ্ট স্থান বাংলার ইতিহাসে।

তাঁদের ইতিহাসের আরম্ভ হিন্দু যুগে। বিভিন্ন তাঁদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মত। কেউ বলেন তাঁরা জাতিতে রাজপুত, পরে রাঢ়ে বসতি স্থাপন করেন উত্তর ভারত থেকে এসে। আবার কেউ বলেন, তাঁরা বাঙালী, মল্লভূমের আদিম অধিবাসী। মল্লভূমে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন তাঁদের পূর্বপুরুষ আদি মল্ল। মল্লবীর তাঁরা। অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামন্ত রাজা পশ্চিমবঙ্গের। প্রবল পরাক্রান্ত জয়মল্ল, কালুমল্ল আর বীরহাম্বীর, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের। বর্ধিত হয় তাঁদের শৌর্যে রাজ্যের সীমানা, বিস্তৃত হয় উত্তরে সাঁওতাল পরগণার দামিন-ই-কোতে, দক্ষিণে মেদিনীপুরের একাংশে, পশ্চিমে পঞ্চকোট, মানভূম ও ছোটনাগপুরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ও পূর্বে বর্ধমানের একাংশে। তাঁরা "মল্লাবনীনাথ" নামে খ্যাতিলাভ করেন। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের স্বাধীনতার কাহিনী, শৌর্যের ও বীর্যের কাহিনী। তাঁদের সংস্কৃতির আর কৃষ্টির পৃষ্ঠপোষকতার কাহিনীও খ্যাতিলাভ করে।

শাক্ত, এই নৃপতিরা শক্তির উপাসক, শিবের পূজকও বীর্যে দুর্মদ, দুর্ধর্ষ। শকটারোহণে প্রেরিত হয় বৃন্দাবন থেকে মহামূল্য বৈষ্ণব গ্রন্থ গৌড়ে তাদের মধ্যে আছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থের সন্ত-সমাপ্ত অমূল্য পাণ্ডুলিপি। পুরোধা তার বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাস, নরোত্তম আর শ্যামানন্দ। তাঁরা ধীরে ধীরে বিষ্ণুপুরের রাজার এলাকায়, মল্লভূমের গোপালপুর গ্রামে উপনীত হন। দস্যুরা অপহরণ করে সেই গ্রন্থগুলি। খবর পেয়ে মূর্ছিত হন কবিরাজ, করেন মৃত্যুবরণ। দস্যুদের হাতে নিগৃহীত হ'য়ে বৈষ্ণবাচার্যেরা বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হন। অতিবাহিত হয় কিছু দিন। শেষে একদিন শ্রীনিবাস রাজসভায় উপনীত হন। মুগ্ধ হন রাজা বীরহাম্বীর তাঁর ব্যবহারে। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। এক সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা মল্লভূমের ইতিহাসে ঘটে। তাঁরা ফিরে পান অপহৃত গ্রন্থগুলি।

সিংহাসনে আরোহণ করেন বীরহাম্বীর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। স্রষ্টা তিনি, নির্মাণ শুরু করেন মল্লেশ্বরের শিবের মন্দির কিন্তু অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে যান বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করায়। প্রবল পরাক্রান্ত তাঁর পুত্র রঘুনাথও, মুর্শিদাবাদের নবাব কর্তৃক সিংহ উপাধিতে ভূষিত হন। হন প্রথম সিংহ বিষ্ণুপুরের রাজাদের মধ্যে। তিনি সমাপ্ত করেন মল্লেশ্বরের এই অসম্পূর্ণ মন্দিরটির নির্মাণ। তিনিই বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ দেবালয়ের ও বাঁধের নির্মাতা। তারপরে রাজত্ব করেন একে একে রঘুনাথনন্দন বীরসিংহ ও তাঁর পুত্র দুর্জন সিংহ। তিনিই নির্মাণ করেন মদনমোহনের মহিমময় মন্দিরটি, সুন্দরতম মন্দির বিষ্ণুপুরের।

১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল সিংহ অধিরোহণ করেন বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে। তিনি প্রতিরোধ করেন মারাঠা বর্গী রঘুজী ভোঁস্‌লার সেনানায়ক দুর্ধর্ষ ভাস্কর পণ্ডিতের আক্রমণ। তাঁর কাছে পরাজিত হয় মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দী খাঁয়ের সৈন্যবাহিনী। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল সিংহের মৃত্যু হয়, চৈতন্য সিংহ অধিরোহণ করেন বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে। মল্লভূমের শেষ স্বাধীন রাজা, তাঁর কাছে দামোদরের তীরে পরাজয় বরণ করে নবাব সিরাজের সৈন্যবাহিনী। সিংহাসনের অধিকার নিয়ে চৈতন্য সিংহের গোপাল সিংহের অপর পৌত্র

দামোদর সিংহের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তিনি সাহায্যপ্রার্থী হন মুর্শিদাবাদের। নবাব মীরজাফর আক্রমণ করেন বিষ্ণুপুর, গভীর রাত্রিতে অতর্কিতে। রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করেন চৈতন্য সিংহ সঙ্গে নিয়ে পরিবারবর্গ ও কুলদেবতা মদনমোহনকে। রক্ষাকর্তা তিনি বিষ্ণুপুরের, স্বহস্তে ধারণ করেন কামান "দলমাদল" ভাস্করের বিরুদ্ধে। প্রকম্পিত হয় সারা মল্লভূম তার গভীর গর্জনে। ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে পলায়ন করেন ভাস্কর পণ্ডিত। ভবিষ্যতেও একাধিকবার গর্জে ওঠে বিষ্ণুপুরের কামান, ওঠে ইংরাজের বিরুদ্ধেও। চৈতন্য সিংহ মুর্শিদাবাদে উপনীত হন। ক্লাইভের অনুগ্রহে ফিরে পান বিষ্ণুপুরের রাজ্য ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু পান না মদনমোহন। তিনি সপ্ত-সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রীত হন গোকুল মিত্রের কাছে, প্রতিষ্ঠিত হন বাগবাজারে।

দামোদর সিংহও স্থাপন করেন এক পৃথক রাজ্য জামকুঁড়িতে। স্থাপিত হয় বিষ্ণুপুরের সঙ্গে ইংরাজের প্রথম সম্পর্ক। বিষ্ণুপুরাধিপতি বর্ধিত হারে রাজস্ব দিতে অশক্ত হন ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর ইংরাজের অধিকারে আসে। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষে আর অন্তর্দ্বন্দ্বে বিষ্ণুপুর রাজ্যের অবনতি উপনীত হয় চরমে। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য সিংহের মৃত্যু হয়। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মাধব সিংহ বাৎসরিক কর দিতে অসমর্থ হন, নীলামে বিক্রীত হয় বিষ্ণুপুর রাজ্য, বর্ধমানের রাজা ক্রয় করেন। পরিসমাপ্তি হয় পশ্চিমবঙ্গের এক স্বাধীন রাজ্যের মহা-গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের এক পরাক্রমশালী দুর্ধর্ষ নৃপতিদের, অবসান হয় এক সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকদের ইতিহাস।

পরের দিন ভোরে উঠে চা ও প্রচুর জলযোগ করে, গৃহস্বামীর পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে মন্দির দর্শনে বার হই। দুর্গের সামনে উপনীত হই। মুগ্ধবিস্ময়ে দেখি এক অপরূপ কীর্তি বিষ্ণুপুরের রাজাদের। দেখি এক পিরামিডাকৃতি মঞ্চ, পাদদেশে তার সারি সারি বাংলার দোচালা আর চারচালা গৃহের অলঙ্করণ। পরিচিত রাসমঞ্চ নামে দাঁড়িয়ে আছে দুর্গের বাইরে এই মঞ্চটি, প্রহরী হয়ে আছে দুর্গের ভিতরের মন্দিরগুলির।

রাসমঞ্চ দেখে আমরা দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করি। মন্দির-নগরে পরিণত হ'য়ে আছে দুর্গটি, বুকে নিয়ে চারিটি দেউল ও আরও কত মন্দিরের সমষ্টি। সুন্দরতম এই মন্দিরগুলি, বিভিন্ন তাদের গঠনপদ্ধতিও, মহিমময়, অঙ্গে নিয়ে

আছে সুন্দরতম অলঙ্করণ আর মূর্তির সম্ভার। শ্রেষ্ঠ দান বাংলার মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির আর ভাস্করের তাঁদের মহিমময় সৃষ্টি অবিনশ্বর কীর্তি। দেখি বাংলার মন্দিরের গঠনপদ্ধতির এক সুষ্ঠু ক্রমবিকাশ। হাম্বীর নন্দন রঘুনাথ সিংহই নির্মাণ করেন অধিকাংশ সুন্দরতম মন্দিরগুলি, বেশীর ভাগই বিষ্ণুমন্দির, পূজিত হতো তাদের গর্ভগৃহে বিষ্ণুর বিভিন্ন মূর্তি।

প্রথমে দেউলগুলি দেখি, তারা বর্ধমান জেলার বরাকরের বেগুনিয়া দেউলের সমপর্যায়ে পড়ে না, পড়েনা বাঁকুড়ার বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বরের দেউলেরও। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বাংলার প্রসিদ্ধ পালনৃপতিদের দ্বারা নির্মিত এই মন্দিরগুলির গঠনের মহিমময়ত্বে, অঙ্গের পর্যাপ্ত সুন্দরতম অলঙ্করণে, শিল্পসম্পদে আর মূর্তিসম্ভারে। কিন্তু বুকে নিয়ে আছে বাংলার এক লুপ্ত পদ্ধতির প্রতীক, সংযোজন উড়িষ্যার বহুবিস্তৃত মহামহিমময় স্থাপত্যের সঙ্গে বাংলার, প্রতিফলন ভুবনেশ্বরের বহু শতাব্দীব্যাপী মন্দিরস্থাপত্যের, এক গোষ্ঠীভুক্তির সাক্ষী। এই সংযোজন ময়ূরভঞ্জে, কিচিং-এ সাধিত হয়। মহাশক্তিশালী ভঞ্জ রাজারা সাধন করেন।

তার পরে শ্যামরায়ের মন্দিরে উপনিত হই। পঞ্চরত্ন এই মন্দিরটি, ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। বিষ্ণুমন্দির তার চারিটি চালা, নির্মিত বাংলার চারচালা গৃহের অনুকরণে, শীর্ষে নিয়ে আছে কেন্দ্রস্থলে একটি বৃহদাকৃতি শিখর ও চারিকোণে চারিটি ক্ষুদ্রতর আকৃতির অন্দশিখর। সর্বাঙ্গে তার পোড়ামাটির অপরূপ পর্যাপ্ত অলঙ্করণ আর মূর্তিসম্ভার। মূর্তি দিয়ে রচিত হয় এই মন্দিরগাত্রে ভাগবত গীতার কত কাহিনী, মহাভারতের আর পুরাণের কত দৃশ্য, কত উৎসবের, কত সুখ-দুঃখের চিত্রও। দেখে স্তব্ধ হই, প্রণতি জানাই তার স্রষ্টিকর্তাকে। মদনগোপালের মন্দিরে উপনীত হই। বিষ্ণুমন্দির এই মন্দিরটিও, পঞ্চরত্ন, নির্মিত হয় ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, অঙ্গে নিয়ে পোড়ামাটির অলঙ্করণ, কিন্তু সমপর্যায়ের নয় শ্যামরায়ের মন্দিরের গঠনের সৌকুমার্যে আর অঙ্গের অলঙ্করণের ঐতিহ্যে।

জোড়-বাংলাতে উপনীত হই। যুক্ত হয় পাশাপাশি দু'খানা বাংলার দোচালা ঘর, শীর্ষে নিয়ে একটিমাত্র শিখর বা চূড়া। দেখি এক বিশিষ্ট অভিনব সৃষ্টি বাংলার স্থপতির, তার নিজস্ব পরিকল্পনার অনবদ্য সুষ্ঠু রূপদান।

নাই অন্য কোন দেশে। ইষ্টক দিয়ে ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয় এই মন্দিরটি, সর্বাঙ্গে নিয়ে পোড়ামাটির পর্যাপ্ত অলঙ্করণ, শিল্পসম্পদ আর মূর্তিসম্ভার—কত দৃশ্য, কত কাহিনী, কত চিত্রও। শ্রদ্ধা নিবেদন করি বাংলার মহা-অভিজ্ঞ স্থপতিকে।

জোড়-বাংলা দেখে আমরা লালজীর মন্দিরে উপস্থিত হই। বিষ্ণুমন্দির, ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, শীর্ষে নিয়ে আছে একটি মাত্র শিখর, অঙ্গে নিয়ে আছে প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণ। তারপর একে একে রাধাশ্যাম, কালাচাঁদ ও মদনমোহনের মন্দির দেখি। এক রত্ন বা এক চূড়াবিশিষ্ট এই মন্দিরগুলিও নির্মিত হয় বাংলার চারচালা গৃহের অনুকরণে, সুস্পষ্ট তাদের ছাদের অঙ্গের বঙ্কিম রেখা। মহামহিমময় তাদের মধ্যে মদনমোহনের মন্দিরটি, সুন্দরতম মন্দির বিষ্ণুপুরের, ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা দুর্জন সিংহ নির্মাণ করেন। অপরূপ এই মন্দিরের অঙ্গের শিল্পসম্পদ আর অলঙ্করণ, অতুলনীয় এর গাত্রের পোড়ামাটির মূর্তিসম্ভার আর দৃশ্যের সমাবেশ। সমপর্যায়ে পড়ে শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দিরের আর জোড়বাংলার মন্দিরের কারুকার্যে, অঙ্গের শিল্পসম্পদের পর্যাপ্তে ও ঐতিহ্যে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি আর প্রণাম জানাই স্থপতি আর ভাস্করকে ফিরে আসি গৃহে।

পরের দিন মল্লেশ্বরের মন্দির দেখতে যাই। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে বীরহাম্বীর নির্মাণ শুরু করেন এই মন্দিরটির। তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেওয়ায় সম্পূর্ণ হয় না মন্দিরটির নির্মাণ, তাঁর পুত্র রঘুনাথ সিংহ, বিষ্ণুপুরের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, সমাপ্ত করেন এই মন্দির নির্মাণ। প্রাচীনতম এই মন্দিরটি, চতুষ্কোণ চূড়া বিশিষ্ট, অভিনব, সমপর্যায়ে পড়ে না বিষ্ণুপুরের অপর মন্দিরের গঠনের গরিমায় আর অঙ্গের অলঙ্করণে। অপরূপ দেবতার বাহন বৃষভের মূর্তিটি একেবারে জীবন্ত, তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দিরের নন্দীর ও মহীশূরের নন্দীর সঙ্গে সমপর্যায়ে পড়ে। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত কৃষ্ণরায়ের অপরূপ মন্দিরটিও দেখে আসি। আরও কয়েক দিন বিষ্ণুপুরে অতিবাহিত করে কলিকাতায় ফিরে আসি। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি যা আজও অম্লান হ'য়ে আছে মনের মন্দিরে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বরাকর

বেগুনিয়া দেউল

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সাল, বেলা দুটোয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের বন্ধুবর শ্রীমান অমলকুমারের মোটরে চড়ে আসানসোল অভিমুখে রওনা হই। সঙ্গে যান সারথি, জ্যেষ্ঠ পুত্র, দুই পুত্রবধূ ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের সতীর্থ শ্রীমান জানকী রমন। অধিবাসী তিনি দক্ষিণ ভারতের, অভিজ্ঞ মোটর চালকও, হবেন দ্বিতীয় সারথি মোটরের। শুনি সুচালক সারথিও, মহাঅভিজ্ঞ মরণের দ্বার জি. টি. রোডে মোটর চালনায়।

প্রথমেই শ্রীমান রমন ষ্টীয়ারিং ধরেন, বজ্র মুষ্টিতে। পঞ্চাশ মাইল গতিতে গাড়ী ছোটে। আমরা অতিক্রম করি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, পার হয়ে বাই টালার সেতু, উপনীত হই বি. টি. রোডে। চল্লিশ মিনিটেই উপস্থিত হই দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দিরের সামনে। দূর থেকে মাকে ভক্তিভরে প্রণতি জানিয়ে, মন্দিরকে ডাইনে রেখে, বালীর সেতু অতিক্রম করে জি টি রোডে উপনীত হই। মন্থর হয় মোটরের গতিও। বিঘ্ন সাধন করে কত অগ্রগামী যান, করে কত লরিও, অতিক্রমকারী কত পশ্চাতের যানও।

আমরা একে একে অতিক্রম করি বালী, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, শেওড়াফুলি, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হুগলি, ব্যাণ্ডেল, কত শস্যশ্যামল প্রান্তর উপনীত হই পাণ্ডুয়াতে। পরিচিত ছোট পেঁড়ো নামেও, প্রখ্যাত এই পাণ্ডুয়া বুকে নিয়ে আছে মুসলমান কীর্তির সুন্দরতম নিদর্শন, অঙ্গে নিয়ে আছে বাইশ দরওয়াজা তার সাহ সুফির মসজিদ। মোটর থেকে নেমে, দূর থেকে দেখি তার ১২৭ ফুট উঁচু, পাঁচতলা মিনারটি। সাহ সুফি নির্মাণ করেন এই মিনার, ক্রম হ্রস্বায়মান, বৃত্তাকার তার ঊর্ধ্বদেশ। জয়স্তম্ভ তাঁর পাণ্ডুয়া বিজয়ের এই মিনারটি। ছিলেন তখন পাণ্ডুয়া নগরে, পাণ্ডু নামে এক রাজা। সৌভাগ্যবান সেই নৃপতি, পুণ্যবানও, অধিষ্ঠিত তেত্রিশ কোটি দেবতা তাঁর রাজপ্রাসাদের কুণ্ডে। পুনরুজ্জীবিত হ'ত মৃতমানুষ সেই কুণ্ডের মহাপবিত্র জলের স্পর্শে। বাস করতো তখন পাণ্ডুয়া নগরে বহু হিন্দু। সুখের, শান্তির আর আনন্দের ছিল

তাদের জীবন। প্রপীড়িত কিন্তু মুষ্টিমেয় মুসলমান প্রজা, অসন্তুষ্টও। তাদের আমন্ত্রণেই পাণ্ডুয়া বিজয়ের জন্য, সসৈন্যে প্রেরিত হন দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ সাহের ভ্রাতুষ্পুত্র সাহ সুফি। পরাজিত হন পাণ্ডুয়াধিপতি পাণ্ডু সুফির হস্তে, সপরিবারে মৃত্যু বরণ করেন ত্রিবেণীর পবিত্র গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে।

মোটর এসে থামে বর্ধমান ষ্টেশনের সামনে। বেলা তখন পাঁচটা; ম্লান হ'য়ে আসে দেব দিবাকরের রশ্মি। বুকে নিয়ে আছে বর্ধমানও কত ইতিহাস, ইতিহাস কত বিভিন্ন যুগের—হিন্দু, মুসলমান আর ইংরাজের, কত ঐতিহ্যও, ঐতিহ্য কত বিভিন্ন সংস্কৃতির—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন আর ইস্‌লামের। গাড়ী থেকে নেমে, হাত মুখ ধুয়ে, চা ও মামলেট খেয়ে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। তারপর আবার মোটরে উঠে বসি। ঘন অন্ধকারে দিগন্ত তখন অবলুপ্ত। বদলে যায় সারথিও, মোটর চালক অধিকার করে সারথির স্থান, সুদক্ষ সে জি. টি. রোডে মোটর চালনায়। মোটর ছাড়ে, উপনীত হয় মাইলের কাঁটা কখন চল্লিশে, কখন পঞ্চাশে। সম্মুখে, বিপরীত দিকে, যতদূর দৃষ্টি যায় দেখা যায় শুধুই আলোর মালা। নক্ষত্র গতিতে ছুটে আসে সেই আলো, আসে উদ্দাম গতিতে, অমিত গর্জনে, অতিক্রম করে যায় আমাদের মোটর। যায় প্রতিমুহূর্তেই এক বা একাধিক লরি, মৃত্যুর দূত, জ্বালিয়ে যায় তাদের অত্যুজ্জ্বল "হেড্ লাইট"। পথের দুই পাশে উন্মুক্ত নর্দমা, তার ধারে ধারে এক একটি মহীরুহ, উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে। একটু অসাবধান হলেই, গড়িয়ে যাবে মোটর নর্দমায়, উল্টে যাবে তার দেহ, নয়ত সঙ্ঘাত হবে পথের পাশের বিশাল বৃক্ষের সঙ্গে। চূর্ণ হবে মোটর সেই আঘাতে, প্রাণান্ত হবে আমাদের সকলের। নয়ত সংঘর্ষ হবে বেগবান ধাবমান লরির সঙ্গে, বিচূর্ণ হবে মোটর সেই সংঘর্ষে, চূর্ণ বিচূর্ণ হবে আমাদের দেহও। এক মহা আতঙ্কে আতঙ্কিত হয় আমাদের সারা অন্তকরণ, কণ্টকিত হয় দেহ, রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকি শেষ পরিণতির। অতিক্রম করে যাই একে একে পানাগড় আর অণ্ডাল, নির্বিঘ্নে, হয় না কোন সংঘাত, কোন সংঘর্ষ। কিন্তু বিরাম নাই এই বিপরীত দিক থেকে মরণের দূতের আগমনের, আসে অবিরাম গতিতে, অশেষ, অবিচ্ছিন্ন তাদের লুকোচুরি খেলাও—দেখি স্তব্ধ হ'য়ে।

বাম দিকে মোড় নিয়ে, আমাদের মোটর দুর্গাপুরের ব্যারাজের সামনে

এসে থামে। মনীষী বিধানচন্দ্র রায়ের মানস পুত্র দুর্গাপুর, প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শনের অধিকারী দুর্গাপুর—দেখি আলোয় আলোকিত হ'য়ে আছে তার পথ, তার প্রান্তর, তার উদ্যান-বাটী, তার হর্ম্যরাজি, তার কারুশালা আর শিল্পশালা, হ'য়ে আছে তার আকাশ বাতাস। মহাসমৃদ্ধিশালী ধনেজনে—পরিণত হবে দুর্গাপুর একদিন সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে, কেন্দ্রস্থল হবে কৃষ্টির, হবে সভ্যতার আর শিক্ষারও।

মোটর থেকে নেমে, ব্যারাজ পরিক্রমণ করে, আমরা আবার মোটরে উঠে বসি। কিছুক্ষণ পরেই আসানসোলে, বেথ্ রোডে, পুত্রের গৃহে উপনীত হই। নিরাপদেই পরিসমাপ্তি হয় এক ভীতিপূর্ণ বিপদসঙ্কুল যাত্রা। হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয় সমস্ত আকাশ, অবলুপ্ত হয় দিগন্ত ঘন মেঘের অন্তরালে, সুরু হয় বৃষ্টি, পড়ে অবিরাম গতিতে।

পরের দিন সকালে, স্নানান্তে, প্রচুর জলযোগ করে আমরা বরাকরের দেউল দেখতে রওনা হই, মোটরে চড়ে যাই, সঙ্গী হন পুত্রের সতীর্থ মিঃ ব্যানার্জি, মিঃ গাঙ্গুলী, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, পুত্রবধূ মঞ্জু ও পৌত্র গৌতম। জি. টি. রোড দিয়ে গাড়ী চলে, উঁচু নিচু রাস্তায়, কখন উর্ধ্বে ওঠে, কখনও নিচুতে নামে, সর্পিল গতিতে অতিক্রম করে শহর। অগ্রসর হয় গাড়ী, দেখি দু'পাশের বন্ধুর প্রান্তর আর বনবীথি স্পর্শ করে দিগন্তের ছোট নাগপুরের শৈলমালার চরণ। মুগ্ধ হ'য়ে দেখি প্রকৃতির এক নয়নাভিরাম পরিবেশ। দূর থেকে দেখি দক্ষিণে ইস্পাত নগর কুলটি। কিছুক্ষণ পরেই দৃশ্যমান হয় কলনাদিনী বরাকর নদী, এপারে তার বাংলার বর্ধমান জেলা অপর পারে বিহারের মানভূম। এপারে আজও অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে চারিটি প্রস্তর নির্মিত দেউল, প্রহরী হ'য়ে আছে তারা পশ্চিমবঙ্গের। ক্রম হ্রস্বায়মান শিখরাকার তাদের শিখরের গঠন, অনুরূপ বেগুনের; তাই পরিচিত তারা বেগুনিয়া নামে। মন্দিরের সামনে এসে গাড়ী থামে। গাড়ী থেকে নেমে, খানিকটা বন্ধুর পথ অতিক্রম করে, আমরা একটি প্রাঙ্গণে উপনীত হই। দেখি অঙ্গণ আলো করে দাঁড়িয়ে আছে চারিটি মন্দির। সবগুলিই শৈব মন্দির পূজিত হ'তেন তাদের গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ, মূর্তি দেখি শিবের বাহন নন্দীরও (বৃষভের), মূর্তি সিদ্ধিদাতা গণেশের আর দুর্গার। সবগুলিই রেখ দেউল,

ঈষৎ বক্র রেখায় শিখরাকৃতি হ'য়ে উর্ধ্বে ওঠে তাদের ছাদ, শীর্ষে নিয়ে আমলক আর চূড়া। কিন্তু কন্‌কেভ্‌ অন্তঃবর্তুলাকার তাদের আমলকের সূক্ষ্মাগ্র ধারগুলি, কন্‌ভেকস্‌ বহিঃবর্তুলাকার নয় উড়িষ্যার আমলকের অঙ্গের ধারের মত। বৈশিষ্ট্য বাংলার, বৈশিষ্ট্য সুরাষ্ট্রেরও।

আমরা একে একে দেখি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্দিরটি। দেখি ঘুরে ঘুরে তাদের নির্মাণ কৌশল, তাদের গঠন পদ্ধতি, মুগ্ধ হ'য়ে দেখি চারিপাশ থেকে তাদের পগের অঙ্গের অলঙ্করণ আর মূর্তির সম্ভার। স্থপতিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, চতুর্থ মন্দিরের সামনে উপনীত হই।

দাঁড়িয়ে আছে চতুর্থ সর্বশেষ প্রান্তে, সর্বাঙ্গে নিয়ে আপন বৈশিষ্ট্য এক সীমাহীন সৌন্দর্য। শীর্ষে নিয়ে আছে এই দেউলটি পবিত্র নগর ভুবনেশ্বরের প্রাচীনতম মন্দির পরশুরামেশ্বরের অনুরূপ শিখারা। তাই সমপর্যায়ে পড়ে পরশুরামেশ্বরের, সমসাময়িকও নির্মিত হয় অষ্টম শতাব্দীতে, প্রাচীনতমও এই চারিটি দেউলের মধ্যে। প্রাচীনতম রেখদেউল বাংলারও, পূর্বসূরী বাংলার সমস্ত রেখদেউলের—প্রাচীনতর সুন্দরবনের জটার দেউলের, বর্ধমানের ইছাই ঘোষের দেউলের, বাঁকুড়ার বাহুলাড়া গ্রামের সিদ্ধেশ্বরের দেউলের, বিষ্ণুপুরের রেখদেউলের, আর দোহারের ষাঁড়েশ্বরের ও মল্লেশ্বরের দেউলের। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে অঙ্গে নিয়ে আছে তার আমলকও সূক্ষ্মাগ্র কন্‌কেভ ধার। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে তার উর্ধ্বাংশের চার কোণের রাহাপগের অঙ্গের ক্ষুদ্র আমলকগুলি, স্থাপিত পর্যায়ক্রমে এক একটি ভূমির উপর। দেখি তার অঙ্গের রাহাপগ বিভাজক নিরবচ্ছিন্ন রেখাও। দেখি চারিপাশ থেকে তার অঙ্গের অলঙ্করণ, মূর্তিসম্ভারও—দেখি মূর্তি বুদ্ধের মূর্তি কত দেব-দেবীরও। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি, তার গর্ভগৃহে বিরাজ করেন শিবলিঙ্গ। বুকে নিয়ে আছে এই বৈশিষ্ট্য সৌরাষ্ট্রের সুপ্রাচীন প্রস্তরের মন্দিরও।

নির্মিত হয় অপর তিনটি মন্দির নবম ও দশম শতাব্দীতে। উত্তরসূরী তারা চতুর্থ মন্দিরের নিকৃষ্টতর গঠন রীতিকে, মহিমময় তাদের একটির গর্ভগৃহের গণেশের মূর্তিটি, মুগ্ধ হয়ে দেখি। কিন্তু নাই তাদের অঙ্গে চতুর্থ মন্দিরের সুষমা, নাই সে সৌন্দর্য, নাই সে অপরূপ রূপ, মহিমন্বিত নয় তারা স্থপতির হৃদয়ের ঐশ্বর্যে আর মনের মাধুরীতে। প্রণতি জানাই স্থপতিকে আর

ভাস্করকে, জানাই স্রষ্টা নৃপতিদেরও। মন্দির থেকে বার হ'য়ে এসে মোটরে উঠে বসি। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি যা অক্ষয় হ'য়ে আছে মনের মন্দিরে।

চার মাইল অতিক্রম করে আমাদের বাহন কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরের সামনে এসে থামে। মানভূমের পঞ্চকোটের রাজা এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। অন্যতম প্রাচীনতম শক্তিপীঠ এই কল্যাণেশ্বরী, আবাস স্থল কত শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক সাধুরও, বুকে নিয়ে আছে প্রাচীনতম ঐতিহ্য। হ'ত এই মন্দিরে নরবলিও।

গাড়ী থেকে নেমে, মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণ থেকে, পূজার উপকরণ কিনে নিয়ে, একটি অঙ্গন অতিক্রম করে, মন্দিরে প্রবেশ করি। সঙ্গী হন পুত্রবধূ। দেবতাকে পূজা ও দর্শন করে, দেখি মন্দিরটি। সুপ্রাচীন নয় এই মন্দিরটি, মহিমন্বিত নয় ভাস্করের হস্তের স্পর্শেও।

মন্দির থেকে বার হয়ে এসে আবার মোটরে উঠে বসি। মোটর ছাড়ে, অগ্রসর হয় মাইথন অভিমুখে। দামোদর পরিকল্পনার সুন্দরতম অবদান এই মাইথন, এক গৌরবময় কীর্তি, এক মহিমময় সৃষ্টি ভারতের পূর্ত-শিল্পীর, মহা তীর্থ কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরের নিকট অবস্থিত। শুনি মাই-কি-থান, মায়ের স্থান থেকেই তার এই মাইথন নামকরণ। দু'পাশে লতাগুল্ম, ঘন বনবীথি আর কণ্টকগুচ্ছ তার মাঝে মাঝে এক একটি শৈলশৃঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে, অঙ্গে নিয়ে সবুজ আভরণ, রুদ্ধ করে আছে পথ। তাদের মধ্য দিয়ে পথ যায় সর্পিল গতিতে। নিঃশেষিত হয় পথ শৈলমালার প্রান্তে এসে, স্পর্শ করে গিরিবরের চরণ, প্রণতি জানায়। তার পর আবার নিষ্ক্রান্ত হয় পথ, অগ্রসর হয় গিরিবরকে পশ্চাতে রেখে। চলে এক লুকোচুরি খেলা শৈল-শৃঙ্গে আর পথে, দেখি মুগ্ধ হ'য়ে। দেখি দক্ষিণে, বারাকরের স্রোত চঞ্চল বুকে কত অসংখ্য শৈলশৃঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে পৃথক হ'য়ে, আছে নিভৃতে, নির্জনে, মহামহিমময় রূপে আছে, হ'য়ে আছে অপরূপ। বামে, গিরি কন্দরে মাইথন ড্যাম, অতিক্রম করে তার বুক বরাকরের জল, অমিত বিক্রমে, উন্মত্ত গর্জনে, অবিরাম গতিতে। দেখি দেবশিল্পীর এক সুন্দরতম নয়নাভিরাম সৃষ্টি, এক নন্দনকানন, এক অমরাবতী, এক মহাগৌরবময় সৃষ্টি মানব শিল্পীরও, এক সুমহান কীর্তি। তাই অভিনব এই মাইথন, অপরূপ।

আমরা সেতু অতিক্রম করে উপনীত হই অপর পারে, অতিক্রম করি এক

অলোকসুন্দর পরিবেশ, দেখতে দেখতে যাই বরাকরের অভিনব রূপ। পৌছাই জি. টি. রোডে।

আসানসোলের দিকে কিছু দূর অগ্রসর হ'য়ে আমাদের বাহন দক্ষিণে মোড় নেয়, পাঞ্চেত দেখ্‌তে যাই। অন্যতম অবদান দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার এই পাঞ্চেতও। অতিক্রম করি ঘন বনবীথি, করি লতাগুল্মও, পার হ'য়ে যাই ছয় মাইল পথ, উপনীত হই পাঞ্চেত ড্যামে। অলোকসুন্দর নয় এই রাস্তা। মাইথনের পথের মত রহস্যময়ও নয়। সেতুর এপারে এসে আমাদের মোটর থামে। দীর্ঘতর এই সেতুটি মাইথনের সেতুর চাইতে, আমরা পদব্রজে অতিক্রম করি। দেখি সম্মুখে প্রসারিত দামোদর, স্পর্শ করে তার অচঞ্চল বুক ছোটনাগপুরের এক ধ্যানমৌনী গিরিবরের চরণ, বন্দনা করে গিরিবরকে। দেখি অতিক্রম করে তার জলরাশিও লক্‌গেট্‌ "বন্ধনী" উপনীত হয় অপর পারে, মুখরিত হয় চারিদিক তার কলনাদে, মুখর হয় দিগন্ত। প্রণতি জানাই দামোদরকে, জানাই বরাকরকেও। সুমহান দামোদর, সৌম্য, প্রশান্ত, অচঞ্চল নিস্তরঙ্গ। চঞ্চলা, সুমধুরহাসিনী, কলনাদিনী, রহস্যময়ী বরাকর, অনন্ত যৌবনা।

ফিরে আসি পুত্রের গৃহে, তখন দ্বিপ্রহরের প্রখর কিরণে দিগন্ত উদ্ভাসিত। তার পরেও একদিন প্রণতি জানাই কল্যাণেশ্বরী মাতাকে আর দর্শন করি মাইথন, সঙ্গে নিয়ে স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ আর পৌত্রী মালবিকাকে আর নিয়ে শ্রদ্ধেয় জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, পুত্রপ্রতিম ফণীন্দ্রনাথ মজুমদার আর তার পত্নী রেণুকে। ক্ষুদ্র ষ্টীমারে আরোহণ করে ভ্রমণ করি সারা হ্রদটি। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি সূর্যাস্ত তার ডেকে দাঁড়িয়ে। দেখি অস্তযান দেব দিবাকর গিরি শৃঙ্গের অন্তরালে, রক্তিম হয় গিরিবরের শীর্ষদেশ, রক্তবর্ণ ধারণ করে হ্রদের নিস্তরঙ্গ বুক করে দিগন্তও, শেষে মিলিয়ে যায় অসীমে সেই লাল আভা। কণ্ঠে উচ্চারিত হয়

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর—"

মহা সুন্দরকে বরণ করে পুত্রের গৃহে ফিরে আসি। আজও অক্ষয় হ'য়ে আছে মাইথনের স্মৃতি মনের মণিকোঠায় হয় নাই ম্লান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হালিশহর

শিবের মন্দির

বহুদিন থেকেই লুক্কায়িত ছিল মনের মণিকোঠায় হালিশহরে, সাধকপ্রবর অপূর্ব শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা রামপ্রসাদের জন্মভূমি দেখবার এক বাসনা। তীব্রতর হয় সেই বাসনা চলচ্চিত্রের পর্দায় সাধক রামপ্রসাদ দেখবার পর। শেষে একদিন, সত্যই সুযোগও এসে যায়, আসে অতর্কিতে। সম্ভব হয় তাঁর জন্মভূমি দর্শন, সহজ হয়।

উপেনদার বাড়ীতে বসে, তাঁর সঙ্গে সাহিত্য আলোচনায় নিযুক্ত, এমন সময় এক সুদর্শন যুবক এসে উপেনদাকে প্রণাম করে বলেন, তাঁরা হালিশহর অধিবাসী, যদিও তাঁদের বর্তমান নিবাস বালিগঞ্জে, পরিচালিত হয় নাকি তাঁদের অর্থে সেখানে একটি বিদ্যালয়। বলেন শীঘ্রই সেখানে সাধকপ্রবরের গৃহে একটি কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁরাই হবেন উদ্যোক্তা। আহ্বান করা হবে একটি সভাও এই উৎসব উপলক্ষে, পৌরোহিত্য করবেন সেই সভায় বাংলার এক বিখ্যাত মনীষী। প্রধান অতিথি হবেন এক বিচারপতি। সম্মানিত অতিথি হওয়ার জন্য উপেনদাকে অনুরোধ করা হ'চ্ছে। তিনি রাজী হ'লে নির্দিষ্টদিনে, তাঁকে মোটরে করে হালিশহরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। উপেনদাদের আদিনিবাসও হালিশহরে, তাই তিনিও সহজেই রাজী হয়ে যান। এই সুযোগে, বহু বৎসর পরে দর্শন হবে তাঁর মাতৃভূমিও। স্থির হয় আমাকেও উপেনদার বাহন হয়ে যেতে হবে।

নির্দিষ্ট দিনে, দ্বিপ্রহরে, উদ্যোক্তাদের এক পরমাত্মীয়ার মোটরে চড়ে উপেনদা, আমি, মহিলাটি ও আরও একজন হালিশহরবাসী হালিশহর অভিমুখে রওনা হই।

আমাদের মোটর ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে চল্লিশ মাইল গতিতে

ছোটে। ব্যারাকপুরের পুলিস ফাঁড়ি অতিক্রম করে ডানদিকে মোড় নেয়। তারপর সর্পিল গতিতে অগ্রসর হয়। আঁকা বাঁকা রাস্তা, অপ্রশস্তও, মন্থর হয় বাহনের গতি। কোথাও পথের দু'পাশের দিগন্তপ্রসারিত সবুজ ক্ষেতের, কোথাও দু'পাশের সুবৃহৎ শিল্পালয়ের ভিতর দিয়ে আমাদের মোটর চলে। কোথাও আমরা অতিক্রম করি একটি ক্ষুদ্র নগর। পার হয়ে আসি একে একে পলতা, ইছাপুরের বন্দুক তৈরীর শিল্পালয়, শ্যামনগরের কাপড়ের কল, কাঁকিনাড়ার পাটের কল, উপনীত হই নৈহাটিতে। দেখি দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনে একখানি পূর্বদিকগামী ট্রেন।

বাঁ দিকে মোড় নিয়ে, আমাদের মোটর মহাপবিত্র গঙ্গার তটের উপর দিয়ে অগ্রসর হয়। এপারে তার নৈহাটী। এই নৈহাটীরই পাঁচ মাইল দূরে, কাঁটালপাড়ায় সাহিত্য-সম্রাট বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, বাংলার ঋষি, বন্দেমাতরম মন্ত্রের উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন, ওপারে হুগলিতে মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ধন্য হয় বাংলা দেশ তাঁদের আবির্ভাবে।

তার পাশেই ভাটপাড়া, পরিচিত ভট্টপল্লী নামেও; পরবর্তী কালের নবদ্বীপ। সমপর্যায়ে পড়ে বাংলার নবদ্বীপ আর ভাটপাড়া বিদ্যাচর্চায়, শাস্ত্র আলোচনায়, পড়ে শিক্ষাদানেও। অমর হ'য়ে আছে ইতিহাসের পাতায়, অমরত্ব লাভ করেছেন তাদের অধিবাসী বিশ্ব বিশ্রুত পণ্ডিতরাও।

বুকে নিয়ে আছে ভাটপাড়া কয়েকটি মন্দির। তাদের অধিকাংশই শৈব মন্দির। প্রাচীনতম তাদের মধ্যে দুইটি বাংলা শৈব মন্দির, স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা করেন বীরেশ্বর ন্যায়লঙ্কার ১৭২৭—২৮ খ্রীষ্টাব্দে। নির্মিত হয় বাঁধাঘাটেও দুইটি শিবের মন্দির ১৭৩৭—৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, বাণেশ্বর পঞ্চানন নির্মাণ করেন। রামকৃষ্ণ সার্বভৌমও প্রতিষ্ঠা করেন একটি পঞ্চরত্ন মন্দির ১৭৬৯—৭০ খ্রীষ্টাব্দে একটি নবরত্ন মন্দিরও ১৭৭৩—৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। দুইটিই শৈব মন্দির শীর্ষে নিয়ে আছে তারা একটি করে মূল শিখর ও প্রথমটি চারিটি আর দ্বিতীয়টি আটটি অঙ্গ শিখর। প্রতিষ্ঠিত হয় দুইটি শৈব মন্দির রামশঙ্কর তর্কবাগীশ কর্তৃকও ১৮০২—৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠা করেন ভোলানাথ ঠাকুর ১৮১৯—২০ খ্রীষ্টাব্দে একটি নবরত্ন শিবের মন্দির। নির্মিত হয় ভাটপাড়ায় আরও অনেক মন্দির, ছড়িয়ে আছে তার পথে ঘাটে, বুকে নিয়ে আছে

তারা বাংলায় শিল্পীর বহুশত বৎসরের সাধনার দান, সুন্দরতম মহিমময় সৃষ্টি তার স্থপতির আর ভাস্করের।

ভাটপাড়া অতিক্রম করে, আমাদের মোটর হালিশহরে উপনীত হয়। অতিক্রম করি আমরা প্রকৃতির এক সুন্দরতম, নয়নাভিরাম পরিবেশ। বামে, প্রবাহিতা তরঙ্গ সঙ্কুল ভাগীরথী শোনা যায় তাঁর মৃদু গুঞ্জন, কানে ভেসে আসে তাঁর অন্তরের ধ্বনি, দক্ষিণে বালির চড়ার উপর বিরল বসতি। দেখি, মুগ্ধ বিস্ময়ে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কত দৃশ্য—দৃশ্য বৈষ্ণবাচার্য ঈশ্বরপুরীর, তাঁর সফল মনোরথ হয়ে গয়া থেকে স্বগৃহে ফিরে আসার। অবশেষে হন তিনি বিজয়ী, সক্ষম হন তিনি ন'দের নিমাই পণ্ডিতকে মন্ত্রে দীক্ষিত করতে, চালিত করতে যুগাবতারকে তাঁর নির্দিষ্ট পথে। উপকৃত হয় বাংলা দেশ, হয় ভারতবাসী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমের বন্যায় ভেসে যায় চতুর্দিক। বিদূরিত হয় পাপ, বিলুপ্ত হয় অধর্ম, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় ধর্ম। দৃশ্য মাতৃসাধক রামপ্রসাদের নিত্য গঙ্গা স্নানের, কন্যারূপে মাতার তাঁর অঙ্গনের বেড়া বাঁধার। আরও কত দৃশ্য। কানে ভেসে আসে—"আমায় দেমা তবিলদারী, আমি নেমকহারাম নই শঙ্করী।"

দক্ষিণে মোড় নিয়ে আমাদের মোটর একটি সরু গলির মধ্যে প্রবেশ করে। কয়েকটি প্রাচীন মন্দির ও অর্ধ ভগ্ন জরাজীর্ণ অট্টালিকার পাশ দিয়ে, বঙ্কিম গতিতে গিয়ে উপনীত হয় সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের গৃহের প্রাঙ্গণের সংলগ্ন রাস্তার উপর।

অন্যতম প্রাচীনতম নগর বাংলা দেশের এই হালিশহর, পরিচিত হাবেলী-শহর আর কুমারহট্ট নামেও। সম্ভবতঃ এইখানেই ছিল বাংলার শেষ হিন্দু স্বাধীন রাজা, সেনবংশের রাজাদের রাঢ়দেশের রাজধানী, পরিচিত ছিল তখন বিজয়পুর নামে, সুহ্মদেশের অন্তর্গত ছিল।

বুকে নিয়ে ছিল এই হালিশহরই মুসলমান শাসকের কত উত্থান পতনের ইতিহাস কত জয় পরাজয়ের। বুকে নিয়ে ছিল কত অট্টালিকা, কত হর্ম্য, কত রাজপ্রাসাদ, খ্যাতিলাভ করেছিল হাবেলী শহর নামে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে, হালিশহর পরগণা গঙ্গোপাধ্যায় গোত্রীয় সাবর্ণ চৌধুরীদের আদিপুরুষ পাঁচুশক্তি খানের অধীনে আসে। তাঁর সময়েই

বিক্রমপুর থেকে বৈদ্যরা আর কোন্নগর থেকে কায়স্থরা এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন। গড়ে ওঠে "হালিশহর সমাজ"। এইখান থেকেই সাবর্ণ চৌধুরীদের বিভিন্ন শাখা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন স্থানে বঁড়িশা বেহালা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

জন্ম গ্রহণ করেন তাঁর প্রপৌত্র লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, অধিকারী হন তিনি এক বিস্তৃত জমিদারীর। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন মন্দির কালীঘাটে আর হালিশহরে। নির্মাণ করেন নাকি একটি রাজপথও হালিশহর থেকে বঁড়িশা পর্যন্ত। স্পর্শ করে সেই পথ কালীঘাটের কালিকাদেবীর মন্দিরের পদতল।

তাঁর পুত্র রাম রায়, সমসাময়িক দিল্লীর প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ মহামতি আকবরের। রাম রায়ের পৌত্র বিদ্যাধরের আমলে সাবর্ণ চৌধুরীদের হস্তচ্যুত হয় হালিশহর। বিভক্ত হয় দুই অংশেও। বৃহত্তর অংশ নবদ্বীপ অধিপতি রাজা রাঘব রায়ের অধিকারে আসে, ক্ষুদ্রতর অংশ বাঁশবেড়িয়ার দত্ত রাজাদের। বিভক্ত হয় বাঁশবেড়িয়ার অংশও দুই ভাগে, বাঁশবেড়িয়ার প্রসিদ্ধ রাজা রামেশ্বর রায়ের মৃত্যুর পর।

গড়ে ওঠে সাবর্ণ চৌধুরীদের প্রচেষ্টায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় হালিশহর—কুমারহট্টে, একটি সাংস্কৃতিক ও সুধীসমাজ। বাস করেন এসে এখানে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বংশ। সমপর্যায়ে পড়ে হালিশহর নবদ্বীপ আর ভাটপাড়ার, তাদের বিদ্যাবত্তার ও পাণ্ডিত্বের গৌরবে। অন্যতম তাঁদের মধ্যে কামালপুরের ভট্টাচার্য বংশ। এই বংশেরই কামদেব বিদ্যাবাচস্পতি, এক দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক অলঙ্কৃত করেন শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের রাজসভা, অন্যতম তাঁর সভার নবরত্নেরও। প্রতিযোগিতা হয় তাঁদের সঙ্গে ভাগীরথীর অপর পারের বাঁশবেড়িয়ার সুবিখ্যাত পণ্ডিতদের।

এই হালিশহরেই, রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পরিবারে, বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তাঁর শ্যামসুন্দর আচার্য, রচয়িতা তিনি সংস্কৃত ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃতের। অন্যতম তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর দ্বাদশ শিষ্যের, তাঁর কাছে গয়াতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। চৈতন্য ডোবা নামে পরিচিত হয় তাঁর বাস্তভিটা, প্রতিষ্ঠিত হয় তার সামনের, একটি সুন্দর মন্দিরের ভিতর, গৌর নিতাই মূর্তি।

এই হালিশহরেই বাসের জন্য গৃহ নির্মাণ করেন নবদ্বীপ অধিবাসী, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের লীলাসহচর, শ্রীবাস পণ্ডিত। বাসস্থান পদাবলী রচয়িতা বাসুদেব ঘোষের আর কীর্তনীয়া মাধবেরও, বিস্তৃত হয় বৈষ্ণব ধর্মও হালিশহরে।

নির্মিত হয় বহু মন্দিরও। প্রাচীনতম তাদের মধ্যে শৈব মন্দিরগুলি, ছড়িয়ে আছে গঙ্গার তীরে, আছে তার পথেঘাটে, পরিণত হয়ে আছে জীর্ণ অবস্থায়, বুকে নিয়ে আছে তাদের পূর্ব গৌরব ও বাংলার শিল্পীর ঐতিহ্য। চার-চালা বাংলা মন্দির কোনটি, কোনটি পঞ্চরত্ন শীর্ষে নিয়ে আছে একটি মূল ও চারিটি অঙ্গ শিখর। তার চৌধুরী পাড়ায় শ্যাম রায় বিরাজ করেন, সিকদার পাড়ায় রাধাগোবিন্দ, আর বারেন্দ্র গলিতে মদনমোহন। পূজিতা হন শক্তিও—বলিদাঘাটায় সিদ্ধেশ্বরী দেবী, খাসবাটীতে শ্যামাসুন্দরী আর শ্মশানকালী শ্মশানঘাটে।

জন্মগ্রহণ করেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই হালিশহরেই রামপ্রসাদ। মাতৃমন্ত্রের সাধক তিনি, রচনা করেন মুখে মুখে কত অসংখ্য সঙ্গীত। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের বিশিষ্ট সুরে গীত মাতৃসংগীতে মুখরিত হয় হালিশহরের আকাশ বাতাস। হয় সারা বাংলা দেশ। প্রবর্তিত হয় রামপ্রসাদী সুর, রামপ্রসাদী গান। মুগ্ধ হয় সেই গান শুনে বাংলার জনসাধারণ, হন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা আর নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও। সহায়ক হয় সেই সংগীত কত সাধকের মাতৃসাধনারও। আজ হালিশহর হারিয়েছে তার পূর্বগৌরব, কিন্তু বিস্মৃত হয় নাই তার অধিবাসীরা তার ঐতিহ্যের ইতিহাস। তার পরিচায়ক এই মহৎ সভা।

আমরা মোটর থেকে নেমে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে, মন্দিরের সামনে উপনীত হই। নগ্নপদে, সোপাণশ্রেণী অতিক্রম করে, মন্দিরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কালী মূর্তিটি দর্শন করি। শোভন গঠন অপরূপ এই মূর্তিটি। মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি। তারপর বহুকষ্টে জনারণ্য ভেদ করে এসে, মঞ্চের এক কোণে স্থান সংগ্রহ করি। দেখি, সমবেত হয়েছেন হাজার তিন চার নর ও নারী—এসেছেন তাঁরা গঙ্গার উভয় তীরবর্তী গ্রাম থেকে, কলিকাতা থেকেও এসেছেন, এসেছেন কত মনীষী আর সুধীও।

কিছুক্ষণ পরেই সুরু হয় সভা। ভাষণ দেন কর্মসচিব, বর্ণনা করেন

সাধক প্রবরের কত কীর্তির কাহিনী। পরিশেষে বিবৃত হয় এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার পটভূমিকাও। বলেন, এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন সিলেটের এক অধিবাসী। মা তাঁর হাত ধরে, অতিক্রম করেন কত পর্বত, কত বন উপবন, কত পথ আর প্রান্তর, কত নদ নদী, উপনীত হন গঙ্গাতীরে। সেখান থেকে একটি সর্পিল পথ দিয়ে একটি গৃহের প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে একটি পঞ্চ মুণ্ডের আসন অপর প্রান্তে একটি অট্টালিকা। সেই আসনে বসেই সাধক প্রবর রামপ্রসাদ সিদ্ধি লাভ করেন। বলেন মাতা এইখানেই প্রতিষ্ঠা কর আমার মূর্তি। নিদ্রা ভঙ্গে, স্বপ্নে দেখা পথ দিয়ে এসে, তিনি উপনীত হন রামপ্রসাদের বাস্তুভিটায়। লাগে কয়েক বৎসর। পরিচিত হন সেখানকার বিশিষ্ট অধিবাসীদের সঙ্গে, বলেন তাঁদের কাছে স্বপ্নের কথা। প্রস্তাব করেন নিজের অর্থে এখানে মা কালীর একটি প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবারও। কিন্তু বিলম্ব হয় মূর্তি নির্মাণ করতে। লাগে দীর্ঘ আট বছর। অদ্য সকালেই মহাআড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ সেই মাতৃমূর্তি। প্রতিষ্ঠাতাও উপস্থিত, সমর্থম করেন তিনিও কর্মসচিবের উক্তি।

তারপর সুরু হয় এক এক বক্তার দীর্ঘ বক্তৃতা। ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে। অসহনীয় গরমে আর লোকের ভীড়ে দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হয়। অতি কষ্টে নিশ্ছিদ্র, নীরন্ধ্র, আট দশ ফুট ঘন নরনারীর প্রাচীরের বেষ্টনী ভেদ করে, বাইরে বেরিয়ে আসি—ফেলি স্বস্তির নিঃশ্বাস।

দেখি পঞ্চ মুণ্ডের আসন। এক পুস্তক বিক্রেতার দোকান থেকে একখানি রামপ্রসাদের রচিত সঙ্গীতের বই কিনি।

হঠাৎ দেখা হয়ে যায় আমার দিল্লীর সতীর্থ মুকুল বন্দোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে। শুনি, তিনিও হালিশহরবাসী। বলেন তিনি, আছে নাকি হালিশহরে, বারেন্দ্র গলিতে, কয়েকটি প্রাচীন শিবের মন্দির, দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি গঙ্গার তীরেও। দেখি, দাঁড়িয়ে আছে কয়েকখানি সোয়ারী বিহীন সাইকেল রিকসা, এসেছে তারা সভায় যাত্রী নিয়ে। তাদেরই একখানিতে দুইজনে চড়ে বসি, অবিলম্বে বারেন্দ্র গলি অভিমুখে রওনা হই। যাই মন্দির দর্শনে। কিছুক্ষণ পরেই বারেন্দ্র গলিতে উপনীত হই। রিকসা থেকে নেমে দেখি একে একে সবগুলি মন্দিরই। সবগুলিই পরিত্যক্ত শৈব মন্দির, বাংলা

চার চালা পদ্ধতিতে নির্মিত। তারা সমসাময়িকও। একটির অঙ্গের উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায়, নির্মিত হয় মন্দিরটি ১৬৬৫ শকাব্দে। বুকে নিয়ে আছে মন্দিরগুলি প্রকৃষ্টতম নিদর্শন বাংলার ভাস্করেরও। অলঙ্কৃত করেন মহাঅভিজ্ঞ ভাস্কর তাদের প্রাচীরের গাত্র কত সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম বিচিত্র লতাপল্লব দিয়ে, কত জীবন্ত মুখর পৌরাণিক কাহিনী দিয়েও।

সিংহ বাহনে দাঁড়িয়ে আছেন অপরূপ চন্দ্রাতপের নিচে, মহিষমর্দিনী তাঁর দুই পাশে দুই দেবী দাঁড়িয়ে আছেন। বেষ্টিত তাঁর চারিদিক অনবদ্য, সূক্ষ্মতম শঙ্খলতা আর প্রস্ফুটিত পদ্ম দিয়ে। ঊর্ধ্বে শোভা পায় দুইটি পল্লবগুচ্ছ, বিভক্ত প্রস্ফুটিত পদ্মের ঝালর দিয়ে। সুন্দরতম প্রস্ফুটিত পদ্মের ঝালর দিয়ে ভূষিত সিংহাসনের পাও। দেখি মুগ্ধ হয়ে।

অপরূপ কিন্তু বৃষভবাহনে মহাদেবের মূর্তির চারিপাশের পদ্মের বেষ্টনী। সুন্দরতম তার ঊর্ধ্বদেশের দুই পল্লব গুচ্ছের চারিদিকের প্রস্ফুটিত পদ্মের বেষ্টন এক পাশে তার শঙ্খলতা, অপর পাশে সূক্ষ্মজালির পাড়। স্তব্ধ হয়ে দেখি।

দেখি কত যুদ্ধের দৃশ্যও—কোথাও হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধ করেন নৃপতি, কোথাও অশ্বপৃষ্ঠে হস্তে নিয়ে দীর্ঘ দণ্ড, প্রোথিত সেই দণ্ড আক্রমণোদ্যত এক ব্যাঘ্রের বক্ষে। কোথাও বা রথারোহণে, সঙ্গে নিয়ে সৈন্য সামন্ত। মহা পরাক্রমশালী সেই রথের অশ্বদ্বয় অগ্রসর হয় বীর বিক্রমে। কোথাও মুখোমুখী হয়ে যুদ্ধ করেন দুই অশ্বারোহী ঊর্ধ্বে প্রক্ষিপ্ত অশ্বের সম্মুখের পদদ্বয়। প্রোথিত অশ্বারোহীদের হস্তে ধৃত দীর্ঘ দণ্ড বিপক্ষের অশ্বের বুকে। যুদ্ধ দেখি কুরু পাণ্ডবের। দেখি আরোহীবিহীন একটি অশ্বও। দেখি নৌবাহিনীও অগ্রসর হয় নৌকায় চড়ে।

দেখি, ঊর্ধ্বে এক যুদ্ধের দৃশ্য, নিম্নে বাহিত হয় একটি আহত সৈনিক। বহন করে নিয়ে যায় তাকে চারিটি সৈনিক, দু'জন সামনে দু'জন পিছনে। বেষ্টিত এই দৃশ্যের চতুর্দিকও প্রস্ফুটিত পদ্মের বেষ্টনীদিয়ে।

দেখি আরও কত দৃশ্য। দৃশ্য দেখি রাজসভার। সিংহাসনে বসে আছেন নৃপতি, তাঁর সামনে দুই দম্পতি। দূরে দাঁড়িয়ে দুই পরিচারক, একজন হস্তে নিয়ে আছে হুঁকা অপরজন একটি দণ্ড। তাদের অঙ্গে শোভা পায় আলখেল্লা

শিরে শিরস্ত্রাণ। যত দেখি, বিস্ময় বাড়ে তত। খুব সম্ভব এই শিল্পী গোষ্ঠীই নির্মাণ করেন সুরধুনীর অপর তীরের বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেবের অপরূপ মন্দিরটিও। তাই সমপর্যায়ে পড়ে এই মন্দিরগুলি, গঠনে, আর অঙ্গের সুন্দরতম তম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণে। তাদের প্রাচীরের গাত্রের পৌরাণিক কাহিনীও লাভ করে অনবদ্য রূপ, পায় পূর্ণ বিকাশ, সম্পূর্ণ পরিণতি।

শিল্পীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে, রিকসায় চড়ে গঙ্গারতীরে উপনীত হই। দেখি দাঁড়িয়ে আছে সেখানেও কয়েকটি পঞ্চরত্ন মন্দির, বুকে নিয়ে আছে বাংলার স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন।

ফিরে আসি সভাস্থলে। কিছুক্ষণ পরেই পরিসমাপ্তি হয় সভারও। আমাদের সঙ্গে নেওয়া বিস্কুট ও "গিরিশে"র সন্দেশ দিয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করে মোটরে উঠে বসি। রাত্রি দশটায় ফিরে আসি গৃহে।

আজও অক্ষয় হয়ে আছে হালিশহরের স্মৃতি মনের মণিকোঠায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাঁশবেড়িয়া

১। বাসুদেবের মন্দির ২। হংসেশ্বরীর মন্দির

৬ই নভেম্বর ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। সকাল সাড়ে সাতটায়, পুত্রপ্রতীম অরবিন্দের মোটরে চড়ে, বাঁশবেড়িয়া অভিমুখে রওনা হই। সঙ্গে যান স্ত্রী আর উর্মিলা, আমাদের বোম্বাই-এর প্রবাস জীবনের নিত্যসহচরী। গতি চঞ্চল, হাসিতে উচ্ছল, প্রোজ্জ্বল রহস্যময়ী এই উর্মিলা, সুপ্রতিষ্ঠিত বন্ধুবর ডক্টর ঘোষের বধূ। দর্শন করতে যাই বাসুদেব ও হংসেশ্বরীর মন্দির।

দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দিরের পাশ দিয়ে গিয়ে, বালীর সেতু অতিক্রম করে, পঞ্চাশ মাইল গতিতে আমাদের মোটর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে উপনীত হয়। তারপর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটতে থাকে। কখনও উচ্ছল তরঙ্গসঙ্কুল গঙ্গার তট অতিক্রম করে, কখনও বা দুই পাশের ঘন সন্নিবিষ্ট অট্টালিকার ব্যূহ ভেদ করে সর্পিল গতিতে অগ্রসর হয়।

আমরা একে একে বালী, উত্তরপাড়া কোন্নগর অতিক্রম করে মাহেশে উপনীত হই। দেখি, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাহেশের প্রসিদ্ধ রথটি। শুনি, প্রসিদ্ধিতে মহাপবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথের পরেই এই রথের স্থান। প্রতি বৎসর, রথযাত্রার সময় সচল হয় এই অচল রথ, হয় মহা আড়ম্বরও। সপ্তাহব্যাপী এক বিরাট মেলাও বসে। সমবেত হয় এখানে দেশ বিদেশ থেকে যাত্রী, কত পুণ্য লোভাতুর। মুখরিত হয় মাহেশ তাদের কলধ্বনিতে, প্রকম্পিত হয় তার আকাশ বাতাস।

মাহেশ পেরিয়ে আমাদের মোটর অতিক্রম করে শ্রীরামপুর। এখান থেকেই জেমস্ অগাষ্টাস হিকি, প্রকাশ করেন ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রথম সংবাদ পত্র, পরিচিত বেঙ্গল গেজেট নামে। তখন শ্রীরামপুর ছিল ডেনমার্ক সরকারের অধীনে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরেই ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম

মুদ্রণযন্ত্র প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক ও বাংলার আদি গদ্যের স্রষ্টা, উইলিয়ম কেরির প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায়। এই মিশন প্রেসেই, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর উদ্যমেই প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষায় বাইবেল। তাঁর সহযোগিতা করেন চুঁচুড়া নিবাসী রামরাম বসু। এই শ্রীরামপুরই তাঁর কর্মের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। রচিত হয় তাঁর নেতৃত্বে এই খানেই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮১৫ তে বাংলা ভাষায় তেরখানি গ্রন্থ; রচনা করেন কেরি, রামরাম বসু, গোলোকনাথ শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও আরও কয়েকজন লেখক। জন্মগ্রহণ করেন কেরি ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই অগাষ্টে, ইংলণ্ডে, নর্দাম সায়ারে, পলাশ পিউরি গ্রামে এক অখ্যাত তন্তুবায় পরিবারে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, ১৩ই নভেম্বর তিনি মরিয়া জাহাজে চড়ে কলিকাতায় উপনীত হন। মৃত্যুবরণ করেন, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন, তিয়াত্তর বৎসরের কর্মময় ও এক মহাগৌরবময় জীবন যাপন করে। তাই হয়ে আছে শ্রীরামপুরই বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক, পরিণত হয়ে আছে এক মহাতীর্থে। স্থাপিত হয় বাংলার অন্যতম প্রাচীনতম মিশনারী কলেজও এই শ্রীরামপুরেই।

সেখান থেকে মোটর সেওড়াফুলিতে পৌছায়। এখান থেকেই প্রসিদ্ধ তীর্থ তারকেশ্বরে যেতে হয়। ১৭২৯ সালে, দশনামী সন্ন্যাসী মায়াগিরি প্রতিষ্ঠা করেন এই তারকেশ্বরে একটি শৈব মঠ। উত্তর সাধক তিনি জগদগুরু শঙ্করাচার্যের। তাঁর চার প্রধান শিষ্যের শিষ্য স্থাপন করেন দশনামী শৈব সম্প্রদায় পরিচিত তীর্থ, বন, আশ্রম, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী নামে, নিজেদের নামানুসারে। চৈত্র সংক্রান্তিতে, মহাআড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এখানে গাজনের উৎসব। সম্মিলিত হন সেই উৎসবে দেশ দেশান্তরের কত সন্ন্যাসী। একটি বৃহৎ মেলাও বসে।

তারপরে, আমরা একে একে সেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর ও মানকুণ্ডু অতিক্রম করি। চন্দননগরে উপনীত হই। কয়েক বছর আগেও রাজত্ব করতেন এখানে ফরাসীরা।

আমরা অতিক্রম করি একে একে চুঁচুড়া, হুগলী ও ব্যাণ্ডেল। মহাপ্রসিদ্ধ ছিল একদিন চুঁচুড়া ও হুগলি, ছিল মুসলমান শাসকদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল। এইখানেই ডাচ বণিকরা প্রথমে বাণিজ্য সুরু করেন। বুকে নিয়ে আছে হুগলী

কত উত্থান পতনের ইতিহাস, সাক্ষী হয়ে আছে হাজি মহম্মদ মহসিনের অমর কীর্তিরও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইমামবাড়া আর বিদ্যালয় (কলেজ)। ডান দিকে মোড় নিয়ে, আমাদের মোটর অতিক্রম করে দু'পাশের দিগন্ত প্রসারী সবুজ ধান ক্ষেত, উপনীত হয় গঙ্গার তীরে। তারপর, কয়েকটি বঙ্কিম অপ্রশস্থ পথ পার হয়ে এসে, আমাদের মোটর মন্দিরের সিংহ দরজার সামনে এসে থামে।

বাঁশবেড়িয়া, পরিচিত বংশবাটী নামেও, হুগলী জেলায়, গঙ্গার তীরে অবস্থিত। বাঁশের প্রাচুর্যের জন্যই এই স্থানের নাম রাখা হয় বাঁশবেড়িয়া। রাজত্ব করেন এখানে রাঢ়ীয় কায়স্থ দত্ত রাজবংশ। অন্যতম প্রাচীনতম রাজবংশ বাংলাদেশের, সুপ্রতিষ্ঠিতও বাংলার সেন বংশের নৃপতিদের আমল থেকেই, পরিচিত তাঁরা কখনও রায়, কখনও মজুমদার, কখনও বা রাজমহাশয় নামে।

কেউ বলেন উত্তর ভারতের রাজপুত বংশোদ্ভব তাঁদের পূর্বপুরুষ, সামন্ত এক গুর্জর প্রতিহার বংশের, কনৌজ থেকে এসে বাস করেন বঙ্গদেশে, রাঢ়ে, গুর্জর প্রতিহারদের পতনের পর। এই বংশেরই দেবাদিত্য দত্ত, অধিকার করেন এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ মুর্শিদাবাদে। বসতি স্থাপন করেন মুর্শিদাবাদে। ক্রমে বাড়ে তাঁদের ক্ষমতা, বর্ধিত হয় প্রতিপত্তি, তাঁরা ভূষিত হন রায় উপাধিতে।

খুব সম্ভব এই বংশেরই দ্বারকানাথ বর্ধমান জেলায় পাটুলি গ্রামে এসে বাস করেন। তাঁর পৌত্র সহস্রাক্ষ। সহস্রাক্ষের পৌত্র রাঘব দত্ত, দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে, একুশটি পরগণা সমন্বিত একটি বিস্তীর্ণ জমিদারী লাভ করেন। মজুমদার উপাধিতেও ভূষিত হন। জমিদারীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য, সপ্ত-গ্রামের উত্তর পূর্বে, ভাগীরথী তীরে, বাঁশবেড়িয়াতে নতুন বাসস্থান স্থাপন করেন।

তাঁর দুই পুত্র রামেশ্বর ও বাসুদেব। অগ্রজ রামেশ্বর, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, মহাপরাক্রমশালীও, বাঁশবেড়িয়াতে এসে স্থায়ীভাবে বাস করেন। কনিষ্ঠ পাটুলিতেই থেকে যান। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁকে বাঁশবেড়িয়াতে ৪০১ বিঘা জমি দান করেন, ভূষিত করেন রাজামহাশয় উপাধিতেও। লাভ করতে সক্ষম হন নাই সারা ভারতবর্ষে অন্য কোন নৃপতি

রাজামহাশয় উপাধি মুসলমান বাদশাহের কাছ থেকে। তাই পরিণত হয়ে আছে ঔরঙ্গজেবের দেওয়া এই সনদটি একটি মূল্যবান দলিলে, রক্ষিত আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ডকুমেণ্ট গ্যালারিতে। তিনিই বাঁশবেড়িয়াতে গড় বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। গড়ের পরিধি এক মাইল। চতুর্দিকে তার বাঁশের বেষ্টনী। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই রাজ অন্তঃপুরে নির্মাণ করেন বাসুদেবের অপরূপ মন্দিরটি; উৎকীর্ণ আছে মন্দিরের গাত্রে প্রাচীন বাংলা অক্ষরে। সুপণ্ডিত তিনি, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, পৃষ্ঠপোষক বিদ্যার, গড়ে ওঠে বাঁশবেড়িয়াতে একটি সুধী ও বিদ্বৎ সমাজ তাঁর ও পরবর্তী রাজা-মহাশয়দের আমলে। নিযুক্ত হন কাশীর বিখ্যাত নৈয়ায়িক রামশরণ তর্ক-বাগীশ রাজা রামেশ্বরের সভা পণ্ডিত। স্থাপিত হয় বহু টোল আর চতুষ্পাঠী বাঁশবেড়িয়াতে। নিযুক্ত হন বহু সুপণ্ডিত সেইসব টোলের অধ্যাপক। আসেন তাঁরা কাশী, মিথিলা ও আরও অনেক স্থান থেকে। প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তাঁরা বাঁশবেড়িয়াতে এসে। শ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যে তিনটি নৈয়ায়িক বংশ। সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যে রামভদ্র। জন্মগ্রহণ করেন এই বাঁশবেড়িয়াতে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথক শ্রীধর। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় বাঁশবেড়িয়া ঐশ্বর্যে, মনীষীদের জ্ঞানের গরিমায়, সংস্কৃতিতে আর কৃষ্টিতে।

রামেশ্বরের পুত্র রঘুদেব, পরাক্রমশালী তিনিও, প্রতিরোধ করেন মারাঠাদের আক্রমণ। সক্ষম হন না মারাঠারা বংশের বেষ্টনীর বুহ্য ভেদ করতে, প্রবেশ করতে বাঁশবেড়িয়াতে, পরাজিত হন। বিতাড়িত হন রাজ্য থেকেও।

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নৃসিংহ দেব প্রতিষ্ঠা করেন স্বয়ম্ভবার মন্দির, উল্লিখিত আছে মন্দিরের অঙ্গের উৎকীর্ণ শ্লোকে। তিনি যখন নাবালক, অধিকার করেন বাঁশবেড়িয়া রাজ্যের এক বিস্তীর্ণ অংশ বর্ধমান ও নদীয়ার মহারাজা। রাজা নৃসিংহ দেব কয়েক বছর কাশীতে বাস করেন। বিদ্বান তিনি, ধর্মানুরাগীও, সেখানে তিনি বহু বিখ্যাত শৈব ও তান্ত্রিক সাধুর সংস্পর্শে আসেন। সুরু করেন সেই খানেই তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধনাও। শোনা যায় সেই সময়ই, কাশীতেই, তিনি মাতা হংসেশ্বরী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন। কাশী থেকে ফিরে এসে, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি হংসেশ্বরীর মন্দিরের নির্মাণ সুরু করেন। কিন্তু মৃত্যু এসে বিঘ্ন সাধন করে, তৈরী হয় শুধু দ্বিতল মন্দিরের, পরিসমাপ্তি হয় না।

মন্দিরের। পরিসমাপ্ত করেন এই অর্ধ সমাপ্ত মন্দিরের নির্মাণ তাঁর ধর্মপ্রাণা পত্নী রাণী শঙ্করী ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে। লাগে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর আর পাঁচ লক্ষ টাকা। সম্পূর্ণ হয় মন্দির নির্মাণ; প্রতিষ্ঠিত হয় মন্দির, হন দেবী, মহা আড়ম্বরে। নিমন্ত্রিত হন কত মহা পণ্ডিত, কত অভিজ্ঞ অধ্যাপক, কত সুধী, সমাগত হন তাঁরা ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে। উৎকীর্ণ হয় মন্দিরের অঙ্গে একটি শ্লোকও মন্দির নির্মাতাদের বিবরণ দিয়ে।

আজ বাঁশবেড়িয়ার রাজারা হারিয়েছেন সে সমৃদ্ধি, বিভক্ত আজ তাঁদের সম্পত্তি বহু অংশে, তাই লাঘব হয়েছে মন্দিরের পূজার আড়ম্বরও। নিশ্চিহ্ন হয়েছে কালের করালে স্বয়ংভবার মন্দিরটি। সংস্কারহীন সুন্দরতম বাসুদেবের মহামহিমময় মন্দিরটিও। হয়ত ধ্বংসে পরিণত হবে অদূর ভবিষ্যতে, বুকে নিয়ে বাংলার মহাঅভিজ্ঞ শিল্পীর এক অপরাজেয় দান, এক অমূল্য সম্পদ, এক মহাগৌরবময় কীর্তি, এক মহামহিমময় সৃষ্টি। অপূরনীয় ক্ষতি হবে বাংলার, হবে ভারতের, বিশ্বেরও হবে।

আমরা মোটর থেকে নেমে, প্রাঙ্গণ পার হ'য়ে, সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে, হংসেশ্বরীর মন্দিরের সুপ্রশস্ত চাতালে উপনীত হই। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে মন্দিরের বৈশিষ্ট্য। ত্রয়োদশ রত্ন এই মন্দিরটি, শীর্ষে নিয়ে আছে একটি মূল শিখর ও দ্বাদশটি অঙ্গ শিখর, তার ছয়টি তলার উপর। অনুরূপ এই শিখরগুলি আকৃতিতে আর নির্মাণ পদ্ধতিতে, বেষ্টিত হ'য়ে আছে তাদের শীর্ষদেশ ঋজু পদ্মের দল দিয়ে। গর্ভগৃহের সম্মুখের স্তম্ভযুক্ত অলিন্দে উপনীত হই। বুকে নিয়ে আছে দীর্ঘ সরু স্তম্ভগুলি সূক্ষ্ম শিল্প সম্ভার। কেন্দ্রস্থলে একটি জলাধার, কিন্তু নাই তাতে জল।

এগিয়ে গিয়ে প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে গর্ভগৃহে অবস্থিতা দেবীকে দর্শন করি। বিস্মিত হই দেবীর রূপ দেখে। পুরোহিত তখন পূজার উপকরণ প্রস্তুতিতে নিযুক্ত। তাঁর কাছেই শুনি, সুউচ্চ বেদীর উপর শায়িত মহাদেবের নাভি থেকে নির্গত হয়েছে কুণ্ডলিনী শক্তি। সেই শক্তির প্রতীক হয়ে, তাঁর মস্তকের উপর, অষ্টদল পদ্মাসনে উপবিষ্টা দেবী। বিলম্বিত তাঁর দক্ষিণ পদ। তাঁর শিরে শোভা পায় নাড়ির আকার বিশিষ্ট পদ্মের ছত্র। প্রোথিত আছে ও নর মুণ্ড, সেই বেদীর অঙ্গে—একটি কেন্দ্রস্থলে ও চারিকোণে চারিটি, অভ্যন্তরে

নিয়ে আছে বেদী ১০৮টি নারায়ণ শিলাও। বেদীর নিচে সহস্রদল পদ্ম, থাকে থাকে নেমে গিয়ে, স্পর্শ করে সর্ব নিম্ন আর একটি সুউচ্চ বেদীর পৃষ্ঠদেশ। গর্ভগৃহে বসে আছেন দারুরূপী মাতা হংসেশ্বরী, মূর্ত প্রতীক কুল কুণ্ডলিনী শক্তির, মূর্ত প্রতীক তান্ত্রিক সাধনারও—ধারণ করেন এক মহা বিস্ময়কর রূপ। এই রূপেই নাকি তিনি নৃপতি নৃসিংহ দেবকে কাশীধামে স্বপ্নে দেখা দেন। পুরোহিত বলেন, মুখোশ পরে কালীমূর্তি ধারণ করেন মাতা হংসেশ্বরী কালীপূজার রাত্রিতে। উপবাসে ক্লিষ্ট থেকে, পবিত্র দেহে ও অন্তঃকরণে, রাজারা সেই মূর্তিকে সারারাত্রি ধরে পূজা করেন। পূজান্তে, নিজের রূপ পরিগ্রহ করেন দেবী।

বহুক্ষণ ধরে, দেখি দেবীর এই অপরূপ রূপ। পূজা দিয়ে প্রসাদ নিয়ে, দেখি ঘুরে ঘুরে, চতুর্দিক থেকে মন্দিরটি। দেখি বিশিষ্ট তার পরিকল্পনা, অভিনব তার গঠনপদ্ধতি, প্রতীক প্রকৃষ্ট তান্ত্রিক সাধন প্রণালীর, সহায়কও। বুকে নিয়ে নাই এমন পদ্ধতি অন্য কোন মন্দির।

দেখি ছয়টি শিবলিঙ্গও, চারিটি নিচের তলায়, দুইটি দ্বিতলে। পাঁচটি সোপানের শ্রেণী অতিক্রম করে মন্দিরের শীর্ষদেশে উপস্থিত হই। বুকে নিয়ে আছে এই সোপানের শ্রেণী, হংসেশ্বরীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। প্রতীক তারা মানব দেহ মন্দিরের পাঁচটি নাড়ীর—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বজ্রাক্ষ ও চিত্রিনীর। দাঁড়িয়ে আছে হংসেশ্বরীর মন্দির তান্ত্রিক যোগ সাধনার স্থাপত্য রূপ পরিগ্রহ করে—তার পূর্ণ বিকাশ।

হংসেশ্বরীর মন্দির দেখে, স্বয়ংভবার শূন্য প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে, আমরা বাসুদেবের মন্দির দেখতে যাই। নিশ্চিহ্ন হ'য়েছে স্বয়ংভবার মন্দির, পড়ে আছে শুধু ভিত্তি, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে হংসেশ্বরী আর বাসুদেবের মন্দির। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামেশ্বর নির্মাণ করেন এই মহামহিমময় মন্দিরটি। নির্মিত বাংলার নিজস্ব চালা পদ্ধতিতে শীর্ষে নিয়ে আছে মন্দিরটি একটি শিখর। একটি উন্মুক্ত বারান্দা বেষ্টন করে আছে তার চারিদিক, রচিত হয় মন্দিরের, প্রদক্ষিণের পথ। দেখি, বেষ্টিত চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের তিনদিকও প্রশস্ত অলিন্দ দিয়ে। নির্মিত হয় পোড়ামাটি দিয়ে অলিন্দের চতুর্দিকে বহিঃপ্রাকার, বুকে নিয়ে ছয়টি অর্ধচন্দ্রাকার খিলান যুক্ত প্রবেশ পথ, অঙ্গে নিয়ে অনবদ্য, সুন্দরতম

আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ। অপরূপ সুন্দরতম, মহিমময় মূর্তি-সম্ভার দিয়ে শোভিত করেন বাংলার মহাঅভিজ্ঞ ভাস্কর তাদের চারি পাশ, অলঙ্কৃত করেন তাদের শীর্ষদেশও, করেন মন্দিরের সর্বাঙ্গ, করেন উজাড় করে দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য, মিশিয়ে দিয়ে মনের অন্তহীন মাধুর্য।

কোনটির ব্যাস দৈর্ঘে ছয় ফুট, প্রস্থে তিন ইঞ্চি, কোনটি ছয় ও আট ইঞ্চি চতুষ্কোণ, অঙ্গে নিয়ে আছে প্রতিটি পোড়ামাটি সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ, কত বিভিন্ন লতা পল্লব, কত সূক্ষ্মতম জালির কাজও। বুকে নিয়ে আছে কত জীবন্ত মূর্তিসম্ভারও। মূর্তি কত দেবদেবীর, মূর্তি মহিষাসুর মর্দিনীর, দশমহা-বিদ্যার। মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের দশাবতারের—তাঁর নৃসিংহ মূর্তির। মূর্তি আরও কত দেবদেবীর। মূর্তি দিয়েই রচিত হয় কত কাহিনীও পোড়ামাটির অঙ্গে—কাহিনী পুরাণের,কাহিনী মহাভারতের আর রামায়ণের—কাহিনী হরপার্বতীর বিবাহের, শ্রীকৃষ্ণের গোপিনী সঙ্গে নিয়ে রাসলীলার, কাহিনী দক্ষযজ্ঞের, কাহিনী কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধের, কাহিনী ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় নিয়ে আসার, দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানের। কাহিনী হরধনু ভঙ্গের, সীতার সঙ্গে রামের বিবাহের, কাহিনী হনুমানের রামকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার, ও আরও কত কাহিনী। কত দৃশ্য আর চিত্রও। দৃশ্য রাজসভার, দৃশ্য কত যুদ্ধের, পণ্যে ভরতি অর্ণবপোত নিয়ে কত সমুদ্র যাত্রার বাংলার কত শ্রেষ্ঠীর, কত ধনী বণিকেরও, দৃশ্য বিজয়সিংহের সিংহল যাত্রার। দ্বিতল এই সমুদ্রযাত্রার দৃশ্যগুলি, উপরের তলায় উপবিষ্ট যাত্রীরা আর আরোহীরা, নিচের তলায় সুষ্ঠু, শোভনগঠন নাবিকের দল, নিযুক্ত তারা দাঁড় টানায়। প্রদীপ্ত তারা প্রাণের প্রাচুর্যে, জীবন্ত। চিত্র দেখি কত নৃত্যেরও, নৃত্য করেন পরমা রূপবতী বিশালাক্ষী, বঙ্কিমগ্রীব, পীনোন্নত বক্ষা, যৌবনমত্তা নারীরা, কত উর্বশী আর মেনকা, কত রম্ভাও মৃদঙ্গের সঙ্গে, তালে তালে। সুষম তাঁদের দেহের প্রতিটি ভঙ্গী, অনবদ্য তাঁদের নৃত্যের ছন্দ, প্রদীপ্ত তাঁদের আনন, তাঁদের সর্বাঙ্গ সুষমার দ্যুতিতে। বিভ্রম জাগায় মনে। চিত্র দেখি কত যুদ্ধের ও সপ্তদশ শতাব্দীর কত রাজনীতির, কত সামাজিক জীবনের—তাদের সুখ দুঃখের—তাদের আশা আকাঙ্খার। জীবন্ত প্রতিটি কাহিনী, দৃশ্য ও চিত্র মহাঅভিজ্ঞ বাংলার অজানা শিল্পীর মনের মাধুরীতে আর হৃদয়ের ঐশ্বর্যে, মুখর প্রতিটি পোড়ামাটির অঙ্গ তাঁর

হস্তের স্পর্শে, বাঙময়, অপরূপ। মুখর মন্দিরের সর্বাঙ্গও, অভিনব। তাই লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন।

দেখি ঘুরে ঘুরে, চারিপাশ থেকে দেখি, যত দেখি, বিস্ময় বাড়ে তত, দেখে মেটে না আশ, হয় না পরিতৃপ্তি। দেখি ২৭৭ বছর আগেকার এক সুন্দরতম সৃষ্টি, এক অনুপম কীর্তি বাংলার মহাঅভিজ্ঞ এক ভাস্করের, নিদর্শন তাঁর অপরিসীম, তুলনাহীন ভাস্কর্য জ্ঞানের।

একটি প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরের অলিন্দে উপনীত হই। দেখি অনুরূপ অলঙ্করণে অলঙ্কৃত গর্ভগৃহের বহিরাঙ্গ আর প্রবেশ দ্বারও। গর্ভগৃহের বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছেন দেবতা বাসুদেব।

শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। শ্রদ্ধা নিবেদন করি স্রষ্টা নৃপতি রামেশ্বরকে, জানাই বাংলার অজানা শিল্পীদেরও। দেবতাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে অপেক্ষমান মোটরে উঠে বসি। ফিরে আসি গৃহে, তখন দ্বিপ্রহর অতিক্রম করেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কান্তনগর

কান্তজীর মন্দির

অনেকদিন আগে, আমার এক নিকট আত্মীয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে ঠাকুর-গাঁতে পূজার অবকাশ যাপনের সঙ্কল্প করি। নিযুক্ত তিনি তখন সেখানে, উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। ষষ্ঠীর দিন সকালে যাত্রার ক্ষণ ও তারিখ জানিয়ে তাঁকে তারের বার্তা পাঠাই। যেতে হয় দার্জিলিং মেলে চড়ে নিলফামারি পর্যন্ত, সেখান থেকে গোযানে চড়ে আটাশ মাইল। গোযান আসে ঠাকুর গাঁ থেকে যাত্রী নিতে, সুলভ নয় নিলফামারিতে। তাই এই তারের বার্তা।

বিকেল চারটেয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস সঙ্গে নিয়ে, আর নিয়ে স্ত্রী তার ভগ্না সুহাসকে শিয়ালদহ স্টেশনে উপনীত হই। কিন্তু, সক্ষম হই না দার্জিলিং মেলে উঠতে। লোকের ভিড়ে আর জিনিসের গাদাগাদিতে, স্থান নাই তাতে তিলধারণেরও, স্থানাভাব "ডুপ্লিকেট দার্জিলিং মেলেও—প্রবেশ নিষেধ—তাই উঠতে হয় সান্তাহারগামী এক মন্থরগতি ট্রেনে। রাত্রি দ্বিপ্রহরে সান্তাহারে গাড়ী বদল করে পরের দিন সকাল সাতটায় নিলফামারিতে পৌঁছাই। কিন্তু দর্শন মেলে না গোযানের মালিকের, সন্ধান পাই না কুলিরও। কোন রকমে নিজেরাই জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে অপেক্ষা গৃহে উপনীত হই।

সঙ্গে আনা খাবার খেয়ে গোযানের সন্ধানে বার হই। মেলেও একটি গোযান, এসেছে ঠাকুর গাঁ থেকে সেখানকার এক ব্যবসায়ীর জিনিস নিতে। সেই গোযানে করেই ঠাকুরগাঁয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি।

ফিরে এসে, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে, আমরা গোযানের নিকট উপস্থিত হই। বাঁধা হয় গোযানে আমাদের জিনিস, আমরা একে একে গোযানে উঠে বসি। গোযান ছাড়ে, ঠাকুরগাঁ অভিমুখে রওনা হয়। তখন দেখি

দিবাকরের প্রখর কিরণে উত্তপ্ত চারিদিক, দিগন্ত প্রদীপ্ত। অগ্রসর হয় গোযান, মন্থর তার গতি, ধীরে ধীরে অতিক্রম করে সর্পিল পথ। পথের দু'পাশে, দেখা যায় তৃণহীন, শুষ্ক বন্ধুর মাঠ, বুকে নিয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ক্ষুদ্র লতাগুল্ম আর কণ্টক গুচ্ছ। আমরা অতিক্রম করি কত অর্ধ উলঙ্গ নর আর নারী, কত শ্রেণীবদ্ধ গোযান, কত পঙ্কিল কর্দমাক্ত পথ, কত ঘন বন বীথি, কত হিংস্র শ্বাপদপূর্ণ ভয়াল অরণ্য, পার হ'য়ে যাই তিস্তার প্রমত্ত বুকও। অবশেষে ঠাকুরগাঁয়ের এস্. ডি. ও.র গৃহের সামনে এসে আমাদের রথ থামে। পরিসমাপ্তি হয় আমাদের যাত্রার। বিপদ সঙ্কুল এই যাত্রা, কষ্টসাধ্য, অসুন্দরও।

সর্বাঙ্গের ব্যথা প্রশমিত হতেই, সপ্তাহ অতিবাহিত হয়। তারপর, একদিন গৃহকর্তার নিকট ভয়ে ভয়ে কান্তনগরে গিয়ে কান্তজীর দর্শনের প্রস্তাব করি। তিনিও সানন্দে, বিনা প্রতিবাদে রাজী হয়ে যান আমার প্রস্তাবে। কেটে যায় আরও তিন দিন যাওয়ার প্রস্তুতিতে। শেষে সত্যিই একদিন ভোরে সকলে মিলে কান্তনগর অভিমুখে রওনা হই। স্বয়ং গৃহকর্তা আমাদের যাত্রার সঙ্গী, তিনিই পুরোধা, যেতেও হবে গোযানে চড়ে চল্লিশ মাইল, তাই সীমাহীন এই আয়োজনের আড়ম্বরও। তিনি নিজে আরোহণ করেন তাঁর রাজকীয় রথে। বিশেষ ভাবে তৈরী। তিনখানি সুদৃশ্য গোযানে আমরা উঠে বসি। তারপর শ্রেণীবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হয় রথ চতুষ্টয় কান্তনগর অভিমুখে, মন্থর তাদের গতি, তাদের সম্মুখে আর পশ্চাতে যায় তকমাধারী চাপরাশী ও ভৃত্যের দল। সঙ্গে যায় বিভিন্ন সুপাচ্য খাদ্যও। দু'পাশে দেখা যায় সবুজ ক্ষেত, প্রসারিত সেই ক্ষেত দিগন্তের অঙ্কে। শেষে আমাদের রথগুলি কান্তনগরের কান্তজীর মন্দিরের সামনে এসে থামে। হয় না কোন বিপদ রাস্তায়, সুখের ও আনন্দের হয় যাত্রা। তখন অস্তাচলে যান দেব দিবাকর রক্তিম হয় মন্দিরের চূড়া, হয় প্রান্তর আর বৃক্ষের শীর্ষদেশও, ছড়িয়ে পড়ে সেই লাল আভা দিগন্তে।

আমরা গোযান থেকে নামি। খবর পেয়ে ছুটে আসেন মন্দিরের কর্মাধ্যক্ষ আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যান। প্রকৃতির এক সুন্দরতম অলোক-সুন্দর পরিবেশে, নিভৃতে, নির্জনে দাঁড়িয়ে আছে মহামহিমময় মন্দিরটি। বিরাজ

করেন তার গর্ভগৃহে বিষ্ণুমূর্তি কান্তজী, পূজিত হন এই মন্দিরে প্রতি বছরে ছয় মাস, বাকী ছ'মাস দিনাজপুরের রাজ অন্তঃপুরের মন্দিরে।

নির্মাণ সুরু করেন এই মন্দিরটির দিনাজপুরের সুপ্রসিদ্ধ মহারাজা ঘোষ বংশীয় প্রাণনাথ, সমাপ্ত করেন তাঁর দত্তক পুত্র রামনাথ। বিষ্ণু দত্ত, এই বংশের এক পূর্ব পুরুষ, জাতিতে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ, নিযুক্ত হন প্রাদেশিক কানুনগু, মোগল বাদশাহ মহামতি আকবরের রাজত্বের শেষাশেষি। তিনি বসতি স্থাপন করেন এসে দিনাজপুরে। তাঁর পুত্র শ্রীমন্ত চৌধুরী লাভ করেন দিনাজপুরের জমিদারী সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে—সাহসুজার নিকট থেকে, হন প্রথম জমিদার দিনাজপুরের লাভ করেন বহু দেবোত্তর সম্পত্তিও এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে। বর্ধিত হয় তাঁর জমিদারীর আয়তন, বাড়ে রাজ্যের আয়ও। অন্তর্ভুক্ত ছিল এই সমস্ত সম্পত্তিই বাংলার সুপ্রসিদ্ধ রাজা গণেশের জমিদারীর। অকালে মৃত্যুবরণ করেন মহারাজা শ্রীমন্তের পুত্র। অধিরোহণ করেন দিনাজপুরের সিংহাসনে তাঁর দৌহিত্র শুকদেব। বর্ধমান জেলার কুলাই গ্রামের ঘোষ বংশের শুকদেব অধিকারী হন মাতামহের সমস্ত সম্পত্তির। অধিকারে আসে তাঁর পুত্র প্রাণনাথের, হাবেলী, পিঁজরা, আরঙ্গবাদ ও আরও অনেক সম্পত্তি। বিস্তীর্ণতর হয় জমিদারী মহাসমৃদ্ধিশালী হন দিনাজপুরের ভূস্বামীও, ভূষিত হন রাজা উপাধিতে।

শক্তির উপাসক এই দিনাজপুরের রাজারা, অনুষ্ঠিত হয় রাজ অন্তঃপুরে নিত্য দুর্গাপূজা, মন্দিরে—বৈশিষ্ট্য এই বংশের। নরবলিও হয় দেবীর সামনে। একবার তীর্থ ভ্রমণে যান শাক্ত মহারাজ প্রাণনাথ, ফিরে আসেন বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে, সঙ্গে নিয়ে আসেন এক কৃষ্ণ বিগ্রহ। এই বিগ্রহই কান্তজী। প্রতিষ্ঠিত হন কান্তজী রাজ অন্তঃপুরে মন্দিরে। ক্রমে তিনি পরিণত হন দিনাজপুর রাজবংশের প্রধান উপাস্য দেবতায়। পুজিতা হন দুর্গাও মন্দিরে, কিন্তু রুদ্ধ হয় তাঁর সম্মুখে বলির অনুষ্ঠান।

একদিন স্বপ্ন দেখেন রাজা প্রাণনাথ, অসহ্য শহরের কোলাহল দেবতা কান্তজীর, বিঘ্নদায়ক তাঁর শান্তির। তাই প্রয়োজন হয় দ্বিতীয় মন্দির নির্মাণের শহর থেকে দূরে, নিভৃতে নির্জনে। নির্মিত হয় প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশে, এক লীলা নিকেতনে, এক রহস্য লোকে, এক মহামহিমময়

মন্দির, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার, অনুপম অলঙ্করণ, আর অনবদ্য সুষ্টুগঠন জীবন্ত মূর্তি সম্ভার। পূজিত হন কান্তজী সেই মন্দিরে ছয় মাস, বিরাজ করেন মহাশান্তিতে, লোকালয়ের কোলাহল থেকে বহু দূরে। কিন্তু পরিসমাপ্তি হয় না মন্দিরের নির্মাণ, মৃত্যু বরণ করেন প্রাণনাথ। অধিকারী হন তাঁর দত্তক পুত্র রামনাথ দিনাজপুরের, সমস্ত জমিদারীর। তিনি সমাপ্ত করেন অর্ধ সমাপ্ত মন্দিরটির নির্মাণ। পরিচিত হয় মন্দিরটি কান্তজীর মন্দির নামে, কান্তনগর নামে খ্যাতিলাভ করে স্থানটিও। এই রাজা রামনাথই লাভ করেন অতুল ঐশ্বর্য সুপ্রাচীন বান রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে। হন তিনি মহাসমৃদ্ধিশালী, বিস্তৃত হয় তাঁর জমিদারীও ঊননব্বইটি পরগণা নিয়ে। সীমাহীন তাঁর দানও, তিনি দানবীর নামে খ্যাতি লাভ করেন, ছড়িয়ে পড়ে সেই খ্যাতি দেশে বিদেশে। শস্যশ্যামল হয় সারা দিনাজপুরও, পরিণত হয় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে, শস্যের প্রাচুর্যে আর সমৃদ্ধিতে। কেন্দ্রস্থল হয় শিক্ষার আর সংস্কৃতিরও, হয় কৃষ্টির। দানবীর তাঁর বংশধররাও, অমিতব্যয়ী, তাই আজও দিনাজপুরের জমিদারী তাঁদেরই অধিকারে আছে। দাঁড়িয়ে আছে দিনাজপুরের রাজবংশ উন্নত করে শির, অগ্রাহ্য করে বহু শত বৎসরের কত পারিপার্শ্বিক ভাঙা গড়া, কত উত্থান পতন। তাই আজও তার মন্দিরে সাড়ম্বরে পূজিত হন দেবতা কান্তজী।

পরের দিন সকালে উঠে স্নান সমাপনান্তে আমরা মন্দির দর্শনে বার হই। দেখি, অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম রত্নমন্দির বাংলার, সুন্দরতম গঠনে, অভিনব অঙ্গের পরিকল্পনায়, অপরূপ রূপদানে, দাঁড়িয়ে আছে মহামহিমময় মূর্তিতে কান্তনগরে, দিনাজপুর থেকে ১২ মাইল দূরে। সুরু হয় এই মন্দিরটির নির্মাণ ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে, সমাপ্ত হয় ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে। নবরত্ন এই মন্দিরটি ত্রিতল শীর্ষে নিয়ে আছে একটি প্রধান ও আটটি অঙ্গ শিখর শিরে নিয়ে বিষ্ণু চক্র। নির্মিত হয় এই মন্দিরের শিখর বৃন্দাবনের মদনমোহনের মন্দিরের চূড়ার অনুকরণে, অনুরূপ ধামো জেলার কুন্দনপুরের জৈন মন্দিরের শিখারারও। চতুষ্কোণ এই মন্দিরের কেন্দ্রস্থলের চন্দ্রাতপটি বুকে নিয়ে আছে উড়িষ্যার স্থপতির প্রতিচ্ছায়া—অবরোহণ তার স্থাপত্যের। কিন্তু সূক্ষ্মাগ্র তার অঙ্গের গঠন, ব্যতিক্রম উড়িষ্যার মন্দিরের গঠন রীতির সঙ্গে। অষ্টভুজ অবশিষ্ট আটটি,

উৎপত্তি তাদের শ্রেণীবদ্ধ বাঁশের সারি থেকে। ঈষৎ আনত তাদের শীর্ষদেশ, সজ্জিত তারা বৃত্তাকার আর বহু ভুজাকারে—অনুভূমিকও, আবদ্ধ গ্রন্থির সমষ্টি দিয়ে। তাই বুকে নিয়ে আছে ইষ্টক নির্মিত স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরটি, পরিচায়ক তার অপরিহার্যের।

দেখি মুগ্ধ হয়ে। তার সর্বাঙ্গের অপর্যাপ্ত, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম পোড়া মাটির অলঙ্করণই শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের, তার জীবন্ত, অনবদ্য মহামহিমময় মূর্তির সম্ভার। দেখি মূর্তি দিয়ে রচিত হয় তার প্রতিটি ইষ্টকের অঙ্গে তার সর্বাঙ্গে কত কাহিনী। কাহিনী পুরাণের, কাহিনী রামায়ণের আর মহাভারতেরও। মূর্তি দিয়েই বর্ণিত হয় প্রতিটি পোড়া মাটির অঙ্গে কত দৃশ্য আর চিত্রও। দৃশ্য কত বাংলার অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাবর্তের সামাজিক জীবনের, তাদের রীতি নীতির, তাদের আচার ব্যবহারের, তাদের অঙ্গের বসনের আর ভূষণেরও, দৃশ্য কত রাজনীতিরও, কত রাজসভার, চিত্র কত নৃত্যেরও। দেখি পুনরাবৃত্তি কত প্রথারও। সুষ্টু গঠন, অপরূপ এই মূর্তিগুলিও, জীবন্ত বাংলার মহা অভিজ্ঞ ভাস্করের হস্তের স্পর্শে, বাঙ্ময়। তাই মুখর হয় মন্দিরের সর্বাঙ্গ পরিণত হয় এক অবিনশ্বর অক্ষয় ভাণ্ডারে। তাই অপরূপ এই মন্দিরটি, অভিনব অঙ্গের অতুলনীয় শিল্প সম্পদে, আর অপরাজেয় মূর্তি সম্ভারে, মহা ঐশ্বর্যশালী বাংলার মহা জ্ঞানী স্থপতির আর ভাস্করের অপরিসীম হৃদয়ের ঐশ্বর্যে আর অন্তহীন মনের মাধুর্যে; মহাসমৃদ্ধিশালী হ'য়ে আছে তার ইতিহাসের পাতায়। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে, মূক হ'য়ে দেখি। প্রণতি জানাই দেবতা কান্তজীকে, জানাই তার স্রষ্টা নৃপতিদের, জানাই বাংলার অজানা শিল্পীদেরও অমর তাঁরাও ইতিহাসের পাতায়। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি যা আজও অক্ষয় হ'য়ে আছে মনের মন্দিরে। হয় নাই ম্লান।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মথুরাপুর

মথুরাপুরের দেউল

আমাদের গ্রাম থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত এই দেউলটি। ছেলেবেলা থেকেই তার নাম শুনেছি, বহুবার নৌকাকরে তার পাশ দিয়ে গিয়েছি, কিন্তু প্রবল বাসনা জাগে অন্তরে তাকে ভাল করে দেখবার মার্চ, ১৯৩৪-এর মডার্ণ রিভিউতে গুরুসদয় দত্তের লিখিত বর্ণনা পড়ে। তিনিই প্রকৃত আবিষ্কর্তা এই দেউলের। প্রচারক তার অঙ্গের অনুপম অলঙ্করণেরও। তখন আমি দিল্লী প্রবাসী। লিখেছেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনও এই মন্দির সম্বন্ধে। তারও আগে মেজর রেনেল উল্লেখ করেন এই দেউলের বিষয় ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রোজনামচায়। খুব সম্ভব তিনিই প্রাচীনতম আবিষ্কারক।

সুযোগ ও সৌভাগ্য হয় এই দেউল দর্শনের কিন্তু আরও অনেক বিলম্বে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে, নিমন্ত্রিত হয়ে যাই যখন আমার গ্রামের স্কুলের পারিতোষিক বিতরণের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে। তখন আমি কলিকাতাবাসী। শিয়ালদহ থেকে রওনা হই রাত্রি নটার ট্রেনে। কালুখালিতে ট্রেন বদল করে ভাটিয়াপাড়া শাখা লাইনের গাড়ীতে চড়ে বসি। পরের দিন ভোরে ট্রেন এসে থামে মধুখালিতে। ট্রেন থেকে নেমে তিন মাইল পদব্রজে এসে নিজের গ্রাম কোরকদিতে উপনীত হই। তার পরের পরের দিন মথুরাপুর অভিমুখে যাত্রা করি। সকাল নয়টায় দেউলের সামনে উপনীত হই।

ফরিদপুর জেলায়, গোয়ালন্দ মহকুমায় মধুখালি স্টেশনের অনতিদূরে মথুরাপুর গ্রামে মথুরাপুরের খালের ও চন্দনা নদীর পূর্ব তীরে অদূরে, দেউলটি দাঁড়িয়ে আছে, বাংলার পল্লীমায়ের এক নিভৃত কুঞ্জে উর্দ্ধে তুলে তার উন্নত শির। দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধত মস্তকে অঙ্গে নিয়ে সংগ্রাম সাহের বিজয় অভিযানের প্রতীক। শুনি তিনিই নির্মাণ করেন এই দেউলটি খুব সম্ভব

১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মতে নির্মিত হয় এই দেউলটি ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে। বৈশ্য জাতির এক সন্তান সংগ্রাম সাহই নির্মাণ করেন তাঁর বিজয়স্তম্ভ। মহাপরাক্রমশালী, বিস্তার করেন তাঁর আধিপত্য মথুরাপুরে। ছড়িয়ে পড়ে তাঁর প্রভাব, তাঁর প্রতিপত্তি পূর্ব বঙ্গের এই অঞ্চলে।

উত্তরসূরী উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের মন্দিরের, প্রায় সত্তর ফুট উচ্চ এই দেউলের শীর্ষদেশ বুকে নিয়ে আছে দ্বাদশ পল, রচিত প্রতিটি পল পঞ্চ রথের পরিকল্পনায়, বিভক্ত পঞ্চ পগে প্রতিটি পল। ক্রমশীর্ণায়মাণ এর অঙ্গের গঠন, বার কোণ, থাকে, থাকে, ঋজু হয়ে ঊর্ধ্বে ওঠে, বিস্তৃত হয় ঊনত্রিশ ফুট পরিধি নিয়ে, শীর্ষে নিয়ে একটি কার্নিশের বন্ধনী। রচিত হয় দেউলের, ক্রমশার্ণায়মাণ চূড়া বন্ধনীর শীর্ষদেশে। চূড়ার শীর্ষদেশে নাই কলস, আমলকও নাই। চৌত্রিশ ফুট এগার ইঞ্চি এই দেউলের সর্ব নিম্নাংশের বহিঃ অঙ্গের ব্যাস, বাইশ ফুট এগার ইঞ্চি ভিতর অঙ্গের, বার ফুট তার প্রাচীরের ঘনত্ব, নয় ফুট তার প্রতিটি পলের বিস্তৃতি। রচিত হয় দুইটি উন্মুক্ত প্রবেশ দ্বার পশ্চিম ও দক্ষিণের প্রাচীরের গাত্রে, দুইটি রুদ্ধ দ্বার উত্তর ও পূর্ব গাত্রেও, উন্মুক্ত প্রবেশ পথের অনুকরণে। উন্মুক্ত চূড়ার শীর্ষদেশও, পরিণত হয়েছে ধ্বংসে। আবাস হয়ে আছে কত বৃক্ষের ও লতা গুল্মের।

দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই দেউলের মহিমময় পরিকল্পনা আর অনবদ্য রূপদান। দেখি তার অঙ্গের অপরূপ অলঙ্করণ। দেখি বাংলার মহা অভিজ্ঞ নৃপতির আর মহাপারদর্শী ভাস্করের এক মহামহিমময় সুন্দরতম সৃষ্টি, এক অমর; শাশ্বত কীর্তি, আজও দাঁড়িয়ে আছে অক্ষত অবস্থায়, অগ্রাহ্য করে কালের নির্মম অত্যাচার। দেখি তার অঙ্গের জীবন্ত, মূর্তির সম্ভার, মূর্তি কত নর নারীর মূর্তি কত জন্তুর। সুষ্ঠু গঠন, বীর্যবান, তেজোদীপ্ত এই মূর্তিগুলি, প্রতীক সংগ্রাম সাহের বিজয় অভিযানের। বীরত্ব ব্যঞ্জক, পরিপূর্ণ প্রাণের প্রাচুর্যে তার অঙ্গের খোদিত রামায়ণের ও মহাভারতের কাহিনীর মূর্তির সম্ভার, মূর্তি কৃষ্ণলীলারও। অপরূপ কিন্তু তার নয়টি পলের অঙ্গের সিংহ মূর্তিগুলি, অভিনব পরিকল্পনায়, নিখুঁত রূপদানে। বেষ্টন করে আছে তারা প্রতিটি পলের কটিদেশ। তারা মন্থিত করে চলে পদ্মের বন। অমিত বিক্রমশালী এই সিংহের শ্রেণী, স্ফীত তাদের কেশর, উন্মত্ত তাদের গতি জয়ের আনন্দে, দ্রুতও,

ব্যাদিত তাদের আনন উদ্যত প্রতিটি পশুরাজ এক একটি পদ্মের কোরক ছিন্ন করতে, ধ্বংসে পরিণত করতে কমলের বন। প্রাণময় তাদের অঙ্গের প্রতিটি রেখা বাংলার ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে, বাঙময় তাঁর হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্যে, আর মনের মাধুর্যে। দেখি মুগ্ধ হয়ে, একেবারে মূক হয়ে যাই। দেখি খোদিত কত কীর্তিমুখ, দৃশ্য কত মল্লযুদ্ধেরও।

দেখি প্রাচীরের গাত্রে কত অনবদ্য মূর্তি সম্পদ। মূর্তি দিয়ে বর্ণিত হয় কত রামায়ণের কাহিনী, কাহিনী কৃষ্ণলীলারও। জীবন্ত এই মূর্তিগুলিও সুষ্ঠু গঠন, অমিত বীর্যের প্রতীক, বৈশিষ্ট্য বাংলার ভাস্করের। দেখি অপর দিকে প্রাচীরের অঙ্গে রুক্মিণী হরণের দৃশ্যটিও, অভিনব পরিকল্পনায়, সুন্দরতম রূপদানে। দৃশ্য দেখি যশোদার, কৃষ্ণের, প্রজ্বলিত হোমাগ্নির, সীতার অগ্নি পরীক্ষার, চিত্রকূট শৈলমালায় রামের সঙ্গে ভরতের মিলনের, রামের নিকট হনুমানের আগমনের। দৃশ্য কত বাংলার পল্লীমায়ের, নৃত্যরতা নারীর আর বিভিন্ন স্নানের, কত সামাজিক রীতি নীতিরও।

দেখি এক অশ্বারোহী শিকারীর মূর্তিও, বিলুপ্ত হয়েছে কালের নিষ্ঠুর কবলে শিকারীর আনন ও নয়ন, অবশিষ্ট আছে শুধু একটি রেখা তার দেহের আর মুখের, কিন্তু অক্ষত আছে অশ্বটির মূর্তি। হস্তে ধারণ করে আছেন শিকারী একটি বর্শা। অপরূপ তার হস্তের বর্শা ধারণের ভঙ্গী, বিকাশক তার অমিত বীর্যের, প্রকাশক তার প্রাণের প্রাচুর্যের। মূর্ত হয়ে আছে প্রাচীরের অঙ্গে এক মহা পরাক্রমশালী শিকারী বাংলার মহা অভিজ্ঞ ভাস্করের হস্তের স্পর্শে। মহাতেজোদৃপ্ত অশ্বের মূর্তিটিও, লীলায়িত তার অঙ্গের প্রতিটি গঠন, পরিচায়ক তার দুর্দমনীয় গতির, তার সীমাহীন বীর্যেরও। সমপর্যায়ে পড়ে কোণারকের সূর্য মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রের অশ্বের, অঙ্গের সুঠাম ভঙ্গীতে, গতির তীব্রতায়, আর তুলনাহীন বীরত্বে। অশ্বটি আক্রমণ করেছে একটি হরিণকে, দংশন করেছে তার আনন। দেউলের প্রাচীরের গাত্রে, এক অতুলনীয় সৃষ্টি, এক শাশ্বত কীর্তি, মহামহিমময় পরিকল্পনার অনবদ্য রূপদানে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। নিবেদন করি শ্রদ্ধার অঞ্জলি, বাংলার স্থপতিকে, তার ভাস্করকেও, করি সংগ্রাম সাহকেও। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও অক্ষয় হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়।

তৃতীয় অধ্যায়

মধ্যদেশ

(খ্রীষ্টাব্দ ৯৫০—১০৫০)

প্রথম পরিচ্ছেদ

খাজুরাহো

১।	কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দির	২।	আদিনাথের মন্দির
৩।	দেবী জগদম্বার মন্দির	৪।	পার্শ্বনাথের মন্দির
৫।	লক্ষ্মণের মন্দির	৬।	তুলাদেবের মন্দির

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ সমাপ্ত হয়, পরিসমাপ্তি হয় দক্ষিণ ভারতের মন্দির পরিক্রমা, হয় চালুক্যভূমের আর মহিশূরের, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি এক মহা সমৃদ্ধশালী নগরীর ধ্বংসাবশেষের স্বপ্ন। লুক্কায়িত সেই নগরী মধ্যভারতের অন্তরতম প্রদেশে, মহানগরী দিল্লী থেকে সাড়ে তিনশ মাইল দূরে, মহারাষ্ট্র বীরাঙ্গনা মহারানী লক্ষীবাই-এর পবিত্র নগর ঝাঁসি থেকে একশত মাইল দক্ষিণ পূর্বে। স্বপ্ন দেখি চন্দেল্ল রাজধানী খাজুরাহোর, তার মহাসমৃদ্ধের আর সীমাহীন গৌরবের, বুকে নিয়ে মহামহিমময় পঁচাশিটি মন্দির, অঙ্গে নিয়ে ভারতের মহাঅভিজ্ঞ নাগর স্থপতির আর মহাপারদর্শী ভাস্করের অনবদ্য সুন্দরতম, নিরূপম, সূক্ষ্মতম, মহিমময় নিদর্শন, তাঁদের পূর্ণ পরিণতির, চরম উৎকর্ষের। দেখি অলঙ্কৃত তাদের প্রতিটি প্রস্তরের অঙ্গ সুষ্ঠু গঠন, মহামহিমময় মূর্তিসম্ভার, সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম অলঙ্করণ দিয়ে, মূর্তি কত দেবদেবীর, মূর্তি কত দেবাদিদেব শিবের, কোথাও তিনি মহাদেব, সঙ্গে নিয়ে হরপ্রিয়া পার্বতী, কোথাও সঙ্গে নিয়ে এক পাশে প্রজাপতি ব্রহ্মা ও অন্যপাশে বিষ্ণু। কোথাও তিনি অষ্টভুজ ত্রিনয়ন বিশ্বনাথ, কোথাও চতুরানন বিশিষ্ট তিনি, কোথাও অর্ধনারীশ্বর। মূর্তি—কত বিষ্ণুর-মূর্তি চতুর্ভুজ শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধারী বিষ্ণুর, মূর্তি একাদশআনন বিশিষ্ট বিষ্ণুর, মূর্তি তাঁর দশাবতারেরও, মূর্তি বামন, নরসিংহ ও বরাহ অবতারের, বুদ্ধরূপী বিষ্ণুর। মূর্তি ব্রহ্মাণীর সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মা, বিদ্যাদায়িনী সরস্বতীর, মূর্তি সূর্যের। মূর্তি দিয়ে বর্ণিত হয় সমুদ্র মন্থনের কাহিনী। মূর্তি আরও কত দেবতার আর দেবীর কত

অপ্সরার, কত সুরসুন্দরীর, কত গন্ধর্বের, কত বিদ্যাধরীর। মূর্তি—কত পরম রূপবতী যৌবন মদমত্তা, পীনোন্নত বক্ষা নারীর। কেউ দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়তমের আগমনের প্রতীক্ষায়, নিযুক্ত কেউ কবরী বন্ধনে, কেউ প্রসাধনে, হস্তে নিয়ে স্বর্ণ মুকুর। মূর্তি—কত নর ও নারীর কত বিচিত্র সম্ভোগের, কত মৈথুনের। মূর্তি কত নাগ ও নাগিনীর শিরে নিয়ে ফণা। মূর্তি কত বিভিন্ন জন্তুর—কত হস্তীর কত অশ্বের। শোভিত তারা কত বিভিন্ন আর বিচিত্র সুন্দরতম লতা পুষ্প দিয়েও। দৃশ্য কত যুদ্ধের, কত বিজয় অভিযানের কত চন্দেল্ল নৃপতির।

স্বপ্ন দেখি ভারতের এক মহাপরাক্রমশালী রাজাদের কত শত বৎসরের মহা গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের, ইতিহাস প্রাচীন জেজাকভুক্তির—বর্তমান বুন্দেল খণ্ডের চন্দেল্ল বা চন্দ্রাত্রেয় বংশের রাজপুত নৃপতিদের। রাজত্ব করেন তাঁরা বীর বিক্রমে খাজুরাহোতে, প্রাচীন খাজুরাবতকে, নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। দেখি মহাসমৃদ্ধিশালী খাজুরাহো, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, পরিণত হয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে, কেন্দ্রস্থল হয় কৃষ্টিরও।

উদ্ভূত তাঁরা চন্দ্র থেকে, বংশধর চন্দ্রের, অধিবাসী মনিয়াগড়ের, কেননদীর তীরস্থ প্রাচীনতম অষ্টম দুর্গের অন্যতম দুর্গের, নান্নুক তাঁদের পূর্বপুরুষ বসতি স্থাপন করেন এসে নবম শতাব্দীতে, ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে, জেজাকভুক্তিতে, নিযুক্ত হন সামন্ত নৃপতি, কনৌজের প্রবল পরাক্রমশালী গুর্জর প্রতিহার বংশের সম্রাটদের। মহাপরাক্রমশালী হন তাঁরা খাজুরাহোতে, দশম শতকের প্রথম ভাগে। স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এই বংশের ষষ্ঠ নৃপতি হর্ষদেব চন্দেল্ল, ৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে, মুক্ত হন কনৌজের গুর্জর প্রতিহারদের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে, স্থাপন করেন এক স্বাধীন রাজ্য জেজাকভুক্তিতে। উদ্ধার করেন তিনি কনৌজের রাজা ক্ষিতি পাল দেবকে রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় ইন্দ্রের কারাগৃহ থেকে। প্রবল পরাক্রান্ত তাঁর পুত্র যশোবর্মন, পরিচিত লক্ষ্মণ বর্মন নামেও, অধিরোহণ করেন খাজুরাহোর সিংহাসনে ৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর কাছে পরাজিত হন চেদিরাজ, কালিঞ্জর খাজুরাহোর অধিকারে আসে, বিস্তৃত হয় চন্দেল্ল রাজ্যের সীমানা; বাড়ে তাঁদের সামরিক শক্তি আর প্রতিপত্তিও মধ্য ভারতে। তিনিই নির্মাণ করেন লক্ষ্মণের মন্দির খাজুরাহোতে, পরিচিত রামচন্দ্র আর চতুর্ভুজের মন্দির

নামেও। প্রতিষ্ঠিত হন সেই মন্দিরে, দেবতা বিষ্ণু। মহাপরাক্রমশালী তাঁর পুত্র ধঙ্গও, অলঙ্কৃত করেন খাজুরাহোর সিংহাসন ৯৫০ থেকে ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, ভূষিত হন পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর উপাধিতে। অংশ গ্রহণ করেন তিনি রাজপুত রাজাদের সম্মেলনে জয়পালের নেতৃত্বে, গজনীর সুলতান সাবুক্তগীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। তাঁর কাছে পরাস্ত হন বাংলার পাল নৃপতি মহীপাল দেব, অঙ্গ আর রাঢ় তাঁর অধিকারে আসে, অধিকারী হন তিনি যমুনা ও নর্মদার মধ্যবর্তী এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের।

পৃষ্ঠপোষক তিনি স্থাপত্যের, অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা ভারতের, শোভিত করেন খাজুরাহোর বুক বহু মহিমময় সুন্দরতম মন্দির দিয়ে, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ নাগর স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের নিদর্শন। নির্মিত হয় কাণ্ডারীয় মহাদেবের, দেবী জগদম্বার, চিত্রগুপ্তের, বিশ্বনাথের, পার্শ্বনাথের ও আরও অনেক মন্দির। নির্মিত হয় বহু সুন্দরতম প্রাসাদও রাজধানী খাজুরাহো নগরে। পরাক্রান্ত তাঁর পুত্র গণ্ডও, অধিরোহণ করেন খাজুরাহোর সিংহাসনে পিতার মৃত্যুর পর। তিনিও পদাঙ্ক অনুসরণ করেন পিতার, সহায়ক হন শাহিরাজ আনন্দপালের গজনীর সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। মহাপরাক্রমশালী কিন্তু তাঁর পৌত্র বিদ্যাধর, সুশাসকও, ঐতিহাসিক ইবন-উল-আথরের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি এই বংশের, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা সমসাময়িক ভারতের প্রবলতমও, অলঙ্কৃত করেন সিংহাসন ১০১৭ থেকে ১০২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনিও পদাঙ্ক অনুসরণ করেন পিতৃপিতামহের, প্রতিহত করেন সুলতান মাহমুদের চন্দেল্ল রাজ্য আক্রমণ, ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সামরিক খ্যাতি দিকে দিকে। রাজত্ব করেন তাঁর পুত্র বিজয়পাল ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, দেববর্মন ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রশমিত হতে থাকে চন্দেল্ল ক্ষমতা মধ্য ভারতে, মাহমুদের আক্রমণের পর থেকে। পরিত্যক্ত হয় খাজুরাহো, কিন্তু অপ্রতিহত থাকে তাঁদের প্রতিপত্তি, হয় না প্রশমিত তাঁদের ক্ষমতা মাহোবাতে, কালিঞ্জরে আর অজয়গড়ে। গণ্ডের মৃত্যুর পর থেকেই সুরু হয় যুদ্ধ কালচুরির চেদিদের সঙ্গে চন্দেল্ল নৃপতিদের জেজাকভুক্তির অধিকার নিয়ে। শেষে পরাজয় বরণ করেন চন্দেল্ল রাজা কীর্তিবর্মন দেব চেদিরাজার কাছে, অধিচ্যুত হন তাঁর রাজত্ব থেকেও। রাজত্ব-

করেন তিনি ১০৬০—১১০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সভাসদ ছিলেন তাঁর কৃষ্ণ মিশ্র, রচয়িতা তিনি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের।

পুনর্জীবিত হয় তাঁদের ক্ষমতা, উপনীত হয় শ্রেষ্ঠ শিখরে, পৃথ্বীবর্মনের পুত্র মাধব বর্মনের রাজত্বকালে, ১১২৯ থেকে ১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। সমসাময়িক তিনি সৌরাষ্ট্র (গুজরাট) অধিপতি কুমারপাল দেবের। তাঁর বিজয় অভিযান কলিঙ্গ, অঙ্গ ও বঙ্গ অতিক্রম করে। কালিঞ্জর খাজুরাহো, মাহোবা, আর অজয়গড় তাঁর অধিকারে আসে, আসে ঝাঁসি, বান্দা এবং ছতরপুরও, বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা উত্তরে যমুনা থেকে দক্ষিণ পূর্বে বেটয়া, দক্ষিণে নর্মদা ও পূর্বে রেওয়া জেলা পর্যন্ত। তাঁর পৌত্র পরমার্দি দেব, নিযুক্ত হন রণে দিল্লীর চাহমান বংশের নৃপতিদের সঙ্গে। শেষে সম্পূর্ণ পরাজিত হন তিনি চাহমান নৃপতি পৃথ্বীরাজের কাছে ১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে।

১২০২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর মুসলমান সুলতান কুতবউদ্দীন আইবক আক্রমণ করেন কালিঞ্জর, চন্দেল্ল রাজধানী। পরাজয় বরণ করেন চন্দেল্লরাজ কুতবউদ্দীনের হাতে। স্থাপিত হয় মুসলমান আধিপত্য জেজাকভুক্তি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। রাজত্ব করেন পরমার্দিদেবের পুত্র ত্রৈলক্য বর্মন ১২০৩ থেকে ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, তাঁর পুত্র বীর বর্মন ১২৫০ থেকে ১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, অপ্রতিহত থাকে তাঁদের ক্ষমতা মধ্যভারতে. কালিঞ্জরে, অজয়গড়ে আর খাজুরাহোতে। আবার প্রশমিত হতে থাকে চন্দেল্ল ক্ষমতা মধ্য ভারতে, বীর বর্মনের মৃত্যুর পর থেকে, শেষে অস্তমিত হয়ে যায় একেবারে ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শেরশাহের আক্রমণে। পতন হয় এক মহাপরাক্রমশালী রাজ্যের মধ্য ভারতের, অবসান হয় এক মহাগৌরবময় কীর্তির, বহু শতাব্দীর। কিন্তু আজও অমর হয়ে আছে খাজুরাহো ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, বুকে নিয়ে তাঁদের অতুল কীর্তির মহামহিমময়, সুন্দরতম শাশ্বত নিদর্শন। অমরত্ব লাভ করে তার শিল্পীরা, তার মহাঅভিজ্ঞ স্থপতিরা আর সুনিপুণ ভাস্করেরাও, মহাসৌভাগ্যশালী হয় ভারতবর্ষ।

কেউ বলেন ছিল না কি এই নগরে একটি সিংহদ্বারের দুই পাশে দুইটি স্বর্ণ নির্মিত খেজুর বৃক্ষ তাই পরিচিত হয় নগর খাজুরাহো নামে। কেউ বলেন খেজুর বৃক্ষের প্রাচুর্য থেকেই খাজুরাহো নাম লাভ করে এই স্থান।

অন্যতম প্রাচীনতম স্থান এই জেজাকভুক্তিও, উল্লিখিত আছে তার নাম হিউ-এন-স্যাঙের বিবরণে। তিনি সপ্তম শতাব্দীতে পরিদর্শন করেন ভারতবর্ষ। গজনীর মাহ্‌মুদের কালিঞ্জর অভিযানের সহযাত্রী রিহান-অল্‌-বেরুনিও উল্লেখ করেন তার সম্বন্ধে, বলেন খাজুরাহো ছিল জেজাকভুক্তির রাজধানী। দর্শন করেন ইবন-বটুটা খাজুরাহো ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে। বলেন, বুকে নিয়ে আছে খাজুরাহো অসংখ্য সুন্দরতম মন্দির শোভা করে আছে তারা একটি হ্রদের চারিদিক। খুব সম্ভব সেই হ্রদই নিনোরা তাল, এই নিনোরা তালের দক্ষিণ পূর্ব কোণেই অবস্থিত খাজুরাহো, পরিণত এখন একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। ছিল এই খাজুরাহো ভারতের বৃহত্তম আর সুন্দরতম নগরের অন্যতম—মহা সমৃদ্ধিশালীও, মধ্যযুগে শতাব্দীর পর শতাব্দী, শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল ছিল শিক্ষার আর সংস্কৃতির। আজও বুকে নিয়ে আছে খাজুরাহো তার মহাগৌরবময় অতীতের ধ্বংসাবশেষ, বিস্তৃত আট স্কোয়ার মাইল পরিধি নিয়ে।

একদিন সত্যই রূপপরিগ্রহ করে স্বপ্ন, বিকেল পাঁচটায় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসে চড়ে দিল্লী থেকে ঝাঁসি অভিমুখে রওনা হই, সঙ্গে যান স্ত্রী, রূপ সিংও যায়। রাত্রি বারোটায় ঝাঁসিতে উপনীত হই। অপেক্ষা গৃহে রাত্রি যাপন করে পরের দিন ভোরে মানিকপুরের ট্রেনে চড়ে বসি। দু'পাশে রুক্ষ, বন্ধুর মাঠ, নয় তারা শস্যশ্যামল, বুকে নিয়ে নাই ঘনবসতিও, তার ভিতর দিয়ে সর্পিল গতিতে ট্রেন চলে। দেখতে দেখতে যাই সেই শুষ্ক, জনহীন পরিবেশ। বেলা দশটায় ট্রেন হরপালপুর স্টেশনে এসে থামে। হরপালপুর ঝাঁসি থেকে তিপ্পান্ন মাইল পূর্বে অবস্থিত। আমরা ট্রেন থেকে নেমে পড়ি। হাত মুখ ধুয়ে, সঙ্গের আনা খাবার খেয়ে আমরা খাজুরাহোগামী বাসে চড়ে বসি, যাত্রী হই খাজুরাহোর, যেতে হয় একষট্টি মাইল, ওঠেন আরও অনেক যাত্রীও। যাওয়া যায় মাহোবা স্টেশনে নেমেও। বাসে করে চৌত্রিশ মাইল গেলে উপনীত হওয়া যায় খাজুরাহোতে। আমাদের বাস ছাড়ে, যায় বঙ্কিম গতিতে। রাস্তার দুইপাশে বৃহৎ নিম গাছের শ্রেণী মাঝে মাঝে দেখা যায় আম্রকুঞ্জও, দেখি কত সবুজ শস্যের ক্ষেত, কত জোয়ারেরও, সৃষ্টি হয় রাস্তার দুই পাশে এক নয়নাভিরাম, ছায়া শীতল পরিবেশ। আমরা অতিক্রম করি নওগাঁ বাস দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে থাকে, সর্পিল গতিতে আমরা অতিক্রম করি আরও

কয়েক মাইল। দেখি, দূরে অলঙ্কৃত করে আছে এক অনতি উচ্চ পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ-প্রেতাত্মা এক অতীত গৌরবের। নির্মাণ করেন এই দুর্গটি বুন্দেল্ল গোত্রীয় মহারাজা ছত্রশাল। রাজত্ব করেন তিনি বুন্দেলখণ্ডে প্রবল পরাক্রমে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, বিস্তৃত হয়, তাঁর রাজ্যের সীমানা যমুনা থেকে নর্মদা পর্যন্ত। তাঁর পিতা চম্পত রায়ই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বুন্দেলখণ্ডে।

কিন্তু পরাজিত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন, আত্মহত্যা করে, এড়ান সম্রাটের কারাগৃহ। চম্পত রায়ের মৃত্যু হয়, ছত্রশাল নিযুক্ত হন সম্পূর্ণ করতে পিতার অসম্পূর্ণ কাজ। দুর্ধর্ষ তিনি, মহাপরাক্রমশালীও, নিযুক্ত ছিলেন সম্রাটের অধীনে দাক্ষিণাত্যে। অনুপ্রাণিত হন মারাঠা বীরকেশরী শিবাজীর আদর্শে, সঙ্কল্প করেন বুন্দেলখণ্ডে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের, স্বপ্ন দেখেন এক স্বাধীন নৃপতি হওয়ার, তাঁর সহায়ক হন বুন্দেলখণ্ডের আর মালবের অধিবাসীরা। ক্ষুব্ধ তাঁরা মুঘলের অত্যাচারে, এক অসন্তোষের আগুনে নিরন্তর প্রজ্বলিত তাঁদের অন্তঃকরণ, তাঁরা সমবেত হন তাঁর পতাকার তলে একে একে আসেন হাজারে, যুদ্ধ করেন তাঁর নেতৃত্বে মুঘলের বিরুদ্ধে বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা লাভের জন্য। শেষে জয়ী হন ছত্রশাল, সমস্ত পূর্ব মালব তাঁর, অধিকারে আসে। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে, স্থাপিত হয় রাজধানী পান্নাতে। অগ্রসর হয় পথ সর্পিল গতিতে, পর্বতটিকে বেষ্টন করে, স্পর্শ করে যায় তার পদতল। দেখি দক্ষিণে দাঁড়িয়ে আছে একটি অর্ধ সমাপ্ত স্মৃতিস্তম্ভ মহারাজার। সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি স্তম্ভটি তাঁর পুত্রদের মধ্যে কলহের আর বিবাদের দরুণ, রয়ে গেছে অসম্পূর্ণ অবস্থায়। এই ভ্রাতৃ বিরোধেই দ্বিধা বিভক্ত হয় তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যও, শেষে পরিণত হয় ধ্বংসে।

বাস এসে থামে ছতরপুরে হরপালপুর থেকে চৌত্রিশ মাইল দূরে। আমরা বাস থেকে নেমে সারকিট হাউসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, চা ও টোস্ট খেয়ে বাসে উঠে বসি। আবার বাস ছাড়ে। দেখি বুকে নিয়ে আছে কত অসংখ্য মন্দিরের আর সমাধি সৌধের ধ্বংসাবশেষ ছতরপুর শহরের প্রান্ত সীমা। এইখানেই ছিল রাজা ও রাজ পরিবারের সমাধির স্থান, তাই এইখানেই নির্মিত হয় তাদের সমাধি মন্দিরও। অগ্রসর হয় বাস, দ্রুত তার গতি। দূরে,

বহুদূরে, দিগ্‌বলয়ের অঙ্কে দেখা যায় বুন্দেলখণ্ডের ঘন অরণ্যানী, ভেসে উঠে নিম্নবিন্ধ্য শৈলমালার উচু-নিচু রেখাও। আমরা অতিক্রম করি শিবসাগর, একটি সরোবর, অপরূপ এই সরোবরটি, বুকে নিয়ে আছে কত পদ্মদল আর ফুল, মুগ্ধ হয়ে দেখি।

বাস এসে থামে খাজুরাহোতে, হরপালপুর থেকে একষট্টি মাইল দূরে, লাগে দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা। তখন অস্তাচলে যান দেব দিবাকর পশ্চিম গগনে, রক্তিম হয়ে ওঠে পশ্চিম গগন, রক্তবর্ণ ধারণ করে মাঠ, ঘাট অরণ্য, দিগন্ত। স্তব্ধ হয়ে দেখি এই অপরূপ রূপ। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি দৃশ্য, সে দৃশ্য এক মহা পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের, দৃশ্য দেখি জেজাকভুক্তির (বুন্দেলখণ্ডের) বুকে নিয়ে মহাতীর্থ অমরকণ্টক। উৎপত্তি স্থল এই অমরকণ্টক পবিত্র নদী নর্মদা, শোণ আর মহানদীর। এখান থেকেই, শৈল শ্রেণীর বুক থেকেই মহাকাল প্রবাহিত হন। তাঁরা পশ্চিমে, উত্তরে আর পূর্বে, মিলিত হন—নর্মদা পশ্চিমে, সুরাষ্ট্রের নিচে, আরবসাগরের বুকে, শোণ পাটলিপুত্রের নিকটে পুণ্যতোয়া গঙ্গায়, মহানদী মেশেন উড়িষ্যার বালেশ্বরের কাছে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে। তাই সাধনপীঠ এই পুণ্য ভূমি কত মুনি ঋষির, কত সিদ্ধ মহাত্মার। এই স্থানে এসেই পরিসমাপ্তি হয় তাঁদের পরিক্রমাও। সমবেত হন এখানে কত তীর্থযাত্রী, কত পুণ্য লোভাতুরা, সমাগত হন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, পবিত্র দেহ ও মনে, তাঁরা পূজা দেন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে। অবসর যাপন করেন ভগ্ন মন্দির দেখেও, পূজিত হন না সেখানে কোন দেবতা।

গড়ে ওঠে এই পুণ্যতীর্থ অমরকণ্টকের নিকটেই, বুন্দেলখণ্ডে, প্রাচীন জেজাকভূক্তিতে, চন্দেল্ল বংশের রাজাদের রাজধানী পুণ্যভূমি খাজুরাহোতে এক মন্দিরময় নগর। নির্মিত হয় সেই নগরে পীতবর্ণের পটভূমিতে পঁচাশিটি মন্দির। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে চন্দেল্ল বংশের নৃপতিরা নির্মাণ করেন। দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে শুধু কুড়িটি মন্দির, নিশ্চিহ্ন হয়েছে অবশিষ্ট মন্দিরগুলি, পরিণত হয়েছে ধ্বংসে। সম্বিৎ ফিরে আসে ড্রাইভারের ডাকে বাস থেকে নেমে স্থান সংগ্রহ করি সারকিট হাউসে।

খাজুরাহো উত্তর মধ্য প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, দাঁড়িয়ে আছে দিল্লীর

রাজপথ থেকে কয়েক মাইল দূরে, বেষ্টিত হয়ে আছে পবিত্রআত্মা নিম্ন বিন্ধ্যের শৈলশ্রেণী দিয়ে আর বুন্দেলখণ্ডের অরণ্য ও ঘন বনবীথিতে। আজও বিচরণ করে তার অরণ্যে কত হিংস্র শ্বাপদ, কত ভয়াল ময়াল, মুখরিত হয় তার মাঠ, তার সবুজ ক্ষেত, অরণ্যানী কত বিচিত্র আর বিভিন্ন বর্ণের বিহঙ্গের কাকলিতে, তাদের কলধ্বনিতে মুখর হয় তার নীল আকাশ আর বাতাস।

মহাসমৃদ্ধিশালী হয় খাজুরাহো দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ৯৫০ থেকে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে, উপনীত হয় সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ শিখরে, পরিণত হয় শৈব, বৈষ্ণব আর জৈন সভ্যতার, শিক্ষার ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে, শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল ভারতের কৃষ্টিরও মহাপরাক্রমশালী চান্দেল্ল রাজাদের রাজত্বকালে। শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরাও ভারতের, সাজান খাজুরাহোর বুক পঁচাশিটি মহামহিমময়, সুন্দরতম মন্দির দিয়ে। আজও দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে কুড়িটি মন্দির নির্মিত আপীত প্রস্তরে, অগ্রাহ্য করে সহস্র বৎসরের প্রকৃতির নির্মম অত্যাচার, অঙ্গে নিয়ে আছে দশম আর একাদশ শতাব্দীর ভারতের মহা অভিজ্ঞ স্থপতির আর মহা পারদর্শী ভাস্করের সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম দান, তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রকৃষ্টতম, মহামহিমময় সৃষ্টির প্রতীক, নিদর্শন তাঁদের চরম উৎকর্ষের, পূর্ণ পরিণতির। এই সময়েই লাভ করে নাগর স্থাপত্য আর ভাস্কর্য শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের দরবারে, উপনীত হয় তাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। অলঙ্কৃত করেন সুনিপুণ ভাস্কর এই মন্দিরগুলির প্রতিটি অঙ্গ এক অভিনব মূর্তি সম্ভার দিয়ে,—কেউ অপরূপ, কেউ মহিমময়, কেউ সুমহান, কেউ কদাকার, কুৎসিত দর্শন,—তাদের নিখুঁত, নির্ভুল তুলনাহীন সংযোজনে আর অনবদ্য সমন্বয়ে। জীবন্ত হয় মন্দিরের প্রতিটি অঙ্গ, বাঙ্ময় হয়, হয় অপরূপ তাঁদের মহা অভিজ্ঞ হস্তের স্পর্শে, হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্যে আর মনের অপরিসীম মাধুর্যে।

তিন সমষ্টিতে বিভক্ত এই মন্দিরগুলি। দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিম সমষ্টির মন্দিরগুলি বামিতা রাজনগরের রাজপথের পশ্চিমে। দাঁড়িয়ে আছে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির, লালগুঁয়া মহাদেবের মন্দির, কাণ্ডারীর মহাদেবের

মন্দির, মহাদেবের মন্দির, দেবী জগদম্বার মন্দির, চিত্রগুপ্তের, পরিচিত ভারতজীর মন্দির নামেও, বিশ্বনাথ আর নন্দীর মন্দির, পার্বতীর মন্দির, লক্ষ্মণের মন্দির, পরিচিত রামচন্দ্র অথবা চতুর্ভুজের মন্দির নামেও। মাতঙ্গেশ্বরের মন্দির আর বরাহের মন্দির। সুন্দরতর এই মন্দিরগুলি, লাভ করে অধিক প্রসিদ্ধ আর খ্যাতিও।

দাঁড়িয়ে আছে পূর্ব সমষ্টির হিন্দু আর জৈন মন্দিরগুলি খাজুরাহো গ্রামের সংলগ্ন হয়ে। অতিক্রম করে যেতে হয় খাজুরাহো গ্রাম, উপনীত হতে হয় মন্দিরগুলিতে। আছে এই গোষ্ঠীতে ব্রহ্মা, বামন আর জাভেরীর মন্দির, (হিন্দু মন্দির) আর ঘণ্টাই, আদিনাথ আর পার্শ্বনাথের মন্দির (জৈন মন্দির)। পথে পড়ে হনুমানের মূর্তি।

তার তিন মাইল দক্ষিণে, দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণের গোষ্ঠী—দুলাদেব আর জাতকারী বা চতুর্ভুজের মন্দির, দাঁড়িয়ে আছে বহুদূরে, পৃথক হয়ে আছে অন্য মন্দিরগুলির সঙ্গে।

বিভিন্ন খাজুরাহোর মন্দির নির্মাণ পদ্ধতিও বিভিন্ন তাদের পরিকল্পনা, বৈশিষ্ট্য খাজুরাহোর, প্রচলিত নাই ভারতের অন্য কোন স্থানে। নাই সুউচ্চ প্রাচীরের বেষ্টনী এই মন্দিরগুলির, পৃথক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা পার্থিব পরিবেশ থেকে এক একটি সুউচ্চ প্রস্তরে গঠিত মঞ্চের উপর। এই সুউচ্চ, সুপ্রশস্ত মঞ্চ বা ভিত্তির উপরই নির্মিত হয় প্রতিটি মন্দির, সংযুক্ত তাদের বিভিন্ন অংশ, সন্নিবদ্ধও। রূপ পরিগ্রহ করে এক অবিচ্ছিন্ন, অবিচ্ছেদ্য ভবনের, তাদের সুষ্ঠু, শোভন, অনবদ্য সংযোগের। রচিত হয় না সংযুক্ত ভবনের শ্রেণী, নয় তারা সুমহানও, বহু বিস্তৃত নয় তাদের পরিধিও। তাদের মধ্যে বৃহত্তম মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে একশ ফুটের কিছু বেশী। কিন্তু অপরূপ তারা দর্শনে, সুসামঞ্জস্য তাদের প্রতিটি অঙ্গ, সুচারুপূর্ণ আর সুসংবদ্ধ তাদের অঙ্গের প্রতিটি রেখা, সুষ্ঠু গঠন জীবন্ত তাদের সর্বাঙ্গের মূর্তির সম্ভার আর সূক্ষ্মতম তাদের প্রতিটি অঙ্গের অলঙ্করণ।

রূপ ধারণ করে মন্দিরের, নিম্নতল একটি দ্বিভুজ ক্রুশের, বিস্তৃত তার সুদীর্ঘ অক্ষ পূর্ব থেকে পশ্চিমে, পূর্বপ্রান্তে, অক্ষের পদতলে রচিত হয় একটি মাত্র প্রবেশদ্বার মন্দিরের। বিভক্ত হয় সেই অক্ষ তিনটি অংশে বা প্রকোষ্ঠে—

শীর্ষদেশে রচিত হয় গর্ভগৃহ গর্ভগৃহের সংলগ্ন অন্তরালয় কেন্দ্রস্থলে মণ্ডপ। নির্মিত হয় অর্ধমণ্ডপ বা প্রবেশ পথ সঙ্গে নিয়ে তোরণও। বাড়ে মন্দিরের আকৃতি রচিত হয় মহামণ্ডপ, বেষ্টিত হয় গর্ভগৃহ প্রদক্ষিণের পথ দিয়েও। সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে খাজুরাহোর মন্দির।

সুরু হয় মন্দির নির্মাণ, নির্মাণ করেন খাজুরাহোর স্থপতি। মহা পারদর্শী তিনি স্থাপত্য বিদ্যায়। পূজারী তিনি সুন্দরেরও, রচনা করেন আপীত প্রস্তর দিয়ে এক সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, এক অমরাবতী, উজাড় করে দেন হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য, মিশিয়ে দেন মনের অপরিসীম মাধুরী। উর্ধ্বগতি এই নির্মাণ পদ্ধতি, পরিণত হয় বিভিন্ন চূড়ায় রূপ পরিগ্রহ করে অনবদ্য, সুসামঞ্জস্য, ক্রমউর্ধ্বমান শিখরের শ্রেণীর। গর্ভগৃহের শীর্ষদেশে নির্মিত হয় মূলমঞ্জরী বা শিখারা মন্দিরের। তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত এই মন্দিরগুলি—সর্ব নিম্নাংশে রচিত হয় একটি সুউচ্চ নিম্নতল বা ভিত্তি অঙ্গে নিয়ে কুলুঙ্গি, মহাসমৃদ্ধিশালী শিল্পসম্ভারে, তার উপরে প্রাচীর, বুকে নিয়ে ভিতরের প্রকোষ্ঠের রন্ধ্রের শ্রেণী, তাদের শীর্ষদেশে ক্রমউর্ধ্বমান ছাদের সমষ্টি। পরিণতি লাভ করে সেই ক্রম-উর্ধ্বমান চূড়ার শ্রেণী সুউচ্চ, মহামহিমময় অনুপম শিখারায়, রূপ পরিগ্রহ করে শিবের স্বর্গ কৈলাসের, রচিত হয় তাদের ফাঁকে ফাঁকে কত ঋজু অধিক্ষেপণও দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় উর্ধ্বে, সৃষ্টি হয় মন্দিরের গাত্রে উল্লম্ব, সুসমন্বিত আলোছায়ার প্রবেশ পথও। অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করে মন্দিরের তিনটি প্রধান উর্ধ্বাংশ, শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম দান চন্দেল্ল স্থপতির বহুশত বৎসরের অক্লান্ত সাধনার, পরিচায়ক তাঁর অসামান্য স্থাপত্য জ্ঞানেরও। রচিত হয় ভিত্তি—বিভিন্ন আর মহাসমৃদ্ধিশালী তার অঙ্গের গঠন, বিস্তৃত হয় হর্ম্যতলের চতুর্দিকে। বুকে নিয়ে আছে কিন্তু শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য খাজুরাহোর স্থপতির প্রতীক তাঁর সুন্দরতম কীর্তির তার উপরের অন্তর্বর্তী অংশ, নিদর্শন এই মহামহিমময় সুন্দরতম পরিকল্পনার সর্বপ্রধান অঙ্গেরও। রচনা করেন স্থপতি প্রাচীরের গাত্রে কত অনুভূমিক গবাক্ষের শ্রেণী, প্রবেশ পথ মন্দিরের আলো বাতাসের। এই গবাক্ষ দিয়েই প্রবেশ করে সূর্যের রশ্মি, সৃষ্টি হয় সুস্পষ্ট গভীর ছায়ার বন্ধনীর সারি মন্দিরের ভিতরে, ছড়িয়ে পড়ে তার সর্বস্তরে। বুকে নিয়ে নাই ভারতের অন্য কোন স্থানের নাগর মন্দির এমন অপরূপ গবাক্ষের শ্রেণী, রচিত

হয় নাই এমন স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ বা ব্যালকনিও মন্দিরের বুকে। রচনা করেন নাই এমন অভিনব মহামহিমময় সুন্দরতম পরিকল্পনা, ভারতের অন্য কোন স্থপতি, দেন নাই তাতে এমন অনবদ্য, অনুপম, সূক্ষ্মতম আর প্রকৃষ্টতম রূপ।

মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরের গাত্রের অঙ্গের অলঙ্করণ অন্যতম বৈশিষ্ট্য খাজুরাহোর স্থপতির আর ভাস্করের। রচিত হয় কোথাও দুই কোথাও বা তিনটি সমান্তরাল পাড় বা মেখলা, সংযুক্ত এই পাড়, নিরবচ্ছিন্নও, বিভক্ত পর্যায়ক্রমে প্রাচীরের গাত্রের অধিক্ষেপণ আর কুলুঙ্গি দিয়ে। বেষ্টন করে আছে মেখলার সারি সমস্ত মন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে সারি সারি বৃহৎ অর্ধ-প্রমানাকৃতি মূর্তির সম্ভার। সুষ্ঠু শোভন গঠন এই মূর্তিগুলি, নিখুঁত জীবন্তও, মহা অভিজ্ঞ ভাস্করের হস্তের সুনিপুণ স্পর্শে রূপ পরিগ্রহ করে বিভিন্ন, বিচিত্র সীমাহীন, অশেষ চলমান মহামহিমময় মূর্তির প্রদর্শনীর। অঙ্গে নিয়ে আছে শুধু কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দিরই এমন ছ'শ পঞ্চাশটি সুমহান অপরূপ মূর্তি। অপরূপ সুষ্ঠু গঠন সজীব মূর্তির সম্ভার দিয়ে অলঙ্কৃত হয়ে আছে খাজুরাহোর অন্য মন্দিরগুলিও, বিভিন্ন তাদের সংখ্যা বিভিন্ন মন্দিরের আকৃতি আর আয়তন অনুযায়ী। আছে তাদের মধ্যে নিখুঁত সুন্দর দর্শন মানবমানবীর মূর্তি, পরিপূর্ণ প্রাণের প্রাচুর্যে, মূর্তি আছে দেবদেবীরও, অনবদ্য সুন্দরতম তাদের সর্বাঙ্গের ছন্দময় ভঙ্গী, অপরিসীম তাদের প্রতিটি অঙ্গের সৌন্দর্যও। সত্যযুগের অধিবাসী তারা তাই পরিপূর্ণ তাদের অন্তঃকরণ এক সীমাহীন প্রীতিতে আর আনন্দে, হিল্লোলিত তাদের সর্বাঙ্গ প্রাণের অন্তহীন প্রাচুর্যে, চৈতন্যময় তারা সজীবতার অফুরন্ত স্পন্দনে। নাই এমন অপরূপ মূর্তির সম্ভার ভারতের অন্য কোন মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে, বৈশিষ্ট দান তারা খাজুরাহোর ভাস্করের, তাঁদের অভিনব শাশ্বত কীর্তির, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তারা নাগর ভাস্করের পূর্ণ পরিণতির, চরম উৎকর্ষের।

রচিত হয় মন্দিরের পৃথক ছাদ, অন্তর্নিহিত প্রতিটি কক্ষের শীর্ষদেশে, ক্ষুদ্রতম আর নিম্নতম তাদের মধ্যে অর্ধমণ্ডপ বা তোরণের ছাদ। ক্রমউর্ধ্বমান এই ছাদগুলি, গম্বুজাকৃতি, পিরামিডাকৃতি নয় উড়িষ্যার মন্দিরের ছাদের মত, উপনীত হয় একের পর এক শিখারার বুকে। মহামহিমময় এই শিখারাও,

সুউচ্চ, দাঁড়িয়ে থাকে সবার উপরে, উর্দ্ধে তুলে তার উন্নত শির। রূপ পরিগ্রহ করে খাজুরাহোর মন্দির এক সুউচ্চ শৈলশিখরের, বুকে নিয়ে ক্রমউর্দ্ধমান শিখরের শ্রেণী, প্রতীক কৈলাসের দেবাদিদেব শিবের আবাসের। অভিনব এই ছাদের পরিকল্পনাও, বিশিষ্ট তার নির্মাণ পদ্ধতি, অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য খাজুরাহোর স্থপতির, বুকে নিয়ে নাই অন্য কোন নাগর মন্দির, অঙ্গে নিয়ে নাই উড়িষ্যার মন্দিরের মহামহিমময় পিরামিডাকৃতি শিখারাও

শিখারার পরিকল্পনাই নাগর মন্দিরের কষ্টিপাথর; স্থপতির মধ্যমণি। মহাসৌষ্ঠবসম্পন্ন, মনোজ্ঞ, খাজুরাহোর মন্দিরের শিখারাও, পরিমার্জিত, সুরুচিপূর্ণ সুপরিকল্পিতও সুন্দরতম, লালিত্যপূর্ণ তাদের আকৃতি। সূক্ষ্মতম প্রধান বক্ররেখার অঙ্গের মুখায়ব, ছন্দময় তাদের পারিপার্শ্বিক অংশ, ঋজু তাদের বহিঃ সীমারেখা। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ অলঙ্করণ খাজুরাহোর শিখারার, তার অঙ্গের ক্ষুদ্রায়তন চূড়ার বা উরুশৃঙ্গের বা উরোমঞ্জরির শ্রেণী, তাদের সুষম বণ্টন আর অনবদ্য সমাবেশ। গ্রথিত এই উরুশৃঙ্গের শ্রেণী শিখারার বুকে, বিভক্ত শিখারার অঙ্গও উরুশৃঙ্গের শ্রেণী দিয়ে। মহামহিমময় এই পরিকল্পনা নিখুঁত সুন্দরতম, রহস্যময়, চাতুরিপূর্ণ শিখারার বুকের এই উরুশৃঙ্গের অনবদ্য সমাবেশ, পরিচায়ক খাজুরাহোর স্থপতির বহুশত বৎসরের অভিজ্ঞতার তাঁর শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য জ্ঞানেরও। রহস্যময় হয় শিখারা, হয় অপরূপ।

বুকে নিয়ে আছে খাজুরাহোর মন্দির শুধু একটি মাত্র প্রবেশপথ, পূর্বদিকে। রচিত হয় সুউচ্চ খাড়া সোপানের শ্রেণী, উপনীত হয় সুউচ্চ মঞ্চে, যুক্ত হয় প্রবেশ পথের সঙ্গে। মহিমময় হয় প্রবেশ পথ। রচিত হয় চৌকাটের মস্তকে বাজু, শোভিত হয় বাজু সূক্ষ্মাগ্র খিলানযুক্ত চন্দ্রাতপ দিয়ে, বুকে নিয়ে সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম অলঙ্করণ, ভূষিত হয় উন্নতশির লতাপুষ্প দিয়েও, রূপ পরিগ্রহ করে হস্তীদন্তের উপর সূক্ষ্মতম শিল্প সম্ভারের, বিভ্রম জাগায় মনে।

অনুরূপ, অপরূপ অলঙ্করণে অলঙ্কৃত করা হয় মন্দিরের ভিতরের অন্য দ্বারের শীর্ষদেশও। এই প্রবেশ পথ দিয়েই অলিন্দ অতিক্রম করে উপনীত হতে হয় একটি আয়তক্ষেত্র তোরণে পরিচিত অর্ধমণ্ডপ নামে। উন্মুক্ত তার দুইপাশ উন্মুক্ত অলিন্দের দুই দিকও। দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভের উপর অর্ধমণ্ডপের ছাদ।

ক্রমনিম্নমান এই ছাদ, পরিণত হয় আসনে, রূপধারণ করে ক্ষুদ্রকায় প্রাচীরের। যুক্ত হয় এই অর্ধমণ্ডপের সঙ্গে নাতিবৃহৎ চতুষ্কোণ প্রধান কক্ষ বা সভাগৃহ মন্দিরের, পরিচিত মণ্ডপ নামে, বুকে নিয়ে কেন্দ্রস্থলে চারিটি স্তম্ভ, স্তম্ভের শীর্ষদেশে ছাদের কড়ি। এই কেন্দ্রস্থলের কক্ষ বা মণ্ডপের দুই পাশ থেকেই আড়াআড়ি ভাবে বিস্তৃত হয় মন্দিরের মহামণ্ডপ, সংযুক্ত হয় বাইরের স্তম্ভযুক্ত ব্যালকনির (অলিন্দের) সঙ্গে। সভাগৃহের প্রত্যন্তদেশে রচিত হয় অন্তরালয়, একটি সংকীর্ণ পথ, বুকে নিয়ে চন্দ্রশিলা। যুক্ত হয় এই চন্দ্রশিলা বা প্রশস্ত সোপান গর্ভগৃহের প্রবেশ পথের সঙ্গে। অনুরূপ এই গর্ভগৃহের প্রবেশ পথও মন্দিরের প্রবেশ পথের, গঠনে আর অঙ্গের পর্যাপ্ত, সুন্দরতম, আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণে—মহামহিমময়।

অলঙ্কৃত করেন খাজুরাহোর মহাঅভিজ্ঞ ভাস্কর মন্দিরের কক্ষগুলির,—অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ আর মহামণ্ডপের অভ্যন্তর ও তার স্তম্ভের শীর্ষদেশ, প্রাচীরের গাত্র আর ছাদের অঙ্গ, অনবদ্য সুন্দরতম, মহিমময় মূর্তির সম্ভার দিয়ে। ভূষিত হয় তারা কত সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণেও। বিভিন্ন উড়িষ্যার মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের সঙ্গে, সমৃদ্ধিশালী নয় তারা ভাস্করের হস্তের সুনিপুণ স্পর্শে তাঁর সীমাহীন দানে। চতুষ্কোণ খাজুরাহোর মণ্ডপগুলি, পঁচিশ ফুট স্কোয়ার তাদের প্রতিটির আয়তন। বুকে নিয়ে আছে প্রতিটি মণ্ডপ চারিটি করে স্তম্ভ, দাঁড়িয়ে আছে তারা চারিকোণে, শীর্ষে নিয়ে চারিটি চতুষ্কোণ কড়ি। অপরূপ এই স্তম্ভের শীর্ষদেশের অলঙ্করণ, সুন্দরতম, মহামহিমময়। শিরে নিয়ে আছে স্তম্ভ বন্ধনী। অলঙ্কৃত বন্ধনীর অঙ্গও সুষ্ঠু গঠন জীবন্ত যৌবন মদমত্তা, পীনোন্নত বক্ষা নারী মূর্তি দিয়ে। ছন্দময় এই মূর্তিগুলি, কেউ নিযুক্ত নৃত্যে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে নৃত্যচঞ্চল ভঙ্গীতে। তাদের পদতলে আর মস্তকের উপরে কদাকার কুৎসিৎ দর্শন বামনের মূর্তি, বৈশিষ্ট্য নাগর মন্দিরের, চারিকোণে চার বলদৃপ্ত শার্দুলের, রচিত এক একটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রস্তর দিয়ে। জয় হয় সুন্দরের, পরাজয় বরণ করে অসুন্দর। অলঙ্কৃত স্তম্ভের শীর্ষদেশের বিস্তৃত উপরিভাগও, মহামহিমময় সজীব, শোভন গঠন মূর্তি সম্ভার দিয়ে।

বুকে নিয়ে আছে কিন্তু খাজুরাহোর মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির আর মহাপারদর্শী ভাস্করের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা আর শিল্প কৌশলের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন তার ছাদের

পরিকল্পনা আর নির্মাণ কুশলতা, তার সর্বাঙ্গের অপর্যাপ্ত, মহাসমৃদ্ধ, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ। মহামহিমময়, রহস্যময় হয়ে আছে খাজুরাহোর মন্দিরের প্রতিটি ছাদ।

অগভীর এই সব মণ্ডপের শীর্ষদেশের গম্বুজাকৃতি ছাদ। ভূষিত করেন খাজুরাহোর সুনিপুণ ভাস্কর তার প্রতিটি অঙ্গ সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণে। অনুরূপ পর্যাপ্ত অলঙ্করণে অলঙ্কৃত করা হয় তোরণের আর সীমান্তস্থিত কক্ষের ছাদও। অবলম্বিত হয় জ্যামিতির পদ্ধতি এই ছাদের অলঙ্করণে। রচিত হয় বৃত্তাকার প্রতিচ্ছেদ, রূপ পরিগ্রহ করে তারা কোথাও অর্ধবৃত্তাকার কুলুঙ্গির সমষ্টির, কোথাও বা ডিম্বের, বিলম্বিত তাদের কেন্দ্রস্থল থেকে এক একটি সুদীর্ঘ (পেনড্যাণ্ট) দুল। মহাসমৃদ্ধিশালী এই দুলগুলিও, প্রকৃষ্টতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ দিয়ে। চক্রাকারে আবর্তিত এই বৃত্ত আর অর্ধবৃত্তগুলি রূপ ধারণ করে নদীর বুকের উপলখণ্ডের। প্রথমে রচিত হয় ছাদের অলঙ্করণের পরিকল্পনা। ভূমিতে বসে খোদিত হয় প্রতিটি ছাদের প্রস্তরের অঙ্গ। অলঙ্কৃত করেন ভাস্কর তাদের প্রতিটি অঙ্গ পরিকল্পিত অলঙ্করণে। সম্পূর্ণ হয় তাদের অঙ্গের অলঙ্করণ, স্থাপিত হয় তারা একে একে ছাদের অঙ্গে, নির্দিষ্ট স্থানে, সংযুক্ত হয় পরস্পরের সঙ্গে। নিখুঁত, নির্ভুল এই সংযোজন মহামহিমময় হয় ছাদ, পরিণত হয় এক রহস্যলোকে, এক অমরাবতীতে।

আমরা খুব ভোরে উঠে পশ্চিম গোষ্ঠীর মন্দির দর্শনে যাই। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরগুলি পূর্ব দিকে মুখ করে। তখন উদয় ভানুর আগমনে রক্তিম বর্ণ ধারণ করে পূর্ব দিগন্ত, ছড়িয়ে পড়ে তার আভা মন্দিরের শীর্ষদেশে, পড়ে তার বুকেও, লাল হয় মন্দিরের শীর্ষদেশ, রক্তবর্ণ ধারণ করে তার বুক। আমরা প্রথমে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরে উপনীত হই। প্রাচীনতম মন্দির খাজুরাহোর, নির্মিত তার সর্বাঙ্গ স্ফটিক প্রস্তর দিয়ে, ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি এক অরণ্য সঙ্কুল পরিবেশে, ঘনবন বেষ্টিত হয়ে, তাই সহজ নয় এই মন্দিরে গমন। বেষ্টিত হয়ে আছে ঘনবনে খাজুরাহোর প্রায় সবগুলি মন্দিরই, ব্যতিক্রম শুধু পাঁচটি মন্দির। বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটি একশত তিন ফুট দীর্ঘ ষাট ফুট প্রস্থ প্রাঙ্গণ। বেষ্টিত ছিল এই প্রাঙ্গণটি পঁয়ষট্টি প্রকোষ্ঠ দিয়ে, শীর্ষে নিয়ে শিখর। অবশিষ্ট আছে তাদের মধ্যে শুধু পঁয়ত্রিশটি

আয়তক্ষেত্র এই মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে আঠার ফুট উঁচু প্রস্তরে গঠিত মঞ্চের উপর।

পূজিতা হতেন এই মন্দিরে কালী—সংহারের অধিকর্তা দেবী, অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই মন্দিরের, সঙ্গে নিয়ে চৌষট্টি যোগিনী, তাঁর লীলা সহচরী। সহায়ক তাঁরা দুর্গার তাঁর বিভিন্ন কাজের। তাই পূজিত হন তাঁরা দেবী দুর্গার সঙ্গে, দুর্গা পূজার সমাপনান্তে। সংখ্যায় চৌষট্টি, অধিষ্ঠান করেন তাঁরা বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন তিথিতে। জব্বলপুরের নিকটে, পবিত্র নর্মদা তীরে, ভেরী ঘাটেও একটি চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, ১১৬ ফুট পরিধি নিয়ে। পান্না জেলায় রানীপুরে, জাড়াইলে পাধোলির নিকটে মিতলিতে, পাহাড়পুরে ও আরও কয়েক স্থানেও আছে। কিন্তু বৃত্তাকার তাদের গঠন, আয়তক্ষেত্র নয় খাজুরাহোর মত।

সেখান থেকে আমরা ছয়শত গজ পশ্চিমে অবস্থিত লালগুঁয়া মহাদেবের মন্দিরে উপনীত হই। শৈব মন্দির ক্ষুদ্রতরও আয়তনে, দাঁড়িয়ে আছে অর্ধভগ্ন অবস্থায়। দেখি, নিশ্চিহ্ন হয়েছে তার সামনের অলিন্দটি কালের করালে। অবশিষ্ট আছে শুধু সম্মুখ ভাগের হীরকাকৃতি অলঙ্করণ।

অগ্রসর হ'য়ে, আমরা কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দিরে উপনীত হই। দেখি দাড়িয়ে আছে এই মন্দিরটি মহামহিমময় মূর্তিতে, চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরের উত্তর দিকে। সুন্দরতম আর বৃহত্তম মন্দির খাজুরাহোর, সর্বশ্রেষ্ঠও, দান মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির আর ভাস্করের বহুশত বৎসরের সাধনার। নির্মিত ৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়িয়ে আছে একশত দুই ফুট তিন ইঞ্চি দীর্ঘ, ছেষট্টি ফুট দশ ইঞ্চি প্রস্থ পরিধি নিয়ে, উর্ধ্বে তুলে তার একশত একফুট নয় ইঞ্চি উঁচু উন্নত, মহামহিমময়, শির বা শিখারা।

সান্ধারা প্রাসাদ এই মন্দিরটি, বিস্তৃত তার প্রদক্ষিণের পথ মহামণ্ডপে। দুইটি সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে পৃথক করা হয় গর্ভগৃহ থেকে অন্তরালয়কে। বুকে নিয়ে আছে অনুরূপ দুইটি স্তম্ভ চিত্রগুপ্তের মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের দুই পাশও। সমবিস্তৃত মহামণ্ডপের কেন্দ্রস্থলের বেদীটি, চতুষ্কোণ ভিত্তির সঙ্গে। রচিত হয় মহামণ্ডপের বেদীর চারিপাশে প্রাচীর, দূরত্বের সমতা বজায় রেখে। সংলগ্নীভূত হয় প্রাসাদ বা বিমান

আর মহামণ্ডপের প্রাচীর, যুক্ত হয় মণ্ডপের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে অর্ধমণ্ডপ একটি অর্ধ উন্মুক্ত স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ আর তোরণ। প্রাসাদ আর মণ্ডপের দুই পাশে, কেন্দ্রস্থলে, রচিত হয় ভদ্র, রূপ পরিগ্রহ করে মন্দির জোড়া ক্রুসের। রচনা করেন খাজুরাহোর মহাঅভিজ্ঞ স্থপতি, ধরিত্রীর বুকে প্রস্তর দিয়ে একটি সম্পূর্ণ শৈলমালা, বুকে নিয়ে ক্রম ঊর্ধ্বমান শিখরের শ্রেণী, অঙ্গে নিয়ে সর্বনিম্ন তলায়, পদভাগে, শূন্য গহ্বর, তার উপর স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ আর তোরণের সারি, তারা-গর্ভগৃহে উপনীত হয়। বিরাজ করেন যেখানে শিব লিঙ্গ, মন্দিরের বিগ্রহ। সমতল নয় মন্দিরের হর্ম্যতলও বা মেঝে, ক্রম ঊর্ধ্বমান হয়ে উপনীত হয় মহামণ্ডপের কেন্দ্রস্থলের বেদীতে, সেখান থেকে অন্তরালয়ে। অন্তরালয় থেকে সোপানের শ্রেণী পৌছায় গর্ভগৃহে। অংশ গ্রহণ করে গর্ভগৃহের সুউচ্চ মেঝে বিমানের উল্লম্ব আরোহণে।

দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের ছাদ আর গম্বুজ স্তম্ভ আর উদ্গত স্তম্ভের শীর্ষদেশে, দাঁড়িয়ে আছে গর্ভগৃহের ছাদও উদ্গত স্তম্ভের উপর। রচিত হয় সুবিশাল বন্ধনী, পরিচিত উচ্চালক নামে, মহামণ্ডপের স্তম্ভের শীর্ষদেশে, তার উপর অর্ধ স্তম্ভের আসন। ক্রম নিম্নমান হয়ে নেমে আসে তার পশ্চাৎ দিক, স্পর্শ করে প্রাচীরের গাত্রের উল্লম্ব অংশ, পরিচিত বেদী অথবা সমরাঙ্গন-সূত্রধর নামে। এই স্তম্ভের শ্রেণীর প্রান্তদেশে রচিত হয় মন্দিরের গর্ভগৃহ, বেষ্টিত প্রাচীর দিয়ে। মন্দিরের পবিত্রতম প্রদেশে, শিখারার গ্রীবার নিম্নতম প্রদেশে, কলসের নিচে স্থাপিত হয় লিঙ্গ। গর্ভগৃহের উপর ক্রমহ্রস্বায়মান হয়ে ঊর্ধ্বে ওঠে মন্দিরের শিখারা, শীর্ষে নিয়ে আমলক আর কলস। দর্শন করেন সেই শিখারা ভক্তেরা বাইরে থেকে, পুণ্য লাভ করেন দেখে।

রচিত হয় পৃথক ছাদ মহামণ্ডপ, মণ্ডপ আর অর্ধ মণ্ডপের শীর্ষদেশেও, শিরে নিয়ে আমলক আর কলস। রচিত হয় প্রতিটি মণ্ডপের ছাদের অঙ্গে, ক্ষুদ্রতর মণ্ডপের সমষ্টি। সুষ্ঠু অনুকরণ তারা মূল মণ্ডপের, রূপ ধারণ করে বিমানের অঙ্গের মূলমঞ্জরির উরোমঞ্জরির বা অঙ্গ-শিখরের। ক্ষুদ্রতর গম্বুজের গুচ্ছ দিয়ে শোভিত হয় মহামণ্ডপের শীর্ষদেশের কেন্দ্রস্থলের বৃহৎ গম্বুজটির চতুর্দিকও। রচিত হয় একটি দুল, শিখরের কলসের নিচে, বিলম্বিত হয় গম্বুজের চূড়া থেকে। বিভক্ত এই ছাদের

অঙ্গও বিভিন্ন স্তরে, ক্রম ঊর্ধ্বমান হয়ে উপনীত হয় সেই স্তর প্রাসাদে। ঊর্ধ্বগতিতে ওঠে শুকনাসার শীর্ষদেশের নিচে পর্যন্ত মহামণ্ডপের ছাদও স্তরে স্তরে। দেখি দাঁড়িয়ে আছে একটি সিংহও ঊর্ধ্বদেশে, নিবদ্ধ তার দৃষ্টি ধরিত্রীর বুকে।

নাই কোন প্রবেশপথ সর্বনিম্ন তলাতে, পদভাগে রচিত হয় শুধু একটি গবাক্ষ। নির্মিত হয় প্রাচীরও অনুভূমিক প্রস্তর খণ্ড দিয়ে, উরোমঞ্জরির স্কন্ধ পর্যন্ত, বিস্তৃত হয় প্রাচীরের গাত্র থেকে ভিতরের পোস্তা পর্যন্ত। তার উপর ছাদ। রচিত হয় প্রকোষ্ঠের শ্রেণী, শূন্যগর্ভ এই প্রকোষ্ঠগুলি। নির্মিত হয় প্রধান স্তম্ভ দণ্ডও মন্দিরের গর্ভগৃহের মেঝেতে। গর্ভগৃহের ছাদ ভেদ করে উপনীত হয় সেই স্তম্ভদণ্ড শিখারার স্কন্ধ দেশে, সেখান থেকে আমলক পার হয়ে পৌছায় কলসের নিচে, শীর্ষে নিয়ে উল্টানো পাত্র। কর্পরি নামে পরিচিত এই স্তম্ভদণ্ড, বলা হয় দণ্ডিকাও।

রচিত হয় দীর্ঘচ্ছেদ অক্ষের উপর মন্দিরের চূড়ার শ্রেণী। বিভক্ত হয় চূড়া দুই পাশের গভীর খাঁজ দিয়ে, শৈলমালার রূপ ধারণ করে মন্দির। নির্মিত হয় সেই সব খাঁজের নিচে, সর্ব নিম্নতলাতে, কত সুপ্রশস্ত স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ, বা ব্যালকনি, বাড়ে মন্দিরের সৌন্দর্য। দেখে মনে হয় শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি শৈলমালা, কখন ঊর্ধ্বে ওঠে তার চূড়া আবার নেমে আসে নিচে, আবার উঁচুতে ওঠে। কিন্তু রুদ্ধ হয় তাদের ঊর্ধ্বগতি শুকনাসার কাছে এসে, পরিসমাপ্তি হয় তাদের অগ্রগতিরও। অঙ্গে নিয়ে আছে শুকনাসাও (শিখারার অংশ বিশেষ) মণ্ডপের ছাদের অঙ্গের অলঙ্করণ। কিন্তু বিভিন্ন শিখারার অঙ্গের অলঙ্করণ, বুকে নিয়ে আছে সারি সারি ক্ষুদ্র মন্দির, প্রতীক মূল মন্দিরের তারা। সেখান থেকে বঙ্কিম গতিতে ঊর্ধ্বে ওঠে মূলমঞ্জরি, সঙ্গে নিয়ে উরোমঞ্জরি বা অঙ্গ শিখারা, উপনীত হয় শৃঙ্গে, স্পর্শ করে আকাশ। রূপ ধারণ করে মন্দির দেবাদিদেব শিবের স্বর্গ কৈলাসের। নির্মিত হয় শিখরগুলির অন্তবর্তী গভীর খাঁজে, বিস্তৃত ছাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন নিম্নতম প্রদেশে, অপরূপ সুন্দর পরিমিত প্রকোষ্ঠের শ্রেণী। সম্পূর্ণ বিপরীত তারা ঊর্ধ্বাংশের মহাসমৃদ্ধিশালী শিখরের শ্রেণীর। নিম্নতম প্রদেশে, মন্দিরের সুউচ্চ মঞ্চ নির্মিত হয়, পরিচিত জগতিপীঠ নামে।

দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত মন্দিরটি তার মণ্ডপ, অর্ধমণ্ডপ আর অন্তরালয়, একটি মাত্র পটভূমিতে, এক হয়ে আছে মন্দিরের ক্রম উর্ধ্বমান চূড়ার শ্রেণী অঙ্গে নিয়ে মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির বিস্তৃত পরিকল্পনা। ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের উল্লম্ব পশ্চাত ভাগ।

তাই ঘুরে ঘুরে দেখি সম্পূর্ণ মন্দিরটিকে। দেখি তার প্রতিটি কোণ, প্রতিটি সম্মুখ ভাগের তিন দিক। দেখি অলঙ্কৃত করেন মহা অভিজ্ঞ চন্দেল্ল ভাস্কর তার প্রতিটি অঙ্গ, ভূষিত করেন তার সর্বাঙ্গ মহাসমৃদ্ধিশালী অনবদ্য ভূষণে, আর সুষ্ঠু গঠন জীবন্ত মূর্তি সম্ভার দিয়ে। মূর্তি কত দেব দেবীর, কত উড়ন্ত অপ্সরার, কত সুরসুন্দরীর হস্তে নিয়ে কেউ বেণু, কেউ বীণা, কেউ করতাল। মূর্তি কত বৃক্ষরাণ্যর, কত নাগ আর নাগিনীরও। মূর্তি দিয়ে রচিত হয় কত দৃশ্য—দৃশ্য কত গৃহস্থের সাংসারিক জীবনের, কোথাও নিযুক্ত তারা সংসারের কাজে, কোথাও স্নানে রত, মগ্ন অধ্যয়নে, নিযুক্ত কোথাও বিভিন্ন শিল্প নির্মাণেও, কোথাও নিদ্রায় অচেতন তারা। দেখি নিযুক্ত কেউ প্রসাধনে, কেউ নৃত্যে। দেখি ক্রীড়ায় নিযুক্ত কত বালক বালিকাও। দেখি দৃশ্য কত ক্রীড়ার, কত শিকারের, কত যুদ্ধেরও। দৃশ্য কত অরাতিদমনেরও। দেখি দৃশ্য কত প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম নিবেদনের, কত বিভিন্ন মৈথুনের, নর ও নারীর পূর্ণ যৌন মিলনের। দৃশ্য তাদের সম্ভোগের মহা আনন্দে নিমগ্নের। যৌবন মদমত্তা এই নারীরা, বঙ্কিম তাদের গ্রীবা, আকর্ণবিস্তৃত তাদের নয়ন, লাস্যময়ী তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গী, যৌবন পুষ্ট, মসৃণ তাদের স্তন যুগল, গুরুভার তাদের নিতম্ব। যৌবন দৃপ্ত, শোভন দর্শন, প্রাণের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ তাদের প্রেমাস্পদেরাও, তাই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে তাদের মিলনও।

দেখি কত ভীষণ দর্শন মকরের মূর্তি, মূর্তি কত পরাক্রমশালী শার্দুলের আর বিভিন্ন বন্য পশুর, মূর্তি কত ভাস্করের কল্পিত জন্তুরও। দেখি বিভিন্ন তাদের বিষয়বস্তু, বহু বিস্তৃতও। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে এক মহামহিমময় সুদূর প্রসারিত রঙ্গমঞ্চ, অভিনয় করেন সেই রঙ্গমঞ্চে কত স্বর্গের দেবতা, কত দেবী, কত উড়ন্ত অপ্সরা, কত সুরসুন্দরী, কত গন্ধর্ব, কত যক্ষ, অধিবাসী তাঁরা স্বর্গের। অংশ গ্রহণ করেন সেই অভিনয়ে কত মর্ত্যলোকের অধিবাসীরাও, কত শিশু কত বালক বালিকা, কত যুবক যুবতী,

কত বৃদ্ধ, বৃদ্ধাও, করেন বিভিন্ন অভিনয়। বাদ যান না পাতালের অধিবাসী নাগ আর নাগিনীরাও, যায় না শ্বাপদ আর বিহঙ্গরাও, তারাও অংশ গ্রহণ করে এই অভিনয়ে, করে সুষ্ঠু অভিনয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন এই অভিনয়ে দেবতা আর দেবীরা আর প্রেমিক প্রেমিকারা, মধ্যমণি তাঁরা ভাস্করের। অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করেন তাঁরা ভাস্করের অন্তহীন হৃদয়ের ঐশ্বর্যে আর অপরিসীম মনের মাধুরীতে-মহিমময় হন। মহামহিমময় আর সুন্দরতম হয় খাজুরাহোর মন্দিরও, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের দরবারে, হয় বিশ্বজিৎ। অমরত্ব লাভ করে খাজুরাহো আর তার শিল্পীরাও, শাশ্বত হয় তাদের কীর্তি, অবিনশ্বর হয় সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের পূর্ণ পরিণতির।

শিখারার দক্ষিণ পশ্চিম সম্মুখভাগে উপনীত হই। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি শিখারার অঙ্গের অনবদ্য অলঙ্করণ, দেখি তার নির্মাণ পদ্ধতিও। খোদিত করেন মহা অভিজ্ঞ স্থপতি শিখারার অঙ্গে, প্রতিটি প্রধান দিকে, চারিটি করে উরোমঞ্জরি বা অঙ্গশিখর, সুষ্ঠু অনুকরণ তারা মূলমঞ্জরির। যুক্ত হয় নিম্নস্থ উরোমঞ্জরিগুলি, ঊর্ধ্বে অবস্থিত উরোমঞ্জরির উরুর বা স্কন্ধের সঙ্গে। তাদের দুই পাশে রচিত হয় কর্ণমঞ্জরির সারি। সমান্তরাল অনুভূমিক এই সারিগুলি। নিম্নতর সারির তিনটি ও তৃতীয় সারির একটি কর্ণশৃঙ্গ অধিকার করে আছে উরোমঞ্জরিগুলির পূর্ব ও দক্ষিণ কোণ। কর্ণশৃঙ্গ আর উরোমঞ্জরির কেন্দ্রস্থলে রচিত হয় নষ্টশৃঙ্গ বা খণ্ডরেখার শ্রেণী। অর্ধ লুক্কায়িত শিখারা এইসব নষ্টশৃঙ্গ, দৃশ্যমান শুধু তাদের আমলক আর কোণ, অদৃশ্য থাকে তাদের দুই পাশের বক্র অংশ, দুই দিকের নিকটবর্তী কর্ণশৃঙ্গের অন্তরালে। শিখারার প্রতি চতুর্থাংশে রচিত হয় চারিটি করে নষ্টশৃঙ্গ, দুইটি নিম্নতর সারিতে দুইটি উপরের। একটি মাত্র ক্ষুদ্রতর কর্ণশৃঙ্গ দিয়ে শোভিত করা হয়, তৃতীয় সারিতে, অবস্থিত মূলমঞ্জরির কোণ। তার দুই পাশে দুই সুউচ্চ নষ্টশৃঙ্গ রচিত হয়, স্পর্শ করে তাদের শীর্ষদেশ দ্বিতীয় ও শেষ উরোমঞ্জরি। নিখুঁত আর মহাসমৃদ্ধিশালী হয় শিখারার অঙ্গের উরোমঞ্জরি আর মূলমঞ্জরির কর্ণের রচনা সঙ্গে নিয়ে অনুভূমিক অংশ—পরিচিত ভূমি নামে, ছন্দময় হয় শিখারার অঙ্গের গঠন, হয় মহিমময় আর রহস্যময়ও।

রচিত হয় প্রতিটি শৃঙ্গ বা শিখারার শীর্ষদেশে, দুইটি করে আমলক, তার উপরে কলস। দাঁড়িয়ে আছে ভদ্রের শীর্ষদেশে, সিংহকরণের চূড়ার উপর, সর্বনিম্ন শ্রেণী। বেষ্টন করে আছে উর্ধ্বাংশের সারির শৃঙ্গ শিখারার অঙ্গ, রচিত হয় মেখলা প্রাসাদ বা বিমানের প্রাচীরের গাত্রে। মন্দিরের শিখারা বা মূল-মঞ্জরির সুষ্ঠু অনুকরণ প্রতিটি শৃঙ্গ। উর্দ্ধে ওঠে এই শিখারা, নিম্নতম প্রদেশ থেকে উপনীত হয় তৃতীয় কর্ণশৃঙ্গে, পরিদৃশ্যমান সেখানে শুধু তার কোণ, অঙ্গে নিয়ে ভূমি। কিন্তু অতিক্রম করে শিখারা কর্ণশৃঙ্গ, উপনীত হয় সর্বোচ্চ উরোমঞ্জরিতে, পৌছায় আমলকে।

সপ্তরথ দেউল এই মূলমঞ্জরি, কিন্তু সদগুণ সূত্রে অনুমোদিত সপ্তরথের বক্রতার চাইতে ঋজুতর এই দেউলের বক্রতা আর তার অঙ্গের রেখা। তার চারিপাশের প্রতিটি দিকে রচিত হয় সপ্তপগ, সঙ্গে নিয়ে কোণক পগ।

দাঁড়িয়ে আছে প্রতিটি কর্ণশৃঙ্গ এক একটি চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর, বিস্তৃত তাদের দুই পাশ। অলঙ্কৃত করা হয় এইসব কর্ণশৃঙ্গ আর তাদের সঙ্গের ছাঁচ দিয়ে বিমানের অঙ্গ। রচিত হয় কুটা প্রতিটি দ্বিতীয় উরোমঞ্জরির পাদদেশে তার মূলমঞ্জরির নিম্নতম কোণে। বৃত্তাকার আমলকের সান্নিধ্য ও তার নিচের গভীর সরল রেখাগুলি সৃষ্টি করে প্রাসাদের মূল শিখারার অঙ্গে আলোছায়ার সমাবেশ। সবশেষে, খোদিত হয় গভীর সমান্তরাল সরল রেখার বন্ধনী শিখারার অনুভূমিক অংশে, সংলগ্নীকৃত হয় সমস্ত মঞ্জরির শীর্ষদেশ। রচিত হয় ক্ষুদ্রাকৃতি তল আর মন্দিরের প্রতীকও, বর্ধিত হয় শিখারার অনুভূমিক অংশের সৌন্দর্যও। কিন্তু মহিমন্বিত হয় শিখারা তার শীর্ষদেশের সুবিশাল, শিরাযুক্ত, আমলক, আর তার উপরে অবস্থিত কলস দিয়ে। সবার উপরে স্থাপিত হয় ত্রিশূল বা বীজেশ্বর, মহামহিমান্বিত হয় শিখারা।

অলঙ্কৃত হয় শিখারার ক্রমহ্রস্বায়মান অঙ্গ কত সুন্দরতম রথ, কত অনবদ্য শিল্প সম্ভারে সমৃদ্ধ গবাক্ষ, কত দৃঢ় সন্নিবদ্ধ অঙ্গাবরণ, কত আভরণ, কত অনুপম স্ক্রোলের কাজ, কত সূক্ষ্মতম জালির কাজ আর কত নিরুপম ঝালরের কাজ দিয়েও, মহাসমৃদ্ধশালী হয় শিখারার অঙ্গ। মহামহিমান্বিত হয় সমস্ত শিখারাও, সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে তার অঙ্গের প্রতিটি বক্র অগ্রগতি, সুসমন্বিত হয়ে উপনীত হয় মূলমঞ্জরিতে, তাদের শেষ লক্ষ্যস্থলে। জীবন্ত হয় তার

সর্বাঙ্গ মহা অভিজ্ঞ স্থপতির হস্তের স্পর্শে, বাঙ্ময় হয় তার অঙ্গের প্রতিটি প্রস্তরখণ্ড সুনিপুণ ভাস্করের হৃদয়ের ঐশ্বর্যে আর মনের মাধুরীতে, স্পন্দিত হয় তার সর্বাঙ্গ চন্দ্রকিরণে, বিকসিত হয় সূর্যের রশ্মিতে, স্পন্দিত হয় তার সারা বুক, বর্ণিত হয় প্রতিটি মুহূর্তে। অলোকসুন্দর হয় মন্দির, হয় অপরূপ।

আমরাও বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে দেখি তার সারা অঙ্গের নবারুণের অপরূপ অরুণিমা, দেখি স্তব্ধ হয়ে।

অনুরূপ পরিকল্পনায়, গঠনে তার অঙ্গের অলঙ্করণে শিখারার অপর তিনদিকও।

বিমাণের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি একটি সুউচ্চ মঞ্চের উপর। নির্মিত হয় সেই সুউচ্চ ভিত্তির উপর অনবদ্য শিল্প সম্ভারে অলঙ্কৃত, মন্দিরের স্তম্ভযুক্ত ব্যালকনির (অলিন্দের) শ্রেণী। অভিক্ষিপ্ত এই ব্যালকনিগুলি মন্দিরের ভিতরের প্রদক্ষিণের পথ থেকে। অনুভূমিক তারা মন্দিরের গাত্রের তিনটি মেখলার নিম্নতম মেখলার। ভূষিত হয় এই তিনটি মেখলার সর্বাঙ্গই সুষ্টু গঠন জীবন্ত মূর্তিসম্ভার দিয়ে। বেষ্টন করে আছে এই মূর্তিসম্ভারে অলঙ্কৃত মেখলাগুলিই প্রক্ষিপ্ত ব্যালকনির মধ্যের প্রধান, বৃহৎ কারুকার্য সমন্বিত পোস্তাগুলিও। বুকে নিয়ে আছে তিনটি প্রধান পোস্তার কেন্দ্রস্থলের পোস্তাটি মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ। ব্যালকনির অঙ্গ থেকে বিস্তৃত হয় এই পোস্তাগুলি মন্দিরের সারা অঙ্গে, অবিচ্ছিন্ন অনবচ্ছেদ্য এই বিস্তৃতি। বর্ধিত হয় তাদের আকৃতিও, রূপধারণ করে তারা মূল মন্দিরের সুউচ্চ শিখারার ক্ষুদ্রতর সংস্করণের, তার সুষ্ঠু, নিখুঁত প্রতীকের। তিন সারিতে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সংলগ্নীভূত হয় তারা মূল শিখারার অঙ্গে, অঙ্গীভূত হয় একেবারে, রচিত হয় শিখারার গাত্রে উরোমঞ্জরি মূলমঞ্জরির বা মূল শিখারার। এই মূল শিখারার ক্ষুদ্র সংস্করণ বা উরোমঞ্জরি দিয়েই অলঙ্কৃত করা হয় ব্যালকনির শীর্ষদেশের ত্রিকোণাকার প্রসাধনের স্তর আর অর্ধ শিখারার অন্তবর্তী স্থানও। সংলগ্নীভূত হয় এই অর্ধ শিখারার শ্রেণীও মূল শিখারার পরস্পরকে অবলম্বন করে, অঙ্গীভূত হয় চতুর্দিক থেকে।

সন্নিবিষ্ট হয় কত শিখারার অংশ, অর্ধ শিখারার সমষ্টির ফাঁকে ফাঁকে, বিন্যস্ত হয় কোণের ক্ষুদ্রকায় শিখারার প্রতিটি উল্লম্ব সারির কেন্দ্রস্থলেও। সুসমৃদ্ধ

হয় এই বিন্যাস, মহিমময় হয় তাদের শীর্ষদেশের আমলক আর চূড়া দিয়ে। রেখাকৃতিতে ঊর্ধ্বে ওঠে সেই আমলক আর চূড়া আর তার প্রতিমূর্তি, পরিদৃশ্যমান হয় সকল কোণ থেকেই। নির্মিত হয় নাগর স্থপতির জটিলতম শিখারা ভারতে। নির্মাণ করেন মহা অভিজ্ঞ চন্দেল্ল স্থপতি। সুসামঞ্জস্য হয়, অনবদ্য সমন্বয় হয়, মন্দিরের পরিকল্পনার মহামহিময়ত্বে, তার পরিমিতে, উচ্চতায় এবং অঙ্গের অলঙ্করণের সমৃদ্ধিতে আর পুনরাবৃত্তিতে। মহামহিমময় হয় মন্দির।

অভিক্ষিপ্ত হয় বিমানের অঙ্গের ব্যালকনিগুলি, মন্দিরের গর্ভগৃহের অন্তরতম প্রদক্ষিণের পথ থেকে। বুকে নিয়ে আছে এই প্রদক্ষিণের পথ দুই প্রস্থ প্রাচীর। অঙ্গে নিয়ে আছে বহিঃপ্রাচীর তিনটি মেখলার সারি, অলঙ্কৃত হয়ে আছে তাদের অঙ্গের প্রতিটি পোস্তা বৃহৎ, মহামহিময় মূর্তিসম্ভার দিয়ে, মূর্তি দেব দেবীর। প্রসারিতও প্রতিটি পোস্তাব তিনদিক। তিন মেখলাতেই কুলুঙ্গির ভিতরে রচিত হয় শাদূর্লের মূর্তি, খোদিত হয় উল্লম্ব পার্শ্বদেবতা আর দেবীর মূর্তি, পর্যায়ক্রমে, মূর্তি কত ফণাযুক্ত নাগ আর নাগিনীরও। জীবন্ত, শোভন গঠন, এই মূর্তিগুলি অপরূপ, দাঁড়িয়ে আছে ছন্দময় ভঙ্গীতে, সূক্ষ্মতম কারুকার্য সমন্বিত চন্দ্রাতপের নিচে দুই পাশের সুপ্রক্ষিপ্ত বন্ধনীর অভ্যন্তরে।

দেখি, অলঙ্কৃত বিমানের বহিরাঙ্গের তিন সারি মেখলার প্রতিটি প্রস্তর খণ্ড, তার সর্বাঙ্গ, বিভিন্ন অর্ধপ্রমাণ আকৃতির মূর্তি সম্ভার দিয়ে। মূর্তি কত দেব দেবীর, কেউ দাঁড়িয়ে আছে নৃত্যের ছন্দে, কেউ নিযুক্ত নৃত্যে, অপরূপ ছন্দময় তাঁদের দাঁড়াবার ভঙ্গী, বিকশিত তাঁদের আনন অন্তরের ভাষায়, হিল্লোলিত তাঁদের সর্বাঙ্গ প্রাণের প্রাচুর্যে। দেখি, মূর্তি কত অপ্সরার, কত উড়ন্ত দেব দেবীর আর সুরসুন্দরীরও। মূর্তি দেখি কত জীবন্ত বলদৃপ্ত, শোভন দর্শন পুরুষের, কত যৌবন পুষ্টা পীনোন্নত বক্ষা, হেলায়িত গ্রীবা, আকর্ণ বিস্তৃতা, সুপুষ্ট নিতম্বা পরমা রূপবতী নারীরও। দেখি মূর্তি দিয়ে রচিত হয় কাহিনীও, কাহিনী কত পুরাণের, কাহিনী কত নর নারীর সুখ দুখের, আনন্দ উৎসবের, আশা, আকাঙ্ক্ষারও। দেখি, মহাবীর্যশালী শাদূর্লের আর ভীষণ দর্শন মকরের মূর্তিও। দেখি, স্তব্ধ হয়ে প্রাচীরের গাত্রে সুন্দরতম দান, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, অবিনশ্বর কীর্তি, মহা অভিজ্ঞ চন্দেল্ল ভাস্করের, নিদর্শন তার চরম উৎকর্ষের।
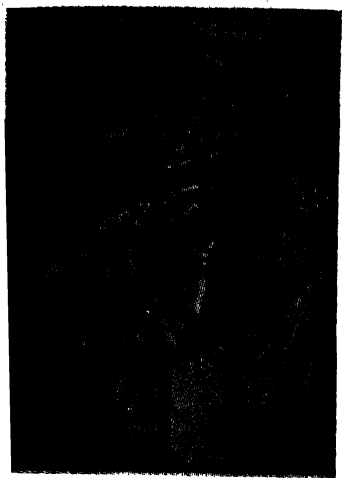
শার্দূল ও সুরসুন্দরী। বিশ্বনাথের মন্দির
খাজুরাহো : মধ্যদেশ
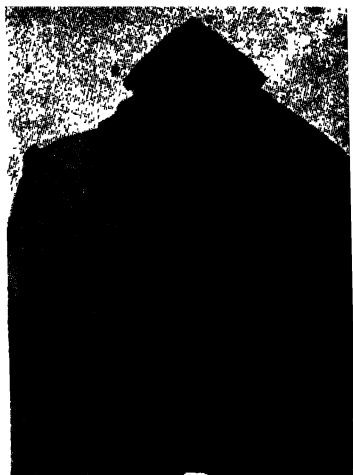
১৮। জোড়বাংলা মন্দির। বিষ্ণুপুর : বঙ্গ
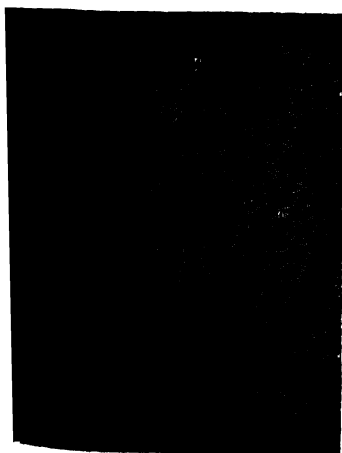
১৯। রাসলীলা। বাসুদেবের মন্দির।
বাঁশবেড়িয়া : বঙ্গ

২০। সূর্য মন্দির। ওশিয়া :

২১। জগমোহনের প্রাচীরের গাত্র। সূর্য মন্দির। কোণার্ক : কলিঙ্গ।
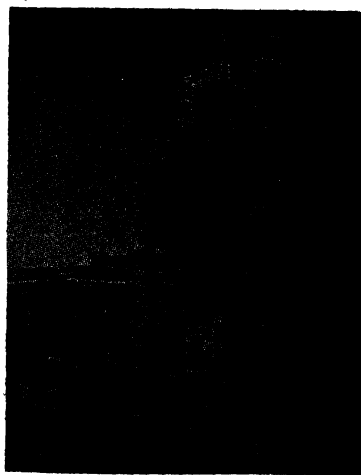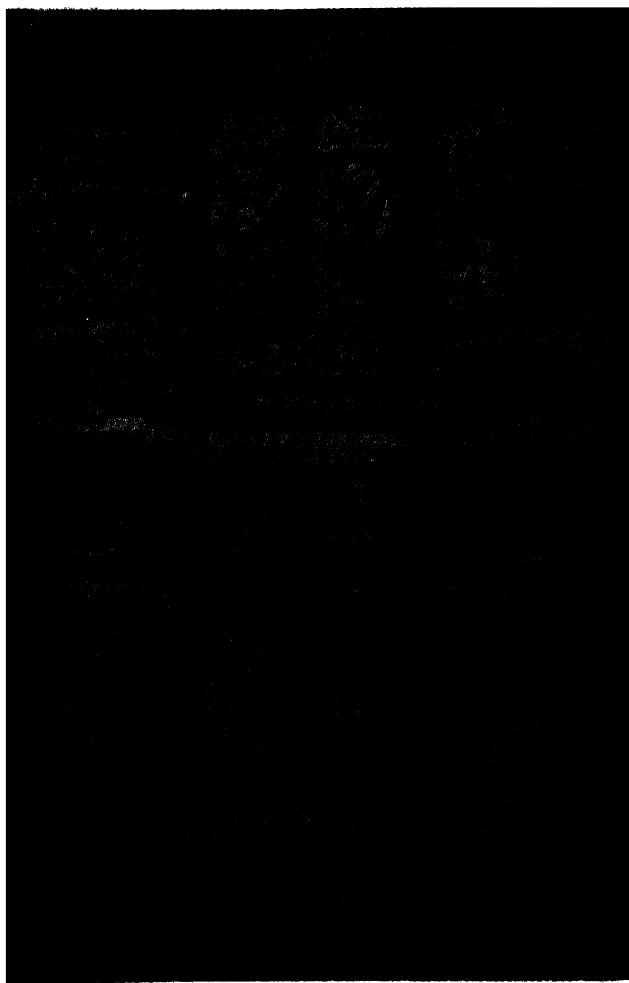
সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করি, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি প্রবেশ পথের তোরণের অঙ্গের অনবদ্য সুন্দরতম অলঙ্করণ, এক আলোছায়ার শান্তিময় পরিবেশ। ব্যালকনি দিয়ে প্রবেশ করে সূর্যের রশ্মি মন্দিরের ভিতরে, প্রতিফলিত হয় সেই কিরণ, প্রশমিত হয় তার তীব্রতা প্রবেশের পথে, সৃষ্টি হয় এক রহস্যময় মহাশান্তির পরিবেশ মন্দিরের অন্তরতম প্রদেশে। দেখি তার অঙ্গের সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত মূর্তিসম্ভার, মূর্তি কত সংগীতজ্ঞের— কেউ নিযুক্ত বেণু বাদনে, কেউ করতাল, কেউ বীণা। দেখি মূর্তি কত ভীষণ দর্শন, ব্যাদিতআনন মকরের, কত উড়ন্ত দেবদেবীর, অঙ্গে নিয়ে পক্ষ। মূর্তি কত আলিঙ্গনবদ্ধ প্রেমিক প্রেমিকারও, জীবন্ত এই নর নারীরা। স্পন্দিত তাদের সর্বাঙ্গ হৃদয়ের ঐশ্বর্যে আর প্রাণের প্রাচুর্যে। তারা পরস্পরকে নিবেদন করে প্রেম। বৃষস্কন্ধ এই পুরুষরা, সুন্দরদর্শন, নিখুঁত তাদের যৌবন দৃপ্ত অঙ্গের গঠন, প্রদীপ্ত তাদের সর্বাঙ্গ পৌরুষের ব্যঞ্জনায়, তাই প্রিয়তম তারা নারীর, বহু আকাঙ্খিত, অভিলষিতও। পরমারূপবতী এই নারীরাও, যৌবনমদমত্তা, পেলব, মাংসল, মসৃণ তাদের স্তন যুগল, গুরুভার তাদের নিতম্ব। তাদের বঙ্কিম গ্রীবাতে, আকর্ণবিস্তৃত নয়নে, লীলায়িত দেহভঙ্গীতে, আর লাস্যময়ী ছন্দে উন্মুক্ত যৌন কামনার সুস্পষ্ট প্রকাশ। তাদের সর্বাঙ্গে ইন্দ্রিয় গ্রাহীতার পরিপূর্ণ বিকাশ। তাই আচঞ্চল পুরুষের দেহের প্রতিটি শোণিতবিন্দু তাদের স্পর্শে। মিলন হয় স্ত্রী পুরুষের—মিলন হয় যৌবনদৃপ্ত, সুন্দর দর্শন, বলদৃপ্ত পুরুষের আর পরমারূপবতী পীনোন্নতবক্ষা যৌবনমদমত্তা নারীর, সম্পূর্ণমিলন। মগ্ন হন তাঁরা এক পরিপূর্ণ মিলনের গভীর আনন্দে, প্রতিফলিত হয় তাঁদের অন্তর্নিহিত আনন্দের দীপ্তি তাঁদের আননে আর নয়নে, বিকশিত হয় তাঁদের সর্বাঙ্গে। রূপ পরিগ্রহ করে এই মূর্তিগুলি শিল্পীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর অভিজ্ঞতার আনন্দ থেকে, পরিচায়ক তারা তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টিরও, শ্রেষ্ঠদান তাঁর হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্যের আর মনের অপরিসীম মাধুর্যের। এক অনবদ্য সুসামঞ্জস্য হয় পার্থিব আর দৈবী ভাবসম্পদে, সুসমন্বয় হয় আধ্যাত্মিক নৈর্ব্যক্তিকতাতে আর বাস্তব রূপ আর যৌবনে, তাদের দৈহিক পরিপূর্ণ মিলনে। মিলন রূপ আর যৌবনের, তাদের পূর্ণ পরিণতির সার্থকতা লাভের। তাই সুন্দরতম অপরূপ এই মূর্তিগুলি

বুকে নিয়ে আছে চন্দেল্ল ভাস্করের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তাঁদের শাশ্বত অবিনশ্বর কীর্তি।

অগ্রসর হই। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে থাকি কক্ষের (সভাগৃহের) ছাদের অঙ্গের অপরূপ, অনুপম, মহাসমৃদ্ধ অলঙ্করণ। সুন্দরতম আর মহাসমৃদ্ধিশালী, অপর্যাপ্তও, তাদের মধ্যে মহামণ্ডপের ছাদের অঙ্গের শিল্পসম্ভার। মহামহিমময় হয় সমকেন্দ্রিক পরস্পর সংযুক্ত বৃত্তের সমষ্টি দিয়ে, রূপ পরিগ্রহ করে এক রহস্যালোকের, এক অলোকসুন্দর পরিবেশের। অভিনব এই ছাদের অলঙ্করণ পদ্ধতি, শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য খাজুরাহোর মহাঅভিজ্ঞ চন্দেল্ল ভাস্করের, তাঁদের বিশিষ্ট, সুন্দরতম দান। স্তব্ধ হয়ে দেখি স্তম্ভের শীর্ষদেশের অনবদ্য মূর্তিসম্ভার। দেখি অলঙ্কৃত তাদের শীর্ষদেশের বন্ধনীর অঙ্গ অপরূপ নারীমূর্তি দিয়ে। শোভন গঠন, যৌবনমদমত্তা, বঙ্কিম গ্রীব, পীনোন্নতবক্ষা, আকর্ণবিস্তৃত নয়না এই নারীমূর্তিগুলি, প্রতিফলিত হয় তাদের অন্তরের অন্তরতম ভাষা তাদের আননে। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় তাদের আনন অন্তরের ভাব সম্পদের সুষ্ঠু বিকাশে, আর মনের আবেগের অনুপম প্রকাশে। তাদের ঊর্ধ্বে আর নিচে রচিত হয় কদাকার, কুৎসিৎ-দর্শন বামনের মূর্তি, বাড়ে নারীর সৌন্দর্য, মনোহারিণী হয় নারী, হয় রহস্য-ময়ী আর মহিমময়ী। দেখি স্তম্ভের শীর্ষদেশে শার্দূলের মূর্তিও, বলদৃপ্ত এই শার্দূলগুলি দাঁড়িয়ে আছে বীর বিক্রমে। সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে নাগর স্তম্ভ লাভ করে শ্রেষ্ঠত্ব, হয় অপরূপ।

গর্ভগৃহের সামনে উপনীত হই। মূক হয়ে দেখি গর্ভগৃহের প্রবেশ পথের আর দ্বারের অঙ্গের মহামহিমময়, অপরূপ অলঙ্করণ। অনুরূপ এই প্রবেশ পথটি, নির্মাণ পদ্ধতিতে, পরিকল্পনায় আর অঙ্গের অলঙ্করণে তোরণের প্রবেশ পথের। দেখি শোভিত কত সুন্দরতম লতাপল্লবে আর পুষ্প সম্ভার দিয়ে তার দ্বারের বাজুর অঙ্গ আর চৌকাঠের শীর্ষদেশ, অলঙ্কৃত কত জীবন্ত, সুষ্ঠু-গঠন তপস্যাপরায়ণ মুনি ঋষির মূর্তি দিয়েও। গর্ভগৃহের দ্বারের দুই বাজুর নিম্নতম প্রদেশে, মকর বাহনে গঙ্গা আর কূর্মবাহনে যমুনার মূর্তি। অপরূপ এই মূর্তি দুইটি। গর্ভগৃহের ভিতরে শ্বেত প্রস্তরে গঠিত শিবলিঙ্গ বিরাজ করেন, বিগ্রহ দেবতা এই মন্দিরের।

মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে, আমরা প্রদক্ষিণের পথে উপস্থিত হই। বেষ্টন করে আছে এই প্রদক্ষিণের পথটি গর্ভগৃহের চতুর্দিক। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি তার ভিত্তির অঙ্গের আর বহিঃপ্রাচীরের গাত্রের অনবদ্য সুন্দরতম অলঙ্করণ আর সুষ্ঠুগঠন জীবন্ত মূর্তিসম্ভার। দুইটি সারিতে অলঙ্কৃত হয়ে আছে প্রাচীরের গাত্র। বুকে নিয়ে আছে নিম্নতম সারি বা মেখলা অষ্টদিকপালের মূর্তি। পালনকর্তা তাঁরা আট দিকের—ইন্দ্র পূর্বদিকের, অগ্নি অগ্নিকোণের, যম দক্ষিণ দিকের, নিঋতি নৈঋত কোণের, বরুণ পশ্চিমের, মরুৎ বায়ুকোণের, কুবের উত্তরের আর ঈশ ঈশানকোণের।

ভূষিত হয় গর্ভগৃহের বহিঃপ্রাচীরের গাত্র আর মহামণ্ডপের প্রাচীরের গাত্রও তিনসারি মহামহিমময়, জীবন্ত মূর্তির সম্ভার দিয়ে। মূর্তি দেবদূতের আর সুরসুন্দরীর, মূর্তি দেবতাদের আর দেবীদেরও। বিভিন্ন তাঁদের রূপ, বিভিন্ন আকৃতি, বিভিন্ন তাঁদের দাঁড়াবার ভঙ্গীও, জীবন্ত, ছন্দময়, রহস্যপূর্ণ তাঁরা সকলেই। মূর্তি দেখি কত প্রেমিক প্রেমিকারও, বহু বিস্তৃত তাঁদের প্রেম নিবেদনের স্বরূপও। রচিত হয় এই মূর্তিগুলিও ভাস্করের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বুকে নিয়ে আছে তাঁর সীমাহীন অন্তর্দৃষ্টিও। তাই জীবন্ত তারা, হিল্লোলিত তাদের সর্বাঙ্গে প্রাণের প্রাচুর্যের স্পন্দন, প্রতিফলিত তাদের আননে অন্তরের আনন্দের উচ্ছাস, শ্রেষ্ঠ কীর্তি তারা চন্দেল্ল ভাস্করের, তাঁর শাশ্বত সৃষ্টি।

ঘুরে ঘুরে দেখি এই অলিন্দের ভিত্তির অঙ্গের আর প্রাচীরের গাত্রের মূর্তিগুলি।

দেখি দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচীরের গাত্রে, অগ্নিকোণে, প্রতিরথের উপর দণ্ডায়মান দিক্‌পাল অগ্নির মূর্তি, মূর্তি দেবতা বৈশ্বানরের। দুই ফুট নয় ইঞ্চি উঁচু চতুর্ভুজ এই মূর্তিটি, সমপর্যায়ে পড়ে কাণ্ডারীয়র প্রাচীরের গাত্রের অপর মূর্তিগুলির উচ্চতায়, দাঁড়িয়ে আছে ঈষৎ আভঙ্গ ভঙ্গিতে। তাঁর দুই বাম হস্তে শোভা পায় পুস্তক আর কমণ্ডলু, নিম্ন দক্ষিণ হস্তে তিনি ধারণ করেন বরদা মুদ্রা. ভগ্ন তাঁর উর্ধ্ব দক্ষিণ হস্তটি। সুউচ্চ মুকুটের আকারে বিন্যস্ত তাঁর জটা মস্তকের উপর, শৃঙ্গাকারে নেমে আসে সেই জটার অগ্রভাগ তাঁর অপ্রশস্ত ললাটে। আননে তাঁর দীর্ঘ শ্মশ্রু, বিলম্বিত

সেই শ্মশ্রু, বঙ্কিম হয়ে নেমে এসে স্পর্শ করে তাঁর বুক। তাঁর কণ্ঠে শোভা পায় বহুমূল্য মুক্তার হার। আকর্ণবিস্তৃত তাঁর সুপ্রশস্ত ভ্রূ। দয়ার অবতার, কিন্তু ক্রোধী, নির্লিপ্ত, রহস্যময় এই দেবতা, বিকশিত হয় তাঁর অন্তরের ভাষা তাঁর আননে। অপরূপ এই মূর্তিটি।

দেখি এক অপরূপ সুরসুন্দরীর মূর্তি দক্ষিণ পশ্চিম প্রাচীরের গাত্রে দ্বিতীয় সারিতে। দুই ফুট নয় ইঞ্চি উঁচু এই পরমা রূপবতী সুরসুন্দরীটিও, দাঁড়িয়ে আছেন হস্তে নিয়ে কমণ্ডলু। বিলম্বিত সেই কমণ্ডলু তাঁর কটিদেশের নিম্নতম প্রদেশে। দেবতাদের প্রিয়তমা এই সুরসুন্দরী, যৌবনপুষ্ট তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব, সুডোল, পেলব, তাঁর নিতম্ব, মসৃণ তাঁর পীনোন্নত বক্ষ, দাঁড়িয়ে আছেন এক দর্পিতা পরমা রূপবতী নারী। তাঁর কর্ণে শোভা পায় হীরক কুণ্ডল, বাহুতে তাগা, মণিবন্ধে স্বর্ণকঙ্কণ, পদতলে উপবিষ্ট একটি গণ, নিযুক্ত তাঁর হস্তস্থিত পাত্র থেকে নিক্ষিপ্ত সুরাপানে।

মন্দিরের প্রাচীরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন সুরসুন্দরী, পরিদৃশ্যমান তাঁর পশ্চাৎভাগের তিন চতুর্থাংশ। দৃশ্যমান শুধু আননের এক পাশ। সামনের দিকে ঈষৎ হেলায়িত তাঁর বঙ্কিম গ্রীবা। সযত্ন বিন্যস্ত তাঁর অঙ্গের উত্তরীয়, স্থাপিত তার এক প্রান্ত তাঁর বামস্কন্ধের উপর, অতিক্রম করে দ্বিতীয় প্রান্ত তাঁর পৃষ্টদেশ, যৌবনপুষ্ট স্তনযুগল, দক্ষিণ স্কন্ধ বেষ্টন করে উপনীত হয় তাঁর বাম নিতম্বের প্রান্তদেশে, স্পর্শ করে যায় কনুই হস্তের ঈষৎ পশ্চাৎ হেলনে। পরিদৃশ্যমান হয় তাঁর যৌবনমদমত্ত পীনোন্নত বক্ষ, উত্তরীয়ের অন্তরাল থেকে।

অনুরূপ উত্তরীয় দিয়ে বেষ্টিত তাঁর কটিদেশও, উপনীত হয় তার এক প্রান্ত দক্ষিণ নিতম্বের প্রান্তদেশে বাম নিতম্বের উত্তরীয়ের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে। অপর প্রান্ত তাঁর উরুদেশ অতিক্রম করে নির্গত হয় জানুর ফাঁক দিয়ে, আবৃত করে বাম জানু।

দৃঢ় পদক্ষেপে দাঁড়িয়ে আছেন সুরসুন্দরী, তাই দণ্ডাকার তাঁর পদদ্বয়, নাই কোন খাঁজ তাঁর উরুতে, নাই পদযুগলেও। বর্ধিত হয় উপরাংশের বৃত্তাকার সুডোল নিতম্বের, মাংসল স্তনের, পেশল দক্ষিণ স্কন্ধের আর আননের সৌন্দর্য। সমন্বয় হয় কবরীর অলঙ্করণে, কর্ণের হীরক কুণ্ডলে, স্কন্ধের, পৃষ্ঠদেশের,

কটিদেশের আর জানুর উত্তরীয়তে। সুসামঞ্জস্য হয় বৃত্তাকার দক্ষিণ স্কন্ধে, পীনোন্নত বক্ষে, হস্তের কমণ্ডলুতে, দণ্ডাকার পদযুগলে আর পায়ের গোড়ালিতে। মহাঅভিজ্ঞ ভাস্করের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে পরিণত হয় মূর্তি।

উপনীত হই দক্ষিণ পূর্ব প্রাচীরের সামনে। প্রাচীরের গাত্রে, দ্বিতীয় সারিতে একটি সুরসুন্দরীর মূর্তি দেখি। বহিঃপানে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন সুরসুন্দরী, হেলায়িত তাঁর দেহ একটি পোস্তার অঙ্গে। কিন্তু মন্দিরের প্রাচীরের দিকে আকর্ষিত তাঁর অন্তর্দৃষ্টি। আকর্ণ বিস্তৃত তাঁর নয়ন, তাঁর মস্তকে সুবিন্যস্ত কবরী, তাঁর কণ্ঠে দীর্ঘ মুক্তার মালা। ঊর্ধ্বে উত্তলিত তাঁর বাম হস্ত, দক্ষিণ হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন একটি পাত্র। অপরূপ তাঁর অঙ্গের মসৃণ পীনোন্নত বক্ষ। সুসামঞ্জস্য হয় তাঁর বঙ্কিম দক্ষিণ হস্তের সঙ্গে আর প্রাচীরের অঙ্গের পোস্তার সঙ্গে, এই হস্ত দিয়েই তিনি দান করেন তাঁর দেহ, প্রকাশিত হয় তাঁর অন্তরের বাসনাও। তাই খোদিত করেন ভাস্কর দেবীর এই অন্তর্নিহিত দৃষ্টি তাঁর কটাক্ষে, অপাঙ্গে এই সুদূরের ডাক শোনা। সর্বদা সচেতন তাঁর অন্তরের অন্তরতম গূঢ় তত্ত্বের বিষয়ে, প্রশান্ত, মহিমময়ী এই দেবী, সঙ্গে নিয়ে যান তাঁর হস্তেধৃত পাত্র। প্রতিফলিত হয় তাঁর অন্তরের আভাস তাঁর দেহের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে। পালন করেন তিনি তাঁর উপরে ন্যস্ত কর্তব্য। হস্তের পাত্রের মতই সাধারণ তাঁর অঙ্গের অলঙ্কারও, বাড়ায় তারা তাঁর দেহের সৌন্দর্য, মহিমময়ী হন দেবী এই সাধারণ অলঙ্কারে। অলঙ্কারের অনুকরণে রচিত হয় তাঁর বঙ্কিম ভ্রূ, বর্ধিত হয় তাঁর ললাটের সৌন্দর্য, অলঙ্কৃত হয় ললাটও।

দেখি পটভূমিতে, পোস্তার অঙ্গে আরও একটি দেবীর মূর্তি—প্রতিমূর্তি এই মূর্তিটির। কিন্তু সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে এই দ্বিতীয় মূর্তিটিও, নিযুক্ত বিভিন্ন কাজে।

দেখি আরও একটি অপরূপ সুরসুন্দরীর মূর্তি দক্ষিণ পূর্ব প্রাচীরের গাত্রে, প্রথম সারিতে। রচিত হয় একটি পর্দা প্রাচীর ও দেবীর মাঝখানে, সম্পূর্ণ পরিদৃশ্যমান হয় পরমারূপবতী দেবীর তেজস্বিনী মূর্তিটি।

দেখা যায় মূর্তিটির পশ্চাৎ দিকের তিন চতুর্থাংশ, দীর্ঘ সুষ্ঠুগঠন পদযুগল থেকে পরিপুষ্ট গুরুভার নিতম্ব পর্যন্ত। এক অপরূপ দৃপ্ত ভঙ্গিতে, সামনের

দিকে হেলে, অবনত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন সুরসুন্দরী, পরিদৃশ্যমান ভাস্করের হস্তের সুনিপুণ স্পর্শে তাঁর দেহের ঊর্ধ্বাংশের অপরূপ তিন চতুর্থাংশ পার্শ্বদেশ। সুসামঞ্জস্য হয় আননে আর দীর্ঘ কবরীতে, হয় কবরীর অঙ্গের অলঙ্কারে আর তাঁর কণ্ঠের মুক্তার হারে। তাঁর বাহুতে শোভা পায় জড়োয়ার বাজু, মণিবন্ধে স্বর্ণকঙ্কণ। ঈষৎ প্রসারিত তাঁর কনুই পশ্চাৎদিকে, রূপ ধারণ করে সূক্ষ্ম কোণের। সুস্পষ্ট হয়, সুপরিস্ফুট হয় তাঁর যৌবনমদমত্ত পীনোন্নত বক্ষ। স্পর্শ করে তাঁর অঙ্গুষ্ঠ আর অনামিকা, তাঁর পরিপুষ্ট মসৃণ স্তনের অগ্রভাগ। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় মূর্তি সৌন্দর্যে। মহাসমন্বয় হয় কনুই-এর বঙ্কিম অংশে, কবরীর বিন্যাসে, গুরুভার সুডোল নিতম্বে আর পেলব স্তনাগ্রচূড়ায়। শোভা পায় তাঁর কটিদেশে বহুমূল্য মেখলা, বেষ্টন করে তাঁর সুপুষ্ট স্তন, বৃত্তাকার, পেলব দক্ষিণ আর বাম নিতম্ব, নিতম্ব অতিক্রম করে উপনীত হয় জানু পর্যন্ত। বাড়ে দেবীর সৌন্দর্য। পরমারূপবতী হন দেবী, হন রহস্যময়ী, মহামহিমময়ীও। রচিত হয় এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, রচনা করেন মধ্যযুগের চন্দেল্ল ভাস্কর হৃদয়ের সীমাহীন ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের অন্তহীন মাধুর্য। তাই লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন এই মূর্তিটি, হয় বিশ্বজিৎ। তাঁর পদতলে দুইটি মার্জারের মূর্তি। উৎকর্ণ হয়ে উপবিষ্ট তারা, নিবদ্ধ তাদের দৃষ্টি দেবীর পানে।

দেখি পশ্চিম প্রাচীরের গাত্রেও, দ্বিতীয় সারিতে, একটি সুরসুন্দরীর মূর্তি। নিযুক্তা সুরসুন্দরী তাঁর পদতল অলক্ত রঞ্জনে। দাঁড়িয়ে আছেন দেবী বঙ্কিম ছন্দে তাঁর বাম পদের উপর, উত্তোলিত তাঁর দক্ষিণ পদ তাঁর অঙ্কের উপর। বাম হস্তে তিনি ধারণ করেন সেই পদ, দক্ষিণ হস্ত দিয়ে রঞ্জিত করেন তার তলদেশ। এক অনুচর ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর বঙ্কিম দক্ষিণ পদের নিচে, পৃষ্ঠে নিয়ে একটি আধার। স্পর্শ করে তাঁর হাঁটুর অগ্রভাগ অনুচরের শির। চূড়ার আকারে বিন্যস্ত তাঁর কুঞ্চিত কুন্তল মস্তকের সম্মুখ ভাগে, মসৃণ ললাটের উপর, পিছনে বৃহৎ কবরী। তাঁর কণ্ঠে শোভা পায় মুক্তার হার, স্কন্ধ অতিক্রম করে স্থাপিত হয় সেই হার তাঁর যৌবনপুষ্ট, পেলব, মাংসল স্তন যুগলের উপর। তাঁর বাহুতে তাগা, মণিবন্ধে স্বর্ণকঙ্কণ, কর্ণে হীরক কুণ্ডল, পদদ্বয়ে মঞ্জীর। অলঙ্কৃত তাঁর কবরীর অঙ্গও বহুমূল্য অলঙ্কারে।

অনবদ্য, ভাবব্যঞ্জক এই মূর্তিটিও। মহাসমন্বয় হয় তাঁর দাঁড়াবার বঙ্কিম ছন্দের, সুডোল আননের, বাঁশীর আকার নাসিকার, আকর্ণবিস্তৃত নয়নের, চিবুকের অপরূপ গঠনের আর পীনোন্নত যৌবনপুষ্ট স্তনাগ্রচূড়ার সঙ্গে তাঁর বলদৃপ্ত পদযুগলের। এক অনবদ্য সুসামঞ্জস্য হয় মহাশক্তিতে আর অনুপম শ্রীতে, দৃপ্ত তেজস্বিতায় আর অপরিসীম কমনীয়তায়, সৃষ্টি হয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ভারতের মধ্যযুগের ভাস্করের, এক অবিনশ্বর, শাশ্বত কীর্তি। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি।

তাঁর দক্ষিণ পাশেও, পোস্তার অঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন এক সুরসুন্দরী—মূর্ত বিকাশ এক সীমাহীন বলবীর্যের, প্রতিফলিত হয় তার আভাস তাঁর পরমসুন্দর আননে, তাঁর যৌবনমদমত্ত স্তনাগ্রচূড়ায়, তাঁর পদযুগলেও, বিকসিত হয় তাঁর সর্বাঙ্গে।

দেখি পূর্ব প্রাচীরের গাত্রে, প্রথম সারিতে আরও একটি সুরসুন্দরীর অপরূপ মূর্তি, মধ্যযুগের ভাস্করের নিদর্শন এক শ্রেষ্ঠ কীর্তির, সুন্দরতম সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের। দেখি মহাঅভিজ্ঞ ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের রেখার মূর্তবিকাশ, পূর্ণ পরিণতি, চরম উৎকর্ষ। রূপ পরিগ্রহ করে সেই রেখা সুন্দরীর দীর্ঘ কেশ আর কবরীর সুন্দরতম বিন্যাসে, তাঁর ললাটের অনবদ্য গঠনে, আকর্ণবিস্তৃত ভ্রূ আর নয়নে, তাঁর উন্নত, ঘৃণায় কুঞ্চিত নাসিকায়, তাঁর ওষ্ঠের আর চিবুকের অনুপম গঠনে, তাঁর পৃষ্ঠের ক্ষুদ্র আবর্তে, তাঁর পেলব বাহুতে, হস্তের বঙ্কিম চম্পকবিনিন্দিত সুকোমল অঙ্গুলিতে আর যৌবনপুষ্ট পীনোন্নত স্তনাগ্রে। বিকশিত হয় তাঁর প্রতিটি অঙ্গে, প্রতিটি শিরা উপশিরায়, স্পন্দিত হয় তাঁর সর্বাঙ্গে, রণিত হয় তাঁর প্রতিটি গতির ছন্দে। তাঁর কর্ণে শোভা পায় হীরক কুণ্ডল, বাহুতে জড়োয়ার তাগা, মণিবন্ধে স্বর্ণ কঙ্কন।

দেখি পশ্চিম প্রাচীরের গাত্রে, শিব প্রতিহারের মূর্তির পদতলে একটি নন্দীর (বৃষভের) মূর্তিও। হেলান দিয়ে বসে আছেন নন্দী, দেবাদিদেব মহাদেবের বাহন, মঞ্চের উপর, উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত তার মস্তক। জীবন্ত এই মূর্তিটি, অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূর্তি চন্দেল্ল ভাস্করের। এক শাশ্বত কীর্তি।

দেখি, এক ফুট এক ইঞ্চি উঁচু, এক ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি দীর্ঘ ও সাড়ে-সাত ফুট প্রস্থ একটি মুষিকের মূর্তিও। গণেশের বাহন এই মূষিক। স্থাপিত

তার পশ্চাদপদ মঞ্চের উপর, বিস্তৃত দক্ষিণ পদ আর আনন সামনে রক্ষিত নাড়ুর উপর। জীবন্ত এই মূর্তিটিও, কিন্তু নাই এই মূর্তিটিতে নন্দীর মূর্তির বিস্তার, সমৃদ্ধিশালী নয় ভাস্করের হস্তের তীক্ষ্ণতা দিয়েও।

কাণ্ডারীয় মহাদেবকে প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধা নিবেদন করি তাঁর মহাঅভিজ্ঞ অমর শিল্পীদের, জ'নাই মধ্যভারতের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা চন্দেল্ল নৃপতিদেরও, উপনীত হই মহাদেবের মন্দিরে। মন্দিরটি অর্ধভগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে কাণ্ডারীয় মহাদেব, দেবী জগদম্বা আর মহাদেবের মন্দির একই বৃহৎ অধিষ্ঠানে। দেখি তোরণে নিযুক্ত এক অর্ধ সিংহ বা শার্দূল ও নর ক্রীড়ায়। অপরূপ এই মূর্তিটি, উচ্চতায় সারে চার ফুট দৈর্ঘ্যে পাঁচ ও প্রস্থে দেড় ফুট, নির্মিত হয় দশম শতাব্দীতে। খাজুরাহোর মহা-পারদর্শী ভাস্কর রচনা করেন। সর্বগ্রাসী এই সিংহ, পরিদৃশ্যমান তার অক্ষত মুখ, দৃশ্যমান তার নিম্ন চোয়ালও। কিন্তু ভগ্ন এই নিম্ন চোয়াল কালের করালে। রচিত হয় অনুরূপ সিংহ ছাদের প্রান্তদেশে, দাঁড়িয়ে থাকে অনুরূপ সিংহ ব্রহ্মদেশের প্যাগোডার প্রবেশ পথে আর উড়িষ্যার মন্দিরের সিংহদ্বারের দুই পাশেও। প্রহরী তারা মন্দিরের, রুদ্ধ করে অমঙ্গলের মন্দিরে আগমনের গতি, বিতাড়িত হয় অমঙ্গল, প্রবেশ করতে পারে না মন্দিরের অভ্যন্তরে।

ত্রৈমাত্রিক এই ভাস্কর্যের গঠন পদ্ধতিও, অনুরূপ প্রাচীরের গাত্রের অন্য মূর্তিসম্ভারের নির্মাণ পদ্ধতির। মহাপরাক্রমশালী, বলদৃপ্ত এই সিংহটি, দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চের উপর বীর-বিক্রমে, উদ্যত করে তার থাবা। অপরূপ এই সিংহটির জঙ্ঘা, জানু, নিতম্ব, স্কন্ধ, কনুই আর পৃষ্ঠদেশের গঠন, সুন্দরতম তার মস্তকের কেশরের পরিকল্পনাও। সাধিত হয় মহাসমন্বয় তার প্রতিটি বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গেও। সুসামঞ্জস্য হয় তার কেশরের চতুর্দিকের জপমালার বেষ্টনীর সঙ্গে আর পদদ্বয়ের মঞ্জীরের সঙ্গে পশ্চাতে অবস্থিত মন্দিরের শীর্ষদেশের আমলক শিলার চতুর্দিকের বৃত্তাকার বেষ্টনীর।

উপবিষ্ট নরটি সিংহের পদতলে, সমস্ত দেহ দিয়ে সে রুদ্ধ করে তার আক্রমণ, নিঃশেষ করে দিয়ে তার সমস্ত শক্তি। দুই হস্ত প্রসারিত করে সে নিবারণ করে সিংহের উত্তোলিত থাবার আক্রমণ। তাই দ্রুত তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, বিকসিত হয় তার সর্বাঙ্গে অসীম ক্লান্তির ছাপ, আননে তার শ্রান্তির

আভাস। শেষে সে স্বীকার করে পরাজয়, পরাজয় বরণ করে প্রবল পরাক্রান্ত, দুর্ধর্ষ, অর্ধ সিংহের সঙ্গে রণে। তাই মুদ্রিত তার নয়ন, আনত তার মস্তক, স্বল্প তার অঙ্গের বসন, পরিমিত তার অঙ্গের অলঙ্কার আর ভূষণও, ব্যতিক্রম সিংহের পর্যাপ্ত ভূষণের সঙ্গে, তার বলবীর্যের সঙ্গে। তাই বুকে নিয়ে আছে এই মূর্তির সমষ্টিও অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভারতের মধ্যযুগের ভাস্করের, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন। কিন্তু নাই তাতে বাস্তবের ছাপ, সমৃদ্ধিশালী নয় কল্পনাতে, নাই আদর্শের বালাইও। প্রতীক লাভ করে প্রাধান্য ভাস্কর্যে, গড়ে ওঠে মূর্তি প্রতীকের সমষ্টি দিয়ে। তাই বৃত্তের প্রতীক দিয়ে রচিত হয় এই মূর্তিটি। ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা দেবী জগদম্বার মন্দিরে উপস্থিত হই।

একটি নিরলঙ্কার প্রাসাদ, বিষ্ণু মন্দির এই দেবী জগদম্বার মন্দিরটি, স্থানান্তরিত হয়েছে বিষ্ণুর বিগ্রহ গর্ভগৃহ থেকে, স্থাপিত হয়েছে তার পরিবর্তে কালো রঙের দেবী মূর্তি।

বিমানের দক্ষিণ সম্মুখ ভাগে উপনীত হই। অনুরূপ এই মন্দিরের ভিত্তিগাত্র কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দিরের ভিত্তি গাত্রের, অঙ্গে নিয়ে আছে অনুরূপ ছাঁচ। কিন্তু বিভিন্ন তাদের অনুবর্তিতা, পড়ে না একই পর্যায়ক্রমে, পৃথক তাদের অঙ্গসৌষ্ঠবও। নির্গত তারা মানসূত্র থেকে। দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করে আছে ভিত্তিগাত্র ভূমি, মনে হয় গ্রথিত হয়ে আছে মন্দিরের প্রাচীরের গাত্র ধরিত্রীর অঙ্গে। দৃঢ়কৃত হয় স্তম্ভশীর্ষের ছাঁচ দিয়ে, অঙ্গে নিয়ে তিন সারি বন্ধনী, সেখান থেকে উর্ধ্বে ওঠে ক্রমহ্রস্বায়মান শিখারা, শীর্ষে নিয়ে আমলক, শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য নাগর দেউলের, তাদের শীর্ষদেশের মুকুট।

অধিক্ষিপ্ত হয় পীঠ বা ভিত্তি মানসূত্র থেকে। সম ভাজক এই অধিক্ষেপন। কোথাও অর্ধ, কোথাও এক তৃতীয়াংশ, কোথাও বা এক চতুর্থাংশ, সম্পূর্ণ অধিক্ষেপনের। সমপরিমাপক তাদের উচ্চতাও।

কিন্তু সংযত খাজুরাহোর মন্দিরের পীঠের অঙ্গের ছাঁচের পরিমাণ, পর্যাপ্ত নয় মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রের নিম্নতম প্রদেশের বেদিকার ছাঁচের মত। রূপ ধারণ করে সেখানে কুমুদের তরুর, ভাস্কর অধিকার করেন স্থপতির স্থান। বিস্তৃত হয় প্রতিটি পোস্তা বা রথের অঙ্গে, হয় প্রতিটি কুলুঙ্গির অঙ্গেও। রূপ

পরিগ্রহ করে চতুষ্কোণ উপাধানের, অঙ্গে নিয়ে পুষ্পদল। রচিত হয় কুম্ভ আর পত্তিকার কেন্দ্রস্থলে কত স্তূপাকৃতি শিল্প সম্ভার। স্তূপের সম্মুখ ভাগে নির্মিত হয় ক্ষুদ্র মন্দির বা কুট। কুটের গর্ভগৃহে, প্রধান পোস্তার অঙ্গে, কেন্দ্রস্থলে, গরুড় বাহনে বিষ্ণুর মহিমময় মূর্তি, রথের অঙ্গে প্রস্ফুটিত পদ্ম অধিকার করে গর্ভগৃহে দেবতার স্থান। অলঙ্কৃত এই সব ক্ষুদ্র মন্দিরগুলিও অসংখ্য গবাক্ষ বা সিংহ করণ দিয়ে। অতিক্রম করে সিংহ করণ কুম্ভের উচ্চতা, কুলুঙ্গি ভেদ করে উপনীত হয় নিম্নতর খাঁচে, রূপ ধারণ করে তার সর্বোচ্চ পৃষ্ঠের, অনুভূমিক খাঁচ উল্লম্ব শাখা প্রশাখায় পরিণত হয়।

রচিত হয় প্রাচীরের গাত্রে, প্রতিটি মেখলা জঙ্ঘা দিয়ে। জঙ্ঘার বুকে মেখলা অথবা মালা, বারান্দিকা অথবা কপোট, স্কন্ধদেশে অন্তরপাত্র শীর্ষদেশে ছাদ, দুই পাশে স্তম্ভ, সম্পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে মন্দির, অধিষ্ঠান প্রধান প্রতিমূর্তির। মেখলার উপরে নির্মিত হয় অর্ধপ্রস্তর বা অর্ধস্তম্ভশীর্ষ-আসন, দাঁড়িয়ে থাকেন তার উপরে প্রতিমূর্তি। অলঙ্কৃত করেন মহাঅভিজ্ঞ ভাস্কর প্রতি সমপৃষ্ঠ, উল্লম্ব ফলকের অঙ্গ, সুন্দরতম শিল্পসম্ভারে শোভিত চন্দ্রাতপের নিচ, সুপ্রশস্ত কুলুঙ্গির ভিতর, মূর্তির সম্ভার দিয়ে। অনবদ্য, সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত, গতিচঞ্চল, ছন্দময়, মূর্তি দিয়ে অলঙ্কৃত হয় মন্দিরের প্রাচীরের গাত্র, ভূষিত হয় তার সর্বাঙ্গ।

স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখি প্রাচীরের গাত্রের মহামহিমময় সীমাহীন মূর্তির সম্ভার। যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, দেখি এক অভিনব মূর্তি। বিভিন্ন প্রতিটি মূর্তি, বিভিন্ন তাদের পরিপ্রেক্ষিতও। আবার দেখা যায় একই মূর্তি বিভিন্ন কোণ থেকেও। তাই দেখতে হয় প্রতিটি মূর্তি একের পর এক। শেষ হয় সম্পূর্ণ দেখা একটি মূর্তি, সুরু হয় দ্বিতীয় মূর্তি দর্শন। নইলে বিভ্রান্ত হয় নয়ন, হয় না সম্পূর্ণ দর্শনও। তারপর প্রসারিত হয় দৃষ্টি প্রাচীরের সর্বগাত্রে, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে থাকি সমস্ত পরিবেশটি, উপলব্ধি হয় তাদের গুরুত্ব, তাদের অনুপমত্ব, তাদের সীমাহীন সমৃদ্ধি। রচিত হয় বিভিন্ন ফলকের অঙ্গে এক একটি মূর্তি, একত্রিত নয় তারা সমষ্টি দিয়ে। কোথাও ফলকের দুই পাশে, উদ্গত স্তম্ভ দিয়ে রচিত হয় চন্দ্রাতপ, কোথাও ক্ষুদ্র মন্দির, কোথাও বা শুধুই ফলক, খোদিত হয় তাদের অঙ্গে এক একটি অনবদ্য, সুষ্ঠু গঠন মহামহিমময় মূর্তি, মূর্তি কত দেব-দেবীর দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা প্রাচীরের

গাত্রে হেলান দিয়ে। কোথাও বর্ধিত হয় মূর্তির আকৃতি, মহামহিমময় হয় প্রাচীরের অলঙ্করণ।

বিভক্ত হয় প্রাচীরের গাত্র তিনটি সারি বা মেখলাতে। অঙ্গে নিয়ে আছে তাদের মধ্যে প্রাচীরের গাত্রের দুইটি কেন্দ্রস্থলের সারি প্রধান ও মহামহিমময় মূর্তিগুলি, জানা যায় তাদের স্বরূপ, তাদের পরিচয়, প্রতিটি প্রতিমার অবস্থিতি দিয়ে। দক্ষিণে, পশ্চিমে ও পূর্বে প্রধান ভদ্রের কেন্দ্রস্থলে—খোদিত হয় ভগবান বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের মূর্তি। দক্ষিণে, প্রাচীরের সর্বনিম্ন প্রদেশে, বেদিকার উপর, গরুড় বাহনে বিষ্ণুর মূর্তি, প্রথম মেখলাতে, লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুর মূর্তি, ঊর্ধ্বে, দ্বিতীয় মেখলাতে, বরাহরূপী বিষ্ণুর মূর্তি।

তৃতীয় মেখলাতে, সবার উপরে, রথারোহণে, বিভিন্ন দেবতার মূর্তি। নিযুক্ত কত দেবতা আর দেবীরা ক্রীড়ায়, এই সর্বোচ্চ ও অনতি প্রশস্ত মেখলার অঙ্গে। মূর্তি বিভিন্ন রথারোহণে অষ্ট দিক পালেরও সর্বোচ্চ প্রশাখায়। অন্তর্নিহিত কুলুঙ্গির মধ্যে এক একটি শার্দূলের মূর্তি। কৃত্রিম গ্রাস এই শার্দূলগুলি ঐশ্বর্যশালী ভাস্করের কল্পনায়, কারও শৃঙ্গযুক্ত সিংহের আনন অথবা শৃঙ্গী নারীর, কারও কাকাতুয়ার চঞ্চু, কারও হস্তীর শুঁড়, কারও বরাহের নাসিকা আর মেষের আনন। রচিত হয় তাদের উপর তিন সারি স্তম্ভশীর্ষ প্রাচীরের ঊর্ধ্বাংশে, সেখান থেকে সুরু হয় শিখারা। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাস্করের এই সুন্দরতম সৃষ্টি, কীর্তি এক মহাগৌরবময় যুগের।

রক্ষিত হয় বিভিন্ন পোস্তার স্বরূপও, পরিবর্তিত হয় না তাদের রূপ তাদের উল্লম্ব গতির পথে। রচিত হয় তাদের শীর্ষদেশে শৃঙ্গ অথবা চূড়া, মহাসমৃদ্ধিশালী হয় পোস্তাগুলি। অলঙ্কৃত হয় তাদের পাদদেশ এক বিশিষ্ট বহিঃআবরণ দিয়েও, তারা রূপ পরিগ্রহ করে বেদিকার স্তূপের। রচিত হয় প্রাসাদের প্রতিটি সম্মুখভাগের কেন্দ্রস্থলে উরোমঞ্জরি, চারিকোণে নষ্ট শৃঙ্গ। শিখারার শীর্ষদেশে নির্মিত হয় আমলক শিলা। অদৃশ্য হয়েছে শীর্ষদেশের চূড়া কালের নির্মম হস্তে। মণ্ডপ থেকে নির্গত হয় পীঠ, স্পর্শ করে বিমান, রচিত হয় মণ্ডপের অঙ্গে ব্যালকনিও। নির্মিত হয় মণ্ডপের প্রাচীর প্রাসাদের প্রাচীরের সংলগ্ন, কিন্তু হয় না তার পোস্তার শীর্ষদেশে শিখারা। পিরামিডাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাঁথুনির বন্ধনী অধিকার করে পোস্তার স্থান শিখারা নির্মাণে।

দেখি দক্ষিণের প্রাচীরের গাত্রে দ্বিতীয় সারিতে দুইটি আড়াই ফুট উঁচু মিথুনের মূর্তি।

আলিঙ্গন বদ্ধ হয় প্রেমিক আর প্রেমিকা। নিষ্পেষিত হয় প্রেমাস্পদ পুরুষ তার প্রিয়তমার আলিঙ্গনে। লুপ্ত হয় তার বাহ্যজ্ঞান, অন্তর্হিত হয় অন্তর্নিহিত জ্ঞানও, তার সমস্ত চেতনাও, নিমগ্ন থাকে সে শুধু এক অন্তহীন, সীমাহীন, অভূতপূর্ব যৌন-মিলনের প্রগাঢ় আনন্দে। তেমনিই বিলুপ্ত হয় বাহ্যজ্ঞান, অবলুপ্ত হয় ভিতরের জ্ঞানও অশরীরী জীবের প্রজ্ঞামনার দৃঢ় আলিঙ্গনে, লাভ করে সে পূর্ণানন্দ, করে ব্রহ্মজ্ঞান, সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় তার কামনা, চরিতার্থ হয় বাসনা, থাকে না কোন দুঃখ, বিদূরিত হয় সমস্ত কষ্ট। স্ত্রী পুরুষের এই মিলনই, মহামিলন পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির—মোক্ষ লাভের সোপান। এই স্ত্রী পুরুষের যৌন মিলনকেই, এই পুরুষ আর প্রকৃতির মহা-মিলনকেই, তাদের সংযুক্ত প্রতীককেই মিথুন বলা হয়, অন্যতম প্রধান অঙ্গ সাধনার। তাই খোদিত হয় মিথুনের, নারী ও পুরুষের কত সম্ভাব্য অসম্ভাব্য মিলনের চিত্র, দৃশ্য কত মোক্ষলাভের প্রতীকের গর্ভগৃহের প্রবেশ দ্বারে, অলঙ্কৃত করা হয় মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রও।

মোক্ষলাভের, ভব বন্ধন থেকে জীবের মুক্তি লাভের প্রতীক মিথুন এক মহামিলন। অভিন্ন, অবিচ্ছিন্ন, অচ্ছেদ্য এই মিলন, অগ্নি আর তার দাহন শক্তির মিলনের মত। অভ্যাস করেন এই মিথুন সাধকরা পূর্ণমিলন হিসাবে। আদিতে পুরুষ থাকেন শুধুই পুরুষ। জন্মগ্রহণ করেন পুরুষ ও নারীর যুক্ত সত্তা হয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ পুরুষ ও নারী। প্রয়োজন হয় দ্বিতীয় সত্তার, বিভক্ত হন সেই পুরুষই দুই অংশে পুরুষ আর প্রকৃতিতে। জন্ম হয় স্বামী স্ত্রীর, মহামিলন হয় পুরুষ আর প্রকৃতির।

মহাশক্তি এই প্রকৃতিও ভগবানের অংশে লুক্কায়িত থাকেন, বিলীন হয়ে থাকেন ভগবানে, তাঁর গুণের অন্তরালে। মিলন হয় ভগবানের মনের বা চিত্তের সঙ্গে বাকের বা বাক্যের সাধিত হয় ভগবানের মিথুন। দ্বিধাভঙ্গ হন ভগবান, শিবের বা জীবের শক্তির প্রয়োজন মেটাতে। বিমুক্তা হন শক্তি ভগবানের দেহ থেকে, মিলন হয় তাঁর সঙ্গে অমোক্ষপ্রাপ্ত মানবের, সহায়ক হন প্রকৃতি তাদের মোক্ষ লাভের।

অভ্যাস করেন যোগী, তপশ্চরণ করেন মনের, দেহের ও বুদ্ধির ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার জন্য। পালন করেন ধর্মানুষ্ঠান মোক্ষলাভের জন্য সাধক, তাঁর সাধনার সিদ্ধিলাভের জন্য। প্রয়োজন হয় তাঁদের মৈথুনের, মিলন জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের, গুণের সঙ্গে ত্রিগুণাতীতের। সম্ভব শুধু এই দেহের সঙ্গে শক্তির প্রতীক মিলন আধ্যাত্মিক পথে বহুদূর অগ্রাসিত সন্ন্যাসীর পক্ষে। প্রয়োজন নাই মৈথুনের অবধূতের, দরকার হয় না তাঁদের স্ত্রী সংগমের। এই শক্তির সাধনাকেই লতা সাধনা বলা হয়। লতা যেমন বৃক্ষকে বেষ্টন করে থাকে, চতুর্দিক থেকে আলিঙ্গন করে শক্তিরূপী নারীও পুরুষ সাধককে—এক হয়ে যায় সাধক আর শক্তি, হারিয়ে ফেলে তাদের পৃথক সত্তা, নিজস্ব রূপ, সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে সাধক, লাভ করে মোক্ষ। তাই গৌরী দেবাদিদেব মহাদেবের অর্ধাঙ্গিনী।

তাই প্রদর্শিত হয় দেবালয়ে, মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে দেবতাদের ক্রীড়া লীলা, মিথুনের দৃশ্য, কিন্তু হয় না মনুষ্যালয়ে গৃহস্থের গৃহে। প্রতীক এই মিথুন মোক্ষলাভের, অন্যতমও মানবের চারি করণীয়ের—ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষের।

নিখুঁত এই যুগল মূর্তি দুইটি, খুব সম্ভব শ্রেষ্ঠ যুগল মূর্তি, প্রকৃষ্টতম মিথুনের মূর্তি, ভারতের মন্দিরের অঙ্গের। আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে আছে দুই পরমারূপবতী, যৌবনমদমত্তা নারী দুইটি জীবন্ত, সুন্দর দর্শন, পৌরুষের মূর্ত বিকাশ পুরুষের, নিবেদন করছে প্রেম, উন্মুক্ত তাদের কটিদেশের সূক্ষ্ম বসন, অর্ধস্খলিত তার প্রান্তদেশ। কণ্ঠ লগ্ন হয়ে আছে দুই নারী দুই পুরুষের, স্পর্শ করেছে নারীদের ওষ্ঠ পুরুষদের অধরোষ্ঠ, স্থাপিত তাদের পদ পুরুষদের অঙ্গে। বিকশিত হয় তাদের পেলব, যুক্ত, চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগে, তাদের কেশ পাশের অনবদ্য বিন্যাসে, তাদের বসনের স্খলনে এক সুগভীর নিবেদন, আকুল আবেদন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার, ইঙ্গিত এক অভূতপূর্ব, অচ্ছেদ্য মিলনের, নিমগ্ন হওয়ার এক অনাস্বাদিত প্রগাঢ় আনন্দে।

দেখি দক্ষিণ প্রাচীরের গাত্রেই দ্বিতীয় মেখলাতে আরও একটি অপরূপ মিথুনের যুগল মূর্তি। আড়াই ফুট উঁচু এই মূর্তিটিও। সমপর্যায়ে পড়ে এই যুগল মূর্তিটিও পরিকল্পনার মহিমত্বে, গঠন গরিমায় ও ভাবসম্পদে আগের

দুইটি যুগল মূর্তির। তারাও বুকে নিয়ে আছে মধ্যযুগের ভাস্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তির নিদর্শন।

গর্ভগৃহে উপনীত হই। স্থানান্তরিত হয়েছে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আদি বিষ্ণুর মূর্তিটি, স্থাপিত হয়েছে তার পরিবর্তে একটি কালো বর্ণের দেবীর প্রতিমা খুব সম্ভব কালীর। দেবীকে প্রণাম জানিয়ে মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হই। কিছুদূর উত্তরে অগ্রসর হয়ে চিত্রগুপ্তের মন্দিরে উপনীত হই। ভরতজীর মন্দির নামেও পরিচিত এই মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে পূর্বমুখী হয়ে, তার গর্ভগৃহে পূজিত হন দেব দিবাকর। দাঁড়িয়ে আছে এই সূর্যমন্দিরটি চুয়াত্তর ফুট নয় ইঞ্চি দীর্ঘ আর একান্ন ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে।

স্তব্ধ হয়ে দেখি তার বাইরের প্রাচীরের গাত্রের মহামহিমময় মূর্তির সম্ভার। মূর্তি দিয়ে রচিত হয় এক বহু বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চ এই মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রেও। অভিনয় করেন সেই রঙ্গমঞ্চে কত শিকারী, কত বিভিন্ন আর বিচিত্র শোভাযাত্রী, কত নৃপতি। অভিনয় করেন কত নৃত্যচপলা যৌবনমত্তা, পরমারূপবতী নারীও, কত পরাক্রমশালী হস্তীও, নিযুক্ত তারা রণে, করে সুষ্ঠু অভিনয়।

অন্তরালয়ে উপনীত হই। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি গর্ভগৃহের প্রবেশ পথের সর্বাঙ্গের অলঙ্করণ, তার প্রতিটি অঙ্গের অনবদ্য, মহিমময়, জীবন্ত মূর্তির সম্ভারও—শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এক গৌরবময় যুগের।

রচিত হয় প্রবেশ দ্বার গর্ভগৃহের। অলঙ্কৃত তার চতুর্দিক সুন্দরতম শঙ্খ লতা দিয়ে। তার ভিতরে, গঠিত হয় পাঁচ ফুট উচ্চ দেবতা সূর্যের অপরূপ মূর্তি। দাঁড়িয়ে আছেন দেব দিবাকর, মহামহিমময়, সুন্দরতম তাঁর মূর্তি, তাঁর পায়ে শোভা পায় উচ্চ পাদুকা। দাঁড়িয়ে আছেন সুন্দরতম কারুকার্য শোভিত চন্দ্রাতপের নিচে, পদতলে উপবিষ্ট বাহন অরুণ। দেখি একটি মহিমময় সূর্যের মূর্তি লিনটেলের শীর্ষদেশে। দ্বারের দুই পাশে, তার শীর্ষদেশে ও প্রাচীরের গাত্রে রচিত হয় কত অনবদ্য স্তম্ভ আর উদ্গত স্তম্ভ। স্তম্ভ আর উদ্গত স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে তৈরী হয় কত অপরূপ চন্দ্রাতপ, কত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। অলঙ্কৃত করেন ভাস্কর সেই সব প্রকোষ্ঠ আর চন্দ্রাতপ কত অপরূপ দেবতা, কত দেবীর মূর্তি দিয়ে। বিভিন্ন তাঁদের রূপ, বিভিন্ন আকৃতি, পৃথক

দাঁড়াবার ভঙ্গীও। তাঁদের ফাঁকে ফাঁকে রচিত হয় কত বিভিন্ন আর বিচিত্র লতা। কিন্তু নাই এই গর্ভগৃহের প্রবেশ পথে লক্ষ্মণের মন্দিরের গর্ভগৃহের অনবদ্য সুসংযোজন প্রতিটি অংশের, নাই রেখগতির ছন্দও। একত্রিত করে সেই ছন্দ প্রতিটি অংশকে মহিমান্বিত করে, সহায়ক হয় এক মহামহিমময় সুন্দরতম সৃষ্টির রচনার। মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতার আসনের পরিকল্পনা অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য খাজুরাহোর স্থপতির।

বিভক্ত এই দ্বারের চতুর্দিকের বেষ্টনীও কয়েকটি প্রধান অংশে। রচিত হয় সুউচ্চ দ্বারপিণ্ডী। অঙ্গে নিয়ে আছে দুই পার্শ্বের বাজুর নিম্নতম প্রদেশ বৃহৎ মূর্তির সমষ্টি। তাদের উর্ধ্বে, দ্বারের শীর্ষদেশে রচিত হয় সারি সারি প্রকোষ্ঠ। অলঙ্কৃত সেই প্রকোষ্ঠের শ্রেণীও শোভন গঠন ক্ষুদ্র মূর্তির সম্ভার দিয়ে। সমমাপ দ্বারের রন্ধ্র তার দুই দিকের প্রতিটি বাজুর প্রস্থের সঙ্গে, সমমাপ বাজুর নিম্নতম প্রদেশের দুই পাশের বৃহৎ মূর্তির সমষ্টির সঙ্গেও। তাই অঙ্গে নিয়ে আছে প্রবেশ দ্বার তার প্রস্থের দ্বিগুণ উচ্চতা। অনবদ্য, সুসামঞ্জস্য, ত্রুটিহীন, সৌষ্ঠব সম্পন্ন অপ্রধান অংশগুলিও। সুসমন্বয় হয় সর্দালের শীর্ষদেশের তিনটি স্বর্গ মন্দিরের সঙ্গে তাদের ভিতরের স্থানের। সুসামঞ্জস্য হয় বর্হিঃবেষ্টনীর সুন্দরতম আর সূক্ষতম অলঙ্করণে অলঙ্কৃত বিভিন্ন সমতল স্থানের সঙ্গে দ্বারের অন্তরতম প্রদেশের সমতল কাঠামোর সঙ্গেও, বুকে নিয়ে নিত্য পরিবর্তনশীল ছায়া। অলঙ্কৃত করেন তার সর্বাঙ্গ মূর্তির সম্ভার দিয়ে ভাস্কর। রচিত হয় অনবদ্য লতাও দ্বারের কাঠামোর অঙ্গে, ভিত্তির নিম্নতম অংশে আর চারিদিকের স্তম্ভের বেষ্টনীর অঙ্গে। সুসামঞ্জস্য হয় মূর্তির সঙ্গে রৈখিক অলঙ্করণের। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় গর্ভগৃহের অলঙ্করণ, হয় অপরূপ।

বিক্ষত, বিচূর্ণিত শাখার কেন্দ্রস্থলের বৃহৎ নারী মূর্তিগুলি। জলদেবী তাঁরা, অধিষ্ঠাত্রী দেবী নদ-নদীর। তাঁদের আনমিত দাঁড়াবার ভঙ্গী সূচিত করে তাঁদের একত্ব, তাঁদের অভিন্নত্ব নদীর উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে। রূপায়িত হয় তাঁদের অঙ্গে উদ্দাম তরঙ্গের রূপ। কিন্তু তাঁরা শুধুই জলদেবী ভ্রূক্ষেপ নাই তাঁদের অন্য কোন কিছুতেই। উদাসীন তাঁরা পারিপার্শ্বিকতায়। দেখি প্রকৃষ্টতম কারুকার্য সমন্বিত চন্দ্রাতপ বুকে নিয়ে কত দেবতা, উপবিষ্ট প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর। তাঁদের নিকটে বৃক্ষের প্রতীক। তাঁদের শাখা-প্রশাখার

নিচে, বিভিন্ন শাখার অঙ্গে, রচিত হয় তাঁদের সঙ্গীর মূর্তি। প্রবেশ পথের বাইরে, কাঠামো হেলান দিয়ে, উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গে, কত ফণাযুক্ত নাগ আর নাগিনীর দণ্ডায়মান মূর্তি। দুই দ্বারে দ্বারপালের মূর্তি।

দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে গর্ভগৃহের দক্ষিণে, কেন্দ্রস্থলের কুলুঙ্গির মধ্যে, একটি একাদশ আনন বিশিষ্ট বিষ্ণুর মূর্তিও। প্রধান আননে তিনি বিষ্ণু, অবশিষ্ট দশ আননে তিনি ধারণ করেন তাঁর দশ অবতারের মূর্তি। মহামহিমময় এই মূর্তিটি অপরূপ। অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি চন্দেল্ল ভাস্করের। অপরূপ সুন্দরতম অলঙ্করণে অলঙ্কৃত ভিত্তির গাত্রের কয়েকটি ফলকের অঙ্গও। মহামহিমময় এই শিল্পসম্পদ, নিষ্প্রভ হয় তাদের কাছে মন্দিরের অবশিষ্ট অলঙ্করণ। রচিত হয় প্রবেশ দ্বারের শীর্ষদেশে, গবাক্ষ-সিংহকরণের অঙ্গেও মূর্তি দিয়ে পাড়। অপর্যাপ্ত এই শিল্পসম্ভার, সংখ্যাতীত, অন্তহীন, অপরূপ, মহামহিমময়। অনুপ্রাণিত দৈব ভাবাবেশে তাদের মধ্যে কয়েকটি মূর্তি, শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহাঅভিজ্ঞ চন্দেল্ল ভাস্করের, সুন্দরতম সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের। সমৃদ্ধিশালী নয় এই ঐশ্বরীক অনুপ্রেরণায় ক্ষুদ্রতর ফলকের অঙ্গের অধিকাংশ মূর্তিই। আছে তাদের মধ্যে একটি পাঁচ ইঞ্চি উঁচু সূর্যমূর্তিও। বহির্ভাগে সূর্যের উত্তাপের প্রচণ্ডতা, অভ্যন্তরে, গর্ভগৃহে আলোছায়ার সমাবেশ, তাই স্থপতির এই অতি সাবধানতা মন্দিরের প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশের রচনায়। তাই এই বহু বিস্তৃত জটিলতাও। তাছাড়াও অধিকার করে আছে মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে প্রতিটি খোদিত মূর্তি তাদের নির্দিষ্ট স্থান। উপযুক্ত অলঙ্করণে অলঙ্কৃত তার অঙ্গের প্রতিটি অলঙ্করণও। তাই নিযুক্ত হন মহাঅভিজ্ঞ স্থপতি, আর সুনিপুণ ভাস্কর মন্দির নির্মাণের কাজে। গড়ে ওঠে মন্দির তাঁদের যুক্ত প্রচেষ্টায়। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় তার প্রতিটি অংশ অনবদ্য সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে আর সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত মূর্তিসম্ভার দিয়ে। মহামহিমময় হয় মন্দির পরিণত হয় একটি রহস্যলোকে।

প্রথমে মন্দিরের চতুর্দিকে পরিক্রমণ করেন মন্দিরের ভক্ত দর্শনার্থী। পরিবর্তিত হয় তার বাইরের অলঙ্কণের রূপ, ভক্তের প্রতি পদক্ষেপে। ভেসে ওঠে নতুন নতুন দৃশ্যও তাঁর চোখের সামনে। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে অগ্রসর হন গর্ভগৃহের দিকে। তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয় এক মূর্তি-সম্ভার ও শিল্পসম্পদের গতির ছন্দ। ভেসে ওঠে বহু বিস্তৃত পর্দায় অঙ্গের এক

গতিশীল চলচ্চিত্র। বিমুগ্ধ হয় তার নয়ন। বিভ্রান্ত হয় দর্শক তার চারিপাশের পর্যাপ্ত, সুন্দরতম, মহামহিমময় মূর্তিসম্ভার দেখে। শেষে দাঁড়াতে হয় তাকে এক একটি দৃশ্যের সামনে। দেখতে হয় তার প্রতিটি পারিপার্শ্বিক, প্রতিটি অঙ্গ, তার সম্পূর্ণরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে। দেখতে হয় বারংবার নইলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় দেখা। স্থপতি ও ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, আমরা মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হই, বিশ্বনাথের মন্দিরে উপনীত হই।

একই মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বনাথের আর তার বাহন নন্দীর মন্দির, পশ্চিম গোষ্টির পূর্ব সারির উত্তর প্রত্যন্ত কোণে। উৎকীর্ণ আছে প্রাচীরের গাত্রে, নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি মহাপরাক্রমশালী চন্দেল্ল নৃপতি ধঙ্গ ১০০২ থেকে ১০০৩ খ্রীষ্টাব্দে। দুই দিকে রচিত হয় দুইটি সোপানের শ্রেণী, যুক্ত হয় মঞ্চের সঙ্গে। দুই পাশে নিয়ে আছে দুইটি সিংহ উত্তরের সোপানের শ্রেণী দক্ষিণের সোপানের শ্রেণী দুইটি হস্তী। বিস্তৃত হয়ে আছে মন্দিরটি উননব্বই ফুট এক ইঞ্চি দীর্ঘ আর পঁয়তাল্লিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, বুকে নিয়ে আছে কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দিরের পরিকল্পনা আর নির্মাণ পদ্ধতি—তার ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। তাই মহা-সমৃদ্ধিশালী তার বাইরের প্রাচীরের গাত্রও। অলঙ্কৃত তার সর্বাঙ্গও সুন্দরতম অলঙ্করণে আর সুষ্ঠু গঠন জীবন্ত, মূর্তিসম্ভার দিয়ে। রচিত হয় মূর্তি দিয়ে কত বিভিন্ন অভিনব দৃশ্যও। বিভিন্ন আর বহু বিস্তৃত তাদের বিষয় বস্তুও। বর্ণিত হয় প্রাচীরের গাত্রে মূর্তি দিয়ে কত পৌরাণিক কাহিনীও। দেখি সমুদ্র মন্থন করেন দেবতা আর দানবরা, নির্গত হয় অমৃত, অমর হন দেবতারা সেই অমৃত পান করে। দেখি নবগ্রহের মূর্তি, মূর্তি বিষ্ণুর দশাবতারেরও। কিন্তু লাভ করে প্রাধান্য এই মন্দিরের অলঙ্করণে যৌবনপুষ্টা, পীনোন্নতবক্ষা, বঙ্কিম গ্রীব, গুরুভার নিতম্বা, পেলব বাহু বিশিষ্টা নারীই পরিণত হয় ভাস্করের মধ্যমণিতে। দেখি শত শত বিভিন্ন সুষ্ঠু গঠন জীবন্ত জন্তুর মূর্তিও। তারাও অধিকার করে এক বিশিষ্ট স্থান মন্দির অলঙ্করণে।

দেখি পশ্চিম প্রাচীরের গাত্রে এক অপরূপ পরমা রূপবতী নারী মূর্তি। জীবন্ত, যৌবন দৃপ্তা এই মূর্তিটি তাঁর দক্ষিণ হস্তে শোভা পায় একগুচ্ছ ফল, উপবিষ্ট তাঁর বাম, পেলব মণিবন্ধের উপর একটি কাকাতুয়া।

দেখি অনুরূপ একটি পরমা সুন্দরী নারীমূর্তি দক্ষিণের প্রাচীরের গাত্রে।

নিযুক্তা নারী আদর করতে একটি শিশুকে। দেখি উত্তরের প্রাচীরের গাত্রেও অনুরূপ একটি নারী মূর্তি, নিযুক্তা বেণু বাদনে। মহিমময়ী, রহস্যময়ী এই নারীমূর্তিগুলিও, অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি চন্দেল্ল ভাস্করের, তাঁদের সুন্দরতম দান।

দক্ষিণ প্রাচীরের গাত্রে দ্বিতীয় মেখলাতে, দেখি একটি অপরূপ সুরসুন্দরীর মূর্তিও, হস্তে নিয়ে কনক মুকুর। দাঁড়িয়ে আছেন সুরসুন্দরী এক অপরূপ বঙ্কিম ঠামে। নাই কোন বসন তাঁর উর্ধ্বাঙ্গে, কিন্তু ভূষিত তিনি পর্যাপ্ত, মহামূল্য, অলঙ্কারে। তাঁর কণ্ঠে স্বর্ণ চিক্ আর মুক্তার মালা, বিস্তৃত সেই হার তার যৌবনপুষ্ট পীনোন্নত, উন্মুক্ত কুচযুগের নিচে পর্যন্ত। তাঁর কর্ণে শোভা পায় হীরক কুণ্ডল, কটি দেশের চন্দ্রহার বিস্তৃত তাঁর জানু পর্যন্ত।

সচেতন তিনি তাঁর যৌবনমদমত্ত, পেলব, সুডোল, সুন্দর, শোভন, ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহের বিষয়ে। অবগতও তাঁর ধমনিতে, তাঁর শিরায় উপশিরায়, যৌবনের উন্নত রক্ত প্রবাহের বিষয়ে। দেখেন কনক দর্পণে তাঁর নিজের অপরূপ মূর্তিটি, তাঁর দেহ বল্লরী, নিবদ্ধ হয় তাঁর দৃষ্টি মুকুরের গভীরে। ক্রমে আনত হয় তাঁর আনন অতি ধীরে তাঁর স্কন্ধের উপর স্থাপিত বঙ্কিমাকৃতি দর্পণের ভিতরের প্রতিবিম্বের দিকে। দর্শন করেন তিনি তাঁর অপরূপ রূপ। এক সুমধুর তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয় তাঁর সারা অন্তঃকরণ। প্রতিফলিত হয় সেই পরিতৃপ্তি তাঁর ওষ্ঠের মৃদু হাসিতে, বিকশিত হয় তাঁর সর্বাঙ্গে। প্রতিবিম্বিত হয় তাঁর ত্রিভঙ্গীম দেহে। সঞ্চারিত হয় এক গতির তরঙ্গ তাঁর সর্বদেহে। পরিসমাপ্তি হয় সেই গতির তরঙ্গ এক সুমধুর আবেশে। অবসান হয় সমস্ত দ্বন্দ্বের, উদ্ঘাটিত হয় ভবিষ্যৎ জীবনের ফলাফল। এক মহা প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয় তাঁর অন্তঃকরণ। বিকশিত হয় সেই প্রশান্তি তাঁর মুখের হাসিতে। প্রবাহিত হয় তাঁর অঙ্গে। পরিতৃপ্ত তিনি, পরিশ্রান্তও, সুসামঞ্জস্য তাঁর প্রতিটি অঙ্গ। নাই তাঁর অন্তঃকরণে বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব, তাঁর গঠনেও কোন অসামঞ্জস্য নাই। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাস্করের এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এক অমর কীর্তি। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দেল্ল ভাস্কর রচনা করেন।

দক্ষিণে, অন্তরভিত্তির নিম্ন মেখলাতে, একটি অনতি প্রশস্ত পোস্তার অঙ্গেও একটি অপরূপ অপ্সরার মূর্তি দেখি। এক ফুট দশ ইঞ্চি এই মূর্তিটি।

অক্ষের চারি পাশে সঙ্কুচিত এই মূর্তিটি। যুক্ত হয়ে আছে তাঁর আয়তন

তাঁর গতির সঙ্গে, এক হয়ে আছে একেবারে। মিলন হয় তাঁর পরিপূর্ণ যৌবনের, তাঁর দেহের প্রতিটি বক্ররেখার সঙ্গে, লুক্কায়িত থাকে তাঁর দুঃখের হাসি তাঁর ব্যথিত হর্ষে।

অবগত তিনি তাঁর দেহের প্রতিটি অংশের বিষয়, অভিজ্ঞাত প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গেও। তাই তাঁর অতি প্রশস্ত বৃত্তাকার সুডোল নিতম্ব, সুপুষ্ট পদদ্বয় আর দীর্ঘ পেশল ভুজদ্বয় সূচিত করে শুধু তাঁর গতির পরিবর্তন, বাড়ায় তাদের তীক্ষ্ণতাও। মূর্ত প্রতীক তিনি গতির, নৃত্য করে তার উদ্দাম তরঙ্গ তাঁর প্রতিটি রক্ত কণিকায়, তরঙ্গায়িত হয় তাঁর প্রতিটি ধমনি সেই গতির তরঙ্গে। মূর্তিমতি নৃত্যও তিনি নৃত্য করেন অনবদ্য ছন্দে। তাই তাঁর প্রতিমূর্তি রূপ পরিগ্রহ করে মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে চিত্র লেখার। মুগ্ধ হয়ে দেখি এই নিখুঁত অপরূপ মূর্তিটিও, অনবদ্য শ্রেষ্ঠকীর্তি চন্দেল্ল ভাস্করের, এক অপরূপ সৃষ্টি।

দেখি দক্ষিণের প্রাচীরের গাত্রে খোদিত একটি মিথুনের দৃশ্য। সঙ্গে নিয়ে আছে দুজন সখীও।

দেখি আলিঙ্গন বদ্ধ দুইটি দেহ, একটি সুন্দরদর্শন নরের ও একটি পরম রূপবতী নারীর, নিযুক্ত তারা মৈথুনে। এই মৈথুনেই তারা লাভ করে পূর্ণ মিলন, পূর্ণ পরিতৃপ্তি, পরিপূর্ণতা লাভ করে নারী আর পুরুষ, প্রকৃতি আর পুরুষ। মূর্ত হয় মহাঅভিজ্ঞ ভাস্করের মহাপারদর্শী হস্তের স্পর্শে, প্রস্তরের বুকে তাদের বাহ্যাকার, তাদের ক্রমবর্ধমান পরস্পরে আত্মবিলুপ্তি, তাদের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন গতির তরঙ্গ, তাদের যৌন সংগম, তাদের সম্পূর্ণ মিলন। লজ্জিত হয় সখীরা এই দৃশ্য দেখে, তাই লজ্জাবনত তাদের শির। অপরূপ এই দৃশ্যটিও, রচিত হয় মূর্তির সমষ্টি দিয়ে এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মধ্যযুগের।

ভিতরে প্রবেশ করি। মুগ্ধ হয়ে দেখি স্তম্ভের শীর্ষদেশের বন্ধনীর অঙ্গের অপরূপ পরম রূপবতী, যৌবনমত্তা নারীমূর্তিগুলি, মহিমময় এই মূর্তিগুলিও, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহাঅভিজ্ঞ চন্দেল্ল ভাস্করের। অলিন্দের বহিঃপ্রাচীরের গাত্রে একটি মহিমময় ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার মূর্তি। সঙ্গে নিয়ে আছেন সৃষ্টিকর্তা তাঁর পত্নী সাবিত্রী। ভিতরের প্রাচীরের গাত্রে একটি অপরূপ শিবের মূর্তি। বাহন

বৃষভের রূপধারণ করেন মহাদেব। গর্ভগৃহে বিরাজ করতেন পান্নার তৈরী শিব লিঙ্গ। স্থানান্তরিত রয়েছে সেই শিব লিঙ্গ। তার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি প্রস্তর নির্মিত লিঙ্গ। প্রণাম জানাই সেই বিগ্রহ দেবতাকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করি খাজুরাহোর মহা অভিজ্ঞ শিল্পীকে। মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে নন্দীর মন্দিরে উপনীত হই।

ক্ষুদ্রতর এই নন্দীর মন্দিরটি, দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বনাথের মন্দিরের বিপরীত দিকে, মুখোমুখি হয়ে, বিস্তৃত হয়ে আছে একত্রিশ ফুট তিন ইঞ্চি দীর্ঘ ত্রিশ ফুট নয় ইঞ্চি প্রস্থ পরিধি নিয়ে। দেখি গর্ভগৃহে একটি অতিকায়, মহিমময় জীবন্ত শিবের বাহন নন্দীর মূর্তি। উচ্চতায় ছয়ফুট এই বৃষটি, দৈর্ঘ্যে সাত ফুট তিন ইঞ্চি। মসৃণ, চাকচিক্যময় তার সর্বাঙ্গ, দেখি মুগ্ধ হয়ে এই অপরূপ মূর্তিটি।

দেবতার বাহনকে প্রণাম জানিয়ে আমরা পার্বতীর মন্দিরে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি বিশ্বনাথের মহিমময় মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে শিরে নিয়ে একটি শিখারা। বিষ্ণু মন্দির, প্রতিষ্ঠিত ছিল এই মন্দিরের গর্ভ-গৃহে বিষ্ণুর বিগ্রহ। স্থানান্তরিত হয়েছে বিষ্ণুর মূর্তি। এখন গর্ভগৃহে বিরাজ করেন মকর বাহনে গঙ্গা। দাঁড়িয়ে আছেন গঙ্গা দেবী মকরের পৃষ্ঠের উপর। পার্বতীর মন্দির দেখে আমরা লক্ষ্মণের মন্দিরে উপনীত হই।

পরিচিত লক্ষ্মণের মন্দির রামচন্দ্র আর চতুর্ভূজের মন্দির নামেও, বিস্তৃত হয়ে আছে আটানব্বই ফুট দীর্ঘ ও পঁয়তাল্লিশ ফুট তিন ইঞ্চি প্রস্থ পরিধি নিয়ে। বিষ্ণু মন্দির, ৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, দাঁড়িয়ে আছে মহাপবিত্র শিব সাগরের নিকট। পঞ্চরত্ন দেউলও এই মন্দিরটি বুকে নিয়ে আছে সুউচ্চ মঞ্চের চারিকোণে চারিটি ক্ষুদ্রতর মন্দির। প্রস্তরের আসন দিয়ে যুক্ত হয় এই ক্ষুদ্র মন্দিরগুলি মঞ্চের সঙ্গে। সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে অর্ধমণ্ডপে উপনীত হতে হয়, যুক্ত হয় অর্ধমণ্ডপ মণ্ডপের সঙ্গে, বিপরীত দিকে তাদের মহামণ্ডপ, অন্ত্রালয় আর গর্ভগৃহ। রচিত হয় একটি প্রদক্ষিণের পথও। বেষ্টন করে সেই পথ গর্ভগৃহ, অন্ত্রালয় আর মহামণ্ডপ। নির্মিত হয় দুই পাশে ব্যালকনি বা ভদ্রের শ্রেণীও।

রচিত হয় একটি আসন। ঊর্ধ্বে ওঠে তার পৃষ্ঠদেশ ভিতরের আসন পট্ট থেকে, প্রক্ষিপ্ত হয় তার শীর্ষদেশ, উচ্চতা তার দুই ফুট চার ইঞ্চি। ঊর্ধ্ব-

উন্মুক্ত ভদ্রের অংশ এই আসন। প্রাচীরের উল্লম্ব অংশে পদ্মের দলের নিচে রচিত হয় বেদী।

অঙ্গে নিয়ে আছে বেদী সুন্দরতম শিল্পসম্ভারে মহাসমৃদ্ধ দণ্ডের শ্রেণী। বিভক্ত হয় বেদিও সরল্লোন্নত ফলক দিয়ে প্যানেলের সমষ্টিতে, পূর্ণ হয় কত মূর্তি, গভীর ছায়া ও পুষ্পদল দিয়ে।

রচিত হয় তার উপরে বেদীর স্তম্ভ। যুক্ত এই স্তম্ভগুলি, বুকে নিয়ে আছে তাদের মধ্যে একটি সুন্দরতম ঝালরের কাজ। নির্গত হয় সেই ঝালর প্যানেলের নিম্নকোণে অবস্থিত কীর্তিমুখের আনন থেকে। দৃশ্যমান শুধু তিন চতুর্থাংশ সেই আননের। বিভক্ত দ্বিতায়টির অঙ্গও বিভিন্ন থাকে। সর্বোচ্চ থাকে রচিত হয় একটি পাত্র, পরিপূর্ণ লতাগুচ্ছে, তার নিচে আমলকের বন্ধনী, বন্ধনীর নিচে একটি কীর্তিমুখ, কীর্তিমুখের নিচে একটি বৃত্তাকার ঝালরের কাজ। বেষ্টিত হয় সেই বৃত্তও ঝালরের কাজ দিয়ে। নিম্নতম থাকে ঝালর দিয়ে রচিত হয় ফলক। সৃষ্টি হয় এক প্রতীকের পুষ্পময় পরিবেশে এক অনবদ্য সংমিশ্রণ মূর্তি আর রৈখিক ছন্দের, সঙ্গে নিয়ে আলো ছায়ার প্রকৃষ্টতম সমাবেশ। রূপ পরিগ্রহ করে যুক্তস্তম্ভের শ্রেণী মন্দিরের এক অভিন্ন, অবিচ্ছিন্ন, অচ্ছেদ্য অংশের। সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে তাদের নিজস্ব রূপ, পৃথক সত্তা, এক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মন্দিরের সঙ্গে, বুকে নিয়ে শুধু শ্বেত আর কালো রেখার প্রতীক। বর্ধিত হয় সেই রৈখিক রূপ যুক্তস্তম্ভের ও সন্নিহিত স্তম্ভের ঋজু ধারের অন্তর্বর্তী উল্লম্ব ছিদ্র দিয়ে। রচিত হয় এই রৈখিক শিল্পসম্পদ বহু স্তম্ভের অঙ্গে, বাড়ে আলো ছায়ার সমাবেশও।

ঊর্ধ্বে প্রক্ষিপ্ত হয় বেদীর শীর্ষদেশ প্রতিটি স্তম্ভের শীর্ষদেশে, তারপর পশ্চাৎ অপসরণ করে রূপ পরিগ্রহ করে ত্রিকোণাকৃতি গবাক্ষের, দুই পাশে নিয়ে বায়ুর প্রবেশ পথ। রচিত হয় সেই প্রবেশ পথ প্রতিটি বৃহৎ কীর্তিমুখ সমন্বিত ও স্ক্রোলের কাজ দিয়ে অলঙ্কৃত প্যানেলের উপরেও। খোদিত হয় তিন থাকে বিভক্ত ক্ষুদ্র ছাদের প্রতীক বিস্তৃততর অংশে, শীর্ষে নিয়ে প্রতিটি ছাদ আমলকশিলা। রচিত হয় ছাদের অঙ্গে সুপ্রশস্ত অকঠিন বন্ধনী, বাড়ে ছাদের নিচের অনুভূমিক ছায়া, কঠিন থেকে পরিণত হয় কোমলে। বিস্তৃত হয় সেই ছায়া তিনটি ছাদের শীর্ষদেশের ঊর্ধ্বে অবস্থিত পদ্মের দল পর্যন্ত।

রচিত হয় রেলের আকৃতিতে আসন পট্টের হেলান পৃষ্ঠদেশ, রূপ ধারণ করে প্রস্তরে গঠিত আসনের। বিশ্রাম করে তার উপরে উপবেশন করে যাত্রীরা প্রদক্ষিণের সময়। বাঁশের অনুকরণে রচিত হয় বৃত্তাকার দণ্ড দিয়ে পশ্চাতের ঢালু অংশটি। অঙ্গে নিয়ে আছে দণ্ডগুলিও সুন্দরতম অলঙ্করণ, মহাসমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে অনুপম শিল্পসম্ভার দিয়ে। সমপর্যায়ে পড়ে বেদীর অঙ্গের শিল্পসম্ভারের। অনুরূপ গঠনে আর অঙ্গের অলঙ্করণে মঞ্চের চারিকোণের চারিটি প্রস্তর নির্মিত আসনও, সংযুক্ত হয় এই আসন দিয়েই ক্ষুদ্র মন্দিরগুলি মঞ্চের সঙ্গে।

রচিত হয় বেদী আর আসন প্রস্তর দিয়ে, বাঁশ আর কাঠের সুষ্ঠু অনুকরণে। রচিত হয় প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ দণ্ড আর কড়িবরগাও, সুষ্ঠু আর নিখুঁত অনুকরণ তারাও অনুপম শিল্প সম্ভারে ভূষিত বাঁশ আর কাঠের তৈরী স্তম্ভ দণ্ডের আর কড়ি বরগার। দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ আসনটিও সুদৃঢ় স্থূল স্তম্ভের উপর। বুকে নিয়ে আছে তাদের সর্বাঙ্গও সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্পদ, মহা সমৃদ্ধশালী হয়ে আছে অনুপম অলঙ্করণে। দাঁড়িয়ে আছে তার উপর সুবিশাল সুউচ্চ মন্দিরটি মহামহিমময় মূর্তিতে। সংলগ্নীভুত হয় তার বুকে, সংমিলিত হয় স্থপতির অবদান আর ভাস্করের দান—শিল্পসম্পদ আর মূর্তি-সম্ভার। নিকটস্থ হয় সুষ্ঠু গঠন মূর্তির সম্ভার জ্যামিতির আকৃতির, হয় এক অপরূপ সমন্বয়, এক অনবদ্য সুসামঞ্জস্য শিল্পসম্ভারে, মূর্তিসম্ভারে আর জ্যামিতিতে।

তাই বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে মন্দিরের প্রাচীরের অলঙ্করণ দর্শকের চোখে, তাদের অবস্থিতির বিভিন্ন দূরত্ব অনুসারে। দূর থেকে দেখলে বিলুপ্ত হয় তার অঙ্গের জটিলতা মন্দিরের গঠনের অন্তরালে, সূর্যের রশ্মিতে সম্পূর্ণ গ্রাসিত হয় মন্দির আর তার অঙ্গের বুনন, এক হয়ে যায় তার অঙ্গের শিল্পসম্ভার আর মূর্তিসম্ভার, তার অঙ্গের স্থাপত্য আর ভাস্কর্য মহিমময় মন্দিরের সঙ্গে। তারপর নিকটস্থ হন দর্শক মন্দিরের, ভেসে ওঠে একে একে তাঁর চোখের সামনে তাদের অঙ্গের অনবদ্য শিল্পসম্ভার, সুন্দরতম অলঙ্করণ, উদ্ভাসিত হয় সুষ্ঠু গঠন মূর্তি সম্ভারও। বিভ্রান্ত হন দর্শক, বিস্মিত হন তাদের রূপ দর্শন করে। শেষে, নিবদ্ধ হয় তাঁর দৃষ্টি এক একটি দৃশ্যে, মহামহিমময় হয় দৃশ্য, সম্পূর্ণ রূপ

পরিগ্রহ করে তার প্রতিটি অংশ, প্রতীক তারা কত বিভিন্ন মতবাদের, কত বিভিন্ন ধর্মেরও—হয় অপরূপ। আবার কিছুদূর পশ্চাৎ অপসরণ করে, ঘুরে ঘুরে দেখেন দর্শক সম্পূর্ণ পরিবেশটি। বিস্ময়ে মুগ্ধ হন দেখে তার মহামহিমময় পরিকল্পনা আর তার অনবদ্য সুন্দরতম রূপদান, স্তব্ধ হয়ে দেখেন তাদের অঙ্গের মহিমময় মূর্তিসম্ভার আর অনবদ্য সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার—দেখেন তাদের অপরূপ সমন্বয়—সুসামঞ্জস্য প্রতিটি বিভিন্ন অঙ্গের, বুকে নিয়ে বিভিন্ন অলঙ্করণ।

আমরাও দূর থেকে মন্দির দেখি। দেখতে দেখতে অগ্রসর হই মন্দিরের সন্নিকটে, দেখি তার অঙ্গের প্রতিটি অলঙ্করণ। তারপর কয়েক পদ পশ্চাৎ-অপসরণ করে ঘুরে ঘুরে দেখি তার সারা অঙ্গের শিল্প ও মূর্তিসম্ভার, মন্দিরের চারিদিক, সমস্ত পরিবেশটিও। দেখি রচিত হয় ভিত্তির গাত্রে নিম্নতম প্রদেশে জীবন্ত সুষ্ঠু গঠন হস্তীর সারি দিয়ে একটি পাড়। তার উপরের দুই সারি মেখলার অঙ্গেও মূর্তি দিয়ে রচিত কত দৃশ্য—দৃশ্য কত যুদ্ধের কত শোভাযাত্রার কত পরাক্রমশালী তেজদৃপ্ত অশ্বের দৃশ্য কত মৃগয়ার, বরাহ শিকারেরও। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির এক মহামহিমময় পরিকল্পনার সুন্দরতম রূপদান, তার অঙ্গের অনুপম জীবন্ত সৃষ্টি সুনিপুণ ভাস্করের। মূর্ত হয়ে ওঠে মন্দিরের প্রতিটি অঙ্গ, মুখর হয় তার অঙ্গের প্রতিটি প্রস্তরখণ্ড এক মহাঅভিজ্ঞ যাদুকরের হস্তের স্পর্শে—জীবন্ত হয়, হয় বাঙ্ময় আর প্রাণময়, হয় অপরূপ। শ্রদ্ধা নিবেদন করি স্থপতিকে, জানাই ভাস্করকে, নিবেদন করি চন্দেল্ল নৃপতিদেরও, অমর তাঁরা ইতিহাসের পাতায়, অমরত্ব লাভকরে খাজুরাহো, মহাসৌভাগ্যশালী হয় ভারত।

ভিতরে প্রবেশ করে মণ্ডপে উপনীত হই। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি একটি অপরূপ শালভঞ্জিকার মূর্তি স্তম্ভের উচ্চালকের শীর্ষদেশের বন্ধনীর অঙ্গে। রচিত হয় ৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এই মূর্তিটি। অঙ্গীভূত হয়ে আছে এক পরমা রূপবতী নারী আর একটি বৃক্ষ, স্পর্শ করে আছে পরস্পরের দেহ, সংলগ্নীভূত হয়ে আছে। যুক্ত হয় তাদের পরস্পরের বিভিন্ন গতি, সংযুক্ত হয় বিভিন্ন আকৃতি। সৃষ্টি হয় শুধু একটি মাত্র ছন্দ, উর্ধ্বে ওঠে তার তরঙ্গ রমণীর বাম পদের অঙ্গুলি থেকে। অপরূপ মহিমময় তাঁর পদক্ষেপের ভঙ্গী, আবর্তিত

হয় তার দেহযষ্ঠি, বঙ্কিমাকৃতি ধারণ করে তাঁর পৃষ্ঠ দেশ। সগৌরবে উত্থিত হয় তাঁর আনন, তাঁর শির, তাঁর দক্ষিণ বাহু মস্তকের উপরে। উদ্যত তিনি সেই হস্তে ধৃত বৃত্তটি নিক্ষেপ করতে। আনমিত সন্নত বৃক্ষের শাখাটিও দক্ষিণ দিকে। নিক্ষিপ্ত হবে সেই বৃত্তটি নিচের দক্ষিণে দণ্ডায়মান ক্ষুদ্রকায় অনুচরের শিরে। তাঁর অঙ্গের দোদুল্যমান আর কম্পমান বসন বেষ্টন করে তাঁর দেহের দক্ষিণাংশ, নিবদ্ধ হয় তাঁর দৃষ্টি বামে দণ্ডায়মান বালিকা পরিচারিকার প্রতি। তরঙ্গায়িত হয় পোশাকর বহিরাঙ্গ—তার গভীরতাও এক গতির তরঙ্গে, উপনীত হয় সেই তরঙ্গ শিখরে। অনুরূপ এই তরঙ্গের প্রবাহ দুলাদেবের মন্দিরের গর্ভগৃহের শার্দূলের মূর্তির অঙ্গের তরঙ্গের প্রবাহের। কিন্তু মহা ঐশ্বর্যশালী নয় সেই গতির তরঙ্গ এমন অঙ্গের মহিমময় গঠন দিয়ে, সমৃদ্ধিশালী নয় এমন গঠন সৌষ্ঠবে। বিস্তৃততর তাদের বৃত্তাংশ বিশ্বনাথের মন্দিরের দক্ষিণ প্রাচীরের গাত্রের সুরসুন্দরীর মূর্তি অপেক্ষা, অধিক ফল প্রসূত। কমনীয় অথচ তেজদৃপ্ত এই অপরূপ নারীমূর্তিটি, মহিমময়ী, রহস্যময়ীও, ছন্দময় নয় তার প্রতিটি অঙ্গ। ঈষৎ দোদুল্যমান তার দক্ষিণ অঙ্গ, দুর্বল দক্ষিণ পদক্ষেপও বামপায়ের তুলনায়। সমপর্যায়ে পড়ে না তেজোদৃপ্ত বাম পদের পদক্ষেপের।

সমন্বয় হয় তাঁর বামপদের দীর্ঘ বক্রাংশের, বুকে নিয়ে নৃত্যের ছন্দ, সঙ্গে অনুভূমিক প্রসারিত হস্তের—সুসামঞ্জস্য হয় উর্ধ্বের বৃক্ষ দিয়ে রচিত চন্দ্রাতপের সঙ্গেও।

শার্দূলাকার দুইটি নিকটবর্তী বন্ধনীর অঙ্গ। পরিচিত উচ্চালক নামে স্তম্ভের শীর্ষদেশের বিস্তৃতি দ্বিতীয় শীর্ষদেশ পর্যন্ত। ভূষিত তাঁর সর্বাঙ্গও বহুমূল্য অলঙ্কারে—বাহুতে জড়োয়ার বাজু, মণিবন্ধে স্বর্ণ কঙ্কণ, কর্ণে হীরক কুণ্ডল। অপরূপ তাঁর বেণীর বিন্যাসটিও। মুগ্ধ হয়ে দেখি।

গর্ভগৃহের সামনে উপস্থিত হই। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি গর্ভগৃহের প্রবেশ পথের অলঙ্করণ—প্রকৃষ্টতম এই অলঙ্করণ, পর্যাপ্তও। দ্বারের শীর্ষদেশের লিনটেলের উপরে এইটি মহিমময়ী ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর মূর্তি। স্থিতির অধিপতি বিষ্ণুর প্রিয়তমা লক্ষ্মী—তাঁর বামে শোভা পায় সৃষ্টির অধিপতি প্রজাপতি ব্রহ্মার মূর্তি, দক্ষিণে প্রলয়ের কর্তা দেবাদিদেব শিবের মূর্তি।

মহামহিমময়, জীবন্ত এই মূর্তি দুইটি। ঊর্ধ্বে পাড়ের অঙ্গে নবগ্রহের মূর্তি—মূর্তি রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু আর কেতুর—মঙ্গলদাতৃ তাঁরা জীবের।

প্রবেশপথে মূর্তি দিয়ে রচিত হয় একটি অনবদ্য সমুদ্রমন্থনের দৃশ্যও। সত্য-যুগ। ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করেন দেবতারা আর দানবরা। মন্দর পর্বত হন দণ্ড, বাসুকী রজ্জু। উঠবে অমৃত। সেই অমৃত পান করে তাঁরা অমর হবেন, অজর আর নিরাময়ও হবেন। মথিত হয় সহস্র বৎসর, বিষ বমন করেন বাসুকী, প্লাবিত করে সেই বিষ চরাচর। ভীত সন্ত্রস্ত দেবগণ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তাঁর নির্দেশে পান করেন সেই বিষ দেবাদিদেব মহাদেব, নীলবর্ণ ধারণ করে তাঁর কণ্ঠ সেই হলাহলের তেজে, হন তিনি নীলকণ্ঠ।

আবার সুরু হয় মন্থন, পাতালে প্রবেশ করেন পর্বত শ্রেষ্ঠ মন্দর। এবারেও এগিয়ে আসেন বিষ্ণু দেবাসুরের সাহায্যে। কূর্ম রূপ ধারণ করে, সাগরের অতল তলে প্রবেশ করে তিনি পৃষ্ঠে ধারণ করেন মন্দরকে, নিরুদ্ধ হয় তাঁর পাতালে প্রবেশ। চলে মন্থনের কাজ আরও সহস্র বৎসর, উত্থিত হন মন্থনে প্রথমে ধন্বন্তরি, তারপর ওঠেন কত অপ্সরাও। অপ্সরাদের পর বরুণের স্ত্রী, বারুণী বা সুরা—গ্রহণ করেন অদিতির পুত্রেরা। ওঠে একে একে উচ্চৈঃশ্রবা, অশ্ব আর কৌস্তভ মণিও, সবশেষে অমৃত কুম্ভ।

যুদ্ধ হয় দেবতাদের অসুরদের সঙ্গে সেই অমৃত কুম্ভের অধিকার নিয়ে, হয় প্রচণ্ড সংগ্রাম। আবার তৃতীয় বার অগ্রসর হন দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু দেবতাদের সাহায্যে। রূপ পরিগ্রহ করেন তিনি মোহিনীর, হরণ করেন সেই কুম্ভ তাঁর আক্রমণকারী অসুরদের বিনাশ করে। অমৃতকুম্ভ নিয়ে উপনীত হন স্বর্গে। যাত্রার পথে, পতিত হয় কয়েক বিন্দু অমৃত কুম্ভ থেকে সিপ্রানদী তীরে উজ্জয়িনীতে, গঙ্গা যমুনার সংগম স্থলে প্রয়াগে, গোদাবরী তীরে নাসিকে আর গঙ্গাতীরে হরিদ্বারে। মহাপবিত্র তীর্থে পরিণত হয় এই সব স্থান। অনুষ্ঠিত হয় প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এই সব স্থানে এক মহাসম্মেলন—সম্মেলন কত মুনি-ঋষির, কত সাধু মহাত্মার, কত শুদ্ধসত্ত আত্মার, কত গৃহীরও, কুম্ভ মেলা নামে পরিচিত হয় এই সম্মেলন। পরিশেষে পরাজিত হন দানবরা যুদ্ধে, বঞ্চিত

হন অমৃত থেকে—লাভ করেন না অমরত্ব—হন না অমর। দেখি মুগ্ধ হয়ে এই সমুদ্র মন্থনের দৃশ্য।

প্রবেশ পথের অঙ্গেই দেখি বিষ্ণুর দশাবতারের মূর্তিও। অবতীর্ণ হন ধরাধামে ভগবান বিষ্ণু যুগে যুগে, দুষ্কৃতদের দমন আর ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। পরিচিত এই বিভিন্ন যুগাবতারই দশাবতার নামে। প্রলয়কালে নিমজ্জিত হন বেদ পয়োধির অতল তলে। মৎস্যরূপ ধারণ করে বিষ্ণু সেই বেদ উদ্ধার করেন, পরিত্রাণ লাভ করেন মুনি ঋষিরা, মৎস্য অবতার নামে পরিচিত হয় এই অবতার। কূর্ম অবতারে তিনি পৃষ্ঠে ধারণ করেন মন্দর পর্বত, দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের দণ্ড। সহজ আর সম্ভব হয় সমুদ্র মন্থন। বরাহ অবতারে তিনি দন্তের সাহায্যে উদ্ধার করেন নিমজ্জমানা ধরিত্রীকে, বধ করেন হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যকেও। এই দৈত্যই লুকিয়ে রেখেছিল পৃথিবীকে সমুদ্রের অতল তলে। নৃসিংহ অবতারে তিনি নর ও সিংহের রূপে আবির্ভূত হন, বিনাশ করেন পরমভক্ত প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকোশিপুকে—অবধ্য তিনি দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার বরে নর অথবা জন্তুর হস্তে। তাই এই যুক্ত রূপ ভগবানের। বামন অবতারে তিনি ত্রিবিক্রম দমন করেন মহাপরাক্রমশালী দৈত্যরাজ বলিকে। পরশুরাম অবতারে তিনি নিঃক্ষত্রিয়া করেন পৃথিবীকে, রক্ষা পান ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়ের অত্যাচার থেকে। রাম অবতারে তিনি লঙ্কার মহাপরাক্রমশালী রাক্ষস নৃপতি রাবণকে হত্যা করেন। রচিত হয় মহাকাব্য রামায়ণ, রচনা করেন আদিকবি বাল্মীকি। কৃষ্ণ অবতারে তিনি মহাভারতের নায়ক, অর্জুনের প্রিয়সখা, মথুরা ও দ্বারকার নৃপতি সাহায্য করেন দুষ্ট কৌরবকুল বিনাশে। জয়ী হন পঞ্চ পাণ্ডব কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে, স্থাপিত হয় ধর্মরাজ্য ভারতে। বলরাম অবতারে তিনি প্রলম্ব নামে এক অসুরকে বধ করেন। কলির শেষে কল্কি অবতারে, অবতীর্ণ হবেন ভগবান কল্কির রূপ ধারণ করে, শ্বেত অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করে হস্তে নিয়ে মুক্ত অসি। দমিত হবে দুষ্কৃতকারী, সংযত হবে ম্লেচ্ছরাও, পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে ধর্ম পৃথিবীতে। এইটিই শেষ অবতার ভগবানের। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি চন্দেল্ল ভাস্করের। তাদের বহু শত বৎসরের সাধনার দান, শাশ্বত সৃষ্টি। গর্ভগৃহে বিরাজ করেন চতুর্ভুজ, ত্রয়ানন বিষ্ণু মহামহিমময়

মূর্তিতে। কেন্দ্রস্থলে তাঁর মনুষ্যানন, দুই পাশে নৃসিংহের আর বরাহের আনন, আনন ভগবানের দুই অবতারের। দেখি মুগ্ধ হয়ে এই অনবদ্য সুন্দরতম দেবতার মূর্তিটিও। প্রণাম জানাই দেবতাকে, শিল্পীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি।

মাতঙ্গেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে মাতঙ্গেশ্বর লক্ষণের মন্দিরের দক্ষিণে। শৈব মন্দির এই মাতঙ্গেশ্বর, পূজিত হন তার গর্ভগৃহে এক সুবৃহৎ, মহিমময় শিবলিঙ্গ উচ্চতা তার আট ফুট চার ইঞ্চি, ব্যাস তিন ফুট আট ইঞ্চি। দেবতাকে প্রণাম করে আমরা মন্দির থেকে বার হয়ে আসি।

মাতঙ্গেশ্বর দেখে আমরা বরাহের মন্দিরে উপস্থিত হই। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি মাতঙ্গেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে। প্রতিষ্ঠিত হয় এই মন্দিরের গর্ভগৃহে একটি অতিকায়, আট ফুট নয় ইঞ্চি দীর্ঘ ও পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি উচ্চ বরাহের মূর্তি। বিষ্ণু মন্দির—পূজিত হন দশাবতারের তৃতীয় অবতার এই মন্দিরে। গর্ভগৃহে উপনীত হই, মুগ্ধ হয়ে দেখি সেই মহিমময় বরাহের মূর্তিটি, খোদিত তার সর্বাঙ্গে কত দেবদেবীর মূর্তি, অলঙ্কৃত দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে তার মস্তক আর পদদ্বয়ও। ভগ্ন পৃথিবীর মূর্তিটি—অবশিষ্ট আছে শুধু তার পায়ের চিহ্ন। প্রণাম জানাই দেবতা বরাহকে, জানাই চন্দেল্ল শিল্পীদেরও, ফিরে আসি সারকিট হাউসে। তখন অবস্থিত দেবদিবাকর মধ্যাহ্ন গগনে, ছড়িয়ে পড়ে তাঁর প্রখর কিরণ দিগন্তে, উত্তপ্ত হয় দিগন্ত।

খাওয়া-দাওয়া করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। তারপর চা পান করে আবার মন্দির দর্শনে যাত্রা করি। দেখতে যাই পূর্ব গোষ্ঠী। বুকে নিয়ে আছে এই গোষ্ঠী ছয়টি মন্দির, তিনটি হিন্দু—ব্রহ্মা, বামন আর জাভেরী বা জভরী ও তিনটি জৈন মন্দির—ঘণ্টাই, পার্শ্বনাথ এবং আদিনাথ। তারা দাঁড়িয়ে আছে খাজুরাহো গ্রামের নিকটে। অতিক্রম করে যেতে হয় খাজুরাহো গ্রাম, করতে হয় খাজুর সাগর বা নিনোরা তালও।

প্রথমে হনুমানের মন্দিরে উপনীত হই, দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দিরটি, নির্মিত পরবর্তীকালে, পশ্চিম গোষ্ঠীর আর খাজুরাহো গ্রামের অর্ধপথে বুকে নিয়ে আছে একটি অতিকায়, বিশাল হনুমানের মূর্তি। অঙ্গে নিয়ে আছে মূর্তিটি একটি ক্ষোদিত লিপি, উৎকীর্ণ ৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। তাই প্রাচীনতম সৃষ্টি

খাজুরাহোর এই মূর্তিটি। দেখা যায় না এমন সুবিশাল হনুমানের মূর্তি সচরাচর। আমরা ভক্ত শ্রেষ্ঠকে প্রণাম জানিয়ে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি।

সেখান থেকে ব্রহ্মার মন্দিরে উপনীত হই। নির্মিত হয় ব্রহ্মার মন্দিরটির কিছু অংশ স্ফটিক প্রস্তরে, কতকাংশ বেলে পাথর দিয়ে—তাদের সংমিশ্রণে। পূজিত হন এই মন্দিরের গর্ভগৃহে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা। বুকে নিয়ে আছে পূণ্যতীর্থ পুষ্করও একটি ব্রহ্মার মন্দির, পূজিত হন সেই মন্দিরেও প্রজাপতি ব্রহ্মা। খুব সম্ভব এইটিই দ্বিতীয় ব্রহ্মার মন্দির ভারতের; পূজিত হন না ব্রহ্মা অন্য মন্দিরে ভারতে।

ব্রহ্মার মন্দির দেখে আমরা বামনের মন্দিরে উপনীত হই। পূজিত হতেন এই মন্দিরের গর্ভগৃহে বামন, পঞ্চম অবতার ভগবান বিষ্ণুর। মহাপরাক্রমশালী হন দৈত্যরাজ বলি, মহাঅত্যাচারীও, তাঁর ভয়ে ভীত ত্রিভুবন। ত্রস্ত, কম্পিত, দেবগণও স্মরণাপন্ন হন দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর। অবতীর্ণ হন বিষ্ণু বামনের রূপ ধারণ করে, উপনীত হন বলির রাজসভায়, প্রার্থনা করেন তিন পদপ্রমাণ ভূমি নৃপতি সকাশে। পূর্ণ করেন তাঁর প্রার্থনা বলি। তখন বিস্তৃত হয় বামনের দেহ, সীমাহীন সেই বিস্তৃতি তিনি রূপ পরিগ্রহ করেন ত্রিবিক্রমের, তাঁর একপদ আচ্ছাদিত করে সমস্ত মর্ত্যধাম, দ্বিতীয় পদে আবরিত হয় স্বর্গলোক। কোথায় রাখবেন তিনি তৃতীয় পদ? জিজ্ঞাসা করেন ভগবান বলিকে। স্থাপন করুন এই পদ আমার শিরদেশে, উত্তর দেন বলি। তখন স্থাপিত হয় তৃতীর পদ বলির শিরদেশে, দমিত হন বলি—অবনত হন দৈত্যরাজ, প্রেরিত হন পাতালে।

সমপর্যায়ে পড়ে জৈন আদিনাথ ও জাতকারী মন্দিরের পরিকল্পনায় ও শিখারার গঠনে। নিরন্ধার প্রাসাদ এই মন্দিরটিও অঙ্গে নিয়ে আছে গর্ভগৃহ, অন্তরালয় ও মহামণ্ডপ, শীর্ষে নিয়ে আছে মহামহিমময় শিখারা, কিন্তু নাই তাতে অঙ্গশিখারা। বিস্তৃত হয়ে আছে মন্দিরটি বাষট্টি ফুট নয় ইঞ্চি দীর্ঘ আর পঁয়তাল্লিশ ফুট তিন ইঞ্চি প্রস্থ পরিধি নিয়ে

দেখি অলঙ্কৃত এই মন্দিরটির বহিঃপ্রাচীরের গাত্রও দুই সারি অনবদ্য, সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত মূর্তিসম্পদ দিয়ে। সারি সারি নৃত্য করেন স্বর্গের অপ্সরারা নাই তাঁদের অঙ্গে কোন বসন, উলঙ্গ তাঁরা। পীনোন্নত যৌবনপুষ্ট তাঁদের

পয়োধর, পেলব তাঁদের ভুজদ্বয়, গুরুভার সুডোল তাঁদের নিতম্ব, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, বিকশিত হয় তাঁদের প্রতিটি অঙ্গে, তাঁদের সর্বাঙ্গে সুস্পষ্ট উন্মত্ত কামনার ইঙ্গিত, উদ্দাম যৌন আবেদন—বিভ্রম জাগায় মনে। নৃত্য করেন তাঁরা কত অনবদ্য অপরূপ ছন্দে। বিভিন্ন সেই ছন্দ, বিচিত্রও, বিভিন্ন তালও। কত বিভিন্ন আর বিচিত্র তাঁদের দাঁড়াবার ভঙ্গীও, ছন্দময়। ক্ষীণাঙ্গী তাঁরা, ক্ষীণ তাঁদের কটিদেশও, তাঁদের শিরে শোভা পায় বহুমূল্য সুবৃহৎ শিরোভূষণ। মূর্তিমতী কামনা তাঁরা, মূর্ত হয় প্রতিটি প্রস্তর তাঁদের উদ্দাম কামনার আবেদনে—পরিণত হয় মন্দিরের প্রাচীরের গাত্র এক সুস্পষ্ট উন্মুক্ত যৌন কামনার পাদপীঠে। ভিতরে প্রবেশ করে বামনরূপী ভগবানকে প্রণাম জানিয়ে মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হই। দেখেছি অনুরূপ বামনের মূর্তি ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের মন্দিরের গাত্রে, দেখেছি পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দিরেও।

বামনের মন্দির দেখে আমরা জভরীতে উপস্থিত হই। দাঁড়িয়ে আছে অক্ষত, সুন্দর, শোভনগঠন, মহিমময় জভরী খাজুরাহো গ্রামের উত্তর পূর্ব প্রদেশে, বিস্তৃত হয়ে আছে উনচল্লিশ ফুট দীর্ঘ ও একুশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। বিষ্ণু মন্দির এই জভরী পূজিত হন তার গর্ভগৃহে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর বিগ্রহ। নিরন্ধার প্রাসাদও বুকে নিয়ে আছে অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ, অন্তরালয় ও গর্ভগৃহ। নাই কোন অলঙ্করণ তার সুউচ্চ অধিষ্ঠানের অঙ্গে, নাই সোপান শ্রেণীর গাত্রে। অপরূপ, সুন্দরতম, মহাসমৃদ্ধিশালী কিন্তু তার মকর তোরণ আর তার ভূষণ সুন্দরতম ক্ষুদ্রতর সংস্করণ কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দিরের তোরণের। অনুরূপ লক্ষণের ও বিশ্বনাথের পরিকল্পনায় ও গঠন পদ্ধতিতে, বিস্তৃত হয় তার অর্ধমণ্ডপ মণ্ডপে, রূপ পরিগ্রহ করে একটি দীর্ঘ প্রবেশ পথের—এক বৈশিষ্ট্য খাজুরাহোর মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির। সাধন করেন এই মণ্ডপ আর অর্ধ-মণ্ডপের ঐক্য অনুভূমিক ব্যাল্কনির শ্রেণী দিয়ে। বিস্তৃত হয় তারা উভয় অংশে। শীর্ণ তারা তোরণের কাছে, ক্রমবিস্তারমান হয়ে স্পর্শ করে শিখারার অঙ্গ। রচিত হয় সম দূরে বৃহৎ কার্নিস বা ছজ্জাও, অধিক্ষিপ্ত হয়ে রূপ পরিগ্রহ করে ঝুলান ছাদের। তার বহিরাঙ্গ থেকে সুরু হয় ছাদের বিস্তার। মহামহিমময় হয় ঐক্য। স্থাপিত হয় এই ছজ্জা বা কার্নিস

আটটি স্তম্ভের শীর্ষদেশের বন্ধনীর উপর। অপরূপ এই স্তম্ভগুলি অঙ্গের গঠনে আর অলংকরণে, অভিনব বন্ধনীগুলিও, মহাসমৃদ্ধিশালী অঙ্গের শিল্প সম্পদে ও মূর্তিসম্ভারে। কিন্তু হারায় না তারা নিজের স্বরূপ, পরিত্যাগ করে না আপন অনুষ্ঠান।

শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য মহাপারদর্শী স্থপতির এই মন্দিরের বুকে নিয়ে আছে তার গর্ভগৃহের সংলগ্ন অন্তরালয়ের নির্মাণ। এই অন্তরালয়ের সাহায্যে নির্মিত হয় গর্ভগৃহের শীর্ষদেশে শিখারা। বিভিন্ন গর্ভগৃহের রূপ আর পরিকল্পনা স্থচারু, স্থউচ্চ, উড্ডিয়মান নিশ্ছিদ্র শিখারার তুলনায়। রচনা করেন মহাঅভিজ্ঞ স্থপতি অনুভূমিক শিখারার বুকে সুস্পষ্ট অধিক্ষেপন, হয় এক নিখুঁত অপরূপ সমন্বয়, স্থসামঞ্জস্য হয় তার অঙ্গের প্রতিটি অংশের গঠনে, বিস্তৃতিতে আর অলঙ্করণে। মহামহিমময় হয় এই ক্ষুদ্র মন্দিরটি। অপরূপ হয়।

মুগ্ধ হয়ে দেখি তার অঙ্গের অপর্যাপ্ত, জীবন্ত, মহিমময় মূর্তিসম্ভার আর জটিল অলঙ্করণ। অলঙ্কৃত হয় তার জঙ্ঘা তিন সারি মূর্তি দিয়ে। মূর্তি কত দেবতার আর দেবীর, মূর্তি কত পীনোন্নতবক্ষ আকর্ণবিস্তৃত পরম রূপবতী নারীর, কত সুষ্ঠু গঠন নরেরও। খোদিত কেউ বৃত্তাকার উদ্গাতস্তম্ভ বেষ্টিত কুলুঙ্গির ভিতর, কেউ অলঙ্কৃত চন্দ্রাতপের নিচে, কেউ মহাসমৃদ্ধিশালী তোরণের অঙ্গে। নিযুক্ত কেউ আঁখিতে কাজল লেপনে, কেউ অলক্ত রঞ্জনে পদদ্বয়, কেউ পাঠে, হস্তে নিয়ে প্রেমপত্র, কেউ চঞ্চল বক্ষের পীড়নে। নিযুক্ত কত নারীও সঙ্গীতে হস্তে নিয়ে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র—কেউ বীণা, কেউ বেণু, কেউ করতাল। যোগদান করে কত নারী বিভিন্ন প্রেমের দৃশ্যেও। নিরপেক্ষ তারা, দাঁড়িয়ে থাকে এক পাশে, হস্ত দিয়ে লুকিয়ে রাখে আনন। তাদের সঙ্গে আছে কদাকার জন্তু, প্রতীক তারা সুন্দর আর অসুন্দরের মিলনের এক সুসামঞ্জস্যের। অঙ্গে তাদের বহুমূল্য বসন আর ভূষণ, কণ্ঠে মুক্তার মালা আর জড়োয়ার ঝালর, কর্ণে হীরক কুণ্ডল, মণিবন্ধে স্বর্ণ কঙ্কণ আর মণিমুক্তা খচিত বলয়, বাজুতে তাগা, কটিদেশে স্বর্ণবন্ধনী, তারা পরিচায়ক তাদের বিভিন্ন বৃত্তির, তাদের মর্যাদার, পরিমাপক তাদের ঐতিহ্যেরও। আকর্ণবিস্তৃত তাদের নয়ন, হাস্যময় তাদের আনন, দীর্ঘ সূচ্যগ্র তাদের নাসিকা, ধনুকাকৃতি তাদের ভ্রূ, বঙ্কিম গ্রীবা, রহস্যময় তাদের আনন সৌন্দর্যের দ্যুতিতে,

ছন্দময় তাদের গতি, প্রতীক তারা পুরাণে বর্ণিত নারীর। মধ্যমণি ভাস্করের অলঙ্করণে অপরূপ এই নারী মূর্তিগুলি, অভিনব ভাস্করের হৃদয়ের ঐশ্বর্যে আর মনের মাধুর্যে। রচিত হয় এক অলোকসুন্দর পরিবেশ, এক মহারহস্যলোক মন্দিরের অঙ্গে, এক অমরাবতী।

দেখি অপরূপ সুন্দরতম শিরোভূষণে, আর বহুমূল্য ভূষণে ভূষিত কত অপ্সরার মূর্তিও। মুগ্ধ হয়ে দেখি খাজুরাহোর মহাঅভিজ্ঞ ভাস্করের এক অপরাজেয় সৃষ্টি, এক শাশ্বত কীর্তি। প্রণত জানাই তার স্থপতি আর ভাস্করকে। ঘণ্টাইতে উপনীত হই।

জৈন মন্দির, দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি খাজুরাহো গ্রামের দক্ষিণ পূর্বে জৈন মন্দিরের সমষ্টি থেকে কিছু দূরে অর্ধভগ্ন অবস্থায়। দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসাবশেষ, প্রেতাত্মা এক অতীত মহাগৌরবময় সৃষ্টির, বুকে নিয়ে পূর্ব গৌরবের প্রকৃষ্টতম প্রতীক অতুল ঐশ্বর্য। অঙ্গে নিয়ে আছে মহাঅভিজ্ঞ আর সুনিপুণ ভাস্করের সুন্দরতম দান, শ্রেষ্ঠ কীর্তি, অবিনশ্বর সৃষ্টি। দেখি লিন্‌টেলের শীর্ষদেশও অলঙ্কৃত একটি মূর্তি দ্বারা রচিত পাড় দিয়ে। বর্ণিত হয় তার অঙ্গে শ্রেষ্ঠ ও চতুর্বিংশতি জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের মাতার ষোলটি স্বপ্ন দর্শনের কাহিনী। লিন্‌টেলের উপর খোদিত হয় গরুড় বাহনে এক চতুর্ভুজা দেবীর মূর্তি, দুই পাশে কুলুঙ্গির ভিতর তীর্থঙ্করদের মূর্তি। বুকে নিয়ে আছে ঘণ্টাই বারটি চোদ্দ ফুট ছয় ইঞ্চি উঁচু স্তম্ভের শ্রেণী। দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভগুলি পঁয়তাল্লিশ ফুট দীর্ঘ পঁচিশ ফুট প্রস্থ ভিত্তির উপর, শীর্ষে নিয়ে আছে মন্দিরের সমতল ছাদ, অঙ্গে নিয়ে ঘণ্টা। অপরূপ শোভন দর্শন তাদের মধ্যে আটটি স্তম্ভ। দীর্ঘ এই স্তম্ভগুলি, সূক্ষ্ম তাদের স্তম্ভদণ্ড, অষ্টকোণ স্তম্ভ মূল, বৃত্তাকারে নির্মিত তাদের শীর্ষদেশ, বুকে নিয়ে আছে অনবদ্য, সুন্দরতম শিল্প সম্ভারের বেষ্টনী, শীর্ষে নিয়ে আছে অনুরূপ প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণে অলঙ্কৃত বন্ধনী। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই স্তম্ভগুলি মহাপারদর্শী চন্দেল্ল স্থপতির আর ভাস্করের মুগ্ধ হয়ে দেখি। স্থপতিকে আর ভাস্করকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি।

সেখান থেকে পার্শ্বনাথের মন্দিরে উপনীত হই। বৃহত্তম আর সুন্দরতম জৈন মন্দির খাজুরাহোর, শ্রেষ্ঠও, দাঁড়িয়ে আছে মহামহিমময় মূর্তিতে, আটষট্টি

ফুট দুই ইঞ্চি দীর্ঘ আর চৌত্রিশ ফুট এগার ইঞ্চি প্রস্থ পরিধি নিয়ে। নাই পার্থক্যের আধিক্য এই জৈন মন্দিরগুলির পরিকল্পনায় আর হিন্দু মন্দিরগুলির পরিকল্পনায়, গঠন পদ্ধতিতেও নাই। শুধু বুকে নিয়ে নাই এই জৈনমন্দিরগুলি শূন্যস্থান, তাদের ঊর্ধ্ব গতিতে, অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য খাজুরাহোর ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের। রচিত হয় তার পরিবর্তে তিন সারি সমান্তরাল বৃহৎ, মহিমময়, সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত মূর্তির সম্ভার। অবিচ্ছেদ্য এই মূর্তির সারি, অবিচ্ছিন্নও অধিকার করে প্রাধান্য মন্দিরের অলঙ্করণে। রচিত হয় পর্যায়ক্রমে অধিক্ষিপ্ত পোস্তার শ্রেণীও, সৃষ্টি হয় বৈচিত্র্য নয়নাভিরাম হয় মন্দিরের অলঙ্করণ। রচিত হয় স্তম্ভযুক্ত কুলুঙ্গি এই সব অধিক্ষেপণের অঙ্গে, অলঙ্কৃত করা হয় সেই সব কুলুঙ্গি বিভিন্ন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি দিয়ে। পবিত্রতার প্রতীক তাঁরা—মূর্ত প্রতীক জৈন ধর্ম ও মতবাদেরও। তাদের পাশে পাশে ক্ষুদ্র স্তম্ভযুক্ত ব্যালকনির শ্রেণী, বুকে নিয়ে আছে অসংখ্য ক্ষুদ্র মূর্তির সমষ্টি।

আয়তক্ষেত্র এই মন্দিরটি গঠনে। অধিক্ষিপ্ত তার দুই প্রান্তদেশ, পূর্ব প্রান্তে রচিত হয় মন্দিরের প্রবেশ পথ আর তোরণ। নির্মিত হয় মন্দিরের ভিতরেও একটি বৃহৎ আয়তক্ষেত্র সভাগৃহ (হল), বিভক্ত দুইটি প্রকোষ্ঠে, অঙ্গে নিয়ে সম্মুখ ভাগে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ, পশ্চাতে গর্ভগৃহ। তৈরি হয় একটি সুপ্রশস্ত প্রদক্ষিণের পথও সম্পূর্ণ সভাগৃহটির চতুর্দিকে। অলঙ্কৃত করেন মহাঅভিজ্ঞ ভাস্কর তার সর্বাঙ্গও হিন্দু মন্দিরের অলঙ্করণের পদ্ধতিতে। শুধু জৈন তীর্থঙ্কর আর জৈন মতবাদ অধিকার করে হিন্দু দেবদেবীর স্থান মন্দির অলঙ্করণে।

ঘুরে ঘুরে মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরের গাত্রের সর্বাঙ্গের অলঙ্করণ দেখি, মূর্তি দিয়ে বর্ণিত হয় কত কাহিনীও। ভিতরে প্রবেশ করে গর্ভগৃহের সামনে উপনীত হই। দেখি গর্ভগৃহের অন্তরভিত্তির পশ্চিম দিকে একটি দুই ফুট এক ইঞ্চি অপ্সরার মূর্তি, চন্দেল্ল ভাস্করের এক অপরূপ সৃষ্টি ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের। সুন্দরতম এই মূর্তিটিও রহস্যময়ী। অনুরূপ তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গী লক্ষণের মন্দিরের বন্ধনীর অঙ্গের শালভঞ্জিকার-মূর্তির, অনুরূপ অঙ্গের বসনে আর ভূষণেও। তাই মনে হয় তারা অধিকার করে প্রস্তরের অঙ্গে ভাস্করের রচিত এক সুমহান মহাকাব্যের বিভিন্ন অংশ। দাঁড়িয়ে আছে এই অপরূপ মূর্তিটি প্রাচীরের

গাত্রের এক প্রান্ত দেশে। রচিত হয় সমকোণে দুইটি উপরিভাগ—আচ্ছাদন মূর্তির, আচ্ছাদিত হয় মূর্তিটি। দক্ষিণে স্তম্ভের সংলগ্ন কুলুঙ্গির ভিতর রচিত হয় একটি তীর্থঙ্করের মূর্তি, বামে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ভিতরে একটি শার্দুলের।

নাই তার চতুর্দিকে কোন অলঙ্করণ প্রাচীরের গাত্রে, সমৃদ্ধিশালী নয় অনবদ্য শিল্পসম্ভার দিয়ে—তাই তীব্রতর হয় এই অপ্সরার গতি, সুস্পষ্টতরও হয়। সাধিত হয় এক অপরূপ সমন্বয় মূর্তির আকৃতিতে, তার গতিতে আর প্রাচীরের গঠনে আর তার অঙ্গের শূন্য স্থানে। সুসামঞ্জস্য হয় মধ্যযুগের গতির সঙ্গে প্রাচীন যুগের স্বাভাবিকত্বের, যুক্ত হয় গতি আর বাস্তব এই মূর্তির রচনায়। তাই মহামহিমময় হয় এই মূর্তিটি, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন খাজুরাহোর মূর্তি সম্ভারের মধ্যে।

অনবদ্য মূর্তিসম্ভার দিয়ে অলঙ্কৃত গর্ভগৃহের বহিঃপ্রাচীরের গাত্রও। দেখি সন্তানের আদরে নিযুক্তা এক স্নেহময়ী মাতা, প্রতিফলিত হয় তাঁর আননে আর নয়নে তাঁর অন্তরের ভাষা, বিগলিত হয় তার সর্বাঙ্গ সন্তান স্নেহে। নিযুক্তা এক পরমা সুন্দরী রমণী পত্র লিখনে, উৎসারণ করে তাঁর পদতল থেকে কণ্টক এক ক্ষুদ্রকায়া পরিচারিকা। দেখি উত্তর দিকেই নিযুক্তা প্রসাধনেও একটি পরমাসুন্দরী নারী। অপরূপ এই মূর্তিগুলিও সুন্দরতম দান জৈন ভাস্করের—তাদের অমর কীর্তি।

গর্ভগৃহে সিংহাসনে বিরাজ করেন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ মহামহিমময় মূর্তিতে, বিগ্রহ দেবতা এই মন্দিরের। অনবদ্য সুন্দরতম অলঙ্করণ দিয়ে অলঙ্কৃত এই সিংহাসনটির সর্বাঙ্গও, সিংহাসনের সম্মুখেও একটি বৃষের মূর্তি—প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের প্রতীক এই বৃষ। অঙ্গে নিয়ে আছে বৃষটিও অপূর্ব, অনুপম শিল্প সম্ভার। প্রতিষ্ঠিত হয় পার্শ্বনাথের আধুনিক মূর্তিটি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। মহাঅভিজ্ঞ স্থপতি ও ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি।

আদিনাথের মন্দিরে উপনীত হই। জৈন মন্দির আদিনাথ কিন্তু ক্ষুদ্রতর দাঁড়িয়ে আছে পার্শ্বনাথের মন্দিরের সন্নিকটে, উত্তর দিকে। অনুরূপ গঠনে আর শিল্প পদ্ধতিতে খা [illegible] হোর মন্দিরের, বুকে নিয়ে আছে আদিনাথও প্রকৃষ্টতম শিল্পসম্ভার আর [illegible] মূর্তিসম্ভার, অঙ্গে নিয়ে আছে অন্তরালের

আর গর্ভগৃহ, শীর্ষে নিয়ে শিখারা। কিন্তু বুকে নিয়ে নাই শিখারা অঙ্গশিখারা। মুগ্ধ হয়ে দেখি। শেষ হয় আদিনাথের মন্দির দর্শন, পরিসমাপ্তি হয় পূর্বগোষ্ঠী দর্শনেরও। তখন অস্ত যান পশ্চিম গগনে দেবদিবাকর, দিগন্ত হয় লালে লাল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা সারকিট হাউসে ফিরে আসি।

পরের দিন, ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সমাপন করি। তারপর প্রাতরাশ খেয়ে আবার মন্দির দর্শনে বার হই। দেখতে যাই দক্ষিণ গোষ্ঠী। বুকে নিয়ে আছে দক্ষিণ গোষ্ঠীও দুইটি মন্দির—দুলাদেবের ও চতুর্ভুজের মন্দির, দাঁড়িয়ে আছে তারা খাজুরাহো গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরে। প্রথমে দুলাদেবের মন্দিরে উপনীত হই।

শৈব মন্দির দুলাদেব, ক্ষুদ্রতরও আয়তনে, নিরন্ধার প্রাসাদ অঙ্গে নিয়ে আছে গর্ভগৃহ, অন্তরালয়, মহামণ্ডপ, মণ্ডপ ও অর্ধমণ্ডপ, বিস্তৃত হয়ে আছে ছেষট্টি ফুট দীর্ঘ ও তেত্রিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। সমপর্যায়ে পড়ে দেবী জগদম্বা, চিত্রগুপ্ত, জভরী, আদিনাথ, বামন ও জাতকারীর। অঙ্গে নিয়ে আছে তাদের মধ্যে দেবী জগদম্বা, চিত্রগুপ্ত, জভরী আর দুলাদেব অঙ্গশিখারা শিখারার বুকে। শোভন গঠন, সুপরিকল্পিত, সুচারু তাদের মধ্যে দুলাদেবের মন্দিরের অঙ্গশিখারা, মহামহিমান্বিত হয় শিখারা, পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন: পূর্ণ পরিণতি লাভ করে মধ্যযুগের নাগর শিখারা।

মাতঙ্গেশ্বরের মত বুকে নিয়ে নাই তার মহামণ্ডপও কোন স্তম্ভ। স্থাপিত হয় তার অষ্টকোণ ছাদের উপর বৃত্তাকার গম্বুজ। তৈরি হয় গম্বুজ বৃত্তের সমষ্টি দিয়ে, ক্রমহ্রস্বামান হয়ে ঊর্ধ্বে উঠে সেই বৃত্তের শ্রেণী উপনীত হয় গম্বুজের শীর্ষদেশে, রূপ পরিগ্রহ করে নদীর বুকে নিক্ষিপ্ত উপল খণ্ডের। তাই অভিনব এই ছাদের নির্মাণকৌশল, পরিচায়ক স্থপতির অগাধ স্থাপত্য জ্ঞানের—তাঁর বহু শত বৎসরের অভিজ্ঞতারও। বুকে নিয়ে আছে এই ছাদ কত মূর্তির সম্ভারও, মূর্তি দিয়ে রচিত হয় চিত্র কত হস্তীযুথের শোভাযাত্রার, শোভাযাত্রা কত বীর্যবান অশ্বেরও, দৃশ্য কত যুদ্ধের হস্তে নিয়ে অসি আর ঢাল, কত বিজয় অভিযানেরও চন্দেল নৃপতিদের। অলঙ্কৃত হয় এই বৃত্তের শ্রেণী কত জ্যামিতিক অলঙ্করণ দিয়েও, মহা-সমৃদ্ধিশালী হয় মহামণ্ডপের ছাদও। চারিকোণে রচিত হয় চারিটি ভীতার্ত, পলায়মান যক্ষের মূর্তি। জীবন্ত এই মূর্তিগুলি,

মহামহিমময়, প্রদীপ্ত প্রাণের প্রাচুর্যে আর অন্তরের দ্যুতিতে। অপরূপ সুন্দরতম কিন্তু তার অঙ্গের শালভঞ্জিকার মূর্তিগুলি, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি খাজুরাহোর ভাস্করের।

দেখি ঘুরে ঘুরে তার বহিঃপ্রাচীরের অনুপম অলঙ্করণ, দেখি তার অঙ্গের সুষ্ঠু গঠন সজীব মূর্তিসম্ভারও। দেখি তিন সারি মূর্তির সম্ভার দিয়ে অলঙ্কৃত তার জঙ্ঘার অঙ্গও। মূর্তি কত দেবতার আর দেবীর, মূর্তি সুরসুন্দরীর, মূর্তি অপ্সরার আর বিদ্যাধরেরও। মূর্তি দিয়েই বর্ণিত হয় প্রাচীরের নিম্নাংশে চিত্র কত দৈনন্দিন জীবনের, কত আশা আকাঙ্খার, কত সামাজিক নীতির চন্দেল্ল যুগের, দৃশ্য কত যুদ্ধের, কত বিজয় অভিযানের চন্দেল্ল নরপতিদের। মুগ্ধ হয়ে দেখি।

দেখি পশ্চিম দিকে দ্বিতীয় সারিতে, কেন্দ্রস্থলের ভদ্রে একটি সূর্য-ব্রহ্মা-শিবের মূর্তি। দুই ফুট উচ্চ এই মূর্তিটি, দশম শতাব্দীতে খোদিত।

অষ্টভুজ এই মূর্তিটি, ভগ্ন তার কয়েকটি হস্ত। দ্বিতীয় যুগল হস্তে তিনি ধারণ করেছিলেন শঙ্খ আর চক্র, বিষ্ণুর প্রতীক। তাই অন্তর্ভুক্ত এই সূর্য মূর্তিটির ব্রহ্মা, অধিপতি সূর্যের, বিষ্ণু, চন্দ্রের অধিপতি আর অগ্নির অধিকর্তা শিব। সদাশিব নামে পরিচিত এই মূর্তিটি অপরিহার্য অঙ্গ শৈব মন্দিরের। তাই বর্মাবৃত দেবদিবাকরের উত্তপ্ত অঙ্গ। ক্রমশীর্ণায়মান হয়ে অতিক্রম করে সেই বর্ম তাঁর কণ্ঠের দোদুল্যমান মুক্তার মালা, উপনীত হয় কটিদেশে। পদ্মাসনে উপবিষ্ট সূর্য, গোড়ালি পর্যন্ত আবৃত তাঁর পদদ্বয় একটি বসন দিয়ে। বিভিন্ন কিন্তু মথুরার সূর্য মূর্তির আকৃতি, বর্মাবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি, সুউচ্চ পাদুকা দিয়ে শোভিত তাঁর পদদ্বয়ও।

দুই হস্তে ধারণ করে আছেন সূর্য দুইটি প্রস্ফুটিত পদ্ম, কালের প্রকাশের প্রতীক। তাঁর দক্ষিণ শিব-হস্তে ধৃত ত্রিশূলও প্রতীক তিন কালের—ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের। তাঁর বামহস্তের সর্প, সূর্যের প্রতীক, কমণ্ডলু আর অক্ষমালা ব্রহ্মার, কাল চক্রের এক ত্রিশূল ছাড়া নাই এখন আর কোন অস্ত্র তাঁর হস্তে। সূর্যের দেহ থেকে অপহরণ করেন তেজ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা, রচনা করেন সেই তেজ দিয়ে দেবতাদের ব্যবহারের জন্য অস্ত্র, রচিত হয় বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল আরও কত বিভিন্ন অস্ত্র বিভিন্ন দেবতার জন্য।

তিনি তেজময়, তাই প্রদীপ্ত হয় তাঁর আনন, বিকশিত তাঁর প্রশান্ত অথচ ভয়ঙ্কর আনন অন্তরের তেজের জ্যোতিতে। ছড়িয়ে পড়ে সেই জ্যোতি তাঁর বুকে, সেখান থেকে তাঁর দুই হস্তে ধৃত দুই প্রস্ফুটিত পদ্মে, চক্রে পরিণত হয় পদ্ম। ঋজু হয়ে উপবিষ্ট তিনি, তাঁর গলদেশে তিনটি গভীর রেখা। তাঁর কণ্ঠে শোভা পায় বহুমূল্য হার, বিস্তৃত কটিদেশ পর্যন্ত। কর্ণে হীরক কুণ্ডল, শিরে সুউচ্চ মূল্যবান মুকুট। অপরূপ এই মূর্তিটি, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহাঅভিজ্ঞ ভাস্করের, রচিত হয় হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়ে; মিশিয়ে দিয়ে মনের অন্তহীন মাধুর্য। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

স্তম্ভমূলের প্রান্তদেশের নিকটে বসনের কেন্দ্রস্থলে, একটি ক্ষুদ্রাকৃতি অর্ধভগ্ন সূর্যের সারথি অরুণের মূর্তি। বসে আছে অরুণ উল্লম্ব অক্ষে, যুক্ত হয় সেই অক্ষে সূর্যের মুকুটের কীর্তিমুখ তিনটি অশ্বের সঙ্গে। দাঁড়িয়ে আছে অশ্বত্রয় স্তম্ভমূলের উপরে। অবস্থিত এই স্তম্ভ মূলের শীর্ষদেশেই দেব দিবাকরের সপ্তাশ্বযুক্ত রথ।

দেখি একে একে চারিটি বিদ্যাধরের মূর্তিও। উড্ডীয়মান এই বিদ্যাধরেরা উড়ন্ত দেবতা তাঁরা, অধিকার করে আছেন সর্বোচ্চ মেখলার দক্ষিণ পশ্চিম দিক। এই খানেই সর্বোচ্চ শিখরে মন্দিরে বিদ্যাধরেরা বিরাজ করেন। দেখি খোদিত কত বিদ্যাধরের মূর্তি মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে, কুলুঙ্গির ভিতর, কোথাও একাকি, কোথাও সঙ্গে নিয়ে তাঁদের পত্নী। ভূষিত তাঁরাও বহুমূল্যে রত্নালঙ্কারে। কেউ এক হস্ত দিয়ে চালনা করেন অসি অপর হস্তে ধারণ করেন মাল্য, কেউ নিযুক্ত বাদ্য বাদনে—বাজান কেউ বীণা, কেউ বেণু। হস্তে তাঁদের নৃত্যের ছন্দ, পদদ্বয়ে গতির তীব্রতা, উদ্ভাসিত তাঁদের দিব্য আনন তাঁদের অন্তরের অন্তর্নিহিত আলোকে। সুন্দর, শোভনদর্শন দেবদূত তাঁরা, নিষ্পাপ বালকের মত তাঁদের আনন। পক্ষহীন তাঁরা কিন্তু উড্ডীয়মান তাঁদের গতি। নৃত্য করেন তাঁরা অপরূপ ছন্দে, সঙ্গীতের তালে তালে নাচেন। বিভিন্ন এই সঙ্গীতও, পৃথক হয় তাঁদের বিভিন্ন আকৃতি আর গতির ছন্দের সঙ্গে, অনুসরণ করে সঙ্গীত তাঁদের গতির। মহাপুণ্যবান, পবিত্রআত্মা তাঁরা, তাই প্রশান্ত তাঁদের আনন, বিরাজ করে এক মহাপ্রশান্তি তাঁদের আননে। সৃষ্টি হয় এক মহাপবিত্র, অলোকসুন্দর, শান্তির পরিবেশও তাঁদের চতুর্দিকে! মধ্যযুগের ভাস্করের এক সুন্দরতম, পবিত্রতম দান তাঁরা।

দেখি দক্ষিণ পশ্চিম প্রাচীরের গাত্রে, দ্বিতীয় মেখলাতে, দুই পোস্তার কেন্দ্রস্থলের অন্তনিহিত কুলুঙ্গির ভিতর একটি অপ্সরার মূর্তি—মূর্তি স্বর্গের নর্তকীর। অপরূপ এই মূর্তিটিও অনবদ্য তার আননের পেলবতা, নিখুঁত তার নাসিকা, ওষ্ঠ আর চিবুকের গঠন, আকর্ণ বিস্তৃত তার নয়ন। তার কণ্ঠে শোভা পায় বহুমূল্য পালকের মালা, কর্ণে হীরক কুণ্ডল, শিরে সুউচ্চ, মূল্যবান শিরোভূষণ। উর্ধ্বে উত্তোলিত তার হস্ত নৃত্যের ভঙ্গীতে। তার কণ্ঠের দোদুল্যমান মালা, কেশের নিখুঁত বিন্যাস আর অনতিপ্রশস্ত মসৃণ ললাট আনে কমনীয়তা তার সর্বাঙ্গে। রমণীয় হয় নারী হয় রহস্যময়ীও।

দেখি নৃত্যের ছন্দে দাঁড়িয়ে আছে একটি অপ্সরা অর্ধমণ্ডপের ভিতরে একটি উদ্গত স্তম্ভের শীর্ষদেশেও। মহানন্দে নৃত্য করে অপ্সরা, অনবদ্য লীলায়িত তার নৃত্যের ছন্দ, নিখুঁত তার তাল। প্রাচীরের গাত্রের সামনে বিস্তারিত হয় একে একে তার প্রতিটি অঙ্গ। প্রসারিত হয় পর পর তার আনন, তার বাহু, তার অঙ্গের উত্তরীয়ও, তার পদদ্বয় নৃত্যের ছন্দে। উড়ে তার শিরের মুকুটও। কিন্তু সংলগ্নীভূত তার দেহ প্রাচীরের গাত্রে। নৃত্যের তালে সুবিন্যস্ত হয় তার অঙ্গের ভূষণ আর বসনও, লতায়িত হয়, রূপ ধারণ করে নর্তকীর। নৃত্যের ছন্দে মুখরিত হয় সমস্ত প্রাচীর। সমাবেশ হয় এক রহস্যময় অলোকসুন্দর আলোছায়ারও। অপরূপ এই মূর্তিটিও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দুলাদেবের ভাস্করের, দেখি মুগ্ধ হয়ে।

দেখি আরও একটি অপ্সরার মূর্তি অর্ধমণ্ডপের ভিতরে, উদ্গত স্তম্ভের উপরে, তিন মেখলাতে বিভক্ত প্রাচীরের গাত্রে। দেখি নিযুক্ত এই দেবনর্তকীও নৃত্যে, নৃত্য করে অপরূপ ছন্দে। অপরূপ তার গঠন সৌষ্ঠবও। তরঙ্গায়িত তার কণ্ঠের মুক্তার মালা, তার কেশগুচ্ছ. ফুটে উঠে এক গতির তরঙ্গ তার শিরে আর অঙ্গের উত্তরীয়তেও। উচ্ছল এই নর্তকীটি, উদ্দাম, পরিপূর্ণ জীবনীশক্তিতে, উচ্ছ্বসিত, প্রাণবন্ত। কিন্তু কেন্দ্রীভূত আর সমস্ত পরিপূর্ণতা, তার সম্পূর্ণতা তার উদরে। দেখি মুগ্ধ হয়ে।

দেখি একটি অপরূপ গণ মূর্তিও, গর্ভগৃহের প্রবেশ পথে সর্দালের কেন্দ্রস্থলে, চতুর্ভুজ এই গণটি, উড্ডীয়মান, উন্মত্ত শঙ্খবাদনে। এক হস্তে ধারণ করে আছে একটি শঙ্খ তার ওষ্ঠের নিকটে। বহন করে নিয়ে যায় গণ তার শিরে

একটি স্তম্ভযুক্ত রথ। স্থাপিত সেই রথের নিম্ন প্রান্তদেশ তার ঊর্ধ্ব হস্তে। আনন্দদানকারী জগতের এই গণ, তাই রচিত হয় তার মূর্তি সর্দালের অলঙ্করণের কেন্দ্রস্থলে, শিবের সিংহাসনের নিচে। মহাসমৃদ্ধশালী হয় সর্দালের অঙ্গও।

মহাশূন্যে প্রসারিত গণের দেহ, তরঙ্গায়িত হয় তার বাতাস তার মুখনিঃসৃত শঙ্খধ্বনিতে, ঘোষিত হয় শিবের আগমনের বার্তা ধরণীতে। নিবদ্ধ থাকে না এই ঘোষণা শুধু শঙ্খধ্বনিতে, তার হস্তে ধৃত শঙ্খে, বিকশিত হয় তার চোখে মুখেও। এক পবিত্র আলোয় আলোকিত হয় তার মুখমণ্ডল, প্রদীপ্ত হয় তার তরঙ্গায়িত কেশপাশ—তার সর্বাঙ্গ। প্রসারিত তার দক্ষিণ ঊর্ধ্ব কর হংসের আকারে, স্পর্শ করে তার অঙ্গুষ্ঠ তার অনামিকা, রূপধারণ করে হংসের চঞ্চুর। পতাকার আকৃতিতে বিস্তৃত তার অর্ধভগ্ন বাম ঊর্ধ্ব হস্ত, ধারণ করে আছে শিবের রথ। ভূষিত তার সর্বাঙ্গ বহুমূল্য অলঙ্কারে। অপূর্ব এই মূর্তিটিও, বুকে নিয়ে আছে চন্দেল্ল ভাস্কর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

গর্ভগৃহের সামনে উপনীত হই। দেখে বিস্মিত হই তার দক্ষিণ প্রবেশ-দ্বারের ও তার সন্নিহিত প্রাচীরের শিল্পসম্ভার। প্রথিত হয় সমকোণে ফলক অঙ্গে নিয়ে শার্দুলের মূর্তি, প্রবেশদ্বারের ও অন্তরালয়ের কোণে। রচিত হয় সিংহশাখার পাশে পুষ্পদল দিয়ে গ্রন্থি, প্রাচীরের গাত্রে ক্রোলের বা ঝালরের কবাট, তার পাশে প্রক্ষিপ্ত হয় একটি উদ্গত স্তম্ভ। রচিত হয়, লেখেন স্টেলা ক্রামরিশ, এক সুন্দরতম তরঙ্গের খেলা ফলকের অঙ্গে। কখন ঊর্ধ্বে উঠে সেই তরঙ্গ, কখন নিচুতে নামে। তরঙ্গায়িত হয় ঝালরের প্রতিটি পুষ্পদলের শীর্ষদেশ, অতিক্রম করে তরঙ্গ এক একটি পুষ্পদল উপনীত হয় শেষ প্রান্তে। আবার ফিরে আসে তরঙ্গ। সৃষ্টি হয় কত আবর্ত, কত গ্রন্থি তার যাতায়াতের পথে। বিস্তৃত হয় এক একটি লতার বৃন্ত সারা প্যানেলের অঙ্গে, নির্গত হয় তার অঙ্গ থেকে কত শাখা প্রশাখাও। দ্বিধা বিভক্ত হয় তাদের অঙ্গ, সৃষ্টি হয় প্রস্তরের অঙ্গে, প্রাচীরের গাত্রে, আলোছায়ার সমাবেশ। শেষে পরিসমাপ্তি হয় তাদের বিস্তৃতি, রুদ্ধ হয় অগ্রগতি গর্ভগৃহের দ্বারের পাশে এসে। দ্বারের চতুর্দিকে এসে তারা রূপ পরিগ্রহ করে শার্দুলের, পৃষ্ঠে নিয়ে আছে শার্দুল আরোহী। শার্দুলের পিছনে এক একটি বিরুদ্ধ পক্ষের লোক, কেউ নিযুক্ত তার পুচ্ছ মর্দনে, কেউ

ভীতি প্রদানে, হস্তে নিয়ে অসি। সমআকৃতির এই নায়করা। কিন্তু আরোহণ করে নায়ক শার্দুলের পৃষ্ঠে, হস্তে নিয়ে একই অস্ত্র, খর্ব হয় তার আকৃতিও। হয় সে ক্ষুদ্রকায়। বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায় শার্দুল অপাঙ্গ দৃষ্টিতে, মুখ ব্যাদান করে তাকিয়ে থাকে ক্ষুদ্রকায় আরোহীর পানে। তরঙ্গায়িত হয় এই ফলকটির সর্বাঙ্গও।

রচনা করেন ভাস্কর তিনটি অপরূপ তরঙ্গের সমষ্টি, গ্রন্থিত হয় তারা পরস্পরের সঙ্গে, সংযুক্ত হয়। বিস্তৃত হয় একটি তরঙ্গ শার্দুলের বক্ষ থেকে তার নিতম্ব পর্যন্ত, অতিক্রম করে শিখা, তার পর তার পৃষ্ঠের আরোহীকে অতিক্রম করে পরবর্তী শার্দুলের শিখায় উপনীত হয়, সেখান থেকে তার নিতম্বে। প্রসারিত হয় দ্বিতীয় তরঙ্গ শার্দুলের আননের একপাশ থেকে তার পুচ্ছের গোড়া পর্যন্ত। সেখান থেকে ঊর্ধ্ব গতিতে তার পৃষ্ঠের আরোহীর প্রসারিত পদদ্বয়ে। তারপর সম্পূর্ণ গ্রাস করে সেই তরঙ্গ পরবর্তী শার্দুলটিকে, অবতরণ করে তার পুচ্ছের গোড়া পর্যন্ত, অতিক্রম করে আরোহীর বক্ষ উপনীত হয় নিচের শার্দুলের আননে। অতিক্রম করে তৃতীয় তরঙ্গটি সর্বোচ্চ সিংহের বৃত্তাকার বক্ষ, তার পায়ের [illegible] পার হয়ে যায় তার পৃষ্ঠের যোদ্ধার উন্নত বক্ষে। সেখান থেকে তার নিতম্ব আর পশ্চাতে প্রসারিত বামপদে। নেমে আসে স্বস্তিকা হস্তে দ্বিতীয় বামনের বক্ষে। তারপর অগ্রসর হতে থাকে সেই তরঙ্গ। পরস্পর বিভক্ত হয় তরঙ্গগুলি সিংহের বক্ষে, তার নিতম্বের উপরে আর যোদ্ধার বক্ষে। নিরাপদে বসে থাকে ক্ষুদ্র আরোহী শার্দুলের উপর, বেষ্টিত হয়ে থাকে তরঙ্গ দিয়ে।

চর্মাকৃতি এই সব মানুষের আর সিংহের গঠন, নির্দেশক তারা ভগবানের প্রত্যাদেশের। দর্শিত হয় জীবন জড়ের ভিতর দিয়ে। রচিত হয় এক নিখুঁত জীবনালেখ্য মন্দিরের গাত্রে।

দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে দুলাদেবের মহাঅভিজ্ঞ শিল্পীর এক সুমহান কীর্তি, সুন্দরতম সৃষ্টি এক মহা গৌরবময় যুগের। খুব সম্ভব সৃষ্টি মহাঅভিজ্ঞ ভাস্কর জগল বা জালনের, রচিত হয় ভগবৎ-অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, উজাড় করে দিয়ে হৃদয়ের সীমাহীন ঐশ্বর্য। উৎকীর্ণ আছে তাঁর নাম এই মন্দিরের বিভিন্ন স্থানে।

স্থপতি ও ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হই সেখান থেকে চতুর্ভুজের মন্দিরে উপনীত হই। অবস্থিত জাতকারী গ্রামের নিকটে, নিরন্ধার প্রাসাদ এই চতুর্ভুজও বুকে নিয়ে আছে গর্ভগৃহ, মহামণ্ডপ ও ক্ষুদ্রকায় অর্ধমণ্ডপ। দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিম দিকে মুখ করে। অঙ্গে নিয়ে নাই তার শিখারা অঙ্গশিখারা, বুকে নিয়ে আছে শুধু চৈত্য গবাক্ষ আর জালির কাজ।

বিষ্ণু মন্দির এই চতুর্ভুজ, পরিচিত জাতকারী মন্দির নামেও জাতকারী গ্রামের নামানুসারে। বিরাজ করেন তার গর্ভগৃহে নয় ফুট উঁচু বিষ্ণু, মহামহিমময় এই মূর্তিটি। সমপর্যায়ে পড়ে না এই মন্দিরটি দুলাদেবের মন্দিরের গঠনে, পড়ে না অঙ্গের অলঙ্করণেও। দেখি ঘুরে ঘুরে মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরের গাত্রের অলঙ্করণ।

দেখি অঙ্গে নিয়ে আছে তিন সারি মহিমময় সুন্দরতম মূর্তিসম্ভার চতুর্ভুজও। শীর্ণতর তাদের মধ্যে তৃতীয় সারিটি, বুকে নিয়ে আছে মূর্তি কত বিদ্যাধরের, কত অপ্সরার, কত দেবলোকের অধিবাসীদেরও। জীবন্ত এই মূর্তিগুলি, মহিমান্বিত হয়ে আছে মহামণ্ডপের প্রক্ষেপণের পটভূমিতে। অলঙ্কৃত করেন মহাঅভিজ্ঞ খাজুরাহোর ভাস্কর প্রথম দুই সারির উর্ধ্বাংশের, দুই প্রান্তের জঙ্ঘার অঙ্গের রথের বুকও দুইটি কুলুঙ্গি দিয়ে অঙ্গে নিয়ে বৃহৎ মূর্তির সম্ভার-মূর্তি প্রধান দেবতার আর দেবীর, তাদের শীর্ষদেশে প্রক্ষিপ্ত ছাদের আচ্ছাদন। শোভিত করেন উত্তর সম্মুখভাগের নিম্নতম সারি চতুর্ভুজ শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাধারী বিষ্ণুর মূর্তি দিয়ে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সমস্ত গুণের প্রতীক, তাঁর উপরে একটি সিংহশীর্ষ দেবী, সম্ভবতঃ নরসিংহের নারী সংস্করণ। সজ্জিত করেন পূর্ব সম্মুখভাগের কেন্দ্রস্থলের সারি একটি শিবের মূর্তি দিয়ে। বৃষারোহণে আছেন দেবাদিদেব মহাদেব, হস্তে নিয়ে ত্রিশূল আর সর্প, তার নিচে কুলুঙ্গির ভিতর একটি দেবদিবাকরের মূর্তি, উপবিষ্ট তিনি একটি সপ্তাশ্বযুক্ত রথের উপর। দেখি দক্ষিণের সম্মুখভাগেও একটি অর্ধভগ্ন দেবতার মূর্তি, তার শীর্ষদেশে অর্ধ-নারীশ্বরের মূর্তি, বাম অঙ্গে তিনি করুণারূপিণী উমা, দক্ষিণ অঙ্গে তিনি দেবাদিদেব মহাদেব—অধিকর্তা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের। অস্বীকার করেন ভৃঙ্গী হর প্রিয়া পার্বতীকে পূজা করতে। যুক্ত হন তিনি আশুতোষের বামঅঙ্গে,

লাভকরেন পূজা শিবের সঙ্গে। জীবন্ত এই মূর্তিগুলি, মহামহিমময় ভাস্করের অন্তরের ঐশ্বর্যে আর মনের মাধুরীতে।

ভিতরে প্রবেশ করি। উপনীত হই মহামণ্ডপে, দেখি তার বৃত্তাকার ছাদ, অষ্টকোণ পরিধিতে—অঙ্গে নিয়ে আছে বিভিন্ন সুন্দরতম অলঙ্করণ। গর্ভগৃহে উপস্থিত হই, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি তার দ্বারের নিম্নাংশের দেবদেবীর মূর্তি। অভিনব এই মূর্তিগুলি। শোভন গঠন, জীবন্ত, সীমাহীন তাদের অঙ্গের মসৃণতা বিভ্রম জাগায় মনে। অপরূপ দান তারা ভাস্করের, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এক মহা গৌরবময় যুগের। গর্ভগৃহে, অন্ধকারে, সমস্ত গর্ভগৃহ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্তিটি, মহামহিমময় মূর্তিতে। তাঁর শিরে শোভা পায় মুকুট, অঙ্গে বহুমূল্য ভূষণ আর সর্বাঙ্গে মূল্যবান মণিমুক্তা ও হীরের অলঙ্কার। ভগ্ন তার নিচের দুই হস্ত, উপরের দক্ষিণ হস্তে তার অভয় মুদ্রা, করতলে তার চক্রের চিহ্ন, বামহস্তে ধারণ করে পদ্মের বৃন্ত ও পবিত্র গ্রন্থ। অপরূপ এই দেবতার মূর্তিটি, স্তব্ধ হয়ে দেখি কিছুক্ষণ। প্রণতি জানাই দেবতাকে ভক্তিভরে। শ্রদ্ধা নিবেদন করি খাজুরাহোর মহাঅভিজ্ঞ শিল্পীকে, যিনি রচনা করেন এমন মহিমময় দেবতার মূর্তি। জানাই তার স্রষ্টা নৃপতিদেরও, [illegible] প্রেরণায় ও অর্থে গড়ে ওঠে এইসব মহামহিমময় মন্দির, অঙ্গে নিয়ে এমন সুন্দরতম, অপর্যাপ্ত অলঙ্করণ আর জীবন্ত মূর্তিসম্ভার। অমর হয় খাজুরাহো, মহাসৌভাগ্যশালী হয় ভারতবর্ষ। মন্দির থেকে বার হই, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি যা আজও অক্ষয় হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়, হয় নাই ম্লান। সমাপ্ত হয় চতুর্ভুজ দর্শন পরিসমাপ্তি হয় খাজুরাহোর মন্দির দর্শনেরও। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা সারকিট হাউসে ফিরে আসি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা চিত্রশালা দেখতে যাই। দেখি এক অপরূপ ভীষণ দর্শনা চামুণ্ডার মূর্তি। আড়াই ফুট উঁচু এই মূর্তিটি অলঙ্কৃত করেছিল খাজুরাহোর জৈন মন্দিরের প্রাচীরের গাত্র। এখন সংরক্ষিত এই চিত্রশালায় প্রদর্শনী হিসাবে।

সমপর্যায়ে পড়ে জৈন চামুণ্ডা যক্ষিণী হিন্দুর চামুণ্ডা দেবীর সঙ্গে। সপ্ত মাতৃকার সপ্তম মাতৃকা এই চামুণ্ডা দেবী। উদ্ভূতা তিনি দুর্গার ললাট থেকে, নিধনকারী শুম্ভ ও নিশুম্ভের, সেনাপতি দৈত্য চণ্ড আর মুণ্ডের, তাই পরিচিতা

চামুণ্ডা নামে। কখন তিনি মন্দিরে নৃত্য পরায়ণা মূর্তিতে পূজিতা হন। কখনও নিযুক্তা তিনি নৃত্যে। অতি কৃশ তাঁর তনু, অন্ধকারময় কুৎসিৎ-দর্শন তাঁর ব্যাদিত মুখগহ্বর, বীভৎস কোটরগত তাঁর অক্ষিতারকা, স্তন-যুগলহীন তাঁর বক্ষ, পরিদৃশ্যমান তাঁর পঞ্জরাস্থি তাঁর অসুন্দর কণ্ঠের হারের অন্তরাল থেকে। এই ভয়ঙ্কর, বীভৎস রূপেই মা সাধন করেন ধ্বংস, সাধিত হয় তাঁর ধ্বংসের লীলা। তাঁর সুগভীর অক্ষিতারকা থেকে নির্গত হয় রাত্রি, হয় মৃত্যু, ধ্বংসও। তাই ম্লান তাঁর নয়নদ্বয়ের চারিদিকের জ্যোতির্মণ্ডল।

অপরূপ এই ভীষণদর্শনা, কুৎসিত, মূর্তিমতী মৃত্যুর প্রতীক, অনবদ্য ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে আর হৃদয়ের অতুল ঐশ্বর্যে। দেখি একে একে বিষ্ণু, উমা, মহেশ্বর, অষ্টভুজা মহিষাশূরী, দিবাকরের, নবগ্রহের মূর্তি, মূর্তি সপ্ত মাতৃকারও বুকে নিয়ে আছে সবগুলিই চন্দেল্ল ভাস্করের কীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

পরের দিন ভোরে উঠে আমরা ফিরবার বাসে চড়ে বসি। বাস ছাড়ে, অগ্রসর হয় সর্পিল গতিতে আম্রকুঞ্জের ভিতর দিয়ে, মহুয়াবনের বক্ষ ভেদ করে। আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক দৃশ্য। দেখি সমবেত কত চন্দেল্ল স্থপতি আর ভাস্কর, বিভিন্ন তাঁদের বেশ, বিচিত্র তাঁদের হস্তের যন্ত্রপাতি। দেখি সমাগত চন্দেল্ল নৃপতিরাও, ভূষিত তাঁরাও মূল্যবান বসনে আর ভূষণে। বলেন, আমরাই নির্মাণ করেছি এই মন্দিরগুলি, করেছি তাদের মহামহিমময়, সুন্দরতম, করেছি অলোকসুন্দরও। রচনা করেছি এক রহস্যলোক, এক মহাসৌন্দর্যের প্রস্রবণ, এক ইন্দ্রলোক খাজুরাহোতে। আমরাই পরিয়েছি তার শিরে মহাগৌরবের মুকুট। রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে সাজিয়েছি। তাই খাজুরাহো মৃত্যুহীন, অমর—অবিনশ্বর, শাশ্বত তার মন্দিরের অঙ্গের কীর্তি। অমরত্ব লাভ করেছি আমরা নিজেরাও।

আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে খাজুরাহোর স্মৃতি মনের মণিকোঠায় হয় নাই ম্লান।

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তরাপথ

(শতাব্দী একাদশ—ষোড়শ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

মথুরা

১।	গোবিন্দজীর মন্দির।	২।	গোপীনাথের মন্দির।
৩।	মদনমোহনের মন্দির	৪।	যুগলকিশোরের মন্দির
৫।	শ্রীরঙ্গজীর মন্দির	৬।	কুঞ্জবিহারীর মন্দির

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস। আমরা তখন দিল্লী প্রবাসী। তিন দিনের ছুটিতে কর্মস্থল গোরক্ষপুর থেকে সস্ত্রীক জ্যেষ্ঠ পুত্র এসে হাজির। তার পরের দিন ছিল সূর্য গ্রহণ। ভোরে উঠে মোটরে চড়ে ওকলায় যমুনাতে গ্রহণের স্নান করতে যাই। অব্যাহতি লাভ করি শহরের জন সমাগম থেকে। হয় কিছু ভ্রমণও।

ফিরবার পথে, বাসনা জাগে জ্যেষ্ঠ পুত্রের মনে, সকলে মিলে মোটরে করে মথুরা-বৃন্দাবন ঘুরে আসবার। কন্যা তখন দিল্লীতে গ্রীষ্মের অবকাশ যাপন করছে, দেখে নাই সে মথুরা ও বৃন্দাবন, তাই এই প্রস্তাব। স্থির হয়, সেই-দিনই খাওয়া দাওয়া করে, বেলা দুটোর মধ্যে রওনা হয়ে, মথুরায় মথুরানাথের মন্দির ও দেব দর্শন করে, বিড়লার ধর্মশালায় রাত্রি যাপন করবো। পরের দিন ভোরে উঠে, বৃন্দাবনের সমস্ত মন্দির দর্শন করে, রাত্রিতে আগ্রায় উপনীত হব। তার পরের দিন, আগ্রাতে—তাজমহল, কেল্লা ও ইৎমদ্দৌলা দেখে দিল্লীতে ফিরবো।

অফিসে গিয়ে, গাড়ীটাকে "সার্ভিসে"র জন্য পাঠিয়ে দিয়ে তিন দিনের ছুটির দরখাস্ত করি। গাড়ী "সার্ভিস" হয়ে এলেই বাড়ীতে ফিরে আসি। ঘড়িতে তখন দেড়টা। গাড়ীর হর্ন শুনেই, জ্যেষ্ঠ পুত্র বেরিয়ে এসে বলে, সব প্রস্তুত, চাও তৈরী। এখন চা পান করে, জিনিসপত্র বেঁধে নিয়ে রওনা হওয়া বাকী। আধ ঘণ্টার মধ্যেই, আমি, আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুত্র-বধূ ও চার বছরের নাতনীকে সঙ্গে নিয়ে মথুরা অভিমুখে রওনা হই। মথুরা রোড ও

হার্ডিঞ্জ অ্যাভেনিউ-র সংযোগস্থলের পেট্রল স্টেশন থেকে প্রয়োজনীয় পেট্রল ও মবিল ভর্তি করে নিয়ে, আমাদের গাড়ী বিদ্যুৎবেগে মথুরা রোড দিয়ে চলতে থাকে।

আমরা একে একে অতিক্রম করি নিজামুদ্দিন ও হুমায়ুনের সমাধি।

বুকে নিয়ে আছে নিজামুদ্দিন প্রবলপরাক্রান্ত বাদশাহ আলাউদ্দিন খিল্‌জীর গুরু নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধি ও তাঁর নির্মিত মস্‌জিদ। স্থাপিত হয় এখানে একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠান, পরিচালনা করেন সেই প্রতিষ্ঠান পরবর্তী গুরুরা। এর প্রাঙ্গণেই, বক্ষে তৃণ নিয়ে নীলাকাশের নিচে, চিরনিদ্রায় অভিভূতা মুঘল সম্রাট সাজাহানের বিদুষী, পরম রূপবতী কন্যা, জাহানারা, অঙ্গে নিয়ে স্বরচিত কবিতা। শিষ্যা তিনি সমসাময়িক নিজামুদ্দিনের, দান করেন এই প্রতিষ্ঠানকে আঠারটি গ্রাম। শুনি, সেই গ্রামের উপস্বত্ব থেকেই আজও নির্বাহ হয় এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ব্যয়। এই সমাধি ক্ষেত্রের অপর প্রান্তে, চির নিদ্রায় নিমগ্ন আছেন পারসীক কবি আমির খসরু।

নির্মাণ করেন মোগল বাদশাহ হুমায়ুনের সমাধি তাঁর প্রিয়তমা বেগম হামিদাবানু। চিরনিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে আছেন তাঁরা দুই পাশাপাশি প্রকোষ্ঠে। পরে, পরিণত হয় এই সমাধি মুঘল রাজপরিবারের সমাধি মন্দিরে, বুকে নিয়ে একশ পঁচাত্তরটি সমাধি। এই সমাধি মন্দিরের একটি প্রকোষ্ঠে, লুক্কায়িত অবস্থায়, ইংরাজ কর্তৃক ধৃত হন দিল্লীর শেষ বাদশাহ, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।

মোটর এগিয়ে চলে, জাংপুরা অতিক্রম করে, বৃহত্তর দিল্লীর বাইরে এসে পৌছায়। দক্ষিণে, সবুজ ক্ষেত স্পর্শ করে অত্যুচ্চ শৈলমালার পদতল, বামে দিগন্তে গিয়ে মেশে। আমরা একে একে অতিক্রম করি কাল্‌কা দেবী আর ওকলা। দক্ষিণে, শৈল শীর্ষে, মন্দিরে বিরাজ করেন কাল্‌কা দেবী, এক বহু পুরাতন বিগ্রহ। বামে, দু'পাশের ঘনবনবীথি ভেদ করে, বঙ্কিম গতিতে অগ্রসর হয় পথ, উপনীত হয় যমুনাপুলিনে। নির্মিত হয় সেখানে যমুনার বক্ষে একটি অ্যানিকাট, তা থেকে খাল কেটে, জল নিয়ে যাওয়া হয় আগ্রা পর্যন্ত। শস্যশ্যামলা হয় দু'পাশের জমি। অ্যানিকাটের ধারে, গড়ে ওঠে মনোরম উদ্যান, দিল্লীবাসীর ভ্রমণের স্থান, স্থান চড়ুইভাতিরও।

মোটর নক্ষত্র গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। আমরা ফরিদাবাদ অতিক্রম করি। বামে, দূরে, দেখা যায় প্রাচীন ফরিদাবাদের প্রাচীর-বেষ্টিত ভগ্ন প্রাসাদ, দক্ষিণে, নতুন ফরিদাবাদের বৃহৎ কলোনি। বাস করে এই কলোনিতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুর্ধর্ষ উদ্বাস্তরা।

একটি প্রাচীন অর্ধ ভগ্ন প্রাচীরে বেষ্টিত প্রাসাদের সংলগ্ন পুষ্করিণীর ধারে এসে আমাদের মোটর থামে। আমরা মোটর থেকে নেমে সতরঞ্চি বিছিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। সঙ্গে আনা চা ও কিছু খাবার খাই। আবার গাড়ীতে উঠে বসি। গাড়ী ছোটে দু'পাশের মহীরুহ ভেদ করে। রক্তিম হয় পশ্চিম গগন। ক্রমে ধীরে ধীরে অস্তাচলে যান দেব দিবাকর, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে দিগন্তে। দৃষ্টি নিবদ্ধ ঘড়ির কাঁটার আর মাইল ফলকের প্রতি। হিসাব করতে থাকি কখন গিয়ে উপনীত হব মথুরায়, দর্শন হবে কি না মথুরানাথের সান্ধ্য আরতি।

হঠাৎ থেমে যায় গাড়ীর গতি, স্থির হয় একেবারে। ড্রাইভার অমর বলে, বন্ধ করে নাই সে গাড়ীর গতি, থেমেছে গাড়ী আপন ইচ্ছায়। নিশ্চয়ই বিকল হ'য়েছে কল। তবে দেরী হবে না নিরাময় হতেও। পৌঁছে যাব আমরা নির্ধারিত সময়েই।

গাড়ী থেকে সবাই একে একে নেমে পড়ি। অমর বনেট উঠিয়ে পরীক্ষা করে তার প্রতিটি অংশ। পায় না কোন দোষ। বনেট নামিয়ে স্টার্ট দেয়, সাড়া দেয় ইঞ্জিন, কিন্তু অগ্রসর হয় না গাড়ী। পিছন থেকে ঠেলি, তবুও অচল। মেকানিক অমর পরীক্ষা করে বারংবার। অবলম্বন করে সব রকমের সম্ভাব্য উপায়, কিন্তু সচল হয় না গাড়ী, অগ্রসর হয় না এক পাও। অতিক্রম করে সময়, মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। উত্তীর্ণ হয় সন্ধ্যা রাত্রির অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে চারিদিক। পরিত্যাগ করতে হয় গাড়ীর সচল হওয়ার সম্ভাবনাও ছেড়ে দিতে হয় তার নিরাময় হওয়ার আশা। দুই পাশে জনহীন প্রান্তর, তার বক্ষ ভেদ করে গিয়েছে মথুরা রোড। ক্রমে থেমে আসে রাস্তার মোটর চলা, শেষে বন্ধ হ'য়ে যায় একেবারে। দর্শন মেলে না কোন পথচারীরও। নীরব, নিস্তব্ধ চারিদিক, এক ভীষণ আতঙ্কে পরিপূর্ণ হৃদয়

আমাদের অন্তঃকরণ। তবুও শেষ নাই অমরের গাড়ী সচল করবার প্রচেষ্টার, তাকে সাহায্য করতে থাকে আমার পুত্র অসিতকুমার।

এমন সময়, পিছন থেকে একখানি লরি এসে আমাদের গাড়ীর পাশে থামে। নেমে পড়ে তার চালক। নামে তার কয়েকজন সঙ্গীও। এগিয়ে আসে তারা যন্ত্রপাতি নিয়ে আমাদের গাড়ীর কাছে। লেগে যায় অমরকে সাহায্য করতে। কিন্তু বিফল হয় তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা। ধরতে পারা যায় না কোন খুঁত গাড়ীর, অথচ থেকে যায় সে নিশ্চল, নির্বিকার।

অতিবাহিত হয় আরও এক ঘণ্টা, মহা উৎকণ্ঠায় আর আতঙ্কে ছেয়ে ফেলে আমাদের অন্তঃকরণ। ভাবতে থাকি ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি। এমন সময় এগিয়ে আসে লরির চালক আমাদের কাছে। বলে, যাচ্ছে তারা মথুরা হ'য়ে গোয়ালিয়রে, লরির পিছনে বেঁধে নিয়ে যাবে আমাদের মোটর, পৌঁছে দেবে গাড়ী সমেত মথুরাতে। আছে নাকি তাদের জানিত একটি ভাল গ্যারাজ আছে মথুরাতে, পৌঁছে দেবে আমাদের মোটর সেই গ্যারাজে। রাজী নয় সে আমাদের এইরকম অবস্থায় এই বিজন মাঠের মধ্যে ফেলে যেতে। ভাবি ভগবানের নির্দেশ। রাজী হয়ে যাই তার প্রস্তাবে, ফেলি স্বস্তির নিশ্বাস। আমার স্ত্রীর ধারণা, সেদিন, আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য, সত্যিই পরিচালকের বেশে, স্বয়ং মথুরানাথ এসে, আমাদের হাত ধরে মথুরায় পৌঁছে দিয়েছিলেন।

কিন্তু কি দিয়ে, আমার মোটর, লরির পিছনে বাঁধা হবে? নাই কোন মোটা দড়ি বা লোহার শেকল তাদের কাছে, নাই আমাদের সঙ্গেও। ছিল আমাদের সঙ্গে হাত কুড়ি নারিকেলের দড়ি। শেষে তাই চারফেরতা করে পাকিয়ে, সেই দড়ি দিয়েই লরির সঙ্গে আমাদের মোটর বাঁধা হয়। কাটে আরও অর্ধ ঘণ্টা।

শেষে সত্যিই সুরু হয় আবার আমাদের যাত্রা। সূচীভেদ্য অন্ধকার, অজানা পথ, নীরব নিস্তব্ধ চতুর্দিক, আমরা মথুরা অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি। আগে আগে চলে লরি; তার পিছনে আমাদের মোটর; ব্যবধান মাত্র চার হাতের। অগ্রসর হ'তে হয় লরির সম গতিতে, আর তার চালকের স্টিয়ারিং অনুসরণ করে। একটু অসাবধানতা, সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম, ছিন্ন

হবে রজ্জু, পড়ে থাকবে আমাদের গাড়ী পথের মাঝখানে, অথবা সংঘাত হবে তার লরির সঙ্গে, বিচূর্ণ হবে গাড়ী। চূর্ণ হবে আমাদের সর্বাঙ্গ, হবে সকলের প্রাণান্ত।

একবার অমরের অন্যমনস্কতায় সত্যিই ছিন্ন হয় রজ্জু, এক ভীষণ ঝাঁকানি খেয়ে, আমাদের মোটর থেমে যায়, এগিয়ে যায় লরি। কিন্তু অতি সতর্ক লরির চালক। জানতে পেরে, অবিলম্বে, লরির গতি থামিয়ে দেয়, পেছিয়ে নিয়ে এসে আমাদের মোটরের সামনে দাঁড় করায়। তারপর, সেই ছিন্ন রজ্জু মেরামত করেই, আবার বাঁধা হয় আমাদের মোটর লরির পিছনে। অতিবাহিত হয় আবার অর্ধ ঘণ্টা। কিন্তু ছোট হয় ব্যবধান, আরও বিপদ সঙ্কুল হয় আমাদের গাড়ীর লরির পিছনে চালান। ভীত শঙ্কিত অমর, জানা নাই তার রাস্তা, সীমাহীন অন্ধকারে অদৃশ্য সামনের লরি। ভাবে পড়েছে কোন ডাকাতের পাল্লায়। কম্পিত হয় তার হস্ত, শিথিল হয় তার মুষ্টি স্টিয়ারিং-এর অঙ্গ থেকে, এগিয়ে যায় মোটর, বেঁচে যায় সংঘাতের হাত থেকে এক চুলের জন্য। ঘটে এই ঘটনা আরও কয়েকবার। এক সীমাহীন আতঙ্কে পরিপূর্ণ হয় আমাদের সকলের অন্তঃকরণ, প্রতীক্ষা করতে থাকি অবধারিত মৃত্যুর, গাড়ীসুদ্ধ সকলের জীবনান্তের।

অবশেষে, রাত্রি এগারটায় আমরা নিরাপদে মথুরার রাস্তা ও মথুরা রোডের সংযোগ স্থলে উপনীত হই। ফেলি মুক্তির নিশ্বাস—মুক্তি সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। গাড়ী থেকে নেমে লরির চালকের সঙ্গে রাস্তার সংলগ্ন গ্যারাজে উপনীত হই। সেখান থেকে একটি সুশ্রী বালককে সঙ্গে নিয়ে আবার গাড়ীতে উঠে বসি। লরি ছাড়ে; সেই সঙ্গে আমাদের গাড়ীও, মাইল খানেক এসে সেই চালকের প্রদর্শিত একটি গ্যারাজের সামনে থামে। গ্যারাজে মোটর রেখে আমরা সকলে লরিতে উঠে বসি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটি হোটেলে উপনীত হই। স্থান মেলে নিচের তলার একটি নাতিপ্রশস্ত ঘরে। লরি চালক তার সঙ্গীদের সাহায্যে আমাদের জিনিসপত্র সেই ঘরে রেখে দিয়ে বিদায় নেয়। অনেক সাধ্যসাধনাতেও, এমন কি মিষ্টি খাওয়ার জন্যও, তাকে একটি পয়সা নিতে রাজী করাতে পারি নি। দেবদূতের মতই তার আবির্ভাব, আবার দেবদূতের মতই কার্য সমাপনান্তে তার প্রস্থান। কিন্তু

রেখে যায় সে এক অক্ষয় স্মৃতি, আমাদের মনের মণিকোঠায় যা আজও হয় নি ম্লান।

বিষ্ণুর অবতার, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি, মহাপুণ্যতীর্থ হিন্দুদের, এই মথুরা, দাঁড়িয়ে আছে যমুনার দক্ষিণ তীরে। জন্মগ্রহণ করেন এই মথুরায় উগ্রসেনের পুত্র, প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি কংসের কারাগৃহে, যাদব বসুদেবের ঔরসে, রাজভগ্নী দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ।

দৈববাণী শোনেন নৃপতি কংস, মৃত্যু বরণ করতে হবে তাঁকে, ভগ্নী দেবকীর পুত্রের হস্তে। তাই যখনই সন্তান-সম্ভাবনা হয় দেবকীর, আবদ্ধ হন তিনি কারাগৃহে। হত্যা করা হয় তাঁর সন্তানকে ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। নিহত হয় তাঁর সম্ভাব্য হত্যাকারী। এবারেও নিক্ষিপ্ত হন দেবকী কারাগৃহে। ঘোর তামসী নিশি, সূচীভেদ্য অন্ধকার, নিস্তব্ধ চারিদিক। শোনা যায় শুধু ঝড়ের রুদ্র গর্জন আর মুহুর্মুহু অশনি সম্পাতের শব্দ। আসন্ন তাঁর সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময়। দ্বারের অপর প্রান্তে, কম্পমান দেহে, উৎকণ্ঠিত অন্তঃকরণে বসুদেব দাঁড়িয়ে। ভূমিষ্ট হয় সন্তান, হন ভগবান বিষ্ণু। দৈব নির্দেশ পান বসুদেব তাঁকে গোকুলে নন্দ গোপের গৃহে নিয়ে যেতে। সন্তানকে বক্ষে ধারণ করে, তিনি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন, নিঃশব্দ পদক্ষেপে উপনীত হন কারাগৃহের দ্বারে। দেখেন নিদ্রিত প্রহরীবৃন্দ। দ্বার অতিক্রম করে নিষ্ক্রান্ত হন কারাগৃহ থেকে, উপনীত হন রাজপথে। আলোড়িত তখন দিগন্ত ঝড়ের উদ্দাম বেগে, শোনা যায় তার প্রলয় নাচনের শব্দ, আকাশের বুক চিরে চমকিত হয় বিদ্যুৎ, উদ্ভাসিত হয় চতুর্দিক। ভ্রূক্ষেপ নাই বসুদেবের, অগ্রসর হন তিনি। অতি দ্রুত তাঁর গতি, উপনীত হন যমুনা-পুলিনে। দ্বিধা বিভক্ত হয় যমুনা তাঁদের আগমনে। রচিত হয় পারাপারের পথ। সেই পথ অতিক্রম করে, উপনীত হন তিনি অপর পারে। উপস্থিত হন নন্দালয়ে। বলেন নন্দ, এই মাত্র তাঁর স্ত্রী যশোদা প্রসব করেছেন একটি কন্যা। বসুদেব ভাবেন, এও ভগবানের নির্দেশ। পরিবর্তিত হয় সন্তান। স্থাপিত হয় দেবকীর নন্দন সংজ্ঞাহীনা যশোদার অঙ্কে। বুকে তুলে নেন বসুদেব তাঁর কন্যাকে। মথুরায় ফিরে এসে, স্থাপন করেন সেই কন্যাকে রোরুদ্যমানা দেবকীর কোলে। তখনও নিদ্রিত রাজপুরী।

প্রভাতে উঠে কংস দেখেন, প্রসব করেছেন দেবকী একটি কন্যা যৌবনে উপনীত হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করেন।

মধ্যমণি শ্রীকৃষ্ণ মহাকাব্য মহাভারতের, অধিপতি মথুরার আর দ্বারকার. এক মহামানব, পুরুষোত্তম। বিবাহ করেন তাঁর বৈমাত্রেয় ভগ্নী সুভদ্রাকে হস্তিনার (বর্তমান মিরাট জেলায়) কুরুবংশের নৃপতি পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জুন। স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যভেদ করে বিবাহ করেন পঞ্চপাণ্ডব, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব, পাঞ্চাল-রাজ দুহিতা দ্রৌপদীকেও। নির্মিত হয় দ্বিতীয় রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে (বর্তমান দিল্লীতে)। রাজ্যের অধিকার নিয়ে মহাসমর হয় পবিত্র কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ মাঠে, পাণ্ডবদের সঙ্গে পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের, দুর্যোধনের শত ভ্রাতার। সহায় হন পাণ্ডব পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ, হন পাঞ্চালরাজও। অপর পক্ষে যোগদান করেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আর ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গ। জয়ী হন পাণ্ডবগণ। প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতে এক ধর্মরাজ্য, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায়। অবসান হয় বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মুখ নিঃসৃত উপদেশ নিয়ে রচিত হয় ভাগবত-গীতা, শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ভারতের।

ধ্বংস হয় যদুবংশের দ্বারকায়, মৃত্যুবরণ করেন শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের শরাঘাতে, দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রস্থান করেন পঞ্চ পাণ্ডব। যাত্রার পূর্বে মথুরা নগরে দূত পাঠিয়ে যদুবংশের একমাত্র বংশধর, কৃষ্ণের প্রপৌত্র, উষা ও অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে আনিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

আছে তার আগেরও এক ইতিহাস। মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে লোনার ষ্ঠ পুত্র, মধু দৈত্য লাভ করেন একটি শূল! মহাদেবের বরে, অবধ্য হবে মধুর পুত্র, যতদিন এই শূল তার হাতে থাকবে। এই বর লাভ করে, মধু াণ করেন একটি অপরূপ সুন্দর নগর, পরিচিত মধুপুরী নামে। মধুর পুত্র বণ দৈত্য লাভ করে সেই শূল, মধুর বরুণালয়ে প্রয়াণের পর। মহা-অত্যাচারী এই লবণ দৈত্য, ত্রিভুবন কম্পিত তার অত্যাচারে। বিঘ্ন হয় তপোবনে মুনি ঋষিদের তপস্যারও। শেষে একদিন ভার্গব, তার অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য, অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপনীত হন। প্রেরিত হন নিষ্ঠে ভ্রাতা শত্রুঘ্ন লবণকে দমন করতে। নিহত হন শূলহীন লবণ শত্রুঘ্নের

হস্তে। নির্মাণ করেন শত্রুঘ্ন মধুপুরীতে একটি সুবর্ণপুরী। পরিচিত হয় সেই পুরী মথুরা নামে। মহাসমৃদ্ধিশালী সেই মথুরা, বাস করেন এসে সেখানে শূরসেনরা। রাজত্ব করেন সেই পুরীতে শত্রুঘ্ন দ্বাদশ বৎসর। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পরিণত হয় মথুরা (শূরসেন) ভারতের ষোড়শ মহাজনপদের—অঙ্গ, কাশী, কোশল, মগধ, বৃজি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অশ্মক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজের অন্যতম।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের আমলে মথুরা মগধের অধীনে আসে। পরিণত হয় মথুরা মহাসমৃদ্ধশালী নগরে, হয় বৌদ্ধ মহাতীর্থেও, কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে। ইউচি নামে এক যাযাবর জাতির শাখা এই কুষাণরা, আদিম অধিবাসী চীনদেশের কানসু প্রদেশের, প্রাধান্য লাভ করেন তাঁরা ভারতবর্ষে, প্রথম কদাফিসের নেতৃত্বে, পহ্লব আর শকেদের শাসনের অবসানে। কণিষ্ক, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, অধিরোহণ করেন কুষাণ সিংহাসনে খুব সম্ভব ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে! স্থাপিত হয় রাজধানী পুরুষপুরে (বর্তমান পেশোয়ারে)। মহাপরাক্রমশালী তিনি, বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা গান্ধার থেকে বিহার পর্যন্ত।

ভারতের বাইরে, মধ্য এশিয়াব মালভূমি পর্যন্ত। কাশ্মীরও তাঁর অধিকারে আসে। পৃষ্ঠপোষক তিনি নাগার্জুন প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মের, শিল্প ও সাহিত্যেরও, নির্মাণ করেন রাজধানী পুরুষপুরে, বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর একটি মহা-মহিমময় চৈত্য, বুকে নিয়ে অপরূপ, সুন্দরতম গান্ধার স্থাপত্যের নিদর্শন, গ্রীকের অঙ্গ সৌষ্ঠবতা আর ভারতের পেলবতা ও আধ্যাত্মিকতা। নির্মিত হয় কাশ্মীরে, কণিষ্কপুরে আর মথুরায় বহু সংঘারাম (বিহার), হয় বহু সুদৃশ্য হর্ম্যও। অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রণেতা চরক, দার্শনিক নাগার্জুন আর অশ্বঘোষ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই অশ্বঘোষ, খ্যাতি-লাভ করেন তিনি একাধারে, কবি, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ, দার্শনিক ও ধর্মাচার্যরূপে। রচনা করেন তিনি বহু গ্রন্থ, শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে বুদ্ধচরিত আর সূত্রালঙ্কার। তেইশ বৎসর রাজত্ব করে কণিষ্ক পরলোকে গমন করেন।

রাজত্ব করেন একে একে বাশিষ্ক আর হুবিষ্ক। নির্মাণ করেন হুবিষ্ক একটি সুন্দরতম সঙ্ঘারাম মথুরাতে, অঙ্গে নিয়ে প্রকৃষ্টতম শিল্পসম্ভার। বাসুদেব শেষ

উল্লেখযোগ্য রাজা এই বংশের কুষাণ আধিপত্যের ভারতে অবসান হয় কুষাণ ক্ষমতার, পরিসমাপ্তি হয় তৃতীয় শতকে। গুপ্তরা অধিকার করেন তাঁদের সাম্রাজ্য।

মহাপরাক্রান্ত এই গুপ্ত সম্রাটরা, রাজত্ব করেন মগধে প্রবল প্রতাপে ৩২০ থেকে ৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। শ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যে সমুদ্র গুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য, আর স্কন্ধগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। বিস্তৃত তাঁদের রাজ্যের সীমানা, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ, দক্ষিণে নর্মদা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র আর পশ্চিমে আরব সাগরের উপকূল পর্যন্ত। আসে তাঁদের অধিকারে পশ্চিম উপকূলের সুপ্রসিদ্ধ বন্দর ভৃগুকচ্ছ আর সূর্পারক। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় ভারত বৈদেশিক বাণিজ্যে, উপনীত হয় চরমে। বিদ্বান গুপ্তসম্রাটরা নিজেরা, পৃষ্ঠপোষক বিদ্যার, সংস্কৃতির আর শিল্পের, উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে উপনীত হয় ভারতের শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কন, হয় ভারতের সঙ্গীত, বিজ্ঞান, ধর্ম আর দর্শন। লাভ করে পূর্ণ পরিণতি ভারতের মনীষা, ভারতের সংস্কৃতি আর কৃষ্টি। রচিত হয় শ্রেষ্ঠ স্বর্ণযুগ ভারতে। পরিণত হয় ভারত এশিয়ার সভ্যতার আর সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে।

বপন করেন যে বীজ গান্ধারে, গ্রীক আর বৌদ্ধ মহাযান স্থপতি, তাঁদের যুক্ত প্রচেষ্টায়, পরিণত করেন সেই বীজ মহীরুহে, মথুরাতে, পবিত্রতীর্থ বৌদ্ধদের, মহাতীর্থ হিন্দু আর জৈনদেরও, কুষাণ ও গুপ্ত সম্রাটরা। রচিত হয় কত বৌদ্ধ মহামহিমময় চৈত্য, হয় অসংখ্য সঙ্ঘারাম। নির্মিত হয় বহু জৈন বস্তি (মন্দির)। তাদের অঙ্গে শোভা পায় অনবদ্য, সুন্দরতম শিল্প-সম্ভার আর সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত মূর্তিসম্ভার। রচিত হয় পরবর্তীকালে কত হিন্দুমন্দির, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের নিদর্শন। নির্মিত হয় কেশবদেবের মহামহিমময় মন্দির বুকে নিয়ে অলিন্দ আর শিখারা। ধ্বংসে পরিণত করেছেন সেই মন্দির মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেব, স্থানান্তরিত করেছেন বিগ্রহ নাথদ্বারে মেবারের রাণা রাজসিংহ। এখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতে। তাই এই বৈশিষ্ট্য মথুরার, পরিণত হয় মথুরা ভারতের মন্দিরময় নগরে। বুকে নিয়ে আছে তার নিদর্শন তোরণের অঙ্গ, প্রবেশ পথের ধ্বংসাবশেষ আর সঙ্ঘারামের রেলিং, আবিষ্কৃত হ'য়েছে মথুরাতে। বুকে নিয়ে

ছিল এই মথুরাই, তেইশ ফুট আট ইঞ্চি উচ্চ ছয় টন ওজনের সুপ্রসিদ্ধ লৌহ স্তম্ভটি, শীর্ষে নিয়ে ছিল গরুড়ের মূর্তি। স্থাপিত এখন এই স্তম্ভটি দিল্লীতে, কুতবের প্রাঙ্গণে, নীলাকাশের নিচে। অম্লান, মসৃণ তার অঙ্গ, দাঁড়িয়ে আছে অগ্রাহ্য করে প্রকৃতির সহস্র বৎসরের নির্মম অত্যাচার—অপূর্ব দান ভারতের লৌহ-কারের, পরম বিস্ময় বিশ্বের লৌহকারের আর বৈজ্ঞানিকের। নির্মাণ করেন এই স্তম্ভটি গুপ্ত সম্রাট কুমার গুপ্ত ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে।

পতন হয় মগধের গুপ্ত সম্রাটদের ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে, মথুরা মৌখরি রাজাদের অধীনে আসে। বিবাহ হয় শেষ মৌখরিরাজ গ্রহবর্মণের সঙ্গে থানেশ্বররাজ প্রভাকর বর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর। পরাজিত ও নিহত হন গ্রহবর্মণ গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের হাতে, মৌখরি রাজ্য থানেশ্বরের প্রভাকর বর্ধনের পুত্র, হর্ষবর্ধন শীলাদিত্যের অধীনে আসে। মথুরা আসে থানেশ্বরের অধীনে।

মহাপরাক্রমশালী হন আর্যাবর্তে গুর্জর-প্রতিহার বংশের রাজারা, কনৌজে স্থাপিত হয় তাঁদের রাজধানী, মথুরা গুর্জর-প্রতিহার সম্রাটদের অধীনে আসে।

শাখা গুর্জরের, তাঁরা প্রবেশ করেন হূন জাতির সঙ্গে ভারতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষার্ধে মধ্য-এশিয়া থেকে। পাঞ্জাব অতিক্রম করে আসেন, বসতি স্থাপন করেন রাজস্থানে, মাড়বারে বর্তমান যোধপুরে। বলেন তাঁরা নিজেরা, সূর্য বংশীয় ক্ষত্রিয় ইক্ষ্বাকু বংশোদ্ভব তাঁরা, অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণের বংশধর।

তাঁরা রাজপুতনা থেকে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়ে দক্ষিণে ও পূর্বে অগ্রসর হন। রাজত্ব স্থাপন করেন ভৃগুকচ্ছে আর মালবে। হরিশ্চন্দ্র, প্রতিষ্ঠাতা এই বংশের ভিন্‌মালে স্থাপন করেন তাঁর রাজধানী।

৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম নাগভট্ট পত্তন করেন এক নতুন প্রতিহার রাজবংশ মালবে। শিপ্রা নদী তীরে উজ্জয়িনীতে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী। মহা পরাক্রমশালী তিনি রাজত্ব করেন ৭২৫ থেকে ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর কাছে পরাজয় বরণ করেন সিন্ধুর আরবরা, প্রতিহত হয় তাদের উত্তর ভারতে প্রবেশ। তাঁর বিজয় অভিযান অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী রাজ্য।

পরাক্রমশালী তার পরবর্তী রাজা বৎসরাজও, অলঙ্কত করেন প্রতিহার সিংহাসন ৭৭৫ থেকে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি প্রভুত্ব স্থাপন করেন গুর্জরদের বিভিন্ন শাখার উপর, হন একচ্ছত্র অধিপতি সমস্ত গুর্জর রাষ্ট্রের। পরাজিত করেন বাংলার পালশ্রেষ্ঠ ধর্মপালদেবকে। কিন্তু নিজে পরাজয় বরণ করেন রাষ্ট্রকূট অধিপতি ধ্রুবের কাছে, সুরু হয় উত্তরাপথের প্রাধান্য নিয়ে প্রতিহার, পাল ও রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

প্রবল পরাক্রান্ত বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্টও, অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, অলঙ্কত করেন সিংহাসন ৮০০ থেকে ৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর বিজয় অভিযান অতিক্রম করে কনৌজ। তাঁর কাছে পরাজয় বরণ করেন কনৌজ নৃপতি চক্রায়ুধ। কনৌজে স্থানান্তরিত হয় প্রতিহার রাজধানী। নতি স্বীকার করেন তাঁর কাছে সিন্ধু, অন্ধ্র ও বিদর্ভের অধিপতিরা। পুনরুদ্ধৃত হয় প্রতিহারের লুপ্ত গৌরব। বিস্তৃত হয় রাজ্যের সীমানা পশ্চিমে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে পূর্বে বঙ্গদেশের সীমান্ত পর্যন্ত। সাম্রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে প্রতিহার রাজ্য। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নয় এই বিজয়ের গৌরব। তিনি পরাজয় বরণ করেন রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নিকট, রুদ্ধ হয় গতি তাঁর বিজয়বাহিনীর, প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। কীর্তিহীন তাঁর পুত্র রামভদ্র।

অধিরোহণ করেন প্রতিহার সিংহাসনে দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র মিহির ভোজ ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, রাজত্ব করেন ৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি এই বংশের তিনিও, মহাপরাক্রমশালী, তাঁর বিজয় অভিযান অতিক্রম করে জেজাকভুক্তি বর্তমান বুন্দেলখণ্ড, করে মগধের সীমান্ত পর্যন্তও। তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেন বাংলার পাল রাজা। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা পশ্চিমে কাথিয়াবাড় ও পাঞ্জাবের কর্ণাল পর্যন্ত। কিন্তু প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে তাঁর বিজয়বাহিনী। রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব প্রতিহত করেন। মুখর তাঁর প্রশংসায় আরব পর্যটক সুলেমান।

প্রবল পরাক্রান্ত তাঁর পুত্র মহেন্দ্র পালও, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, অলঙ্কত করেন প্রতিহার সিংহাসন ৮৮৫ থেকে ৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরাজিত হন তাঁর কাছে বাংলার অধিপতি নারায়ণ পাল। বিস্তৃত হয় তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা মগধ পর্যন্ত, হয় উত্তর বঙ্গেও। উপনীত হয় প্রতিহার ক্ষমতা, তার

ঐশ্বর্য উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। পৃষ্ঠপোষক সাহিত্য ও সংস্কৃতির, অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা "কর্পূরমঞ্জরী" নাটক রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ কবি রাজশেখর। শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির আর শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় রাজধানী কনৌজ।

রাজত্ব করেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ভোজ ৯১০ থেকে ৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি সিংহাসনচ্যুত হন ভ্রাতা মহীপাল কর্তৃক। রাজত্ব করেন মহীপাল ৯১২ থেকে ৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অক্ষত থাকে রাজ্যের সীমানা কিছুদিন। শেষে তিনি পরাজয় বরণ করেন রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় ইন্দ্রের কাছে। হস্তচ্যুত হয় রাজধানী মহাসমৃদ্ধিশালী কনৌজও। প্রশমিত হতে থাকে তাঁদের ক্ষমতা—শেষে অস্তমিত হয়ে যায় একেবারে। স্বাধীনতা ঘোষণা করেন একে একে জেজাক-ভুক্তির চন্দেল্লরা, চেদির (মধ্যপ্রদেশের) কলচুরীরা, মালবের পরমারেরা, সৌরাষ্ট্রের (গুজরাটের), চৌলুক্যরা ও বাঘেলারা আজমীরের চাহমান বা চৌহানরা আর কনৌজের গহড়বালরা—সকলেই রাজপুত। অবসান হয় উত্তর ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত শেষ হিন্দু-সাম্রাজ্যের, এক প্রতিভাবান, মহাশক্তিশালী কীর্তিমান রাজবংশের। পরিসমাপ্তি হয় আরবদের ভারতে এক প্রতিরোধকারীর, ইস্‌লামের এক প্রবলতম শত্রুর, এক সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকের, এক মহাগৌরবময় যুগের। সুরু হয় রাজপুত অভ্যুত্থান ভারতে।

গুর্জর-প্রতিহারদের পতন হলে, একাদশ শতকের মধ্যভাগে মথুরা কনৌজের গহড়বাল রাজপুতদের অধীনে আসে। অধিকারে আসে চৌহান বা চাহমান রাজপুত রাজাদেরও। পরাজিত ও নিহত হন শেষ চৌহান নৃপতি তৃতীয় পৃথ্বীরাজ, ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে, মহম্মদ ঘুরির হাতে, মথুরা মুসলমানদের অধীনে আসে। সুরু হয় ভারতে মুসলমান শাসন। স্থাপিত হয় রাজধানী দিল্লীতে।

দুর্ভাগ্য ভারতের, ধ্বংসের লীলা সঙ্গে নিয়ে আসে মুসলমান আক্রমণ-কারীরা, সঙ্গে নিয়ে আসে মুসলমান বিজেতারাও। এক গজনীর সুলতান মামুদই ধ্বংস করেন দশ সহস্র মন্দির। তাঁর অনুসরণ করেন কুতবুদ্দিন, সিকান্দার লোদি, ঔরংজেব ও আরও অনেকে। ধ্বংসে পরিণত হয় মথুরাতে কুষাণ রাজাদের মহামহিমময় অতুলনীয় কীর্তি, বুকে নিয়ে ভারতের ঋষির

অমূল্য দান, কত অমূল্য সম্পদ, কত শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভারতীয় স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের। নিশ্চিহ্ন হয় গুপ্ত রাজাদের তৈরী অসংখ্য মন্দির আর জৈন বস্তিও, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ মূর্তিসম্ভার—কত সহস্র বৎসরের স্থপতির ও ভাস্করের সাধনার দান। আজ হারিয়েছে মথুরা তার পূর্ব-গৌরব, পরিণত হয়েছে এক কীর্তিহীন, সমৃদ্ধিহীন শহরে। অবশিষ্ট আছে শুধু তার যমুনাপুলিনের বিশ্রাম ঘাট। কংসকে হত্যা করে, এই ঘাটে এসেই বিশ্রাম করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। আজও প্রতিহত হয় তার পাষাণ সোপান শ্রেণীতে নীল যমুনার তরঙ্গ, শোনা যায় তার অন্তরের ধ্বনিও। আজও প্রতি সন্ধ্যায় মথুরা বাসিনীরা তার নীল বক্ষে জলন্ত প্রদীপ জ্বালায়। বুকে নিয়ে আছে কেশব দেবের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও।

ভোরে উঠে, চা ও জলযোগ সেরে, অমরের জিম্মায় গাড়ী রেখে, দুই সাইকেল রিক্সাতে চড়ে, আমরা বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হই। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যের ও কৈশোরের লীলাভূমি এই বৃন্দাবন, বিস্তৃত হ'য়ে আছে চুরাশি ক্রোশ পরিধি নিয়ে। সুরু হয় তার পরিক্রমা বৃন্দাবন থেকে। যেতে হয় মথুরার ভূতেশ্বর হ'য়ে মধুবন তালবন, কুমুদবন, শান্তনুকুণ্ড আর বহুলাবন হ'য়ে রাধা-কুণ্ডে। রাধাকুণ্ড থেকে শ্যামকুণ্ড হয়ে গিরিগোবর্ধন। সেখান থেকে লাঠাবন হয়ে বদরিনারায়ণে, কাম্যবনে, নাগার কদম খণ্ডিতে, সনেরারে আর শ্রীমতী রাধিকার জন্মস্থান বর্ষাণে। বর্ষাণ থেকে সঙ্কেত হ'য়ে নন্দগ্রামে। সেখান থেকে যাবট, কোকিলবন, বৈঠান, চরণ পাহাড়ী দর্শন করে, কোটবন হয়ে শেষশায়ী। সেখান থেকে মেলবন হয়ে রাম ঘাট, অক্ষয় বট, চীর ঘাট ও নন্দ ঘাট। তার পর যমুনা অতিক্রম করে, ভদ্রবন, ভাণ্ডীবন, মাঠবন, মান সরোবর, লৌহবন, বলদেব দেখে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, মহাবন আর গোকুল। গোকুল দর্শন করে, ফিরে আসতে হয় মথুরাতে, ভূতেশ্বরে। পরিসমাপ্ত হয় পরিক্রমা।

মহাপুণ্যভূমি এই বৃন্দাবন, পরিচিত ব্রজমণ্ডল বা ব্রজধাম নামেও, পবিত্র তীর্থ সাধুসন্তদের, প্রকৃষ্টতম তপস্যার স্থান মহাতপস্বী আর সাধু মহাত্মাদেরও, পরিণত হয় হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে আর দুর্জনের আবাস স্থলে, দিল্লীর মুসলমান বাদশাহদের অত্যাচারে।

অত্যাচারে আর অনিয়মে ছেয়ে ফেলে সমস্ত ভারত, এক সীমাহীন

দুর্নীতির স্রোতে প্লাবিত হয় তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত, আবির্ভূত হন নবদ্বীপে ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায়, যুগাবতার, প্রেমিকশ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। পিতা তাঁর—জগন্নাথ মিশ্র, মাতা—শচীদেবী। বিতরণ করেন তিনি প্রেমের বাণী ভারতের দিকে দিকে—বাঙ্গালায়, উড়িষ্যায় আর দক্ষিণ ভারতে। ধন্য হয় কত পাপী-তাপী তাঁর চরণ স্পর্শে, কৃতার্থ হয় তাঁর প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গনে।

এক তীব্র বাসনা জাগে তাঁর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্থল বৃন্দাবন আবিষ্কারের। শুধু একজন ভক্ত সঙ্গে নিয়ে, তিনি উন্মত্ত আবেগে, প্রেম বিতরণ করতে করতে, পদব্রজে হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল মহারণ্য অতিক্রম করে মথুরাতে উপনীত হন। সেদিন ছিল ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দ, বাদশাহ্ সিকান্দার আলি তখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বিশ্রামঘাটে স্নান করে কেশব দেবের মন্দির দর্শন করে, তিনি ব্রজধামে উপস্থিত হন। ঢল ঢল তাঁর স্বুবর্ণ অঙ্গের লাবণি, মুখে কৃষ্ণ নাম বুলি, আবিষ্ট তিনি এক দিব্য ভাবাবেশে। আত্মবিস্মৃত কখনও তিনি গাভীর হাম্বারব শুনে, কখনও ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য দেখে, সংজ্ঞাহীন কৃষ্ণলীলার উদ্দীপনায়। বিচরণ করেন তিনি ব্রজমণ্ডলের বনে উপবনে প্রাচীন লুপ্ততীর্থের সন্ধানে। এমনই করেই তিনি পুনরুদ্ধার করেন শ্রীমতী রাধারাণীর স্মৃতিসমৃদ্ধ রাধাকুণ্ড।

ফিরবার পথে, তিনি মহাতীর্থ প্রয়াগে কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। এইখানেই তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদ, শ্রীরূপ এসে তাঁর চরণে পতিত হন। গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের প্রাক্তন সচিব এই রূপ, ভূষিত সাকর মল্লিক উপাধিতে, স্নুকবিও, আত্মসমর্পণ করেন মহাপ্রভুর কাছে। তাঁকে কিছুদিন কাছে রেখে, ব্রজরসতত্ত্বে অভিজ্ঞ করে, বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন।

লুটিয়ে পড়েন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসনাতনও, প্রভুর পদতলে মহাতীর্থ বারাণসী ধামে। মহাপণ্ডিত তিনি, অতি প্রিয় পাত্র বাদশাহের, প্রধান অমাত্যও, দবির খাস নামে খ্যাত। ব্রজমণ্ডলীর অন্যতম স্তম্ভ, পরিণত হন তিনিও অন্তরঙ্গ পার্ষদে, প্রেরিত হন ব্রজধামে। তাঁরাই একে একে পুনরুদ্ধার করেন ব্রজমণ্ডলের লুপ্ত তীর্থগুলি। আবার লাভ করে বৃন্দাবন জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ স্থান, পরিণত হয় মহাতীর্থে, ছড়িয়ে পড়ে তার মহিমা দিকে দিকে।

দু'পাশের বন্ধুর প্রান্তর ভেদ করে, সর্পিল গতিতে চলে পথ। আমরা রিকসায় চড়ে সেই পথ অতিক্রম করি। মাঝে মাঝে দেখা যায় লতাগুল্মে আবৃত অনুচ্চ বৃক্ষের শ্রেণী, দেখি কণ্টকগুচ্ছও। চালক বলে, এই ত গোচারণের মাঠ। এইখানে চরাতেন ধেনু, সঙ্গী পরিবৃত হয়ে ব্রজের রাখাল। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একে একে কত কাহিনী—বধ করেন ব্রজের রাখাল অনার্যা পুতনা রাক্ষসীকে, পদ দলিত করেন সহস্র ফণাযুক্ত কালিয়-নাগকে—অপহরণ করেন ননী মা যশোদার ভাণ্ডার থেকে, বিবসনা করেন স্নানরতা ষোড়শ গোপিনীকে, লুকিয়ে রাখেন তাদের বসন কদম্বের ডালে।

রিকসা গোবিন্দদেবের মন্দিরের সামনে এসে থামে। নির্মাণ করেন এই বর্তমান মন্দিরটি ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে, অম্বরের অধিপতি মানসিংহ, মহামতি আকবরের রাজত্ব কালে। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি নাগর স্থাপত্যের শেষ নিদর্শন।

মহাপ্রস্থান করেছেন পঞ্চ পাণ্ডব, সঙ্গে নিয়ে দ্রৌপদীকে, ইন্দ্রপ্রস্থের ও মথুরার সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছেন বৃষ্ণি বংশের একমাত্র বংশধর ঊষা-অনিরুদ্ধ সুত বজ্রনাভ। মহাসমৃদ্ধিশালী তখন মথুরা, ভাগবৎধর্মের স্রোত প্রবাহিত সারা মথুরায়। একদিন পুত্র বজ্রকে ডেকে, মাতা ঊষা শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্তি গড়বার জন্য আদেশ করেন। নির্মিত হয় একটি মূর্তি। মাতা বলেন শুধু আননটিই শ্রীকৃষ্ণের মুখের অনুরূপ হয়েছে, বিভিন্ন অন্য অঙ্গ। রচিত হয় দ্বিতীয় মূর্তি, বলেন মাতা সাদৃশ্য আছে বক্ষস্থলের, নাই আর কোন অঙ্গের। নির্মিত হয় তখন তৃতীয় মূর্তি, মাতা বলেন সাদৃশ্য আছে শুধু চরণ যুগলের। তখন মাতৃ আদেশে, প্রতিষ্ঠিত হন তিনটি বিগ্রহই, পরিচিত শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ আর মদনগোপাল নামে বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানে।

তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন মথুরাতে কেশবদেব, গোবর্ধনে হরিদেব ও মহাবনে বলদেবের বিগ্রহ। প্রতিষ্ঠিত হন আরও অনেক দেবতা ও দেবী বৃন্দাবনে, মথুরাতে ও আরও অনেক স্থানে হন সাক্ষীগোপাল, গোপীনাথ গোপাল, মদনগোপাল আর শ্রীগোপাল —হন গোপেশ্বর আর ভূতেশ্বর—হন বৃন্দাদেবী ও কাত্যায়নী দেবী, মহাবিদ্যাও হন।

নির্মিত হয় বৃন্দাবনে পাঁচটি মন্দির, বুকে নিয়ে নাগর স্থাপত্যের নিদর্শন—গোবিন্দদেব, রাধাবল্লভ, গোপীনাথ, যুগলকিশোর আর মদনমোহন বা মদন গোপালের মন্দির। সবগুলিই লাল বেলে পাথরের তৈরী, অঙ্গে নিয়ে আছে বৃন্দাবনের স্থাপত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম তাদের মধ্যে গোবিন্দদেবের মন্দির, বিশালতমও। ছিল এই মন্দিরের শীর্ষদেশে একটি মূল শিখর বা চূড়া, আর চারিটি অঙ্গশিখর। দেখা যায় তার সর্বোচ্চ শিখারার শীর্ষদেশের আলোক—দূর, দূরান্তর থেকে। দেখেন বাদশাহ ঔরঙ্গজেব দিল্লীতে বসে। উজীরকে আদেশ করেন চূড়া ভেঙে ফেলতে, ধ্বংস করতে মন্দির। ধ্বংসে পরিণত হয় সবগুলি চূড়াই, বিচূর্ণ হয় মন্দিরের গর্ভগৃহ ; ধ্বংসাবশেষ দিয়ে রচিত হয় মসজিদ, সেই মসজিদে উপাসনা করেন বাদশাহ ঔরঙ্গজেব। পলায়ন করেন মন্দিরের পুরোহিত, বিগ্রহ বুকে নিয়ে অম্বরে। আজও জয়পুরে মন্দিরে, পূজিত হন গোবিন্দজী। স্থান লাভকরেন নতুন বিগ্রহ এই মন্দিরে।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখি, দাঁড়িয়ে আছে শুধু মহামণ্ডপটি, একটি বৃহৎ ক্রুশের আকৃতিতে। তার পূর্বপ্রান্তে রচিত হয়েছে মন্দিরের গর্ভগৃহ। বিস্তৃত ছিল এই কোণ থেকেই মন্দিরের আদি গর্ভগৃহ, এখন পরিণত হয়েছে ধ্বংসে, অদৃশ্য হয়েছে একেবারে। অনুরূপ গ্রীক ক্রুশের এই মণ্ডপটি, দৈর্ঘ্য ১১৭ ফুট, প্রস্থে ১০৫। অনক্ষত ছিল যখন এই মন্দিরটি, তার দৈর্ঘ্য ছিল ১৭৫ ফুট। নাই কোন বিশেষ পার্থক্য এই মন্দিরের বহিভাগের নির্মাণ পদ্ধতির সঙ্গে অপর বৃহৎ নাগর মন্দিরের বহিভাগের। সাদৃশ্য আছে গোয়ালিয়রের শাশ-বহুর মন্দিরের সঙ্গে। কিন্তু অভিনব এই মন্দিরের ভিতরের নির্মাণ পদ্ধতি, মেলে না তার অঙ্গের অলঙ্করণও পূরবর্তী নাগর মন্দিরের সঙ্গে, প্রভাব ভারতের ইসলাম স্থাপত্যের।

নাই কোন মূর্তিসম্ভার এই মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে, ব্যতিক্রম হিন্দু স্থাপত্যের। খুব সম্ভব আকবরের ভীতিতেই, দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে শোভিত করেন নাই এই মন্দির। কিন্তু অপরূপ এই মণ্ডপের স্থাপত্য—এর অলিন্দ, বন্ধনীযুক্ত খিলানের নিম্নস্থ পথ, সুন্দরতম পোস্তা, প্রশস্ত ছাইচ আর অলঙ্করণ সমৃদ্ধ প্রাচীর। হয় এক অপরূপ সমন্বয় এক অনবদ্য সুসামঞ্জস্য। অপর হিন্দু

মন্দিরের ছাদের মত নিচু নয় এই মণ্ডপের ছাদ, রচিত হয় সুউচ্চ খিলানযুক্ত গম্বুজ পরস্পর বিভক্ত সূক্ষ্মাগ্র খিলানযুক্ত তোরণ দিয়ে। নাই এই বৈশিষ্ট্য অন্য নাগর মন্দিরে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

গোবিন্দজীর মন্দির দেখে, আমরা মদনমোহনের মন্দিরে উপনীত হই। কৃষ্ণদাস, বৃন্দাবনে পরিচিত রামদাস নামে, এক মূলতানবাসী বণিক। বাণিজ্য সম্ভারে নৌকা ভরতি করে, যমুনার বক্ষ অতিক্রম করে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হন। রুদ্ধ হয় তাঁর নৌকার গতি বৃন্দাবনের কালিয়দহের ঘাটে এসে আবদ্ধ হয় চড়ায়। অতিবাহিত হয় তিন দিন বিফল হয় বণিকের সমস্ত প্রচেষ্টা, অগ্রসর হয় না নৌকা এক তিল। অবশেষে; তিনি সনাতন গোস্বামীর শরণাপন্ন হন। প্রার্থনা করেন সনাতন দেবতা মদনগোপালের কাছে। অনুগ্রহ হয় দেবতার। ফিরে পায় গতি বণিকের নৌকা। আগ্রাতে বাণিজ্য-সম্ভার বিক্রয় করে ফিরে আসে বণিক। সমর্পণ করে বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ সনাতনের হস্তে। সেই বিপুল অর্থ দিয়েই নির্মিত হয় এই মন্দির। সাতান্ন ফুট দীর্ঘ এই মন্দিরের অন্তর্মধ্যভাগ, কুড়ি ফুট প্রস্থ এই মন্দিরের নাটমণ্ডপটি, আর বাইশ ফুট উচ্চ গর্ভগৃহের ছাদ। তার উপরে রচিত হয় একটি পঁয়ষট্টি ফুট উচ্চ ক্রমহ্রস্বায়মান সূক্ষ্মাগ্র শিখারা, অঙ্গে নিয়ে কয়েকটি তির্যক সুপ্রশস্ত বন্ধনী। রচিত হয় বন্ধনীর ফাঁকে ফাঁকে, শিখারার গাত্রে, বহু ক্রমশীর্ণমান অগভীর প্রকোষ্ঠ, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার। সবার উপরে শোভা পায় একটি শিরাযুক্ত, সুবৃহৎ, বৃত্তাকার আমলকশিলা।

নাই এমন শিখারা অন্য নাগর মন্দিরে, বৈশিষ্ট্য তারা বৃন্দাবনের স্থাপত্যের, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। ঔরঙ্গজেবের ভীতিতে স্থানান্তরিত হয় এই মন্দিরের বজ্রনাভের তৈরী মদন গোপালের বিগ্রহও জয়পুরে, সেখান থেকে করৌলিতে। সেখানে করৌলিরাজ গোপাল সিং একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। আজও বিরাজ করেন সেই মন্দিরে মদনমোহন।

সেখান থেকে আমরা গোপীনাথের মন্দিরে উপনীত হই। শেখাবতীর কচ্ছবাহ-ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতার পৌত্র রায় সিংহ, গোস্বামীদের তত্ত্বাবধানে এই সুবৃহৎ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে হলদিঘাটের অভিযানে যাত্রার পূর্বে, তিনি আকবরের সঙ্গে বৃন্দাবনে এসে

গোপীনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন। ভগ্নাবস্থায় পরিণত হয়েছে এই প্রাচীন মন্দিরটি, ধ্বংস হয়েছে তার মহামণ্ডপ। বাঙ্গালী কায়স্থ নন্দকুমার ঘোষ, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান মদমোহনের মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

উপনীত হই কেশি ঘাটে। মুগ্ধ হয়ে দেখি যুগলকিশোরের মন্দিব, অন্যতম প্রাচীনতম মন্দির বৃন্দাবনের, সুন্দরতমও। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে, কচ্ছবাহু ঠাকুর রায় সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নোন্‌করণ এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। যুক্ত হয় এই মন্দিরের পঁয়ত্রিশ ফুট ব্যাস দেউল একটি আয়তক্ষেত্র মহামণ্ডপের সঙ্গে। চতুষ্কোণ, সতের ফুট চৌরস এই মন্দিরের গর্ভগৃহটি, চতুষ্কোণ মহামণ্ডপের অভ্যন্তর ভাগও। অপরূপ এই মহামণ্ডপের খিলানেব শিল্পসম্ভার, পবিচায়ক শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যজ্ঞানের। খিলানের নিচে, রচিত হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, তার অঙ্গে মূর্তি দিয়ে গিরিগোবর্ধনধারীর গোবর্ধন-লীলাব কাহিনী, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। অপরূপ, সুন্দবতম এই মন্দিরের পূর্ব প্রবেশপথের শিল্পসম্ভারও। অঙ্গে নিয়ে আছে ক্রমহ্রস্বায়মান চূড়া, সুপ্রশস্ত বন্ধনী, শীর্ষে, মহিমময় বৃত্তাকার আমলক শিলা। দেখি মুগ্ধ হয়ে।

রামজীর মন্দির দেখে, আমরা রাধাবল্লভজীর মন্দিরে উপনীত হই। নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে, রাধাবল্লভ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হরিবংশ গোঁসাই, সুন্দরদাসের অর্থে। বৃন্দাবনের পাঁচটি প্রাচীনতম মন্দিবের অন্যতম, বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিবটিও নাগর স্থাপত্যের শেষ নিদর্শন।

তারপর শ্রীরঙ্গজীর মন্দির—পরিচিত শেঠের মন্দির নামেও। প্রসিদ্ধ ধনকুবের শেঠ লখমির্চাদ তেক্কলই-এর অপূর্ব কীর্তি এই মন্দিরটি, নির্মিত পরবর্তী কালে, বুকে নিয়ে আছে, উত্তর ভারতে, দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন। শোভিত হয়ে আছে তার প্রবেশ পথ অনবদ্য, সুন্দরতম শিল্প সম্পদে ভূষিত গোপুরম দিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে একটি স্বর্ণনির্মিত গরুড় স্তম্ভও, বাহন দেবতা শ্রীরঙ্গজীর। সোনার তাল গাছ নামে পরিচিত এই স্তম্ভটি।

সেখান থেকে শাহজীর মন্দিরে উপনীত হই। শ্বেতমার্বেল প্রস্তরে তৈরী এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে সুন্দরতম শিল্পসম্ভার আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ—দেখি মুগ্ধ হ'য়ে।

সেখান থেকে কৃষ্ণচন্দ্রমার বৃহৎ মন্দিরে যাই। নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি পাইকপাড়ার ত্যাগী ভূস্বামী কায়স্থ কুলতিলক কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, পরিচিত লালাবাবু নামে—পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে।

লালাবাবুর কুঞ্জ দেখে আমরা জয়পুররাজ প্রতিষ্ঠিত নবমন্দিরে উপস্থিত হই। শ্বেতমার্বেল প্রস্তরে নির্মিত এই মন্দিরটিও, বুকে নিয়ে আছে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার।

নিকুঞ্জ বনে উপনীত হই। নিত্য লীলাস্থল শ্রীকৃষ্ণের এই নিকুঞ্জবন। বৃক্ষরূপধারী মহাতপস্বীরা অবনতমস্তকে দর্শন করেন সেই নিত্য লীলা, অদৃশ্য লোক চক্ষুর।

যমুনাপুলিনে গিয়ে বস্ত্রহরণের ঘাট দেখে, আমরা কুঞ্জবিহারীর মন্দিরে উপনীত হই। হরিদাসপুরের মহাধনী জ্ঞানধীরের পৌত্র সাধু হরিদাস এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—তুলনাহীন তাঁর প্রেম ভক্তি, অপরিসীম তাঁর ত্যাগ। নিক্ষেপ করেন তিনি স্পর্শমণি-যমুনার জলে। বাস করেন তিনি বৃন্দাবনে। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ মিঞা-তানসেন তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য, তাঁর দর্শনে ধন্য হন মহামতি আকবরও। তাঁরই উপাস্য দেবতা এই কুঞ্জবিহারী। সত্তর হাজার টাকা ব্যয়ে তাঁর শিষ্যেরা এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। অপরূপ এই মন্দিরের অঙ্গের অলঙ্করণও, নিদর্শন প্রকৃষ্টতম শিল্প নৈপুণ্যের। দেখি মুগ্ধ হয়ে। আসেন দলে দলে যাত্রী—কৃতার্থ হন বিহারীজীকে দর্শন করে।

এই মন্দিরগুলি ছাড়াও বুকে নিয়ে আছে বৃন্দাবন বহুশত মন্দির, আর অসংখ্য কুঞ্জ, বিস্তৃত হয়ে আছে তার পথের দুই পাশে—তার বনে উপবনে। নাই সে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ বামেতে নিয়ে রাইবিনোদিনী, নাই ষোড়শ গোপিনীর দলও। কিন্তু আজও ছড়িয়ে আছে তার স্মৃতি, তার শত শত মন্দিরে, তার সহস্র কুঞ্জে, তার অসংখ্য বনে, উপবনে, তার প্রতিটি ধূলিকণায়। আমরা সেই মহাপবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে প্রণতি জানিয়ে মথুরাতে ফিরে আসি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরিদ্বার

১।	দক্ষেশ্বরের মন্দির	২।	সর্বনাথদেবের মন্দির
৩।	মায়াদেবীর মন্দির	৪।	হৃষীকেশের মন্দির
৫।	ভরতের মন্দির	৬।	লক্ষ্মণের মন্দির

বিশে নভেম্বর ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। ভোর সাড়ে পাঁচটায় আমাদের ট্রেন হরিদ্বার ষ্টেশনে এসে থামে। তখনও ফোটেনি দিনের আলো দিগন্তে। ট্রেন থেকে নামতেই শীতের কন্‌কনে বাতাসে আমাদের সর্বাঙ্গ অবশ করে আনে, টাঙা থেকে নেমে গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে ভাঙা, অন্ধকার সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে একটি বাড়ীর ত্রিতলে উপনীত হই। পাণ্ডাজি পথ-প্রদর্শন করেন।

প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে প্রাচীরের ধারে এসে দাঁড়াই। নিচেই পীচের রাস্তা, তার সংলগ্ন ব্রহ্মকুণ্ড, অপর পারে এক প্রশস্ত চাতাল, পরিচিত হরকিপেড়ি নামে। বুকে নিয়ে আছে চাতাল একটি ঘড়িঘর নির্দেশ করে সময়। সামনে দূরে শোভা পায় নীল গিরিশ্রেণী, প্রসারিত হ'য়ে আছে দিগন্তে। তার পদতলে নীল গঙ্গা প্রবাহিতা, শোনা যায় তার অন্তরের ধ্বনি, কানে আসে মৃদু গর্জন। সৃষ্টি হয় প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশ, এক শ্রেষ্ঠ লীলাভূমি। দেখে মুগ্ধ হই।

মনে পড়ে যায় আর একদিনের কথা। প্রথম সেদিন আসি হরিদ্বারে। সেদিন ছিল বিষুব সংক্রান্তির আগের আগের দিন, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত কাল। হরিদ্বারে সেবারে পূর্ণকুম্ভ।

আছে এক ইতিহাস এই পূর্ণকুম্ভের। দেবতারা সমুদ্র মন্থন করেন। ওঠে এক সুধা-কুম্ভ, পরিপূর্ণ অমৃতে। অসুররা অপহরণ করেন সেই সুধাকুম্ভ। কয়েক বিন্দু সুধা পড়ে ধরিত্রীর অঙ্গে, পড়ে হরিদ্বারে, প্রয়াগে, উজ্জয়িনীতে

আর নাসিকে। মহাতীর্থে পরিণত হয় এই সব স্থান। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে সমাগত হন এই সব স্থানে কত অসংখ্য সন্ন্যাসী, বৈরাগী আর নাগা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী।

বসন্ত কালে বিষুব সংক্রান্তিতে বৃহস্পতি যখন কুম্ভ রাশিতে অবস্থান করেন, সূর্য উপনীত হন মেষ রাশিতে তখন গঙ্গাতীরে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ হয়।

বৃহস্পতি যখন উপনীত হন মেষ রাশিতে, চন্দ্র ও সূর্য মকর রাশিতে আর তিথি যদি অমাবস্যা হয় পূর্ণকুম্ভ হয় মহাতীর্থ প্রয়াগে, গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে।

যদি বৃহস্পতি, চন্দ্র আর সূর্য অমাবস্যা তিথিতে তুলা রাশিতে অবস্থান করেন কুম্ভ হয় উজ্জয়িনীতে, শিপ্রা নদীর তীরে।

অমাবস্যা তিথিতে কর্কট রাশিতে অবস্থান করেন যদি বৃহস্পতি, সূর্য আর চন্দ্র কুম্ভ হয় গোদাবরী তীরে নাসিকে।

হরিদ্বার, সমপর্যায়ে পড়ে আরও ছয়টি পুণ্য তীর্থের—অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী আর দ্বারকার, অন্যতম সপ্ত পবিত্র পুরীর, বেষ্টিত হয়ে আছে পর্বতে। একদিকে শোভা পায় বিল্ব পর্বত, বিরাজ করেন সেই পর্বত-শিখরের মন্দিরে মনসা দেবী। নীল পর্বতের শীর্ষদেশে মন্দিরে বিরাজ করেন শ্রীচণ্ডী দেবী আর অঞ্জনাদেবী। তিনদেবী অলঙ্কৃত করে আছেন তিন কোণ, তাই শ্রীখণ্ডে পরিণত হয় হরিদ্বার। তার বক্ষ ভেদ করে প্রবাহিতা হিমালয় দুহিতা, শ্বেত-বসনা, নৃত্যদোলা-কলনাদিনী গঙ্গা, শোনা যায় তাঁর নূপুরের ধ্বনি। চণ্ডী পাহাড়ের পদতলে নীলবসনা, নীলধারা বয়ে যান মৃদু গর্জনে সৃষ্টি হয় এক অলৌকিক পরিবেশ নীল গিরি শ্রেণীর পটভূমিকায়। তাই এই স্থানেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা রচনা করেন এক যজ্ঞকুণ্ড, করেন মহাযজ্ঞ। ব্রহ্মকুণ্ড নামে পরিচিত হয় সেই যজ্ঞকুণ্ড। মহাপবিত্র এই কুণ্ডের জল।

আবার এইখানেই নীল ধারার অপর পারে, চণ্ডী পাহাড়ের বিপরীত দিকে কনখলে রাজত্ব করেন ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি দক্ষ, স্থাপন করেন রাজধানী। পতির নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী সেখানে হোমাগ্নিতে প্রবেশ করেন, সতীকুণ্ড নামে খ্যাতি লাভ করে সেই স্থান। স্বর্গে বসে খবর পান মহাদেব, ছুটে আসেন মর্ত্যধামে, রুদ্র মূর্তিতে উপস্থিত হন যজ্ঞস্থলে। তুলে নেন সতীর প্রাণহীন

দেহ নিজের স্কন্ধে বিচরণ করেন উন্মাদের মত সারা পৃথিবীতে। নারায়ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে কাটেন সতীর দেহ টুকরো টুকরো করে। বাহান্ন অংশে বিভক্ত হয় সেই দেহ, পড়ে বাহান্নটি স্থানে, পীঠস্থানে পরিণত হয় সেই সব স্থান। প্রশমিত হয় শিবের ক্রোধ, রক্ষা পায় সৃষ্টি। আছে দক্ষের রাজবাড়ী, আছে সেই সতী কুণ্ডও।

সগরের পুত্রদের উদ্ধার করতে গঙ্গাদেবী মহাদেবের জটার অন্তরাল থেকে এই হরিদ্বারে অবতীর্ণা হন। পবিত্র হয় পৃথিবী সুরধুনীর স্পর্শে। মহাতীর্থে পরিণত হয় হরিদ্বার।

অবতীর্ণা হন পতিতপাবনী অতি তীব্র তাঁর গতির বেগ। এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে মুনি দত্তত্রয় নিযুক্ত কঠোর তপস্যায় দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর। সেই গতির বেগ ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাঁর আসন, বসন আর দণ্ড। ভেসে যায় কুণ্ডস্থানও। চক্রের আকারে ঘুরতে থাকে শুধু তাঁর কোষা। মহা ক্রুদ্ধ হন মুনি। বাসনা জাগে তাঁর মনে গঙ্গাকে ভস্মে পরিণত করতে। উপনীত হন তখন দেবতারা সেই স্থানে, আসেন ব্রহ্মাও, স্তুতি করেন সহস্রার্জুনের গুরু, দত্তত্রয়কে। তাঁদের স্তবে সন্তুষ্ট হন মহামুনি, অনুষ্যা-নন্দন দত্তত্রয়, হন প্রসন্ন। বলেন গঙ্গাদেবীকে, যেখানে তিনি মুনির কোষাকে ঘিরে আছেন বিরাজ করুন সেখানে দেবতা সকলে, পরিচিত হ'ক এই স্থান কুশাবর্ত নামে। তর্পণ করুন এখানে এসে জগতবাসী পিতৃপুরুষের, হবে না তাদের পুনর্জন্ম। সম্মত হন দেবতারা। পবিত্র তীর্থে পরিণত হয় সেই স্থান। আজ আসে এই ঘাটে যাত্রী, আসে হাজারে হাজারে, আসে পুণ্য লোভাতুর, তর্পণ করে পিতৃ পুরুষের। দান করে পিণ্ড। আছে এই ঘাটে মহামুনি দত্তত্রয়ের মন্দিরও।

মহাতীর্থ হরিদ্বার, সুন্দরতম লীলাভূমি ধরণীর, মর্ত্যের নন্দন কানন, হ'য়ে আছে হরির দুয়ার, দ্বার স্বর্গের অমরাবতীর, প্রবেশপথ পুণ্যতীর্থ কেদারনাথ আর বদরীনাথের, পথ দেবাত্মা হিমালয়ের। এখানে সত্যনারায়ণের মন্দিরে তপস্যা করেন অপ্সরা শ্রেষ্ঠা রম্ভা, হয় ভগবদ্ দর্শন। ঋষিকেশে, ত্রিবেণী সঙ্গমে মন্দিরে পূজিত হন ভরত। স্থাপন করেন এই মন্দির আচার্য শ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য।

লছমনঝোলায় লক্ষণ বিরাজ করেন। আছে সেখানেও একটি সুন্দর মন্দির। ব্রহ্ম বধের পাপে পাতক হন রাম আর লক্ষ্মণ রাবণ আর ইন্দ্রজিতকে হত্যা করে। স্বর্গে গিয়ে তপস্যা করতে উপদেশ দেন বশিষ্ঠ মুনি, বলেন তবেই হবে মুক্তি, দূর হবে ব্রহ্ম বধের পাপ। লক্ষ্মণ তপস্যা করেন লছমনঝোলায়, রাম দেবপ্রয়াগে, বদরীনারায়ণের পথে। হন তাঁরা পাপমুক্ত। পরিচিত হয় এই স্থান স্বর্গধাম নামে, বলা হয় তপোভূমিও। পরিণত হয় মহাতীর্থে। বাস করেন কত মুনি, ঋষি, কত সন্ন্যাসী, এই তপোভূমির গুহার অভ্যন্তরে, বাস করেন ঘরের চালার নিচেও, নিযুক্ত থাকেন কঠোর তপস্যায়।

এই পথেই দ্বাপরে পঞ্চপাণ্ডব স্বর্গের উদ্দেশে যাত্রা করেন। যাওয়ার পথে ভীম হরিদ্বারে তাঁর গদা পরিত্যাগ করে যান, সৃষ্টি হয় একটি কুণ্ড সেই গদার আঘাতে, পরিচিত হয় সেই কুণ্ড ভীমগোদা নামে।

পরের দিন ভোরে উঠে আমরা গঙ্গায় স্নান করতে যাই। নাই আজ সে-দিনের ভীড়, নাই লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সঙ্ঘাত, রুদ্ধ হয় না গতি প্রতি পদক্ষেপেই। নাই আজ কুম্ভের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রা নাই দশনামী, উদাসী, বৈরাগী আর উলঙ্গ নাগার। যান তাঁরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে, নির্দিষ্ট পর্যায়ে। প্রথমে যান একদল সন্ন্যাসী, নৃত্যচপল গতিতে, বাজনার তালে তালে লাঠি খেলতে খেলতে। তাঁদের পেছনে অসিযুদ্ধ করতে করতে অগ্রসর হন আর এক দল। তাঁদের অনুগমন করে অশ্বের-শ্রেণী, ভূষিত হ'য়ে জরির কারুকার্য সমন্বিত বহুমূল্য আবরণে, পৃষ্ঠে নিয়ে নগ্নদেহ ভস্মে আচ্ছাদিত সন্ন্যাসী। কারো পৃষ্ঠে শোভা পায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ নাগাও। অগ্রসর হয় তারাও বাদ্যের তালে তালে। তাদের পেছনে দুই অশ্বপৃষ্ঠে দুই সন্ন্যাসী দামামা বাজান। তাঁদের পশ্চাতে যান অনেক সন্ন্যাসী, তাঁদের ভস্মের ভূষণ, নাই অন্য কোন বসন, নাগা সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁরা, যান পদব্রজে। কত হস্তীযূথ অনুগমন করে তাঁদের, সজ্জিত তারাও বহুমূল্য ভূষণে। তাদের আগে যায় দুইটি হস্তী, ভূষিত মূল্যবান আবরণে। পৃষ্ঠে শোভাপান দু'জন ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসী, হস্তে নিয়ে দণ্ড আর পতাকা, প্রতীক সম্প্রদায়ের। হস্তীপৃষ্ঠে তাঁদের অনুগমন করেন সম্প্রদায়ের প্রধান মোহন্ত, যান মণ্ডলেশ্বর, অগ্রসর হন মন্থর গতিতে। বহুমূল্য ভূষণে সজ্জিত সেই হস্তী, তার পৃষ্ঠে শোভা পায় রৌপ্য নির্মিত

স্বর্ণ-খচিত সিংহাসন, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার। নাই কোন আভরণ মোহন্তের অঙ্গে, ভূষিত তিনি ভস্মে। তাঁর শিরে শোভা পায় বহুমূল্য হীরের মুকুট, ছড়িয়ে পড়ে তার দীপ্তি, উদ্ভাসিত হয় চারিদিক। মস্তকে শোভা পায় সাচ্চা জরির কারুকার্য সমন্বিত মূল্যবান স্বর্ণছত্র। সমন্বয় ঐশ্বর্যের আর ত্যাগের, নির্দেশক মায়ার বন্ধন মুক্তির। সবশেষে যান অন্য সাধুরা, যান তাঁরা পদব্রজে। ভস্মাচ্ছাদিত তাঁদের অঙ্গও। উপনীত হয় শোভাযাত্রা ব্রহ্মকুণ্ডে। স্নান সমাপন করে তাঁরা নিজেদের আখড়ায় ফিরে আসেন। অপেক্ষা করতে হয় অন্য যাত্রীদের যতক্ষণ না সমাপ্ত হয় সন্ন্যাসীদের স্নান।

স্নানান্তে ফিরে আসি ধর্মশালায়। তার পর চা ও কিছু জলযোগ করে টাঙায় চড়ে কনখল্ অভিমুখে যাত্রা করি। সঙ্গে যান পাণ্ডাজী। পথে পড়ে রামকৃষ্ণ মিশন। আমরা একটি চৌমাথায় নেমে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে গঙ্গা-তীরে উপনীত হই। কিনে নিয়ে যাই কিছু ফুল। সেইখানেই বটবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে দক্ষেশ্বরের মন্দির, সেই মন্দিরে বিরাজ করেন একটি শিবলিঙ্গ। দেবতাকে পূজা দিয়ে দক্ষের যজ্ঞকুণ্ড দেখি। শুনি এই কুণ্ডের আগুন জ্বলে রাত্রি-দিন, হয় না নির্বাপিত। একে একে শীতলাদেবীর আর হনুমানজীর মন্দির দেখে আমরা ঘাটে উপনীত হই। প্রায় পঞ্চাশ গজ দীর্ঘ এই ঘাটটি। তার সোপানের শ্রেণী গঙ্গাগর্ভে গিয়ে পৌঁছেছে। নীল এই গঙ্গার জল, তাই খ্যাতিলাভ করে নীল ধারা নামে, বয়ে যায় কল স্বরে। ওপারে নীল গিরি শ্রেণী, তার শীর্ষদেশে শোভা পায় চণ্ডীদেবীর মন্দির। সৃষ্টি করে এক মনোরম শান্তির পরিবেশ, মুগ্ধ হই দেখে।

ফিরবার পথে দেখে আসি সতীকুণ্ডও। চারিদিকে জঙ্গলে পরিবেষ্টিত হ'য়ে আছে কুণ্ডটি, আছে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

বিকেলে সর্বনাথদেবের মন্দির দেখতে যাই, অবস্থিত এই মন্দিরটি কুশাবর্তের ঘাটের দক্ষিণে। আছে এই মন্দিরে পঞ্চমুখ পশুপতিনাথের মূর্তি, কষ্টিপাথরে নির্মিত হয় এই মূর্তিটি নেপালের প্রসিদ্ধ পশুপতিনাথের অনুকরণে। আছে এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে আরও অনেকগুলি দেব-দেবীর মূর্তি।

কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে মায়াদেবীর মন্দিরে উপনীত হই। প্রাচীনতম

মন্দিরের অন্যতম এই মন্দিরটি। এই মন্দির দর্শন না করলে সুফল হয় না যাত্রা ; হয় না সার্থক।

মন্দির দেখে আমরা গীতা ভবনে উপস্থিত হই, দাঁড়িয়ে আছে গীতা ভবন মন্দিরটির বিপরীত দিকে। বিড়লা নির্মাণ করেন এই গীতা ভবনটি। ক্ষুদ্র সংস্করণ তাঁর স্থাপিত নতুন দিল্লীর গীতা ভবনের। অনুরূপ এই ভবনের শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিটি দিল্লীর গীতা ভবনের শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির।

যেতে হয় প্রায় মাইল খানেক পথ। যাই শহর অতিক্রম করে একটি প্রান্তরের ভিতর দিয়ে। অস্ত যান দিবাকর। অপরাহ্নের লাল রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে দূরের পাহাড়ের বুকে, সৃষ্টি হয় এক নয়নাভিরাম দৃশ্য, এক রমণীয় পরিবেশ। টাঙা একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের নিচে এসে থামে। তার শীর্ষদেশে বিরাজ করেন কালভৈরব। আমরা টাঙা থেকে নেমে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে চাতালে উপনীত হই। দর্শন করি কালভৈরব, প্রণাম জানাই দেবতাকে। নেমে এসে বিল্বকেশ্বরের মন্দির দেখতে যাই। দেখি বিল্ববৃক্ষতলে বিরাজ করেন এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ পুরাণে লেখা আছে—মহা পবিত্র এই লিঙ্গ, দর্শন করলে শিবলোক প্রাপ্তি হয় মানবের। দেখি গৌরীকুণ্ডও। ফিরে আসি ধর্মশালায়। তখন রাত্রির অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে দিগন্ত।

পরের দিন ভোরে উঠে চা ও জলযোগ সমাপন করে ট্যাক্সি চড়ে হৃষীকেশ ও লছমনঝোলা অভিমুখে রওনা হই। দর্শনী লাগে কুড়ি টাকা। পথে পড়ে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের মন্দির।

অনেকগুলি আঁকা বাঁকা রাস্তা অতিক্রম করে আমাদের ট্যাক্সি শহরের প্রান্তদেশে এসে পৌছায়, উপনীত হয় প্রকৃতির এক অনুপম পরিবেশে। সামনে দূরে দেখা যায় নীলগিরি শ্রেণী, দাঁড়িয়ে আছেন দেবতাত্মা হিমালয়, স্পর্শ করে আছেন আকাশ। রুদ্ধ করে আছেন পথ। দু-পাশে সবুজ ধানের ক্ষেত প্রসারিত হ'য়ে আছে দিগন্তে। দেখি মুগ্ধ হ'য়ে। ট্যাক্সি এগিয়ে যায় বিদ্যুৎ গতিতে। সুরু হয় রাস্তার দু'পাশে বড় বড় সবুজ বৃক্ষের শ্রেণী। তাদের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় সবুজ ধানের ক্ষেত। ক্রমে অন্তর্হিত হয় ক্ষেত্র, রূপ নেয় এক ঘন জঙ্গলের। রাস্তা যায় বঙ্কিম গতিতে, ভেদ করে যায় অরণ্যের বুক, অদৃশ্য হ'য়ে যায় সবুজ বৃক্ষ শ্রেণীর অন্তরালে, আবার বেরিয়ে এসে চলতে থাকে

সর্পিল গতিতে। চলে এক লুকোচুরি খেলা রাস্তায় আর জঙ্গলে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে থাকি প্রকৃতির এই সুন্দরতম লীলাভূমি।

ট্যাক্সি এসে থামে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের মন্দিরের সামনে। দেখি দাঁড়িয়ে আছে একখানি বাস, নিয়ে এসেছে যাত্রী, তাঁরা দর্শন করছেন মন্দির। খ্যাতি লাভ করে এখান থেকে বদরীনারায়ণের পথের ফুলচটি পর্যন্ত স্থান কুব্জামৃত তীর্থ নামে। আমরা ট্যাক্সি থেকে নেমে মন্দির দর্শন করে আবার ট্যাক্সিতে উঠে বসি। ট্যাক্সি চলে। আবার শুরু হয় রাস্তার দু-ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত। দেখা যায় দূরে গিরি শ্রেণীও। দেখা যায় পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটি শহরও। শুনি টিহিরি গাড়োয়ালের রাজার অধীনে এই শহরটি। শেষে ট্যাক্সি হৃষীকেশ শহরে এসে উপনীত হয়। শহর অতিক্রম করে ডান দিকে মোড় নিয়ে আমরা গঙ্গাতীরে ভরতের মন্দিরের সামনে উপস্থিত হই। পরিচিত এই স্থান ত্রিবেণীর ঘাট নামে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। ত্রিবেণীতে গঙ্গা-পূজা সমাপন করে হৃষীকেশের মন্দিরে উপনীত হই। দেবতাকে পূজা দিয়ে ভরতের মন্দির দেখতে যাই। শোভিত হ'য়ে আছে এই মন্দিরটি দ্রাবিড় শিল্প সম্পদে, বুকে নিয়ে আছে দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যের নিদর্শন, পৃথক হ'য়ে আছে উত্তর ভারতের অন্য মন্দির থেকে।

ঘাটে উপনীত হই, সামনে ঘন নীল হিমগিরি শ্রেণী, প্রসারিত হ'য়েছে দিগন্তে, তার পদতলে নৃত্য চপলা, কলনাদিনী গঙ্গা, সজ্জিতা নীল বসনে।

ঘাট থেকে ফিরে এসে মন্দিরের সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানে বসে চা ও জলযোগ করে আবার ট্যাক্সিতে উঠে বসি। ট্যাক্সি লছমনঝোলা অভিমুখে চলে বঙ্কিম গতিতে, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আর গঙ্গার কিনারা দিয়ে, অতিক্রম করে এক ভারি সুন্দর পরিবেশ। মাইল সাতেক গিয়ে রুদ্ধ হয় ট্যাক্সির গতি। শুনি, অনুমতি নাই ট্যাক্সির অগ্রসর হওয়ার, যেতে হবে পদব্রজে স্বর্গদ্বার পর্যন্ত।

ট্যাক্সি থেকে নেমে কিছুদূর গিয়ে আমরা লক্ষ্মণের মন্দিরে উপনীত হই। দেখি সমাগত হ'য়েছেন সেখানে জন দশ বারো যুবক। আছেন তাঁদের মধ্যে

বাঙালী, মহারাষ্ট্রীয়, দক্ষিণ ভারতীয়, উত্তরপ্রদেশবাসী, আছেন পাঞ্জাবীও। তাঁরা সকলেই দেরাদুনের সমর বিদ্যালয়ের ছাত্র, এসেছেন দেরাদুন থেকে সাইকেলে চড়ে হরিদ্বার দেখতে। সামনে লছমনঝোলার সুন্দর সেতু, নির্মিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। তার নিচে দিয়ে হিমালয়ের বেষ্টনী থেকে মুক্তি লাভ করে প্রবাহিত হন গঙ্গা, যান অমিত বিক্রমে, গর্জন করতে করতে। ওপারে গঙ্গার তীরে শোভা পায় কত মন্দির। সামনে বামে আকাশচুম্বী হিমগিরিশ্রেণী, দিগন্তে গিয়ে মেশে, রুদ্ধ করে পথ। দক্ষিণে বঙ্কিম গতিতে উচ্ছ্বসিত আবেগে বয়ে যান পতিতোদ্ধারিণী। ধীরে ধীরে সেতুর উপর এসে উপস্থিত হই।

কুখ্যাত ছিল এই লছমনঝোলা, বিভীষিকা বদরীর যাত্রীর। ছিল এখানে একটি সেতু, নির্মিত দড়ি দিয়ে। কষ্টসাধ্য আর বিপদসঙ্কুল ছিল সেই সেতু পার হওয়া, জীবনান্ত হ'ত কত যাত্রীর। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই সেতুটি নির্মিত হয়, নির্মাণ করেন কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ ধনী। সহজ হয় পারাপার, সুগম হয় বদরীনারায়ণ যাত্রা।

আমরা ধীরে ধীরে সেতু অতিক্রম করে উপনীত হই আরও এক স্বর্গীয় পরিবেশে। সামনে পাহাড়ের শ্রেণী, রুদ্ধ করে আছে পথ, বাঁদিকে দেবতাত্মা হিমালয়ের বক্ষ ভেদ করে বঙ্কিম গতিতে উঠে যায় বদরীনারায়ণেব পথ, দক্ষিণে পাহাড়ের পদতলে এক আম্রকুঞ্জ। বিস্তৃত হ'য়ে আছে এই আম্রকুঞ্জটি দু'মাইল পরিধি নিয়ে। তার নিচে দিয়ে সর্পিল গতিতে পথ যায় স্বর্গদ্বার পর্যন্ত, যায় কালীকম্‌লিওয়ালির আশ্রমের গা ঘেঁষে। আমরা প্রকৃতির এই সুন্দরতম পরিবেশে দু'মাইল পথ অতিক্রম করে কালীকম্‌লিওয়ালিতে পৌছাই, সেখান থেকে স্বর্গদ্বারে উপনীত হই। হয় না কোন কষ্ট, অনুভব করি না পথ চলার ক্লান্তি।

স্বর্গদ্বারে নির্মিত হয়েছে একটি মন্দির, রচিত হয়েছে একটি সুন্দর ঘাট সেই মন্দিরের সংলগ্ন। ঘাটের সোপানশ্রেণী স্পর্শ করেছে গঙ্গার গর্ভ। নির্মিত হয়েছে ঘাটের চাতালে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠও যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য। আমরা একটি ঘরে শয্যা বিছিয়ে, তার উপর বসে বিশ্রাম করি। ইক্‌মিক্ কুকারে খাবার প্রস্তুত হ'তে থাকে। খাবার প্রস্তুত হ'লে আমরা স্নান সমাপন করি

গঙ্গার শীতল স্বচ্ছ জলে। দূর হয় ক্লান্তি। স্নানান্তে খাওয়া শেষ করে আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে গীতা ভবন দেখতে যাই।

বহু অর্থব্যয়ে নির্মাণ করেন এই গীতা ভবনটি গোরক্ষপুরের এক ধনী ব্যবসায়ী, আছে এই গীতা ভবনের প্রাচীরের গাত্রে আর ছাদের অঙ্গে চিত্রিত গীতার সমস্ত কাহিনী। গীতা ভবন থেকে খেয়ানৌকায় আমরা গঙ্গা পার হ'য়ে অপর পারে উপনীত হই। তখন বেলা পাঁচটা। দেখি গঙ্গায় অসংখ্য মাছ, দেখেছি হৃষীকেশের আর হরিদ্বারের গঙ্গাতেও, কিন্তু সীমাহীন এখানকার মাছের সংখ্যা। তুলনা হয় না হরিদ্বারের আর হৃষীকেশের সংখ্যার সঙ্গে। এপারে ঘাটের উপর আমাদের ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। তাতে চড়ে আমরা হরিদ্বার অভিমুখে রওনা হই। আসবার পথে দেখে আসি সপ্তধারা, দেখি ভীমগোদাও, স্পর্শ করি কুণ্ডের জল।

ফিরে আসি হরিদ্বারে। তখন ব্রহ্মকুণ্ডে, গঙ্গা মাতার মন্দিরে সুরু হয় সন্ধ্যা-আরতি, আর তার সঙ্গে উদাত্ত কণ্ঠের সাম গান। অপূর্ব এই আরতি, সমপর্যায়ে পড়ে কাশীর বিশ্বনাথের আরতির। আরতি হয় আরও অনেক মন্দিরে, শোনা যায় ঘণ্টার ধ্বনি। আরতি শেষে কিছুক্ষণ ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে বসি। দেখি সারি সারি আলোর মালা ভেসে চলে ব্রহ্মকুণ্ডের উপর। আসে দলে দলে নারী, ভাসিয়ে দিয়ে যায় ব্রহ্মকুণ্ডে জ্বলন্ত প্রদীপ। সৃষ্টি হয় কুণ্ডের বুকে ভাসমান আলোর মালা। শোভা পায় ভাসমান আলোর মালা গঙ্গার বুকেও। বড় ভাল লাগে দেখতে।

কিছুক্ষণ হরকিপেড়ীতে বেড়াই। উৎসব মুখরিত হরকিপেড়ী, কেউ করে কীর্তন, কোথাও বা হয় পাঠ। বক্তৃতা দেন কোথাও কোন সন্ন্যাসী, বলেন ধর্মের কথা।

পরের দিন ঘুম ভেঙ্গে যায় ব্রহ্মকুণ্ডের মন্দিরের ভোরের আরতির ঘণ্টার আওয়াজে। খাওয়া দাওয়ার পর মন্দির দর্শনে বেরিয়ে পড়ি। দর্শন করি কুশাবর্ত ঘাট; দেখি শিখদের গুরুদ্বারা, উপনীত হই ভোলা গিরির আশ্রমে। এই আশ্রমটি স্থাপন করেন ভোলানন্দ গিরি, এক মহাপুরুষ। তিনি গিরি সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে কোন অট্টালিকা ছিল না। একটি খড়ের ঘরের মধ্যে বসে তপস্যা করতেন সিদ্ধপুরুষ আর দাওয়ায় বসে বলতেন

ধর্মের কথা। আসতো যাত্রী দলে দলে, সমবেত হ'ত এই আশ্রমের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে, শুনে কৃতার্থ হ'ত তাঁর বাণী। আজ তাঁর শিষ্যেরা নির্মাণ করেছেন এখানে একটি মন্দির, যেমন বৃহৎ তেমনই সুন্দর। স্থাপন করেছেন সেই মন্দিরে তাঁর আবক্ষ মর্মর মূর্তি। গড়ে তুলেছেন চারিদিকে সুবিশাল অট্টালিকার শ্রেণী। নির্মিত হ'য়েছে, অনেকগুলি ধর্মশালাও, স্থান পায় সেখানে যাত্রীরা।

আশ্রম দেখে নীলধারা দেখতে যাই। মুগ্ধ হই দেখে—গঙ্গার অপরূপ রূপ।

বিকেলে বিল্ব পর্বতে অবস্থিত মনসাদেবীর মন্দির দেখতে যাই। দেখি অনেক বিল্ববৃক্ষ এই পর্বতের অঙ্গে। নাই কোন ভাল রাস্তা, তাই কষ্টসাধ্য এই পর্বত আরোহণ। শীর্ষদেশে নির্মিত হয়েছে মনসাদেবীর মন্দির, বেষ্টিত হ'য়ে আছে মন্দিরটি একটি অলিন্দে। আমরা দেবীর পূজা দিয়ে সেই অলিন্দে এসে দাঁড়াই, দেখি চারিদিকের দৃশ্য। দেখি হরিদ্বার শহর, দেখি কনখল, দেখি সুরধুনী গঙ্গাকে। দেখা যায় সপ্তধারা, দেখা যায় চণ্ডীর পাহাড়, শীর্ষে নিয়ে চণ্ডীদেবীর মন্দির। দূরে সামনে, বামে, দক্ষিণে, হিমগিরি শ্রেণী, দেখা যায় দেবতাত্মা হিমালয়। দক্ষিণে পাহাড়ের পদতলে দেখা যায় একটি উপত্যকা, বুকে নিয়ে আছে সবুজ আভরণ। ভেদ করে যায় সেই আভরণ একটি রূপালী রেখা, যায় সর্পিল গতিতে, দিগন্তে গিয়ে মেশে।

সেই দিনই রাত্রি দশটার গাড়ীতে বিদায় নিই পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারের কাছ থেকে। ফিরে আসি দিল্লীতে। সঙ্গে নিয়ে আসি এক স্মৃতি, যা আজও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে, হয় নি ম্লান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদ্যনাথ ধাম

রাবণেশ্বরের মন্দির

এক প্রত্যুষে দেওঘর থেকে সপরিবারে আর সবান্ধবে বৈদ্যনাথ দর্শনে যাত্রা করি। টাঙায় চড়ে যাই। লাল কাঁকরের পথ সর্পিল গতিতে অগ্রসর হয়। আমরা অতিক্রম করি কত বন্ধুর জমি, কত কণ্টকগুচ্ছ, কত লতাগুল্ম, কত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শৈলমালা অঙ্গে নিয়ে সবুজ বনানী, কত নিরাভরণ, নিঃসঙ্গ পর্বত শৃঙ্গ, অতিক্রম করি মহাপবিত্র বিন্ধ্যর এক পরম রমণীয় পরিবেশ, এক নয়নাভিরাম লীলাভূমি, বৈদ্যনাথ ধামে উপনীত হই। সেখান থেকে শহরের কেন্দ্রস্থলে বৈদ্যনাথের মন্দিরে। দেবাদিদেব বৈদ্যনাথ, শ্রেষ্ঠ মহালিঙ্গ ভারতের দ্বাদশ শিবলিঙ্গের, প্রিয়তম ভৈরব জয়দুর্গার, অন্যতম একান্ন পীঠের, বিরাজ করেন সাঁওতাল পরগণায় দুমকা জেলায় দেওঘর মহকুমায়। উত্তরে তার শিবগঙ্গা এক দীর্ঘ সরোবর, বুকে নিয়ে আছে কত পদ্মফুল, কত পুষ্প-সম্ভার, কত রং-বেরঙের পক্ষীও, বেষ্টিত হয়ে আছে তার চতুর্দিক প্রস্তর নির্মিত সোপান শ্রেণী দিয়ে। পরিচিত শিবগঙ্গা কীর্তিনাশা রাবণের প্রস্রাব নামেও।

মহাপরাক্রমশালী হন লঙ্কাধিপতি রাবণ আদি দেব ব্রহ্মার বরে, জয় করেন সমস্ত পৃথিবী, হন ত্রিলোকের অধীশ্বর। বাসনা জাগে তাঁর অন্তঃকরণে দেবাদিদেব মহাদেবকে নিজের স্কন্ধে বহন করে স্বর্ণলঙ্কায় নিয়ে যাওয়ার। রক্ষক হবেন তিনি তাঁর পুরীর। তিনি কৈলাসে উপনীত হয়ে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। পূজা করেন আশুতোষকে সহস্র বিল্ব পত্র দিয়ে। তুষ্ট হন মহাদেব, স্বীকৃত হন তাঁর স্কন্ধে আরোহণ করে লঙ্কায় যেতে। কিন্তু নিষেধ করেন তাঁকে স্কন্ধচ্যুত করে পদমাত্র অগ্রসর হতে। আনন্দিত হন দশানন শিবের বর লাভ করে। তুলে নেন শিবকে আপন স্কন্ধে, যাত্রা করেন স্বর্ণলঙ্কা অভিমুখে হৃষ্ট অন্তঃকরণে।

আতঙ্কিত হন দেবগণ শরণাপন্ন হন জলাধিপতি বরুণদেবের। তিনি লঙ্কাধিপতির জঠরে প্রবেশ করেন। অনুভব করেন রাবণ প্রস্রাবের বেগ—অসহনীয় সেই বেগ। দেখেন সম্মুখে দণ্ডায়মান এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তিনি সেই ব্রাহ্মণের স্কন্ধে মহাদেবকে স্থাপন করে, মহাদেবের নিকটে প্রস্রাব করার প্রার্থনা করে নিযুক্ত হন প্রস্রাবে। নিরুপিত হয় সময়ও। কিন্তু বিরামহীন সেই প্রস্রাব, হয় অবিরাম গতিতে দেবতাদের মায়ায়। অতিবাহিত হয় কত মুহূর্ত, কত ঘণ্টা, এক স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয় প্রস্রাব। উত্তীর্ণ হয় নির্দিষ্ট সময়ও। তখন মহাদেবকে ধরিত্রীর অঙ্কে স্থাপন করে ব্রাহ্মণ প্রস্থান করেন, আপন আলয়ে যান। অবস্থান করেন দেবাদিদেব সেইস্থানে। শোনেন না কোন অনুনয় রাবণের, মানেন না কোন কাতর উক্তি। শেষে মহাক্রুদ্ধ হন দশানন, শিবের লঙ্কা গমনের অস্বীকৃতিতে, তাঁর শিরে এক প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত করে লঙ্কায় ফিরে যান। তাই খ্যাতিলাভ করে এই স্থান কীর্তিনাশা রাবণের প্রস্রাব নামে, রাবণেশ্বর মহাদেব নামে পরিচিত হন লিঙ্গও।

লুক্কায়িত থাকেন দেবাদিদেব সেইস্থানে বহু শত বৎসর, থাকেন যুগের পর যুগ, অবস্থান করেন লোকচক্ষুর অন্তরালে এক গভীর অরণ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে। বৈদ্যনাথ নামে, এক সত্যনিষ্ঠ, নিরক্ষর পশুপালক সেই অরণ্যে পশু চরায়। দেখে রোজই এক নির্দিষ্ট সময়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে তার এক দুগ্ধবতী গাভী। যখন সে ফিরে আসে থাকে না কোন দুধ তার বাঁটে, নিঃশেষিত হয়ে যায় একেবারে। এক দিন সে অনুসরণ করে গাভীর, অনুগমন করে, দেখে ক্ষরিত হয় তার দুগ্ধ অজস্র ধারায় একখণ্ড শিলার উপরে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে বৈদ্যনাথ এই দৃশ্য, মূক হ'য়ে যায় একেবারে। শেষে গৃহে ফিরে আসে। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখে বৈদ্যনাথ দেবাদিদেবের। তিনি তাকে তাঁর আগমনের বার্তা জানান, তাঁর আবির্ভাবের। প্রকাশিত হয় তাঁর মাহাত্ম্য, ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। খ্যাতি লাভ করেন তিনি বৈদ্যনাথ নামে। আসে তাঁর দর্শনে লক্ষ শত পুণ্যেলোভাতুর, কত তীর্থ যাত্রী, সমবেত হয় দেশ বিদেশ থেকে। তারা নিবেদন করে শ্রদ্ধার অঞ্জলি, ডালি উজাড় করে দিয়ে যায়।

এক সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের একেবারে কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে মূল মন্দিরটি, বেষ্টিত হয়ে আছে বাইশটি ক্ষুদ্র মন্দিরের সমষ্টি দিয়ে। বৃহত্তম মূল মন্দিরটির

আয়তন বুকে নিয়ে আছে গর্ভগৃহ, অলিন্দ আর মণ্ডপ, শিরে নিয়ে আছে সুউচ্চ চূড়া বা শিখর। অন্ধকার গর্ভগৃহে বিরাজ করেন রাবণেশ্বর শিবলিঙ্গ, অর্ধহস্ত পরিমিত গভীর লিঙ্গ বাপীতে। অঙ্গে নিয়ে আছে শিব মন্দিরটি সীমাহীন অলঙ্করণ, সুন্দরতম শিল্প সম্পদ, সূক্ষ্মতমও, আর জীবন্ত মূর্তিসম্ভার—দান প্রাচীন ভারতের মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির আর ভাস্করের, তাঁদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কীর্তি এক গৌরবময় যুগের ঐতিহ্যের। বিরাজ করেন ক্ষুদ্র মন্দিরগুলিতে বিভিন্ন দেবতা আর দেবী—তারাও অঙ্গে নিয়ে আছে কত সুন্দরতম অলঙ্করণ, কত কারুকার্য, মহাসমৃদ্ধশালী হয়ে আছে কত শিল্পসম্ভার দিয়েও।

টাঙা থেকে নামা মাত্র পাণ্ডারা এসে আক্রমণ করেন, বগলে তাঁদের এক একটি বিপুলকায় বাঁধান খাতা-ঠিকুজি পূর্ববর্তী বৈদ্যনাথ যাত্রীদের। বিব্রত হই তাঁদের আক্রমণে, তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসায়। অতি কষ্টে একটি পাণ্ডা ঠিক করে আমরা শিবগঙ্গায় উপনীত হই। মুগ্ধ হই তার অপরূপ রূপ দেখে। স্নানাতে মন্দিরের সিংহদ্বারে ফিরে আসি। তার পরে মন্দিরে প্রবেশ করে অঙ্গনে অবস্থিত কূপ থেকে দেবতার পূজার জন্য পবিত্র জল কিনি, কিনি অঙ্গন থেকে পূজার উপকরণ—আতপ চাল, দুধ, কলা, মিষ্টি. বিল্বপত্র আর পুষ্প।

পূজা দিতে রাবণেশ্বরের মন্দির অভিমুখে অগ্রসর হই। দেখি সমবেত হয়েছেন শত শত তীর্থযাত্রী-হয়েছেন অধিবাসী কত বঙ্গের, কত দ্রাবিড়স্থানের, কত অন্ধ্রের, কত সুদূর মহারাষ্ট্রেরও। তাঁরা দেবদর্শনের আর পূজার জন্য একযোগে অগ্রসর হন। তাঁদের অনুগমন করে, বহুকষ্টে, অশেষ পরিশ্রমে গর্ভগৃহে উপনীত হই। আমাদের সম্মুখে পাণ্ডা মহারাজ, তাঁর পিছনে আমার স্ত্রী, সর্বশেষে আমি। প্রদীপের স্বল্পালোকে আমরা দেবতাকে দর্শন করি, স্থাপন করি সঙ্গে নেওয়া পূজার উপচার দেবাদিদেবের মহাপবিত্র লিঙ্গের উপর। দেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াই। দেখি নিযুক্ত আমার ভক্তিমতী স্ত্রী দেবতার প্রণামে, অবনত তাঁর মস্তক তাঁর দুদিক থেকে আকর্ষণ করে আছে তাঁর কেশ গুচ্ছ দুইটি কৃষ্ণ বর্ণ, ভীমাকৃতি অবাঙ্গালী তীর্থ যাত্রী। প্রথমে অনুনয় করি, অনুরোধ করি তাঁর কেশাকর্ষণ থেকে বিরত হতে, শেষে সজোরে মুষ্টাঘাত করি তাদের পৃষ্ঠে—করি বারংবার।

তখন নিবৃত্ত হন তাঁরা কেশাকর্ষণ থেকে, পেছিয়ে আসেন কিছু দূর। আকর্ষণ মুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন আমার স্ত্রীও, নিষ্ক্রান্ত হন মন্দির থেকে আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করে।

তার পর মন্দির প্রদক্ষিণ করে আমরা অঙ্গনের এক প্রান্তে গিয়ে বসি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি, অপনোদন করি দেবদর্শনের শ্রান্তি, লাঘব হয় কষ্টেরও। ফিরে এসে দেখতে থাকি মূল মন্দিরটি। দেখি ঘুরে ঘুরে তার সর্বাঙ্গের অলঙ্করণ। বুকে নিয়ে আছে মন্দির প্রতীক এক প্রাচীন ভারতের অবিনশ্বর কীর্তির, এক শাশ্বত গৌরবময় ঐতিহ্যের। জানিনা কে এই মহিমময় মন্দিরের স্রষ্টা, কবে নির্মিত হয় এই মন্দির। তাই শ্রদ্ধা নিবেদন করি সেই অজ্ঞাত নির্মাতাকে, জানাই তার মহাঅভিজ্ঞ শিল্পীদেরও। তার পর দেখি একে একে ক্ষুদ্র মন্দিরগুলি। প্রণতি জানাই তাদের অধিষ্ঠাত্রী বিগ্রহ দেবতা আর দেবীদের। পাণ্ডার গৃহে ফিরে আসি।

ভোজনান্তে বিশ্রাম করি। অস্ত যান দেবদিবাকর পশ্চিম গগনে সন্ধ্যার ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়ে দিগন্তে। বেজে ওঠে আরতির ঘণ্টা দেবতার মন্দিরে। আমরা ধীরে ধীরে মন্দিরে উপস্থিত হই। দর্শন করি দেবাদিদেবের আরতি মুগ্ধ হয়ে। তার পর পাণ্ডা ঠাকুরকে দর্শনী দিয়ে আমরা টাঙায় চড়ে বসি, ফিরে আসি দেওঘরে। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি যা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উদয়পুর

উদয়েশ্বরের মন্দির

সমাগত হয় অবসর গ্রহণের দিন ও ক্ষণ, নিঃশেষ হ'য়ে আসে দিল্লীবাসের আয়ু, বাসনা জাগে মনে উদয়পুরে গিয়ে উদয়েশ্বরের মন্দির দর্শনের। পরিচিত নীলকান্তেশ্বর নামেও, দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি গোয়ালিয়রে ভীলসা থেকে চল্লিশ মাইল উত্তর ও উত্তর পূর্বে বুকে নিয়ে আছে অতীত ঐতিহ্যের এক সুন্দরতম, প্রকৃষ্টতম মহামহিমময় নিদর্শন, প্রতীক এক মহা গৌরবময় সৃষ্টির, অঙ্গে নিয়ে আছে খাজুরাহোর অপরাজেয় স্থাপত্য পদ্ধতি—তার প্রতিরূপ। অভিনব গঠন রীতিতে, অতুলনীয় পরিকল্পনার মহিময়ত্বে, অপরূপ অঙ্গের অলঙ্করণে গোয়ালিয়রের দুর্গের ভিতরের তেলিকা ও শাশবহুর মন্দিরও, নির্মিত একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। অঙ্গে নিয়ে আছে তেলিকা ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলের অভিজ্ঞান।

এক শুভ মুহূর্তে উদয়পুর অভিমুখে রওনা হই। ভীলসা স্টেশনে নেমে মোটরে করে উদয়পুরে পৌছাই। পরের দিন সকালে উঠে মন্দির দর্শনে যাত্রা করি, উপনীত হই মন্দিরের সামনে।

নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি রক্তবর্ণ বেলে প্রস্তর দিয়ে মালবের পরমার বংশের রাজা উদয়াদিত্য ১০৫৯ থেকে ১০৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, তাই পরিচিত এই মন্দিরটি উদয়েশ্বরের মন্দির নামে। প্রবল পরাক্রান্ত হন এই পরমারেরা সৌরাষ্ট্রে ও মালবে গুর্জর প্রতিহারদের পতনের পর। অলঙ্কৃত করেন পরমার সিংহাসন মহাপরাক্রমশালী মুঞ্জ সাবুক্তগিনের ভারত আক্রমণের সময়। পরাজিত হন তাঁর কাছে বহু সমসাময়িক রাজা, ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সামরিক খ্যাতি দিকে দিকে। কিন্তু নিজে পরাজয় বরণ করেন দাক্ষিণাত্যের চালুক্য নৃপতি দ্বিতীয় তৈলের কাছে। তাঁর মৃত্যুর পর সিন্ধুরাজ অধিরোহণ করেন পরমার সিংহাসনে। ভূষিত হন তিনি নবশশাঙ্ক উপাধিতে।

প্রবল পরাক্রান্ত তাঁর পুত্র ভোজদেব সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, রাজত্ব করেন পিতার মৃত্যুর পরে ১০১০ থেকে ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর কাছে পরাজিত হন তুরস্ক বা তুর্কীরা; হন চালুক্য আর চেদিরাজও, বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমা দক্ষিণে কোঙ্কন উপকূল পর্যন্ত। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তিনি, একাধারে সমর বিজয়ী বীর, বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী। রচনা করেন কবিতা, প্রণয়ন করেন ছন্দজ্ঞান, রাজনীতি, জ্যোতিষ শাস্ত্র, দর্শন ও স্থাপত্য-বিদ্যা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গ্রন্থ। স্থাপন করেন একটি মহাবিদ্যালয় রাজধানী ধারা নগরীতে। অধিত হয় সেই বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা। তিনি নির্মাণ করেন সুন্দরতম, সুমহান মন্দির রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। পূর্বসূরী তিনি পরবর্তী বিজয়নগরের রাজাদের তাই অমর ইতিহাসের পাতায়। শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এই বংশের উদয়াদিত্য পরমারও, নির্মাণ করেন উদয়েশ্বরের মহামহিমময় মন্দিরটি। ক্রমে প্রশমিত হয় তাঁদের ক্ষমতা মালবে শেষে পরাজয় বরণ করেন শেষ পরমার রাজা মালকদেব আলাউদ্দিন খিলজির কাছে ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে। উজ্জয়িনী, চন্দেরী মাণ্ডু আর ধারা তাঁর অধিকারে আসে, স্থাপিত হয় মুসলমান আধিপত্য পরমার রাজ্যে।

পশ্চিম সম্মুখভাগে উপনীত হই। দেখি প্রক্ষিপ্ত হয় এই মন্দিরটির ভদ্র পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে আর দক্ষিণে, সমন্তরাল তাদের প্রধান সম্মুখভাগ গর্ভগৃহের প্রাচীরের সঙ্গে, ঋজু তাদের পার্শ্বদেশ। "ভূমিজ" পদ্ধতিতে নির্মিত হয় এই মন্দিরের প্রাসাদটি। বুকে নিয়ে আছে এই পদ্ধতি চতুষ্কোণ ও বৃত্তের সংযোজন আর পল্লবাকার পোস্তা। মহাসমৃদ্ধিশালী হ'য়ে আছে প্রাসাদের অঙ্গ আলোছায়ার অপরূপ সমাবেশে। খোদিত হয় তার ভিতর কত মূর্তি, কত বিভিন্ন অলঙ্করণ; কত সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার। তার দুই পাশে রচিত হয় ক্রমনিম্নমান বহিঃপৃষ্ঠ, প্রতিফলিত হয় তার বুকেও সমকোণে আলো। বর্ধিত হয় সেই আলোছায়ার প্রতিফলন পল্লবিকা ও ক্ষুদ্র পৃষ্ঠ ও খাঁজের রচনায়। এক আলোছায়ার আবরণে পরিণত হয় মন্দিরের প্রতিটি প্রাচীরের গাত্র।

স্তম্ভের রূপ ধারণ করে এই পোস্তাগুলি মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে জঙ্ঘার অংশে। রচিত হয় সমউচ্চ বেদী ভারী ও সুবিশাল ছাঁচ দিয়ে আদিস্থানের

শীর্ষদেশে। ক্রমবর্ধমান এই আদিস্থানের নিম্নাংশে সংযুক্ত হয় ভিত্তি আর বেদীর ঋজু ছাঁচ, রূপ পরিগ্রহ করে উল্লম্ব মূর্তির। অনমনীয় তাদের প্রতিটি অংশ, আধার তারা আলোছায়ার, লুক্কায়িত থাকে সেই ছায়া তাদের বুকে। আধার তারা আলোরও, আহবণ করে তারা সেই আলো। রচিত হয় বেদীকা আব আদিস্থান খাজুরাহোর মন্দিরেও, কিন্তু বিভিন্ন তাদের নির্মাণ পদ্ধতি, পৃথক তাদের পরিকল্পনাও, নিয়ন্ত্রিত করে তারা আলোছায়ার সমাবেশ মন্দিরের অঙ্গে-মহাসমৃদ্ধ হয় মন্দির।

রচিত হয় স্তম্ভাকৃতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠেব শ্রেণী, বেষ্টিত হয় মন্দির সেই প্রকোষ্ঠের শ্রেণী দিয়ে, রূপ পবিগ্রহ করে তার চতুর্দিকের প্রাচীরের। বিস্তৃত হয় সেই প্রাচীর, রচিত হয় মন্দিরের শিখারা অঙ্গে নিয়ে যুক্ত পলাযুক্ত শৃঙ্খল। যুক্ত হয় সেই শৃঙ্খল। রচিত হয় লতার বন্ধনীও প্রাচীরের ভদ্রের চারিদিকের প্রক্ষিপ্ত অংশে। রুদ্ধ হয় পূর্ব দিক শুকনাসা দিয়ে, আবদ্ধ হয় অন্য তিন দিক শুকনাসিকা দিয়ে, উচ্চতায় শুকনাসার অর্ধেক।

মন্দিবের সামনে উপনীত হই। দেখে স্তব্ধ হই প্রাচীরেব গাত্রেব অনবদ্য সুন্দরতম অলঙ্কবণ। যুক্ত হয় ত্রিকোণ পোস্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূড়া বা পল্লবিকা দুই পাশের প্রক্ষিপ্ত স্তম্ভযুক্ত ক্ষুদ্রতর মন্দিরের পাদদেশে। বুকে নিয়ে আছে এই সব ক্ষুদ্রতর মন্দির পার্শ্বদেবতা। অঙ্গে নিয়ে আছে গণেশের মূর্তি বাম পাশের মন্দিরটি, সেই পোস্তার অঙ্গেই সমকোণে সন্নিহিত মন্দিরে এক দেবীর মূর্তি। রচিত হয় দুই পাশে স্তম্ভ দিয়ে মন্দিরের অঙ্গে চন্দ্রাতাপও। ঊর্ধ্বে রচিত হয় একটি সুপ্রশস্ত ফালি বা ভাজন, অলঙ্কৃত তার কেন্দ্রস্থল একটি কীর্তিমুখের মূর্তি দিয়ে। নির্গত হয় তার মুখ থেকে একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল, অবতরণ করে সেই শৃঙ্খল মন্দিরের অঙ্গ বেয়ে তার প্রান্তদেশে। নিবদ্ধ থাকে এই অলঙ্করণ জঙ্ঘাতে, স্তম্ভের রূপ পরিগ্রহ করে মন্দিরের অঙ্গে, বিস্তৃত হয় না তারা পোস্তার গভীরতর প্রদেশে। অলঙ্কৃত হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের অঙ্গ একটি শোভনগঠন বনদেবতার মূর্তি দিয়ে। দাঁড়িয়ে আছেন বনদেবতা একটি পবিত্র লতা কুঞ্জের নিচে, উপবিষ্ট সেই লতাকুঞ্জে কত বিভিন্ন জন্তুও।

নির্গত হয় একটি পল্লবিকা এই সমস্ত খোবের কেন্দ্রস্থলে, অঙ্গে নিয়ে অনুরূপ অলঙ্করণ আর অনবদ্য মূর্তিসম্ভার। বিচ্ছিন্ন কিন্তু এই মন্দিরের গাত্রের

অনুভূমিক অংশ। কিন্তু তারাও বুকে নিয়ে আছে কত সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত মূর্তির সম্ভার। তাদের ফাঁকে ফাঁকে খোদিত হয় প্রমাণ আকৃতির খোব অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার। আনত তারা পরস্পরের দিকে, অঙ্গে নিয়ে আছে আলোছায়ার সমাবেশ। এখান থেকেই সুরু হয় শিখারার ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতি, অঙ্গে নিয়ে কোথাও বৃত্তাকার স্তম্ভের শ্রেণী, কোথাও বা সুস্পষ্ট পল্লবিকা, অঙ্গে নিয়ে নিখুঁত উল্লম্ব অলঙ্করণ কত ছায়া, কত সুপরিণত শিল্পসম্ভার, কত শোভনগঠন মহিমময় মূর্তিসম্ভার, কত সুমহান দৃশ্য—পুনোরুক্তি কত দৃশ্যের কত বৈপরীত্যও। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় মন্দিরের গাত্র তাদের অনবদ্য সংমিশ্রণে আর নিখুঁত সুসামঞ্জস্যে। মহিমময় হয় মন্দির, হয় অপরূপ।

শিখারার দক্ষিণ পশ্চিম সম্মুখভাগে উপনীত হই। দেখি প্রক্ষিপ্ত হয় প্রাচীরের গাত্রে পোস্তাগুলি, রূপ পরিগ্রহ করে স্তম্ভের শীর্ষদেশের। গ্রথিত হয় তাদের শীর্ষদেশে ফালি, ফালির উপরে সুগভীর প্রকোষ্ঠ, শীর্ষে নিয়ে ছাদ। এই ছাদ দিয়েই সীমাবদ্ধ হয় প্রকোষ্ঠগুলি প্রাচীরের গাত্রের উর্ধ্বগতির সঙ্গে। এখান থেকেই ক্রমশীর্ণায়মান হয়ে উর্ধ্বে ওঠে মন্দিরের শিখারা। রচিত হয় শিখারার ভিত্তি বিভক্ত দুই মেখলাতে। এই ভিত্তি থেকেই ক্রমউর্ধ্বমান হয়ে উর্ধ্বে ওঠে শিখরার শুকনাসাকৃতি খিলানের শ্রেণী, অবিভক্ত তার গতি চার চতুর্থাংশে। সেখান থেকে নির্গত হয় কত বিভিন্ন লতা, কত জালির গবাক্ষও, উপনীত হয় শীর্ষদেশে আমলকে। অঙ্গে নিয়ে আছে প্রতিটি খিলান তিন অথবা পাঁচটি করে লতা। অর্ধাবৃত তাদের পাদদেশ শুকনাসা দিয়ে। রচিত হয় তাদের কেন্দ্রস্থলে প্রতি অংশে পাঁচটি শৃঙ্গ প্রতিটি শৃঙ্গের উপর সাতটি ভূমি। আছে প্রতিটি শৃঙ্গের পৃথক ভিত্তি. রূপ ধারণ করে চূড়ার। বুকে নিয়ে আছে চূড়া বন্ধনী, বিস্তৃততর হয় তাদের ব্যাসের মাপ যত উপরে ওঠে। রচিত হয় পাঁচটি শৃঙ্গ আর পাঁচটি শীর্ষযুক্ত স্তম্ভ তাদের কেন্দ্রস্থলে অনুভূমিক বিভাগে, তাদের অন্তর্বর্তী স্থানে অনুরূপ ক্ষুদ্রতর শৃঙ্গ আর প্রাচীরের কোণ। অলঙ্কৃত করা হয় কোণের সংলগ্ন খোবের অঙ্গ বৃত্তাকার ক্রমশীর্ণায়মান ঝালরের কাজ দিয়ে।

এমনই করে উর্ধ্বে ওঠে শিখারা মহামহিমময় মূর্তিতে, অঙ্গে নিয়ে শৃঙ্গের

সজ্জা, বুকে নিয়ে স্তম্ভের ভূষণ, ক্রমহ্রস্বায়মান তাদের আকৃতি, উপনীত হয় স্কন্ধে বা গ্রীবাতে আবদ্ধ আমলক দিয়ে। তারকাকৃতি তার প্রান্তদেশ, তারকাকৃতি মন্দিরের নির্মাণ-পদ্ধতিও, বুকে নিয়ে আছে পাঁচটি করে তারকা এক একটি অংশে। সমন্বয় হয় আমলকের গ্রীবার শিরাকৃতি ধারের সঙ্গে মন্দিরের অঙ্গের তারকার।

বিস্তৃত হয় নীলকান্তেশ্বরের মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রের উল্লম্ব অলঙ্করণ তার বক্ররেখা বেষ্টিত শিখারার অঙ্গেও, অবিচ্ছিন্ন এই বিস্তার। কিন্তু বুকে নিয়ে নাই এই বৈশিষ্ট্য শুধু গোয়ালিয়রের উদয়পুরের নীলকান্তেশ্বরের মন্দির, বুকে নিয়ে নাই সমস্ত তারকাকৃতি মন্দির বা প্রাসাদই। সমপর্যায়ে পড়ে সমস্ত উল্লম্ব পোস্তাযুক্ত নাগর অথবা ভারত গোষ্ঠীভুক্ত মন্দিরই। একই দৃষ্টিভঙ্গী বুকে নিয়ে আছে তাদের রচনাও। স্থপতি অবলম্বন করেন সমরাঙ্গণসূত্রধার তাদের নির্মাণে। মধ্য ভারতে আর দাক্ষিণাত্যে মহীশূরেও, প্রাধান্য লাভ করে স্তম্ভের আকৃতিই বহু মন্দির নির্মাণে। নাই এই বৈশিষ্ট্য অন্য নাগর পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দিরে, নাই দ্রাবিড় মন্দিরেও। নির্মিত হয় সেখানে মন্দিরের প্রাচীরের গাত্র স্তম্ভ দিয়ে, কিন্তু রচিত হয় না মন্দিরের উপরাংশ ভূমিজ স্তম্ভ দিয়ে। অধিকার করে তাদের স্থান আলিসার উপরস্থ ক্ষুদ্র মন্দির প্রাচীন মন্দিরে। পরবর্তী মন্দিরে নির্মিত হয় না মন্দিরে আলিসা, অধিকার করে তার স্থান স্তম্ভ আর উদ্গত স্তম্ভ, সন্নিবিষ্ট হয় তারা ক্ষুদ্রাকৃতি উপাসনা মন্দিরের মাঝে। রূপ পরিগ্রহ করে ক্ষুদ্র মন্দিরের বক্ররেখা বিশিষ্ট ছাদ, বুকে নিয়ে স্তম্ভদণ্ড।

পশ্চিম সম্মুখভাগে উপনীত হই। দেখি বিলম্বিত পশ্চিম চতুর্থাংশের কেন্দ্রস্থলের সুদৃঢ় আর সুপরিকল্পিত পোস্তা এক গভীর ছায়াচ্ছন্ন পটভূমিকায়। অনুরূপ দক্ষিণ আর উত্তরের পোস্তাও। নিখুঁত তাদের উল্লম্ব ধার, নির্ভুল তাদের অঙ্গের বিস্তৃতিও, মহাসমৃদ্ধ হয়ে আছে চতুর্দিকের ছায়া দিয়ে। অঙ্গে নিয়ে আছে ছায়াও অনবদ্য, সুন্দরতম, তুলনাহীন অলঙ্করণ। গ্রাসিত হয়ে আছে সর্বোচ্চ লতাও অলঙ্করণের জটিলতায়, এক হ'য়ে আছে মন্দিরের বুকে, হারিয়েছে তার পৃথক সত্তা।

খোদিত হয় সুপ্রশস্ত লতার বন্ধনী তিন মেখলাতেই, ঝালরের রূপ পরিগ্রহ

করে নিম্নতম মেখলাতে। ভূমিব সমষ্টি দিয়ে রচিত হয় সেই ঝালর। সেখান থেকেই, ছায়াচ্ছন্ন পবিবেশ থেকেই, নির্গত হয় শিখাবার কেন্দ্রস্থলের সম্মুখভাগ। বচিত হয় সেইখানেই গবাক্ষের জালি, যুক্ত হয় স্তব পবম্পবের সঙ্গে, অর্ধাবৃতও হয়। গবাক্ষের কেন্দ্রস্থলেই রচিত হয় সমগ্র ছাচের কেন্দ্র, উন্মুক্ত হয় পর্যায়ক্রমে এক একটি স্তরে। বচিত হয় গবাক্ষেব দুই পাশে, অর্ধভূমির আকার অর্ধ গবাক্ষের উল্লম্ব বেষ্টনী। যুক্ত হয় তারা প্রধান গবাক্ষের শীর্ষদেশেব কেন্দ্রস্থলে। অঙ্গে নিয়ে আছে ঝালরের প্রান্তদেশ পক্ষীর মস্তক, বেষ্টিত তার স্কন্ধ দিয়ে গবাক্ষের অন্ধকারময় ছিদ্রও। নাই এই লতায় ছন্দ, রৈখিক নিরবচ্ছিন্নতাও নাই। কিন্তু শোভিত হয়ে আছে তাব অঙ্গ কত বিভিন্ন আকৃতির বিন্দু আর রেখা দিয়ে, অধিকাব কবে আছে বিভিন্ন ভূষণে সজ্জিত শিখারার অন্যতম প্রধান অংশ, অংশ তার অঙ্গের সুন্দরতম আভরণের। পরিচিত এই বসন পদ্মকোশ নামে। বুকে নিয়ে আছে পদ্মকোশ শ্বেত আর কালোর পটভূমিকা, অলঙ্কৃত তার সর্বাঙ্গ, তার প্রতিটি স্তর বিভিন্ন সুন্দরতম শিল্পসম্ভার দিয়ে, অনুপম আভবণে। প্রতিফলিত হয় সেই স্তরে সূর্যের রশ্মি—বাড়ে মন্দিরের সৌন্দর্য।

এই শিল্পসম্ভারে সমৃদ্ধ পাড়ের পটভূমিকায় রচিত হয় শুকনাসার অঙ্গে কত মূর্তিসম্ভার। সুষ্ঠু-গঠন মূর্তি দিয়েই ভূষিত হয় চক্রাকারে তার দুই ধার। তারা অভিনয় করে তাদের নিজস্ব অভিনয় দুই কীর্তিমুখের অন্তবর্তী স্থানে। বিস্তৃত হয় তাদের মাঝখানে গবাক্ষের ভূষণ, বেষ্টিত হয় গবাক্ষের চারিদিক বৃত্তাকার তীক্ষ্ণধার কিনারা দিয়ে।

অলঙ্কৃত করেন মহাঅভিজ্ঞ ভাস্কব গবাক্ষের কেন্দ্রস্থলও একটি শোভন গঠন জীবন্ত দেবতার মূর্তি দিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটি সিংহাসনের উপর এক পবিত্র রহস্যময় পরিবেশে। রচিত হয় তার চারিপাশে দুই সারিতে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি বেষ্টনী। বেষ্টিত হয় বেষ্টনীও অনুরূপ অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানের বেষ্টনী দিয়ে, বুকে নিয়ে একটি অনুপম লতা, শীর্ষে নিয়ে দেবতার মূর্তি। তার উপরে একটি কীর্তিমুখ উপবিষ্ট। পিরামিডাকৃতি নিচের মন্দিরেব শীর্ষদেশ, অঙ্গে নিয়ে আছে তার ছাদ বন্ধনী, অলঙ্কৃত হয়ে আছে লতার কাজ দিয়ে। দেখি সিংহাসনে উপবিষ্ট এক দেবতার মূর্তি সেই মন্দিরে। তার দুই পাশে

মূর্তি কত দণ্ডায়মান দেবতার আর দেবীর। বৃহৎ পোস্তা আর অনুভূমিক ছায়ার সমষ্টি দিয়ে পৃথক করা হয় নিচের মন্দিরের সঙ্গে উপরের ক্ষুদ্র মন্দিরটিকে, পৃথকাকৃত হয় তাদের ভিতরের মূর্তিসম্ভার, হয় তাদের অঙ্গের বিভিন্ন বিস্তৃত অলঙ্করণও—হস্তীর পৃষ্ঠে শার্দূল, অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানের অঙ্গের স্ক্রলের ভূষণ আর কীর্তিমুখ।

রচিত হয় কত বিভিন্ন অনবদ্য, অনুপম, অলঙ্করণ, কত সুষ্ঠু গঠন সজীব মূর্তিরসম্ভার, মূর্তি কত দেব দেবীর, কত বিভিন্ন নিখুঁত লতাপল্লব, কত সূক্ষ্মতম ঝালরের কাজ মন্দিরের বিভিন্ন অঙ্গে, মহামহিমময় হয় মন্দির। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি।

পূর্বদিকে উপনীত হয়ে স্তব্ধ বিস্ময়ে শুকনাসার পূর্ব সম্মুখভাগ দেখি। দেখি অঙ্গে নিয়ে আছে প্রধান শুকনাসা একটি সুমহান গবাক্ষ, তার অভ্যন্তবে ত্রিপত্রাকার খিলানের বুকে কত সমকোণ মন্দিরের সমষ্টি অঙ্গে নিয়ে কত দেবদেবীর মূর্তি। দেখি নিম্নাংশে তাণ্ডব নৃত্যে নিযুক্ত নটরাজ শিব সঙ্গে নিয়ে দেবীগণ। তাঁরা আবির্ভূত হন এক ছায়াচ্ছন্ন পটভূমি থেকে, নৃত্য করেন এক গভীর ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে।

ছায়াময় হয় অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানের অঙ্গের ফেনায়িত স্ক্রলের কাজ আর মকরের চোঁয়াল, হয় আরোহীদের অঙ্গও। পুনোরুদ্দীপিত হয় ছায়া দুইপাশের মূর্তির সারির উপরও। কিন্তু মুক্তি লাভ করে এই ছায়ার হাত থেকে মহামহিমময় সিংহমুখের দুই পাশের বৃত্তাকার অলঙ্করণ, হয় না ছায়াচ্ছন্ন মকরও। রূপ পরিগ্রহ করে এক বিশাল, জীবন্ত, প্রাণচঞ্চল, মহিমময়, অপরূপ মূর্তির। রচিত হয় শুকনাসার অন্তরালে ক্রম অপস্যয়মান ক্ষুদ্র শৃঙ্গের সমষ্টি। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় গবাক্ষ, মহামহিমময় হয় গবাক্ষের শীর্ষদেশের কীর্তিমুখও, এই শৃঙ্গের সমাবেশে।

শুকনাসার দক্ষিণ পূর্ব কোণে উপনীত হই। দেখি এক মহা মহিমময় সৃষ্টি এক মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির, সুমহান কীর্তি এক মহাপারদর্শী ভাস্করেরও। রূপ পরিগ্রহ করে শুকনাসা একটি গবাক্ষের পর্দার। বিস্তৃত হয়ে আছে প্রান্তদেশের ভাঁজ, মন্দির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে শুকনাসা। খোদিত হয় পিছনে দুইটি ক্ষুদ্র মন্দির, অর্ধাবৃত হয়ে আছে তার অন্তরালে।

অনুরূপ শুকনাসিকাও পরিকল্পনায়, কিন্তু যুক্ত হয় তারা শিল্পসমৃদ্ধ শিখারার অঙ্গে। কিন্তু বিস্তৃত হয় পূর্বদিকের মহামহিমময় শুকনাসা অন্তরালয় বা গর্ভগৃহের সংলগ্ন তোরণের উপরে, রূপ পরিগ্রহ করে মন্দিরের সম্মুখ ভাগের। এই অন্তরালয় অতিক্রম করে গর্ভগৃহে উপনীত হতে হয়, যুক্ত হয় মণ্ডপ আর প্রাসাদ এই অন্তরালয় দিয়ে। আছে এই শুকনাসার নিজস্ব গঠন। রচিত হয় একটি খিলান, প্রক্ষিপ্ত হয় সেই খিলান শিখারার বুক থেকে। পাঁচটি তলে বিভক্ত হয় তার সুমহান দুই পাশ, অলঙ্কৃত হয় শিবের বিভিন্ন মূর্তি দিয়ে, পাশে নিয়ে পার্শ্ব দেবতা আর দেবী। রচিত হয় জাহাজের আকৃতির পৃষ্ঠদেশে একটি সুবৃহৎ আচ্ছাদিত পথ। উপনীত হয় সেই পথ কীর্তিমুখ থেকে শিখারার কেন্দ্রস্থলের প্রশাখায়, সংযুক্ত হয় অট্টালিকার সঙ্গে কীর্তিমুখ। ছায়াচ্ছন্ন হয় পথের বুক চন্দ্রাতপ থেকে নির্গত ছায়ায়, প্রতিফলিত হয় তার অঙ্গে কার্নিসের ছায়াও, সুসামঞ্জস্য হয় তার অঙ্গের আলোছায়ার অভিনয়। তার নিচে বৃহৎ মূর্তি দিয়ে খোদিত হয় যুদ্ধের দৃশ্য। দেখি নিযুক্ত কত মহা পরাক্রমশালী যোদ্ধা মহারণে।

অলঙ্কৃত এই বৃহৎ পাঁচতলার ছাদের তিনটি মেখলাও সারি সারি গবাক্ষ দিয়ে। তাদের মধ্যে আছে একটি সুমহান, সুবিশাল গবাক্ষ। ঊর্ধ্বে ওঠে তার দুই পাশের বহিরাঙ্গ, কুঞ্চিত হ'য়ে উপনীত হয় শিখরে। গ্রথিত হয় তার ভিতরে একটি ক্ষুদ্রতর গবাক্ষ—যুক্ত হয় বৃহত্তর গবাক্ষের সঙ্গে। বুকে নিয়ে আছে বৃহত্তর গবাক্ষটি তিনটি গভীর ছিদ্র বা উন্মুক্ত স্থান। সৃষ্টি হয় কেন্দ্রস্থলে ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ, ছায়াচ্ছন্ন হয় দুই পাশের অর্ধাংশও, রচিত হয় সেখানে কত লতা, কত পুষ্প।

দেখি বুকে নিয়ে আছে অনুরূপ পদ্ধতি মূল মঞ্জরীর অঙ্গও, মহাসমৃদ্ধিশালী হ'য়ে আছে তার অঙ্গের মেখলার স্তর অনুভূমিক রৈখিক আর পত্রের অলঙ্করণ দিয়ে আবদ্ধ হ'য়ে আছে তারা উল্লম্ব ঋজু বন্ধনী দিয়ে। সমষ্টিবদ্ধ এই বন্ধনীগুলি শোভিত হয়ে আছে মহাআড়ম্বরপূর্ণ ভূষণ দিয়েও। দেখি, ভূষিত ক্ষুদ্র শৃঙ্গগুলির কেন্দ্রস্থলের প্রশাখাও সুন্দরতম ক্রমহ্রস্বায়মান গ্রথিত গবাক্ষের শ্রেণী দিয়ে। অঙ্গে নিয়ে আছে এই গবাক্ষও কত বিভিন্ন সুষ্ঠুগঠন মূর্তির সম্ভার, মূর্তি কত দেবদেবীর, কত অনুপম লতা পুষ্প। ঊর্ধ্বে ওঠে শিখারা

উন্নত করে তার মহামহিমময় শির বুকে নিয়ে কত বিভিন্ন সুন্দরতম অলঙ্করণের আর শোভন গঠন মূর্তির নিখুঁত অতুলনীয় সমাবেশ। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় মন্দির, হয় অপরূপ, সুমহানও হয়।

দক্ষিণ দিকে উপনীত হয়ে দেখি দক্ষিণ থেকে অন্তরালয়ের ছাদের নির্মাণ পদ্ধতি আর তার অঙ্গের অলঙ্করণ। দেখি বেষ্টন করে আছে নিম্নতম প্রদেশের মূর্তির সমষ্টি সারা মন্দিরটির চতুর্দিক। অবিচ্ছিন্ন, অচ্ছেদ্য সেই মূর্তির বেষ্টনী, সুরু হয় বামে সমকোণে অবস্থিত প্রাসাদ থেকে মণ্ডপ অতিক্রম করে অন্তরালয়ে উপনীত হয়। দেখি দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চতল প্রাসাদটির প্রতিটি তল শুধু স্তম্ভের উপর, প্রক্ষিপ্ত তার কেন্দ্রস্থলের দুই দিক।

প্রাচীরের পূর্ব গাত্রে একটি মহামহিমময় কীর্তিমুখের মূর্তিও দেখি। সন্নিবিষ্ট এই মূর্তিটি শিখারার কেন্দ্রস্থলের প্রশাখার বুকে, এক সুন্দরতম অলঙ্করণের পটভূমিতে। বিমানের সারথি এই কীর্তিমুখ, তার গতির শক্তি, তাই মহাপরাক্রমশালী, মহাপূজ্যও। ভগ্ন এই কীর্তিমুখের ঊর্ধ্বাংশ।

ভিতরে প্রবেশ করে মণ্ডপে উপনীত হই। দেখি মুগ্ধ হয়ে প্রবেশ পথের পূর্ব দিকের নির্মাণ কৌশল, তার অঙ্গের অলঙ্করণও। একটি অলিন্দ রচিত হয়, প্রক্ষিপ্ত এই অলিন্দটি দক্ষিণ পাশের কেন্দ্রস্থল থেকে।

রচিত হয় ভদ্র মণ্ডপের। দেখি, নির্মিত হয় একটি স্তম্ভযুক্ত কক্ষ বা সভাগৃহও, এই কক্ষ দিয়েই দক্ষিণ দিক থেকে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। রচিত হয় অনুরূপ একটি কক্ষও, প্রবেশ পথ পূর্ব দিকের।

রচিত হয় সোপানের শ্রেণীও বুকে নিয়ে অনবদ্য সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, উপনীত হয় প্রক্ষিপ্ত ভিত্তিতে বা পদ্মতে। চতুষ্কোণ স্তম্ভযুক্ত রেল দিয়ে রচিত হয় বেদী বুকে নিয়ে মহিমময় শোভন গঠন মূর্তির সম্ভার, মূর্তি দেবদেবীর, মূর্তি পার্শ্বদেবতারও। রচিত হয় গ্রন্থি বেদীর আসনপট্টকার অঙ্গে, রূপ পরিগ্রহ করে মোচাকৃতি ক্ষুদ্র ছাদের। উত্থিত তাদের চূড়া এক একটি প্রশস্ত আমলক থেকে। নাই এই ছাদ অন্য কোন মন্দিরে, বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের। বহিঃপ্রসৃত হয় কক্ষাসনের হেলান পৃষ্ঠদেশ উল্লম্ব প্রাচীরের গাত্র থেকে, বিস্তৃত হয় বেদীর উপর দিয়ে, অলিন্দের প্রবেশ পথ থেকে প্রাচীরের গাত্র দিয়ে, রূপ পরিগ্রহ করে স্তম্ভযুক্ত গবাক্ষের, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম অলঙ্করণ।

রচিত হয় ছাদ অলিন্দের শীর্ষদেশে পরিচিত চন্দ্রাবলোকন নামে। দাঁড়িয়ে আছে অনতিদীর্ঘ স্তম্ভের উপর, বিভিন্ন তাদের আকৃতি, তাদের ব্যাসের মাপও। আসনের উপর থেকে ওঠে এই স্তম্ভগুলি, বৃত্তাকার তাদের উর্ধ্বাংশ। বৃত্তাকার শীর্ষদেশও অঙ্গে নিয়ে আছে অঙ্গুরির সমষ্টি। ঋজু, চতুষ্কোণ কিন্তু শীর্ষদেশের বন্ধনীর আকৃতি, স্পর্শ করে চন্দ্রাবলোকনের প্রাচীরের গাত্র। মুগ্ধ হয়ে দেখি।

অতিক্রম করি একে একে মণ্ডপ আর অন্তরালয়, উপনীত হয় অন্তরালয় গর্ভ-গৃহে। দেখি একে একে নন্দীর মূর্তি, স্তম্ভের শ্রেণী আর তাদের অঙ্গের অলঙ্করণ। দেখি অপরূপ শিল্প আর মূর্তিরসম্ভার দিয়ে অলঙ্কৃত প্রবেশ পথ, উদ্গতস্তম্ভের শ্রেণী আর দ্বার, মহাসমৃদ্ধ হয়ে আছে আলো আর ছায়ার পরিবেশে। এক সৌগন্ধ পরিবেশে উপস্থিত হই, অংশ মন্দিরের।

দেখি বুকে নিয়ে আছে মণ্ডপ চারিটি প্রধান সুন্দরতম স্তম্ভের শ্রেণী। দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে দুইটি অন্তরালয়ে, রূপপরিগ্রহ করে প্রাচীরের উদ্গত স্তম্ভের বা বুদ্যস্তম্ভের। গর্ভগৃহে একমুখ শিবলিঙ্গ বিরাজ করেন।

গর্ভগৃহে উপনীত হই। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রবেশ পথের বাম দিকের অলঙ্করণ। দেখি মণ্ডপের স্তম্ভ, অন্যতম মণ্ডপের চারিটি প্রধান স্তম্ভের। দেখি আরও স্তম্ভ ও উদ্গত স্তম্ভ অন্তরালয়ে, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম অলঙ্করণ, ভূষিত তাদের অঙ্গ মূর্তিসম্ভার দিয়েও। প্রবেশ পথের উল্লম্ব অলঙ্করণের সমষ্টিও দেখি। মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হই দেখে।

দুই ফুট, নয় ইঞ্চি চতুষ্কোণ এই মণ্ডপের স্তম্ভের পাদদেশ, চতুষ্কোণ তাদের দণ্ডও পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি পযন্ত, অষ্টকোণ তিন ফুট আট ইঞ্চি, আর বৃত্তাকার এক ফুট তিন ইঞ্চি পযন্ত। পরিবর্তিত হয় মধ্য যুগের স্তম্ভের আকৃতি চতুষ্কোণ পাদদেশ থেকে অষ্টকোণ কেন্দ্রস্থলে, বৃত্তাকার রূপ পরিগ্রহ তাদের স্কন্ধদেশ। স্থিতিশীল থেকে গতির আধারে পরিণত হয়। তাই খোদিত হয় তাদের পাদদেশের চতুষ্কোণ অংশের চারিপাশে, মন্দিরে, সুন্দরতম অলঙ্করণে অলঙ্কৃত চন্দ্রাতপের নিচে দণ্ডায়মান স্থিতিশীল দেবদেবীর মূর্তি। উর্ধ্বে গতির আধারে গণমূর্তি। সুসামঞ্জস্য হয় স্তম্ভের গঠনের সঙ্গে তার অঙ্গের অলঙ্করণের মূর্তি সম্ভারের।

মহাসমন্বয় হয় তাদের অষ্টকোণ অংশের অঙ্গে খোদিত শৃঙ্খল দিয়ে বিলম্বিত ঘণ্টার সঙ্গে মণ্ডপের ছাদ থেকে বিলম্বিত শৃঙ্খলযুক্ত বৃহদাকৃতি ধাতু নির্মিত ঘণ্টার। কীর্তিমুখের মুখ থেকে বিলম্বিত হয় স্তম্ভের অঙ্গের ঘণ্টা। দেখি আবদ্ধ স্তম্ভের অষ্টকোণ অংশ উড্ডীয়মান মূর্তির মেখলা দিয়ে। তাদের উপরে রচিত হয় বৃহৎ ত্রিকোণের শ্রেণী। রচিত হয় তার উপরে স্তম্ভের বন্ধনী আর তাদের অঙ্গে উডন্ত গণদেবতার মূর্তি। শক্তি তারা স্তম্ভের বর্ধিত হয় বন্ধনীর অঙ্গের সামর্থ এই গণমূর্তি দিয়ে, বাড়ে মন্দিরের স্থাপত্যের বল, বর্ধিত হয় ভারসাম্যও। ধারণ করে তাদের শীর্ষদেশ মন্দিরের ছাদের গুরুভার, ধারণ করে স্তম্ভ। আনমিত নয় তাদের ভারে স্তম্ভদণ্ড। এক অপরূপ সুসামঞ্জস্য হয় গণমূর্তির সঙ্গে বন্ধনীর আকৃতির। উড়ন্ত এই গণেরা। বন্ধনীর অঙ্গ থেকে মহাশূন্যে উড়ে যায়। অনুভূমিক তাদের গতি, সঙ্গে নিয়ে যায় তাদের যাত্রার পথে মন্দিরের ছাদের গুরুভার—স্থিতি লাভকরে সেই ভারসাম্য ছাদের চারিদিকেও। অবিচলিত হয়ে সহ্য করে বন্ধনীর ভার স্তম্ভদণ্ড। বুকে নিয়ে আছে তার পাদদেশ আর স্তম্ভ দণ্ড উল্লম্ব আকৃতির পরিবর্তিত রূপ। প্রক্ষিপ্ত নয় তার চতুষ্কোণ পাদদেশ চতুষ্কোণ স্তম্ভদণ্ডের নিম্নাংশে। অঙ্গে নিয়ে আছে তারা সুন্দরতম অলঙ্করণে সমৃদ্ধ খোদিত মন্দির। দাঁড়িয়ে আছেন প্রতিটি মন্দিরে কারুকার্য সমন্বিত চন্দ্রাতপের নিচে এক একটি দেবতা। তাই বিস্তৃত নয় স্তম্ভের পাদদেশ ভূমিতে। কিন্তু তাদের গঠন পদ্ধতি আর তাদের অঙ্গের মূর্তিসম্ভার অনুক্রমণিকা, পটভূমি স্তম্ভদণ্ডের আর তার শীর্ষদেশের। দেখি মধ্যযুগের মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির আর ভাস্করের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, পরিচায়ক তাঁদের অভিজ্ঞতার, তাঁদের প্রকৃষ্টতম স্থাপত্য জ্ঞানেরও।

বাহির হয়ে এসে সম্পূর্ণ মন্দিরটি দেখি। দেখি ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বে ওঠে তার পিরামিডাকৃতি শিখর বা মূল মঞ্জরী, অঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন আকারের পাত্র, শীর্ষে নিয়ে সুমহান আমলক আর কলস। দেখি অলঙ্কৃত শিখরের অঙ্গ চারিটি সুপ্রশস্ত বন্ধনী দিয়ে, বুকে নিয়ে সুন্দরতম মহিমময় অলঙ্করণ। রচিত হয় তাদের অন্তর্বর্তী পাঁচটি মেখলাতে বা তলে ক্রম উর্ধ্বমান অনুপম সুষ্ঠুগঠন পঁয়ত্রিশটি অঙ্গ শিখর বা উরুমঞ্জরী, শোভন ক্ষুদ্র সংস্করণ তাদের নিজের। দেখি মহা সমৃদ্ধিশালী অলঙ্করণে ভূষিত তার প্রতিটি অঙ্গও, মুখর ভাস্করের হৃদয়ের ঐশ্বর্যে,

বাঙময়, অপরূপ তাঁর মনের মাধুর্যে। দাঁড়িয়ে আছে সুমহান উদয়েশ্বর অঙ্গে নিয়ে এক মহামহিমময় পরিকল্পনার সুন্দরতম নিখুঁত রূপদান। প্রতীক হয়ে আছে এক অপরাজেয় অতুলনীয় সৃষ্টির, এক অবিনশ্বর কীর্তির এক ভারতের বৈশিষ্ট্যের, এক মহাগৌরবময় ঐতিহ্যের, স্বপ্ন এক বিশ্বজয়ের।

প্রণতি জানাই দেবতাকে। নিবেদন করি শ্রদ্ধা স্থপতি আর ভাস্করকে, করি নৃপতি উদয়াদিত্য পরমারকেও, অমর তাঁরা! দিল্লীতে ফিরে আসি। আজও অম্লান হয়ে আছে উদয়েশ্বরের স্মৃতি মনের মণিকোঠায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাশীধাম

১। বিশ্বনাথের মন্দির ২। অন্নপূর্ণার মন্দির

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের শেষে বোম্বাই থেকে কলিকাতায় বদলি হয়ে আসি। ডিসেম্বর মাসের প্রথমে দেড় মাসের ছুটি নিয়ে অবসর যাপন করতে কাশীধামে যাই। আতিথ্য গ্রহণ করি বন্ধুবর অবনী সান্যালের গৃহে। হরিশ-চন্দ্র ঘাটের সন্নিকটে অবস্থিত এই গৃহটি। সঙ্গে যান স্ত্রী ও কন্যা মন্দাকিনী।

এর আগেও তিন বার কাশীতে যাই, ১৯২১, ১৯২৯, ও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। ধন্য হই দেবাদিদেব বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণা মাতাকে দর্শন করে। পবিত্র হই দশাশ্বমেধের মহাপবিত্র ঘাটে স্নান করে। কিন্তু স্বল্প আমাদের স্থিতি এই কাশীধামে এই কয়বার। তারপরেও বহুবার কাশীতে গিয়েছি। বিভিন্ন তার স্থিতির সময়, বিভিন্ন বাসের স্থানও। সার্থক হয়েছে জীবন বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণা দর্শনে। পবিত্র হয়েছে দেহ আর মন তার মহাপবিত্র গঙ্গায় অবগাহনেও। প্রতিবারই দর্শন করে এসেছি বন্ধু পত্নীকে আর তার পুত্র-কন্যাকে বাবু আর কল্যাণীকে।

সংঘটিত হয় মহাপ্রলয়, বিলুপ্ত হয় স্থাবর আর জঙ্গম, হয় চরাচর, শূন্যময় হয় নভোমণ্ডলে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ, তিমিরাবৃত হয় নক্ষত্র, অস্তিত্ব থাকে না অগ্নি, বায়ু, ভূতল আর অহোরাত্রিরও, বিরাজ করেন তখন শুধু নির্গুণ, নির্বিকার, নির্বিকল্প, চৈতন্যময় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। কল্পনা করেন তখন সেই সর্বজ্ঞ পরব্রহ্ম আপনার লীলা দ্বারা নিজের মূর্তি, কল্পনা করেন মঙ্গলস্বরূপা, সর্বজ্ঞানময়ী, শুদ্ধস্বরূপা ঈশ্বরীকেও, প্রকাশ করেন নিজের শরীর থেকে অব্যভিচারিণী মূর্তি।

নির্মাণ করেন সেই সময়েই এই কাশীক্ষেত্র, বিস্তৃত তার পরিধি পঞ্চক্রোশ নিয়ে, বিহার করেন সেই ক্ষেত্রে তিনি নিজে। এই অমূর্ত, পরব্রহ্ম, আদি পুরুষই বিশ্বেশ্বর আর সেই প্রকৃতিপ্রধানা, শ্রেষ্ঠা মায়া, বিকৃতি বিরাজিতা

ভগবতীই অন্নপূর্ণা। পরিত্যাগ করবেন না কাশীক্ষেত্র কখনও বিশ্বেশ্বর, বিমুক্ত হবে না প্রলয় কালেও এই ক্ষেত্র, তাই খ্যাতি লাভ করে এই ক্ষেত্র অবিমুক্ত ক্ষেত্র নামে।

নির্মিত হয় এই ক্ষেত্র জলের উৎপত্তির আগে, শিবা ও শিবের সুখাস্পদ স্বরূপ, মোক্ষরূপ আনন্দের হেতু এই ক্ষেত্র, তাই নাম রাখেন এই ক্ষেত্রের আনন্দ কানন স্বয়ং পিনাকী। হয় এক পরম জ্যোতির বিকাশ এই ক্ষেত্রে, তাই পরিচিত এই ক্ষেত্র কাশী নামেও। পরম পবিত্র এই পুরী, অন্যতম মহাপবিত্র সপ্তপুরীর—কাশী, কাঞ্চী, মায়াপুরী, দ্বারকা, অযোধ্যা, মথুরা আর অবন্তীর। বিরাজ করেন এই কাশীতে উত্তর বাহিনী গঙ্গা, বিশ্বেশ্বরের জলময়ী মূর্তি, শ্রেষ্ঠ নদী কলিযুগের, পবিত্রতমও, তাই পুণ্যতীর্থ ভারতের এই কাশীক্ষেত্র।

মোক্ষলাভ করে পাপীরা এই কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগ করলে, অবিলম্বে উচ্ছেদ হয় তাদেব কর্মবন্ধন, দরকার হয় না কোন যোগাভ্যাসের, কোন তত্ত্ব জ্ঞানের। শোনান তাদের তারকব্রহ্ম নাম স্বয়ং ভগবান চন্দ্রশেখর, লাভ করে তারা মুক্তি। এই কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগই তাদের জন্মজন্মান্তরের তপস্যা, তাদের দান আর নির্বাণ-মুক্তিদায়ী যোগ। বিষ্ণুর পরম পদপ্রাপ্ত হয় অতি পাতকী জীবও, লাভ করে উত্তরবাহিনী গঙ্গা প্রাপ্তি।

পুরাকালে ইন্দ্র ও ব্রহ্মা আদি দেবগণ স্থাপন কবেন এই কাশীক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে পাপীদের দুর্মতি দলনী, দুষ্ট-প্রবেশ-নিবারিণী মহা-অসি-স্বরূপা অসি নদীকে। স্থাপিত হন তার উত্তরদিকে বরুণানদী, ক্ষেত্র-বিঘ্ন-নাশিনী, দুর্বৃত্তগণের সুবৃত্তি বিরোধিনী এই বরুণা নদী। আদেশ করেন স্বয়ং ভগবান চন্দ্রমৌলী দেহলী গণপতিকে এই পুরীর পশ্চাৎভাগ রক্ষার জন্য, স্থাপিত হন তিনি পশ্চিম দিকে। মধ্যস্থা হয় কাশী বরুণা আর অসির, তাই খ্যাতি লাভ করে এই পুরী বারাণসী নামে।

অতি সৌম্য, রুদ্রাক্ষমালা-স্বরূপ ফণীন্দ্রভূষণে ভূষিত ত্রিপুণ্ড্ররূপ, অর্ধচন্দ্রধারী শিবের পরিষদ রূপে গণ্য হন এই কাশীবাসীরা। কাশীবাসী সমস্ত জলচর ও স্থলচর জন্তুই রুদ্ররূপী। মহেশ্বরের কৃপায় দেহান্তে তারা তাতেই বিলীন হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ তারা দশটি রুদ্রেরও। তাই পরিচিত হয় কাশী রুদ্রাবাস নামেও। শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের অর্চনা করলে রুদ্রার্চনার ফল লাভ করে জীব।

শ্মন শব্দের অর্থ শব (মৃতদেহ) শানে মানে শয়ন করা। শ্মশানের অর্থ শবের শয়নের স্থান। শবরূপে শয়ন করে থাকে, মহাভূতগণ কল্পান্ত কালেও। তাই কাশী মহাশ্মশান নামেও খ্যাত।

অনাদি, অনন্ত, অবিমুক্ত পুরী এই কাশীধাম, নিত্য, অনন্ত, অনাদি তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিশ্বেশ্বরও। বুকে নিয়ে আছে কাশী তার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই, আছেন দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বরও। মূর্ত প্রতীক হয়ে আছে কাশী জ্ঞানার্জনের।

উল্লিখিত আছে বেদে মহাসমৃদ্ধিশালী এই কাশীপুরী, সুন্দরতমও। বর্ণিত হয় ঋকবেদে কাশীর পুরুরবার কাহিনী। উল্লিখিত আছে অথর্ববেদে, শতপথ ব্রাহ্মণে, জ্ঞানসংহিতাতে, আছে আরও অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও। তাই বিদ্যমান কাশী প্রাক্‌বৈদিক যুগ থেকেই, অধিকার করে আছে এক বিশিষ্ট স্থান। উল্লিখিত আছে তার কথা আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণে, আছে মহাভারতে, আর বিভিন্ন পুরাণেও। প্রথম ও প্রধান বাসস্থান এই কাশীধাম দেবাদিদেব শিবের, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল শৈবধর্মেরও বিশ্বের। তারা মুখর তার প্রশংসায়। উল্লিখিত আছে বাংলার আদি কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও।

বাসস্থান এই কাশীধাম কত মুনি ঋষির, কত মনীষীর আর কত সুধীর। লীলাক্ষেত্র কত পুণ্যাত্মা মহাত্মার আর সাধুর, স্থান তাঁদের ধর্মেরবাণী প্রচারেরও। পরিণত হয়ে আছে কাশী সংস্কৃতির ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে, আবাহমান কাল থেকেই। শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল কৃষ্টিরও। এইখানেই সারনাথে প্রচার করেন যুগাবতার তথাগত বুদ্ধ তাঁর ধর্মচক্রের বাণী। দর্শন করেন এই কাশীধাম যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তৈলঙ্গস্বামী, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, স্বামী বিবেকানন্দ, গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, সন্ত কবীর ও আরও অনেকে। রচনা করেন এইখানেই সন্ত তুলসীদাস মহাকাব্য রামায়ণ।

কাশী অন্যতম ষোড়শ মহাজনপদের, রাজত্ব করেন এই কাশীতে ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ব্রহ্মদত্ত বংশের নৃপতিরা। অধিকারে আসে কাশীরাজ্য কোশল রাজ্যের, অন্যতম মহাশক্তিশালী চারিটি রাজ্যের, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। বিবাহ করেন মগধ নৃপতি হর্যঙ্ক বংশের বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু কোশলরাজ প্রসেনজিতের কন্যা, দান করেন কাশী গ্রাম প্রসেনজিত অজাতশত্রুকে, কাশী

অধিকারে আসে মগধরাজ্যের। অধিকারে আসে কাশী-কোশল রাজ্য মগধ রাজ্যের, বিম্বিসারের রাজত্ব কালে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। পতন হয় হর্যঙ্কবংশের নৃপতিদের অধীনস্থ হয় কাশী (বারাণসী) একে একে মগধের শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য ও সুঙ্গ বংশের রাজাদের।

খুব সম্ভব অধীনস্থ হয় উজ্জয়িনীর কৌশাম্বী নৃপতিদের বারাণসী খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে, অধিকারে আসে কুষাণ নৃপতি প্রবল পরাক্রান্ত কণিষ্কের খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে। ১৭০ খ্রীষ্টাব্দে অধীনস্থ হয় বারাণসী কৌশাম্বীর মাঘ নৃপতিদের কুষানদেব পতনের পর। প্রবল থাকে বৌদ্ধধর্ম সারনাথে। প্রাধান্য লাভ করে কিন্তু শিবের পূজা আর শৈবধর্ম কাশীতে। ছড়িয়ে পড়ে তার খ্যাতি দিকে দিকে, আসে দেশ বিদেশ থেকে কত তীর্থ-যাত্রী, কত পুণ্যলোভাতুর, কত পুণ্যার্থী।

প্রবল পরাক্রান্ত হন গুপ্ত রাজারা মগধে ৩১৫ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, কাশী গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। তার পরের ইতিহাস, ইতিহাস এক উত্থান ও পতনের, এক জয় আর পরাজয়ের, এক শাসন পরিবর্তনেরও। অধীনস্থ হয় বারাণসী ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে গৌড়ের শশাঙ্কের, মৌখরি বংশের রাজাদের ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে, হয় পুষ্যভূতি বংশের হর্ষবর্ধনের সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে। পরাধীনতা স্বীকার করে বাংলার পাল শ্রেষ্ঠ ধর্মপালদেব ও তাঁর পুত্র দেবপালের অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, করে গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের সম্ভবতঃ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অধীনতা স্বীকার করে বাংলার সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনের কাছেও।

প্রতিহারদের পতনের পর মহাশক্তিশালী হন গহড়বাল রাজবংশের রাজারা একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে কনৌজে ও বারাণসীতে। পরাজিত ও নিহত হন এই বংশের শেষ রাজা জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘুরীর হস্তে, ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। বারাণসী মুসলমানদের অধিকারে আসে।

বুকে নিয়ে আছে এই মহাতীর্থ কাশী এক হাজার পাঁচ শত মন্দির, বলেন মনীষী হ্যাভেল। আমরা পরের দিন সকালে উঠে দশাশ্বমেধ ঘাটে উপস্থিত হয়ে তার পবিত্র জলে স্নান সমাপন করি। পবিত্র হয় আমাদের দেহ। এই স্থানেই দেবাদিদেব ব্রহ্মা অনুষ্ঠান করেন দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ, মনু বংশীয় রাজা

দিবোদাসের সাহায্যে, হন তিনি ব্রহ্মার বরে একেশ্বর অধিপতি পৃথিবীর। নীলবর্ণ হয় তার আকাশ যজ্ঞের ধূম্ররাশিতে। আজও নীল তার আকাশ। প্রতিষ্ঠিত হয় দশাশ্বমেধেশ্বর ও ব্রহ্মেশ্বর নামে দুইটি শিব লিঙ্গও এই স্থানে। ব্রহ্মাই প্রতিষ্ঠা করেন যজ্ঞান্তে। পরিণত হয় দশাশ্বমেধ ঘাট পুণ্য তীর্থে ভারতের।

স্নান সমাপনান্তে আমরা অতিক্রম করি প্রশস্ত রাজপথ, প্রবেশ করি বিশ্বনাথের সঙ্কীর্ণ সর্পিল গলিতে, গলি অতিক্রম করে উপনীত হই বিশ্বনাথের মন্দিরের সিংহ দরজার সামনে। দোকান থেকে পুষ্প, বিল্বদল ও পূজার উপকরণ কিনে নিয়ে আমরা নগ্নপদে সিংহদ্বার অতিক্রম করে মন্দিরের ভিতরে পৌছাই। অঙ্গন পার হয়ে একটি অলিন্দে উপস্থিত হই। অলিন্দ অতিক্রম করে উপনীত হই নাটমন্দিরে। উন্মুক্ত এই অলিন্দ, বেষ্টন করে আছে সমস্ত মন্দিরটি, রূপ পরিগ্রহ করে তার প্রদক্ষিণের পথেরও। শীর্ষে নিয়ে আছে নাটমন্দিরটি পৃথক গম্বুজাকৃতি ছাদ, শিরে নিয়ে আমলক, কলস আর ত্রিশূল। দেখি কিছু-ক্ষণ নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে গর্ভ গৃহে অধিষ্ঠিত দেবাদিদেব বিশ্বনাথকে। গর্ভগৃহে প্রবেশ করে পাণ্ডার সাহায্যে তাঁকে দর্শন করি, ভক্তিভরে পূজা দিয়ে স্পর্শ করি তাঁর মহাপবিত্র লিঙ্গের মস্তক।

অনাদি কাল থেকেই প্রচলিত এই লিঙ্গপূজা। সাক্ষী হয়ে আছে তার সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পার আবিষ্কার। প্রচলিত ছিল লিঙ্গের পূজা তখনও। প্রতিষ্ঠা করেন এক শিবলিঙ্গ রামেশ্বরমেও সীতাদেবী। মহা পবিত্র সেই লিঙ্গও। বিরাজ করেন দেবাদিদেবের জ্যোতির্লিঙ্গ এই কাশীধামে।

উল্লিখিত আছে কাশীখণ্ডে ভগবান বিষ্ণুই প্রথম লাভ করেন দেবাদিদেবের সেই জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন, এই কাশীতে। চক্র দিয়ে খনন করেন তিনি একটি পুষ্করিণী, পরিপূর্ণ করেন সেই পুষ্করিণী নিজের স্বেদ-জলে, করেন কঠোর তপস্যা সেই পুষ্করিণীর তীরে দীর্ঘ পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসর। সন্তুষ্ট হন মহাদেব তাঁর তপস্যায়, দর্শন দেন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পার্বতীকে, আদেশ করেন তাঁকে তাঁর অভিলষিত বর প্রার্থনা করতে। পতিত হয় সেই সময় বিশ্বেশ্বরের মণিভূষিত কর্ণভূষণ সেই চক্র পুষ্করিণীর নিকটে। তাই অভিহিত হয় এই স্থান মহামণি-কর্ণিকা বা মণিকর্ণিকা নামে। তিনি সর্বশক্তিমান মহেশ্বরের বরে নিযুক্ত হন

বেদোক্ত মতে সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের কাজে। মহাতীর্থে পরিণত হয় মণিকর্ণিকাও। আজও বুকে নিয়ে আছে তার স্মৃতি মণিকর্ণিকার মহাশ্মশান।

পূর্বে মণিকর্ণিকেশ্বর, দক্ষিণে ব্রহ্মেশ্বর, পশ্চিমে গোকর্ণেশ্বর ও উত্তরে ভারভূতেশ্বর, এই চতুঃসীমান্তর্গত ক্ষেত্রই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্র। কখনও পরিত্যাগ করবেন না এই মহাক্ষেত্র অবিমুক্তেশ্বর দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বর। তিনিই একেশ্বর অধিপতি এই মহাক্ষেত্রের। পরিণত হয় তাঁর অসীম অনন্ত লীলা-ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্র, অনুপ্রাণিত হয় তার প্রতিটি ধূলিকণা, শিবময় হয় সারা কাশী-ধাম। খুব সম্ভব, এই দেবাদিদেব বিশ্বনাথেই সুসমন্বয় হয় বৈদিক যুগের মহাদেবের সঙ্গে প্রাক্‌বৈদিক যুগের কাশী বিশ্বেশ্বরের, লেখেন ডাঃ অ্যাটলেকর।

উল্লিখিত আছে কাশীখণ্ডে মহাপবিত্র জ্ঞানবাপীর উত্তরে স্থাপিত হয় প্রথম মন্দির বিশ্বেশ্বরের। দাঁড়িয়ে আছে এখন সেখানে একটি মসজিদ, মুসলমান ধর্মমন্দির। সেই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই, তারই অনুকরণে গড়ে উঠে কাশীক্ষেত্রে অন্যান্য মন্দির, খনিত হয় মহাপবিত্র জ্ঞানবাপীও।

স্থাপিত ছিল নাকি এই মন্দিরটি, পরিচিত ছিল তখন মহেশ্বরদেবের মন্দির নামে, মহাশ্মশান মণিকর্ণিকার নিকটে, লেখেন চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাং, তাঁর বিবরণীতে। সপ্তম শতাব্দীতে তিনি দর্শন করেন ভারতবর্ষ।

দশম শতাব্দীতে পরিচিত হন বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ নামে, গহড়বালদের রাজত্ব কালে। পরাজিত হন জয়চ্চন্দ্র শেষ নৃপতি গহড়বাল বংশের মহম্মদ ঘুরীর হস্তে, ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, ঘুরীর অধিকারে আসে বারাণসী, তাঁর সেনাপতি কুতবুদ্দিন আইবক ধ্বংসে পরিণত করেন সুপ্রসিদ্ধ মহামহিমময় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটি। ধ্বংসে পরিণত হয় আরও অনেক মন্দিরও কাশীধামের।

পুনর্নির্মিত হয় বিশ্বনাথের (বিশ্বেশ্বরের) মন্দির পূর্বের প্রাচীন মন্দিরটির অবস্থিতির নিকটে ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে, তিনি রাজত্ব করেন ১২১১ থেকে ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়েই সৌরাষ্ট্রের (গুজরাটের) মহাধনী শেঠ বস্তুপাল দান করেন এক লক্ষ মুদ্রা বিশ্বনাথের পূজার জন্যে।

ধ্বংসের লীলা সঙ্গে নিয়ে আসেন মুসলমান বিজেতারা, ধ্বংসে পরিণত হয় বিশ্বনাথের মন্দির আরও কয়েকবার তাদের রাজত্ব কালে, হয় সিকেন্দার লোদীর রাজত্ব কালেও।

১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে পুনর্নির্মিত হয় বিশ্বনাথের মন্দির বৌদ্ধ বিহারের অবস্থিতিতে, জ্ঞানবাপীতে, ঔরঙ্গজেবের তৈরী মসজিদের অধিকৃত স্থানে। নির্মিত হয় কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত নারায়ণ ভাটের প্রচেষ্টায়, তাঁকে সাহায্য করেন রাজা টোডরমল। লাগে পঁয়তাল্লিশ হাজার ডিনার (স্বর্ণমুদ্রা) এই মন্দির নির্মাণে, ব্যয়িত হয় সম্রাট আকবরের তহবিল থেকে। লুক্কায়িত স্থান থেকে আনীত হন জ্যোতির্লিঙ্গও। প্রতিষ্ঠিত হন সেই মন্দিরে।

ধ্বংসে পরিণত হয়েছে বিশ্বনাথের মন্দির একাধিকবার মুসলমান কর্তৃক, কলুষিত হয়েছে তার প্রস্তরের অঙ্গ, কিন্তু হন নাই দেবাদিদেবের মহাপবিত্র জ্যোতির্লিঙ্গ, কলুষিত হন নাই দেবাদিদেবও। প্রতিবারই লুক্কায়িত রেখেছে তাঁকে গোপনস্থানে ভক্তেরা। তাই পরিত্যাগ করেন নাই কাশীক্ষেত্র অবিমুক্তেশ্বর বিশ্বেশ্বরও। খুব সম্ভব ধ্বংসকারীদের কাশী পরিত্যাগ করবার পরেই নির্মিত হয় ক্ষুদ্র মন্দির দেশবাসীর প্রচেষ্টায়, লুক্কায়িত স্থান থেকে আনীত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হন দেবাদিদেবের জ্যোতির্লিঙ্গ সেই সব মন্দিরে, পূজিত হন বিশ্বনাথ, হন বিশ্বেশ্বর।

আসে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দ, মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ধ্বংসে পরিণত করেন নারায়ণ ভাটের নির্মিত বিশ্বনাথের বিগ্রহশূন্য মন্দিরটি। মন্দিরটির ধ্বংসের পূর্বেই ভক্তেরা লুক্কায়িত রাখেন মহাপবিত্র লিঙ্গটি জ্ঞানবাপীর কূপের জলের নিচে। নির্মিত হয় তাঁর আদেশে একটি মস্‌জিদ বিশ্বনাথের মন্দিরের অধিষ্ঠিত স্থানে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে, যাতে পুনর্নির্মাণ করতে পারে না সেই মহাপবিত্র স্থানে বিশ্বনাথের মন্দির হিন্দুরা। তাঁর কাশীধাম পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই নির্মাণ করেন হিন্দুরা একটি ক্ষুদ্র মন্দির বর্তমান বিশ্বনাথ মন্দিরের অধিকৃত স্থানে। বার করে নিয়ে আসেন জ্ঞানবাপীর অভ্যন্তর থেকে মহাপবিত্র জ্যোতির্লিঙ্গও, প্রতিষ্ঠা করেন সেই লিঙ্গ সেই মন্দিরে। আবার পূজিত হতে থাকেন বিশ্বনাথ মন্দিরে ভক্তিভরে। স্থাপিত হয় সেই মন্দিরে কয়েকটি প্রতিমূর্তিও, আনীত হয় তারা ভাটের তৈরী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে।

অতিবাহিত হয় তারপর একশত আট বৎসর ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোরের মহারাণী পুণ্যশীলা অহল্যা বাঈ নির্মাণ করান বর্তমান বিশ্বনাথের মন্দিরটি

বর্তমান জ্যোতির্লিঙ্গের চারিদিকে। উল্লিখিত আছে তাঁর এই নির্মাণের কথা মন্দিরের অঙ্গের একটি শিলালেখে। কিন্তু উল্লেখ নাই তাতে মহারাণী কর্তৃক লিঙ্গের প্রতিষ্ঠার কথা। পাঞ্জাবের মহারাজা রণজিৎ সিংহ মুড়ে দেন তার শিখরের অঙ্গ স্বর্ণ দিয়ে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে।

সমাপ্ত হয় দেবদর্শন, আমরা প্রদক্ষিণ করি মন্দির। তারপর দেখতে থাকি মন্দিরটি, দেখি তার অঙ্গের শিল্পসম্পদ। অঙ্গে নিয়ে আছে মন্দিরটি নাগর পদ্ধতি। চতুষ্কোণ তার গর্ভগৃহের আকৃতি, চতুষ্কোণ তার বহিরাঙ্গের নিম্নাংশেরও, ক্রমহ্রস্বায়মান হয়ে উর্ধ্বে উঠে তার বক্রাকার শিখর অঙ্গে নিয়ে অঙ্গশিখর আর অলঙ্করণ, শিবে নিয়ে আমলক আর কলস। সবার উপর শোভা পায় ত্রিশূল, শিবের প্রতীক।

একটি দ্বার অতিক্রম করে মহাদেবের অঙ্গনে উপস্থিত হই। দেখি অধিষ্ঠিত এই অঙ্গনে বহু দেবতা ও দেবীর মূর্তি, বুকে নিয়ে প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন। শিবের সভাও দেখি।

জ্ঞানবাপীতে উপনীত হই। পুরাণে বর্ণিত হন মহাদেব অষ্ট মূর্তি, তাঁরই জলময় মূর্তি এই জ্ঞানদায়িনী জ্ঞানবাপী। শিব শব্দের অর্থও জ্ঞান, সলিলরূপে অবস্থিত সেই জ্ঞান এই তীর্থে। তাই পরিচিত জ্ঞানোদ নামেও এই জ্ঞানবাপী। তখন সমুদ্র ভিন্ন ছিল না অপর কোন জলাশয়, উৎপত্তি হয় নাই নদীর, উপনীত হন দিকপাল শ্রেষ্ঠ ঈশানদেব সচ্চিদানন্দ নিলয়, অবিমুক্তেশ্বর ক্ষেত্র, বারাণসীতে। এসে দেখেন বিরাজ করেন সেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, অমর, সিদ্ধ মুনি ঋষিগণ সেবিত জ্যোর্তিমালা মণ্ডিত বিশ্বনাথের মহালিঙ্গ। তাঁর অর্চনা করেন অপ্সরা, বিদ্যাধর, করেন কিন্নরগণও, লাভ করেন পরমানন্দ। বাসনা জাগে তাঁর অন্তঃকরণেও শীতল জল দিয়ে মহালিঙ্গকে স্নান করাতে। সঙ্গে জল না থাকায় তাঁর হস্তে ধৃত ত্রিশূল দিয়ে খনন করেন রুদ্রমূর্তি ঈশান তাঁর দক্ষিণ দিকে, অনতি দূরে একটি কূপ। উত্থিত হয় অপর্যাপ্ত জল সেই কূপ থেকে। তিনি সেই জল দিয়ে সহস্রধারা কলসে মহাআনন্দে সেই মহালিঙ্গকে সহস্র বার স্নান করান। প্রসন্ন হন বিশ্বাত্মা বিশ্বেশ্বর সেই স্বচ্ছ শীতল জলে স্নান করে। ঈশানের ইচ্ছায় ও বিশ্বেশ্বরের বরে জ্ঞানসলিল ভাবে অবস্থিত থাকেন বিশ্বেশ্বর। পরিচিত হয় জ্ঞানবাপী বা জ্ঞানোদ নামে সেই কূপ। বলেন

বিশ্বেশ্বর অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করবে জীব এই জ্ঞানবাপীর দর্শনে। সর্বপ্রকার গ্রহ দোষ মুক্ত হবে মানব, চতুর্বর্গ ফল লাভ করবে এই কূপের দর্শনে, স্পর্শনে আর অবগাহনে, তাই মহাতীর্থে পরিণত হয় জ্ঞানবাপী।

জ্ঞানবাপী দর্শন সমাপনান্তে আমরা অন্নপূর্ণার মন্দিরে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি বিশ্বনাথের মন্দিরের বিপরীত দিকে। বহুবিস্তৃত হয়ে আছে তার নাটমন্দিরটি। মাতাকে দর্শন করে ও ভক্তিভরে পূজা দিয়ে মন্দিরে অবস্থিত হনুমানের মূর্তিটি দেখি। মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গৃহে ফিরে আসি।

খাওয়া দাওয়া করে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার বিশ্বনাথের মন্দির অভিমুখে রওনা হই। দেখতে যাই সন্ধ্যা আরতি। সর্বশ্রেষ্ঠ পূজার অঙ্গ বিশ্বনাথের মন্দিরের, চমকপ্রদ আর মহাআডম্বর পূর্ণও, সুরু হয় এই আরতি বিকেল তিনটায়, সঙ্গে নিয়ে সপ্তর্ষি পূজা। অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আরতি দেবাদিদেবের রাত্রি তিন ঘটিকায়, বেলা সাড়ে এগারটায় হয় রাজভোগ। গ্রহণ করেন বিশ্বনাথ এই রাজভোগে ভক্তদের নিকট থেকে নৈবেদ্য। পূজান্তে প্রসাদ রূপে বিতরণ করা হয় এই ভোগ দেড়শত ব্যক্তিকে—সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের, সাধুদের আর অক্ষম ব্যক্তিদের। অনুষ্ঠিত হয় রাজভোগের পর বিকেল তিনটায় সন্ধ্যা আরতি, রাত্রি সাড়ে নটায় শৃঙ্গার আরতি, রাত্রি সাড়ে এগারটায় শয়নারতি। প্রতিটি আরতির পূর্বে দুগ্ধ, দধি, ঘোল ও মধু দিয়ে স্নান করান হয় দেবতাকে, অনুলেপন করা হয় চন্দন ও কর্পূরও।

মন্দিরে প্রবেশ করে, কিছুক্ষণ আগের থেকেই পাণ্ডা মহারাজার কৃপায় স্থান সংগ্রহ করি নাটমন্দির ও গর্ভগৃহের সংযোগ স্থলে। প্রথম সারির এক কোণে, অপেক্ষা করতে থাকি আরতি সুরু হওয়ার। তিনটে বাজতেই আরম্ভ হয় দেবাদিদেবের আরতি। বেজে উঠে ডমরু, দাঁড়িয়ে বাজান তার বাদক, গুরুগম্ভীর তার শব্দ, ক্রমে সেই আওয়াজ চরমে উপনীত হয়। অনবদ্য তার তালও, তার তালে তালে পুরোহিত আরতি করেন বিশ্বনাথের। সুরু হয় সপ্তর্ষিদের পূজাও, তার সঙ্গে সঙ্গে উদাত্ত কণ্ঠের বেদপাঠ, পাঠ করেন সাত থেকে এগারজন পুরোহিত। মহাঅভিজ্ঞ তাঁরা সংস্কৃত সাহিত্যে ও ভাষায়, সুপণ্ডিতও, পাঠ করেন সমবেত কণ্ঠে সেই বাজনার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে। মুখরিত

হয় গর্ভগৃহ হয় সারা মন্দির। সৃষ্টি হয় এক রহস্যময়, এক অলোকসুন্দর পরিবেশ। শোনেন সেই পাঠ গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত দেবাদিদেব, শোনেন সমাগত ভক্ত মণ্ডলী, মোহিত হন শুনে। মুগ্ধ বিস্ময়ে আমরাও শুনতে থাকি সেই পাঠ। জানতেও পারি না কখন থেমে যায় আরতি, সমাপ্ত হয় সপ্তর্ষি পূজাও। স্ত্রীর ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি। কিন্তু কানে ভেসে আসে তার রেশ যতক্ষণ না গৃহে ফিরি।

দর্শন করি শৃঙ্গার আরতি, দেখি সজ্জিত হন দেবাদিদেব বহুমূল্য ভূষণে আর বসনে-হন অপরূপ, মহামহিমময় হন। কিন্তু নাই সে আড়ম্বর, অনুষ্ঠিত হয় অপেক্ষাকৃত শান্তিময় পরিবেশে। মুগ্ধ হয়ে দেখি এই আরতিও। ভক্তিভরে দেবাদিদেবকে প্রণতি জানিয়ে গৃহে ফিরে আসি।

দেখতে যাই শয়নারতিও। দেখি বর্ণনাতীত দেবতার বেশ, তার সঙ্গে ডমরুর মৃদু আওয়াজ, এক মহাপ্রশান্তিতে, এক মহা রহস্যময় পরিবেশে পরিণত হয় সারা মন্দির। ঘুমিয়ে পড়েন দেবাদিদেব, পড়েন বসুন্ধরাও, নিদ্রাভিভূত হয় সারা জগৎবাসী, হয় ত্রিলোক সেই বাজনার ছন্দে। আমরাও গৃহে ফিরে আসি, নিদ্রায় আচ্ছন্ন আমাদের চোখ। আজও নিভৃতে, নির্জনে চোখের সামনে ভেসে ওঠে দেবতাব সেই অপরূপ রূপ।

দেখি একে একে কেদারনাথ, কালভৈরব, পশুপতিনাথ, বিন্দুমাধব, সাক্ষী গণপতি, বিশালাক্ষী, দুর্গা, সঙ্কটবিমোচন, তিলভাণ্ডেশ্বর ও আদিকেশবের মন্দির। দেখি আরও অনেক মন্দির। পবিত্র তীর্থ কাশীধাম ভারতের, বুকে নিয়ে আছে তার পথঘাট, তার গৃহের অঙ্গন, কত মন্দির। বুকে নিয়ে আছে প্রায় সবগুলিই নাগর পদ্ধতি, কিন্তু বিভিন্ন তাদের আকৃতি, পৃথক তাদের বিস্তৃতিও—প্রতীক হয়ে আছে তারা দেবাদিদেব বিশ্বনাথের, তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি বারাণসীর।

বুকে নিয়ে আছে বারাণসী অসংখ্য আশ্রমও। একদিন আনন্দময়ী মাতার আশ্রমে উপস্থিত হই। গঙ্গার বক্ষ ভেদ করে উঠেছে এই আশ্রম, সুসজ্জিত ও বিস্তৃত, বাসস্থান তাঁর শিষ্যদের। একটি সুপ্রশস্ত কক্ষে বসে শুনে আসি তাঁর বাণীও। দেখি আরও অনেক আশ্রমও।

একদিন উপনীত হই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, শ্রেষ্ঠ কীর্তি মনীষী মদনমোহন

মালব্যের, অন্যতম কেন্দ্রস্থল ভারতের বিজ্ঞান ও কারুশিল্প শিক্ষার। দেখি সুন্দরতম রাজপুত চিত্র-শিল্পও, সংগৃহীত একটি কক্ষে। দেখি কাশী বিদ্যাপীঠও, শ্রেষ্ঠ কীর্তি রাজা ভগবান দাসের, শিক্ষাকেন্দ্র ভারতের কত মনীষীর।

দেখি তার গলিতে গলিতে কত বারাণসী শাড়ীর ক্ষুদ্র কারখানা। তৈরী হয় সেখানে সুন্দরতম ব্রোকেডও, অঙ্গে নিয়ে সূক্ষ্ম কারুকার্য আর সুন্দরতম অলঙ্করণ। দেখি কত বিপণীও, পরিপূর্ণ পণ্য সম্ভারে। দেখি যা কিছু আছে দর্শনীয়।

একদিন গঙ্গাপার হয়ে রামনগরে উপস্থিত হই। তার স্থানীয় রাজাদের বাসস্থান তাদের রাজাপ্রসাদটি বিস্তৃত হয়ে আছে গঙ্গার তীরে। দেখি রাজ প্রাসাদ আর কলাভবন, সুসজ্জিত তার প্রাচীরের গাত্র বহু তৈল চিত্র দিয়ে, চিত্র কত প্রতিমূর্তিরও। পৃষ্ঠপোষক শিল্পের, তাঁদের দানে ও প্রেরণায় গড়ে ওঠে কাশীতে বহু শিল্প, কেন্দ্রস্থল হয় কাশী শিল্পেরও। বুকে নিয়ে আছে রামনগরও একটি আধুনিক নাগর পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দির। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তার রাজারা নির্মাণ করেন। দেখি সেই মন্দিরটিও। তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী হয় একটি সঙ্গীত গোষ্ঠী পরিচিত "বেনারস ঘরোয়ানা" নামে। খ্যাতি লাভ করেন এই ঘরোয়ানার বিসমিল্লা খান, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, গিরিজা দেবী ও আরও অনেকে।

পরিক্রমণ করি তার ঘাট সকাল সন্ধ্যায়, অন্যতম আকর্ষণ বারাণসীর, শুনি কত কথকতা, কত কীতনও দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে, নৌকায় চড়ে ভ্রমণ করি গঙ্গার বক্ষেও কত অপরাহ্নে।

নিঃশেষিত হয়ে আসে কাশীরবাসের আয়ু, তাই একদিন সারনাথে উপস্থিত হই, দাঁড়িয়ে আছে কাশীর উপকণ্ঠে বরুণা নদীর অপর পারে। মহা পবিত্র এই সারনাথও, পুণ্যতীর্থ বৌদ্ধদের, এইখানেই বুদ্ধদেব, তথাগত প্রথমে প্রচার করেন তাঁর ধর্মের বাণী, বাণী সাম্যের আর মৈত্রীর। এইখানেই প্রথম প্রবর্তন হয় তাঁর ধর্মচক্রেরও তাই নির্মাণ করেন মৌর্য সম্রাট অশোক এইখানেই একটি স্তূপ আর একটি স্তম্ভ, শীর্ষে নিয়ে চারিটি অপরূপ জীবন্ত সিংহের মূর্তি আর ধর্ম চক্র। নির্মিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব ২৪২ ও ২৩২-এর মধ্যে মসৃণ বেলে পাথর দিয়ে, শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ অশোকের, সুন্দরতম মহামহিমময়ও। সুঙ্গ রাজারাও নির্মাণ

করেন একটি বৌদ্ধবিহার বা সঙ্ঘারাম পুণ্যভূমি সারনাথে। আবিষ্কৃত হয়েছে এখানে কয়েকটি রেলিং-এর স্তম্ভ আর পুরুষের মস্তক, নির্মিত চুণারের বেলে প্রস্তরে, বুকে নিয়ে সুঙ্গ স্থাপত্য পদ্ধতি।

অস্তমিত হয় সুঙ্গ ক্ষমতা, কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে বারাণসী। দান করেন সারনাথকে একটি বোধিসত্বের মূর্তি মথুরা নিবাসী ভিক্ষু বল ১২৫ খ্রীষ্টাব্দে, উৎকীর্ণ আছে তার অঙ্গে। সম্ভবতঃ শাক্য মুনি তিনি, বুদ্ধ-অঙ্গে তাঁর সঙ্ঘের বসন ও ভূষণ, মুণ্ডিত তাঁর মস্তক, ভগ্ন তাঁর উশনিসা, নাই কোন ওড়না তাঁর অঙ্গে। তাঁর দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা, স্থাপিত বাম হস্ত তাঁর উরু-দেশে, তিনি ধারণ করে আছেন তাঁর অঙ্গের বসন। উপবিষ্ট একটি ক্ষুদ্র সিংহ তাঁর দুই পায়ের অন্তর্বর্তী স্থানে। নির্মিত হয় এই বুদ্ধ মূর্তিটি মথুরায়, মথুরার রক্তবর্ণ বেলে পাথরে। অনুরূপ মথুরার তৈরী অন্য বুদ্ধ মূর্তির এই মূর্তিটি, স্থাপিত হয় সারনাথে।

সাজান সারনাথের বুক গুপ্ত সম্রাটরাও, নির্মাণ করেন একটি বুদ্ধ মূর্তি। পদ্মাসনে বসে আছেন বুদ্ধ, বিরাজ করে তাঁর মস্তকের চতুর্দিকে মহাপবিত্র জ্যোতির চক্র, ওষ্ঠে তাঁর মৃদু, প্রশান্ত হাসি, দুই হস্তে 'ধর্মচক্র' মুদ্রা, প্রচারে নিযুক্ত তিনি প্রথম ধর্মের বাণী। তাঁর পাদদেশে পাঁচটি মূতি, সম্ভবতঃ তাঁর পাঁচজন সঙ্গী, তারা পরিত্যাগ করে যায় তাঁকে গয়াতে, পরে পরিণত হয় তাঁর প্রথম পাঁচ শিষ্যে। পঞ্চম শতাব্দীতে চুনারের বেলে পাথর দিয়ে নির্মিত হয় এই মূর্তিটি, মহামহিমময়, সুন্দরতম, নিখুঁত অঙ্গের গঠনে, আর সর্বাঙ্গের বিকাশে, প্রতীক হয়ে আছে বারাণসীর ভাস্করের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, ঐতিহ্যের এক মহাগৌরবময় যুগের।

সাজান বারাণসীর বুক কত হিন্দু ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দিয়েও। অঙ্গে নিয়ে আছে তার শ্রেষ্ঠ আর প্রকৃষ্টতম নিদর্শন রাজঘাটে আবিষ্কৃত কৃষ্ণের গোবর্ধন গিরি উত্তোলনের মূর্তিটি, নিদর্শন হয়ে আছে এক মহিমময় ঐতিহ্যের বারাণসীর ভাস্করের।

রক্ষিত আছে কৃষ্ণের মূর্তিটি, ভারত কলাভবনে, অপর মূতিগুলি সারনাথের যাদুঘরে। তাই আমরা উপস্থিত হই প্রথমে যাদুঘরে, দেখি তার ভাস্কর্যের নিদর্শন মুগ্ধ বিস্ময়ে, মূক হয়ে যাই তাঁর তথাগতের মূর্তিটি দেখে।

যাদুঘর দর্শন সমাপনান্তে আমরা দেখতে যাই ধামেক স্তূপটি। শ্রেষ্ঠ আর প্রসিদ্ধতম কীর্তিস্তম্ভ বারাণসীর, ভারতেরও, নির্মিত হয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। গুপ্ত রাজারা নির্মাণ করেন। নির্মিত ইষ্টক দিয়ে, বুকে নিয়ে আছে এই স্তূপটি কঠিন প্রস্তরের 'আচ্ছাদন' 'পরিচিত শিলাকঞ্চুকী' নামেও। সম্ভবতঃ যুক্ত হয় এই 'আচ্ছাদন' পরবর্তী কালে। কিন্তু সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে না সেই আচ্ছাদন, থেকে যায় অসমাপ্ত অবস্থায়। অভিনব কিন্তু এই প্রস্তরের আচ্ছাদনের অঙ্গের অলঙ্করণের পরিকল্পনা, বিশিষ্ট অর্থবোধক তারা। তাই বুকে নিয়ে আছে এই স্তূপটি সীমাহীন বৈশিষ্ট্য ভারতের ভাস্কর্যের, তার মহা গৌরবময় ঐতিহ্যেরও, অঙ্গে নিয়ে আছে কত বিশিষ্ট প্রতীকও-পরমাশ্চর্য দান বারাণসীর ভাস্করের, তাই অপরূপ এই স্তূপটি। হয়ত বাসনা ছিল মহাঅভিজ্ঞ ঋষি ভাস্করের অলঙ্কৃত করতে স্তূপটির গম্বুজাকৃতি ঊর্ধ্বাংশের সর্বাঙ্গ অনুরূপ ভূষণে। মহামহিমান্বিত হত সমস্ত স্তূপটি, অপরূপ হত।

আটটি প্রক্ষেপন দিয়ে বিভক্ত হয় তার বৃত্তাকার নিম্নতল প্রকোষ্ঠের শ্রেণীতে। রূপ ধারণ করে তারা ক্রমশীর্ণায়মান হিন্দু মন্দিরের শিখরের গঠনে। খোদিত হয় প্রতিটি প্রকোষ্ঠের কেন্দ্রস্থলে, একটি করে খিলানযুক্ত অর্ধচন্দ্রাকার কুলুঙ্গি, বুকে নিয়ে নিচু সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। তাঁরা উপবিষ্ট আটটি প্রচলিত ভঙ্গীতে। অলঙ্কৃত হয় প্রস্তরের কিছু অঙ্গ বুটিদার বস্ত্রের, ক্রোলের আর পুষ্প সমন্বিত ভূষণেও, মহিমান্বিত হয় তার অঙ্গের ভূষণ।

শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই স্তূপের অলঙ্করণের অভিনবত্বের, লেখেন পার্শী ব্রাউন, বুকে নিয়ে আছে তার গাত্রের প্রশস্ত পাড়—একটি অঙ্গে নিয়ে আছে জ্যামিতিক অলঙ্করণ, দ্বিতীয়টি পুষ্পের ভূষণ—পরিবেষ্টন করে সেই পাড় তার সমস্ত নিম্ন গাত্র, বুকে নিয়ে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের, আপন স্বকীয়তার মূর্ত বিকাশের মহাগৌরবময় ইতিহাস।

প্রতীক চূড়ার বা শিখরের, তার পুষ্পের অলঙ্করণ বুকে নিয়ে আছে অবিচ্ছেদ্য, চলমান, গতিশীল তরঙ্গাকৃতি বক্ররেখার আর পুষ্পের ও শাখা প্রশাখার অনুকরণের সুষ্ঠু সমাবেশ। দাঁড়িয়ে আছে তাদের মাঝে মাঝে এক একটি বহুদল সমান্বিত সূর্যমুখী ফুলের পদক। মহাঅভিজ্ঞ শিল্পীর এক সীমাহীন সৌন্দর্যের, এক তুলনাহীন সুষমার পরিকল্পনা, মহামহিমময়,

অভিনবও, মূর্ত প্রতীক গুপ্ত অলঙ্করণ পদ্ধতির। রূপায়িত হয়ে আছে অজন্তার গুহামন্দিরের গাত্রের অপরাজেয় চিত্রেও, অঙ্গে নিয়ে আছে দিল্লীর কুতব মসজিদের সম্মুখভাগও।

সংলগ্ন হয়ে আছে জ্যামিতিক অলঙ্করণ এই অপরূপ পুষ্পের, ভূষণের বুকে নিয়ে এক অনবদ্য প্রীতিকর বৈপরীত্য তার সাবলীল, ছন্দময়, অবিচ্ছিন্ন গতির, অঙ্গে নিয়ে সারি সারি সরলরেখা, বেষ্টন করে আছে সমস্ত স্তূপটিও। বারাণসীর মহাজ্ঞানী ভাস্করের এক অনবদ্য পরমাশ্চর্য অভিনব পরিকল্পনা এই জ্যামিতিক ভূষণ, নাই অন্য কোন মন্দিরে। সাজান নাই এমন সুন্দরতম অত্যাশ্চর্য অলঙ্করণে ভারতের মন্দিরের অঙ্গ অন্য কোন মহাপারদর্শী ভাস্কর।

অলঙ্কৃত করা হয় আটটি প্রক্ষিপ্ত কুলুঙ্গির অন্তর্বর্তী প্রতিটি স্থানও অবিচ্ছেদ্য চলমান 'ফ্রেটের' সূক্ষ্মতম কাজ দিয়ে। বিভিন্ন প্রতিটি ফ্রেটের অলঙ্করণের পরিকল্পনা, রচিত হয় বিভিন্ন রেখার, মূর্তির আর কোণের সমাবেশে, রূপ পরিগ্রহ তার স্বস্তিকার। সম্পূর্ণ রূপপরিগ্রহ করে ঋষি ভাস্করের অলঙ্করণের মুখ্য পরিণতি। অপরূপ হয় স্তূপের অঙ্গের অলঙ্করণ, মহামহিমময় হয় স্তূপ, বিশ্বজিৎ হয়, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন জগৎ সভায়।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি এক মহাসুন্দরের পূজারীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এক অবিনশ্বর কীর্তি, প্রতীক এক মহাগৌরবময় ঐতিহ্যেরও। বরণ করি পরম সুন্দরকে, প্রণতি জানাই তথাগতকে, মহাজ্ঞানী ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ফিরে আসি কাশীতে। দেবাদিদেব বিশ্বনাথকে শেষ দর্শন ও ভক্তিভরে পূজা করে পরের দিন রওনা হই কলিকাতা অভিমুখে। আজও অক্ষয় হয়ে আছে, কাশীধামের স্মৃতি মনের মণিকোঠায়, হয় নাই ম্লান।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজস্থান

(শতাব্দী অষ্টম—একাদশ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওশিয়া

১। হরিহরের মন্দির　　২। সূর্যমন্দির

৩। মহাবীরের মন্দির　　৪। শচীমাতার মন্দির

বহুদিন আগে ভারত সরকারের কর্ম উপলক্ষে অতিবাহিত করতে হয় প্রায় ছয় মাস সম্ভরে মাতা, স্ত্রী, ভগ্নী ও পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে। তার চারিদিকে ধূ ধূ করে মরুভূমি, কেন্দ্রস্থলে নীল সরোবর। যুক্ত হয় তাতে চারিটি স্রোতস্বিনী— মেন্দা, রূপ নগর, খাড়িয়ান আর খাণ্ডেল। বাড়ে নদীর বুক, বর্ধিত হয় হ্রদের জলও, ছড়িয়ে পড়ে যাট মাইল পরিধি নিয়ে। দৈর্ঘ্যে বাইশ মাইল ও প্রস্থে ছ মাইল পরিধি নিয়ে বিস্তৃত এই সম্ভর হ্রদ।

প্রচলিত আছে একটি কিংবদন্তী এই হ্রদের উৎপত্তি সম্বন্ধে। ৫৫১ খ্রীষ্টাব্দ। শাকম্ভরী দেবী ছিলেন চৌহান বা চাহমান রাজাদের গৃহ দেবতা। তিনি বাস করতেন এক মন্দিরে, এক পর্বতের শীর্ষদেশে। এক সাধুও সেই পাহাড়ে থাকতেন। নিযুক্ত থাকতেন কঠোর ধ্যানে। বেষ্টিত ছিল শৈলমালা এক গভীর অরণ্যে। ঘন বনবীথিতে পরিপূর্ণ ছিল তার সংলগ্ন স্থানও। চৌহানদের একটি কামধেনু ছিল। অদৃশ্য হয়ে যেত সে সকাল সন্ধ্যায়, যখন ফিরে আসতো থাকতো না এক ফোঁটাও দুধও তার বাঁটে। ফিরে আসতো শূন্য বাঁটে। ক্রমে সেই খবর রাজার কানে এসে পৌছায়। তিনি ধেনুর অনুসরণ করেন। যান অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে। উপনীত হন তাঁরা সেই পর্বতের সানুদেশে। ধেনুটি পাহাড়ে উঠতে থাকে। ঘোড়ার পৃষ্ঠ থেকে নেমে রাজাও তার অনুগমন করেন। উপনীত হয় ধেনু শৈল শিখরে এক সমতল স্থানে। তার বাঁট থেকে সহস্র ধারায় ঝড়ে পড়ে দুধ। সিক্ত হয় পর্বতশীর্ষ সেই দুগ্ধে। নিঃশেষিত হয় দুধ গরুর বাঁটে, সে চলে যায়। অতিক্রম করে যায় শৈলমালা আর ঘন অরণ্যানি। উপনীত হয় গৃহে।

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থাকেন নৃপতি, হতবাক হন, বিস্ময়ে মূক হয়ে যান একেবারে। তারপর নিযুক্ত হন তিনি পাহাড়ের অন্বেষণে। দেখেন ধ্যানে নিযুক্ত এক যোগী এক গুহার মধ্যে, প্লাবিত তাঁর সর্বাঙ্গ দুধের প্লাবনে। যুক্ত করে কৃতাঞ্জলিপুটে অপেক্ষা করেন ভূপতি যতক্ষণ না ধ্যান ভাঙে যোগীর। শেষে উন্মিলিত হয় যোগীবরের আঁখি, দেখেন উপবিষ্ট তাঁর সম্মুখে নৃপতি। বলেন, "দুধ পেয়ে আমি সন্তুষ্ট। খুশী শাকম্ভরী দেবীও। তাঁর বরে এক সমতল ভূমিতে পরিণত হবে সমস্ত অরণ্য, মাটির নিচে থাকবে মূল্যবান ধাতু।" ভূপতি বলেন, "কি হবে আমার মূল্যবান ধাতু নিয়ে, সৃষ্টি হবে কলহ ও বিবাদের, হবে যুদ্ধ বিগ্রহ।" উত্তর দেন যোগী, "তবে পরিণত হবে এই উপত্যকা এক সরোবরে, জন্মাবে সেখানে নুন, পরিসমাপ্তি হবে না সেই নুনের, হবে অন্তহীন।" নিদ্রা ভঙ্গে সকলে দেখে অদৃশ্য হয়েছে সেই জঙ্গল। প্রসারিত হয়ে আছে তার পরিবর্তে এক সরোবর, বিরাট সীমাহীন। লবণাক্ত তার জল।

বিফল হয় না রাজার আশঙ্কাও। সুরু হয় হ্রদের অধিকার নিয়ে রাজপুত রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ। অংশ গ্রহণ করে সেই যুদ্ধে মারাঠা আর উদয়পুর। এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় সম্ভর। শেষে মুঘলের অধীনে আসে সম্ভর হ্রদ, সম্রাট আকবরের অধিকারে আসে। এই হ্রদের বাৎসরিক আয় পৌঁছায় পনর লক্ষ টাকায় সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে। অস্তমিত হয় মুঘলের ক্ষমতা, সম্ভর হ্রদ যোধপুরের দখলে আসে। লিখে দেন তার অর্ধঅংশ যোধপুর রাজ জয়পুর নৃপতিকে, যৌতুক তাঁর কন্যার বিবাহের। স্থাপিত হয় (সামলাঠ) সম্ভরে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ইজারা নেয় সম্ভর হ্রদ যোধপুর আর জয়পুর দরবারের কাছ থেকে। দিতে হয় মুনাফা, দেয় রয়ালটিও।

আছে একটি বৈজ্ঞানিক ভাষ্যও এই নুনের উৎপত্তি সম্বন্ধে। স্যার টমাস হলাণ্ড, এক সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বলেন, এই নোনা জল আরাবল্লী পর্বতের গহ্বর থেকে আসে। সেখানে আছে খনিজ শিলা, তাতে নুন, ক্ষার আর সোডিয়াম সালফেট আছে। সেগুলি জমা হয় এসে এই হ্রদের নিচে, আসে মাটির তলা দিয়ে। হ্রদের বুকে সৃষ্টি হয় পলিমাটির। সেই পলিমাটি থেকেই লবণাক্ত হয় হ্রদের জল। নোনা হয় বর্ষার জলও, জমে যখন এসে হ্রদের

বুকে। তাই বর্ষার উপর নির্ভর করে নুনের পরিমাণও। দেখা যায় হ্রদের বুকে দেড় ফুট গভীর আল্‌কাতরার মত কালো রং-এর কর্দম তার নিচে বালু।

এই সম্ভরে বাস করবার সময়েই আমরা প্রথমে দেখে আসি জয়পুর আর অম্বর, সঙ্গে নিয়ে মাতা, ভগ্নী স্ত্রী আর পুত্রদ্বয়। তারপর এক শুভ মুহূর্তে রওনা হই যোধপুর আর ওশিয়া দর্শনে। সঙ্গে যান আমার সম্ভর-প্রবাসের নিত্য সহচর, পরম শুভাকাঙ্ক্ষী জ্যেষ্ঠ সহোদরপ্রতীম বালমুকুন্দ ভাটনগর, কোষাধ্যক্ষ সম্ভর রাজকোষের। প্রবীণ, সৌম্য দর্শন, এই ব্রাহ্মণ। মিরাটের অধিবাসী, বাস করেন এই সম্ভরে কর্ম উপলক্ষে দীর্ঘ দশ বৎসর উদ্যানে পরিবেষ্টিত একটি বৃহৎ বাংলোতে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সঙ্গে নিয়ে। নিত্য তত্ত্বাবধায়ক তিনি সমস্ত সম্ভরের অধিবাসীর, সহায়ক তাদের আপদে-বিপদে, রোগে-শোকে, আনন্দ বর্ধক তাদের উৎসবে, প্রিয় তিনি সকলেরই, শ্রদ্ধার পাত্র। আর যান রাজপুত রমণী গোবিন্দ বাঈ। এক সম্ভ্রান্ত রাজপুত পরিবারের কন্যা এই গোবিন্দ বাঈ। নিরুদ্দিষ্ট হন তাঁর স্বামী, এক সুবেদার মেজর, প্রথম যুদ্ধে। তিনি গলগ্রহ হন না কারও, ভিক্ষার পাত্র নিয়ে উপস্থিত হন না কোন ধনী আত্মীয়ের গৃহে। যোগদান করেন এক ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষা করেন ধাত্রী বিদ্যা। এখন নিযুক্ত তিনি প্রধান ধাত্রী সম্ভরের হাসপাতালের। রূপবতী, সুহাসিনী, মিষ্ট ভাষিণী এই গোবিন্দ বাঈ, নিত্য সঙ্গী আমার স্ত্রীর, প্রিয় সহচরী, সচীবও, তাঁর বহিনজি।

বেলা ১০-৪২ মিনিটে আমাদের ট্রেন সম্ভর হ্রদ স্টেশন থেকে ছাড়ে, ধীরে ধীরে অতিক্রম করে প্ল্যাটফর্ম। শেষে দ্রুতগতিতে চলে। দুপাশে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখা যায় মরুভূমি। আমরা একে একে অতিক্রম করি গুধা, কুচামন রোড, আর মেট্রা রোড। তারপর আমরা নিমগ্ন হই গল্পে। গল্প রাজপুত রাজাদের অপরিসীম শৌর্যের, তাঁদের সীমাহীন স্বদেশ প্রেমের, তাঁদের মহৎ আত্মত্যাগের আরও কত গুণের। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ট্রেন এসে থামে যোধপুর স্টেশনে।

উপনীত হই রাজস্থানে। ভীল আর মীনারাই আদিম অধিবাসী রাজস্থানের। বিভক্ত এই রাজস্থান আরাবল্লী পর্বত দিয়ে। উত্তর পশ্চিম ভাগে তার এক দিগন্তপ্রসারী বিস্তীর্ণ মরুভূমি, দক্ষিণ পূর্বভাগে তার শৈলমালা,

গভীর অরণ্য, আর উর্বরা মালভূমি, বুকে নিয়ে আছে কত স্রোতস্বিনী, প্রধান তাদের মধ্যে বনাস আর চম্বল।

গড়ে ওঠে এই রাজস্থানেই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মৎস, বর্তমান জয়পুর, অন্যতম প্রাচীনতম ষোড়শ মহাজনপদের। বিরাট নগরে স্থাপিত হয় তার রাজধানী। উল্লিখিত আছে মহাভারতেও, মহাসমৃদ্ধশালী ছিল এই বিরাট নগর। প্রবল পরাক্রান্ত হন মৌর্যরা, মগধে ৩০০ থেকে ১৮৪ খ্রীষ্টপূর্বে,—রাজস্থান মৌর্যরাজাদের অধিকারে আসে।

পতন হয় মৌর্যদের, অধীনস্থ হয় রাজস্থান শক ক্ষত্রপদের। আসেন তাঁরা মধ্য এশিয়ার অক্ষু নদীর তট থেকে, প্রবেশ করেন ভারতের অভ্যন্তরে। তাঁদের অধিকারে আসে গান্ধার থেকে নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল, আসে মথুরা, উজ্জয়িনী, ভৃগুকচ্ছ (বারোচ) আর সুরাষ্ট্র। আসে ভূমক ও নহপানের অধীনে। রাজত্ব করেন তাঁরা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে। বিস্তৃত হয় ভূমকের রাজ্য মালব, সুরাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান ও সিন্ধুর একাংশ নিয়ে। প্রসারিত হয় নহপানের রাজ্য, মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে আজমীর পর্যন্ত। প্রবল পরাক্রান্ত রুদ্রদামনও, পৃষ্ঠপোষক সংস্কৃত সাহিত্যের, রাজত্ব করেন ১৩০ থেকে ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মালবে আর সৌরাষ্ট্রে। উজ্জয়িনীতে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী। তাঁর অধিকারে আসে পাঞ্জাবের মুলতান অঞ্চল থেকে কোঙ্কন পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ, আসে রাজস্থানও। খ্যাতি লাভ করেন তিনি মহাক্ষত্রপ নামেও।

প্রবল পরাক্রান্ত হন কুষাণ শ্রেষ্ঠ কণিষ্ক, অধিরোহণ করেন সিংহাসনে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, স্থাপন করেন এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য। পুরুষপুরে, বর্তমান পেশোয়ারে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী। বিস্তৃত হয় তাঁর সাম্রাজ্য গান্ধার থেকে বিহার পর্যন্ত, ভারতের বাইরেও মধ্য এশিয়ার মালভূমি পর্যন্ত। তাঁর কাছে পরাজিত হন পাটলীপুত্রের রাজারা, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন উজ্জয়িনীর অধিপতি পশ্চিম শকক্ষত্রপগণও, তাঁর অধীনস্থ হয় গান্ধার, পাঞ্জাব, সিন্ধু আর উত্তর প্রদেশের এক বিস্তীর্ণ অংশ। তাঁর অধিকারে আসে রাজস্থান।

পতন হয় কুষাণদের, মহাপরাক্রমশালী হন মগধে গুপ্তবংশের রাজারা, রাজত্ব করেন প্রবল প্রতাপে ৩০০ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রবল পরাক্রান্ত

হন সমুদ্রগুপ্ত, এক দিগ্বিজয়ী বীর, বিস্তৃত হয় তাঁর নিজের অধিকার উত্তরে হিমালয়, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে নর্মদা ও পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত। তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করে সমতট (দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ) কামরূপ আর নেপাল, করে পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও মালবের গণতন্ত্রগুলি, উত্তর ও পশ্চিমের শক ও কুষাণ নৃপতিগণ। সুদূর সিংহলরাজ মেঘবর্ণও তাঁকে অধিরাজ বলে স্বীকার করেন। তাঁর নৌবাহিনী অতিক্রম করে ভারতমহাসাগরের বহু দ্বীপ, বিস্তৃত হয় তাঁর প্রভাব সেই সব দেশেও। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, পরাজিত করেন পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপদের, তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি, মালব ও সৌরাষ্ট্র তাঁর অধিকাবে আসে। তিনি শকারি নামে খ্যাতি লাভ করেন। বিস্তৃত হয় গুপ্ত সাম্রাজ্য ভারতের পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত।

অধিকারে থাকে রাজস্থান হূন তোরমান ও তাঁর পুত্র মিহিরকুল বা মিহির গুলেরও, আনুমানিক ৪৯০ থেকে ৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিস্তৃত হয় তাঁদের রাজ্যের সীমানা পাঞ্জাব থেকে মধ্যভারত পর্যন্ত। মধ্য এশিয়ার অধিবাসী এই হূনরাও, দুর্ধর্ষ, প্রবেশ করেন ভারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়ে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগে। অনুমানিক ৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে পরাজয় বরণ করেন মিহিরকুল মগধের গুপ্তরাজ বালাদিত্যের কাছে, তাঁকে সাহায্য করেন মান্দাসোরের অধিপতি যশোধর্মণ। প্রবল পরাক্রান্ত তিনিও স্থাপন করেন এক স্বাধীন রাজ্য ষষ্ঠ শতকে বুধগুপ্তের মৃত্যুর পর। মান্দাসোরে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী। ক্রমে প্রশমিত হয় হূনদের ক্ষমতা, শেষে অস্তমিত হয়ে যায় একেবারে, মিশে যায় তারা ভারতের জনারণ্যে, ভারতবাসীতে রূপায়িত হয়।

পতন হয় গুপ্ত ক্ষমতা, গুপ্ত প্রতিপত্তি মগধে, অধীনস্থ হয় রাজস্থান মৌখরি বংশের। অংশ গ্রহণ করেন তাঁরাও উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাজত্ব করেন তাঁদের তিনটি শাখা কনৌজে, বিহারে ও রাজপুতানায় (রাজস্থানে) ষষ্ঠ শতাব্দীতে।

প্রবেশ করেন গুর্জর জাতিও মধ্য এশিয়ার হূনদের সঙ্গে, ভারতে, সমগোত্রীয় হূনদের, তাঁরাও মিশে যান ভারতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে, ভারতবাসীতে

পরিণত হন। তাঁরা স্থাপন করেন স্বাধীন রাজ্য রাজস্থানে—ভিনমালে ও সিরোহিতে আর নর্মদাতীরে ভৃগুকচ্ছে (বারোচে)।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তাঁদেরই এক শাখা, পরিচিত প্রতিহার নামে, স্থাপন করেন মাড়বারে, এক স্বাধীন রাজ্য। ক্রমে তাঁরা অধিকার করেন কনৌজ, হন মহাপরাক্রমশালীও, স্থাপন করেন অষ্টম শতকের শেষভাগে এক বিশাল সাম্রাজ্য। বিস্তৃত হয় সেই সাম্রাজ্য সিন্ধু সীমান্ত থেকে পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) পর্যন্ত আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। তাঁদের অধিকারে আসে সারা রাজস্থান।

মৃত্যু হয় হর্ষবর্ধনের সপ্তম শতাব্দীতে, গড়ে ওঠে নতুন রাষ্ট্রবিন্যাস, সুরু হয় এক নতুন যুগ ভারতের রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে। অবসান হয় প্রাচীন যুগের আরম্ভ হয় মধ্যযুগ। প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যুগ সন্ধিক্ষণের ভারতে রাজপুত জাতির উদ্ভব। তাঁরা অধিকার করেন এক বিশিষ্ট অংশ, গ্রহণ করেন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উত্তর পশ্চিম ভারতের, হর্ষোত্তর যুগে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, তাঁরাই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তার রঙ্গমঞ্চে। এই রাজপুতরাই অধিকার করেন ভারতের অধিকাংশ রাজ সিংহাসনও হিমালয়ের প্রত্যন্ত দেশ পর্যন্ত, হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত—বিজিত হয় যখন ভারত মুসলমান কর্তৃক। জ্বালিয়ে রাখেন তাঁরা স্বাধীনতার উজ্জ্বল প্রদীপ।

তাই অভিহিত এই যুগ রাজপুত যুগ নামেও। তাঁরাই রক্ষক হন হিন্দুধর্মের, হিন্দু সভ্যতার, হিন্দু সংস্কৃতির ও হিন্দু শিল্পের মুসলমান আক্রমণের কালেও।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতও তাঁদের উৎপত্তি সম্বন্ধে। উদ্ভূত তাঁরা সূর্য ও চন্দ্রবংশ থেকে, বলেন মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা আর সি. ডি. বৈদ্য। আধুনিক মতে হূন, গুর্জর প্রভৃতি বহিরাগত জাতির সংমিশ্রণে তাঁরা উদ্ভূত। তাদের মতই তাঁরাও গ্রহণ করেন ভারতের ধর্ম, তার ভাষা, তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা—ভারতবাসীতে পরিণত হন। সমর্থক এই মতের কর্নেল টড ও কুক। আছে ব্যতিক্রম, উদ্ভূত কয়েকটি রাজপুত জাতির শাখা ভারতীয় জাতি থেকেও।

শিথিল হয় এই মধ্যযুগে রাজনৈতিক সংহতি আর ঐক্য, কিন্তু অব্যাহত

থাকে ভারতীয় সংস্কৃতির ও শিল্পের ধারা। জন্মগ্রহণ করেন ভবভূতি, রাজশেখর ও আরও অনেক সাহিত্যিক, মহাসমৃদ্ধিশালী হয় ভারতের সাহিত্য তাঁদের দানে। ক্রমবিলুপ্তি হয় বৌদ্ধ ধর্মের, বর্ধিত হয় হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিপত্তি। আবির্ভূত হন আচার্য শ্রেষ্ঠ জগদগুরু শঙ্করাচার্য আর রামানুজ এই যুগে, আসে এক যুগান্তর ভারতের ধর্মজীবনেও।

নির্মিত হয় নিত্য নতুন মন্দিরও ভারতের দিকে দিকে অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভারতের মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির আর ভাস্করের, তাঁদের সুন্দরতম, শাশ্বত সৃষ্টি, সুমহান কীর্তি, বুকে নিয়ে কত অনবদ্য অলঙ্করণ আর মহামহিমময় জীবন্ত মূর্তির সম্ভার। রচিত হয় কত অপরাজেয় চিত্র শিল্পও এক মহাগৌরবময় যুগের।

স্থাপিত হয় এই মধ্যযুগেই রাজস্থানেও বহু শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্র। স্থাপন করেন পরমার বংশ মালবে, চৌহান বংশ আজমীরে, গুহিলট বংশ মেবারে, গহড়বাল বংশ কনৌজে, রাঠোর বংশ মাড়বারে, আর কাছাওয়া বংশ অম্বরে। স্থাপিত হয় স্বাধীন রাষ্ট্র বিকানীরে, জয়শলমীরে, বুন্দীতে আর কোটাতেও। প্রবল পরাক্রান্ত হন তাঁদের মধ্যে মেবারের (উদয়পুরের) গুহিলট বা শিশোদিয়া বংশ, মাড়বারের (যোধপুরের) রাঠোর আর অম্বরের (জয়পুরের) কাছাওয়া বংশ।

সুরু হয় এক মহাগৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রাজস্থানের, ভারতেরও। ইতিহাস এক অসীম শৌর্যের, এক অমিত বীর্যের, এক অসীম সাহসিকতার, আর মহৎ আত্মত্যাগের। নির্মিত হয় মরুভূমির বুকে কত সুন্দরতম নগর, কত মহামহিমময় রাজপ্রাসাদ, আর প্রাসাদ, কত দুর্ভেদ্য দুর্গও, অঙ্গে নিয়ে শাশ্বত সৃষ্টি, অবিনশ্বর কীর্তি, বুকে নিয়ে অতুলনীয় ঐতিহ্য। অনুরণিত হয় তার প্রতিটি ধূলিকণা কত বীরত্বের কাহিনীতে, কত বীরগাথাতেও।

গড়ে ওঠে রাজস্থানেও (রাজপুতানাতে) গুপ্ত পরবর্তী যুগে কত সুন্দরতম নাগর পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দির, শীর্ষে নিয়ে মহিমময় শিখর, অঙ্গে নিয়ে অনবদ্য সুন্দরতম অলঙ্করণ। অনুরূপ খাজুরাহোর শিখরের এই শিখরগুলি। পরিচায়ক তারা রাজপুতানার অসামান্য শিল্প জ্ঞানের—তার সুন্দরতম প্রতীক। দুর্ভাগ্য ভারতের ধ্বংসে পরিণত হয়েছে তাদের অধিকাংশই মুসলমান বিজেতার

নির্মম অত্যাচারে আর কালের নিষ্ঠুর করালে। কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে অর্ধধ্বংস অবস্থায়—প্রেতাত্মা তাদের পূর্ব গৌরবের।

বুকে নিয়ে আছে গুপ্ত পরবর্তী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নাগর মন্দিরের রাজস্থানের-গিরাসপুরের মলদেব মন্দির, কোটা রাজ্যের ত্রিরত্ন বিষ্ণু মন্দির, চিতোরের কালিকা মাতার আর যোধপুর রাজ্যের যোগেশ্বরের মন্দির। খুব সম্ভব মাড়বারের (যোধপুরের) ওশিয়াই বুকে নিয়ে আছে মহাঅভিজ্ঞ রাজপুত স্থপতির আর ভাস্করের সর্বশ্রেষ্ঠ দান, সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের, মহামহিমান্বিত হয়ে আছে আপন অভিনব বৈশিষ্ট্যে। শাশ্বত হয়ে আছে তাঁদের যুক্ত প্রতিভার অপরিসীম দানে, হয়ে আছে বাঙ্ময়, অপরূপ হয়ে আছে।

নির্মিত হয় আদিনাথের চৌমুখের মন্দির মাড়বারে, সদরির কাছে রণকপুরে, আরাবল্লীর পশ্চিম দিকের ঢালুতে এক সুন্দর ও নির্জন উপত্যকায়। উৎকীর্ণ আছে তার স্তম্ভের অঙ্গে ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ধরণক এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

অভিনব এই চতুর্মুখের মন্দিরের নির্মাণ পদ্ধতিও। চতুর্মুখ এই সব মন্দিরের গর্ভগৃহ, বুকে নিয়ে আছে চারিটি প্রবেশ পথ, চতুর্মুখ গর্ভগৃহে অধিষ্টিত তীর্থঙ্করদের মূর্তিও, পৃষ্ঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কোথাও একজন তীর্থঙ্কর, কোথাও বা চারিটি বিভিন্ন তীর্থঙ্কর। দর্শনীয় হন তাঁরা, চারিটি প্রধান দিক থেকেই। খুব সম্ভব বৃহত্তম জৈন মন্দির এই আদিনাথের মন্দির, বিস্তৃত হয়ে আছে চল্লিশ হাজার বর্গফুট চৌরস পরিধি নিয়ে। বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটি ঊনত্রিশটি সুপ্রশস্ত মণ্ডপ, অঙ্গে নিয়ে আছে চারিশত কুড়িটি নিখুঁত সুন্দরতম স্তম্ভ। বিভিন্ন তাদের প্রতিটির গঠন পদ্ধতিও, বিভিন্ন তাদের অঙ্গের অলঙ্করণ, বিভিন্ন শিল্পসম্ভারও।

একটি সু-উচ্চ মঞ্চের উপর উঁচু প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত হয়ে আছে মন্দিরটি। অনুরূপ এই প্রাচীরটি দুর্গের প্রাচীরের বাড়ে মন্দিরের নিরাপত্তা। নির্জনতম হয় মন্দির, নিভৃততমও হয়। সেই নির্জনে, নিভৃতে, নিরাপদে, মহাশান্তির পরিবেশে বসে জৈন তীর্থযাত্রীরা পূজা করেন তীর্থঙ্করকে, করেন দেবতাকে। বিভিন্ন সুন্দরতম পর্যাপ্ত অলঙ্করণ দিয়ে ভূষিত এই প্রাচীরের গাত্রও। রচিত হয় ছেষট্টিটি প্রকোষ্ঠ, শীর্ষে নিয়ে এক একটি অপরূপ শোভন গঠন, সুষমামণ্ডিত

চূড়া। তাদের পশ্চাতেও শোভা পায় সুউচ্চ চূড়া আর বৃত্তাকার কুপলার শ্রেণী। অপরূপ হয় সমস্ত পরিবেশটি, মহিমময় হয়। নির্মিত হয় পাঁচটি শিখরও। বৃহত্তম আর সুন্দরতম তাদের মধ্যে কেন্দ্রস্থলের প্রধান মন্দিরের শীর্ষদেশের শিখরটি মহাসমৃদ্ধশালী হয়ে আছে প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণ আর পর্যাপ্ত শিল্প সম্পদে। শীর্ষে নিয়ে আছে কুড়িটি স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ কুড়িটি সুষ্ঠু গঠন নয়নাভিরাম গম্বুজ।

প্রাচীরের তিন দিকে, কেন্দ্রস্থলে, তিনটি দ্বিতল প্রবেশ দ্বার, অঙ্গে নিয়ে আছে সুন্দরতম শিল্পসম্পদ আর মূর্তিসম্ভার। বৃহত্তম ও মহামহিমময় তাদের মধ্যে পশ্চিম দিকের প্রবেশ দ্বারটি, প্রবেশ পথ প্রধান মন্দিরের। এই সব প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে, অনেকগুলি স্তম্ভযুক্ত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মূল মন্দিরে উপনীত হতে হয়। বেষ্টিত হয়ে আছে মূল মন্দিরটি অসংখ্য ক্ষুদ্র মন্দির আর উপাসনা মন্দির দিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে তারা পঁচানব্বই ফুট প্রস্থ ও একশত ফুট দীর্ঘ আয়তক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে। সঙ্গে নিয়ে আছে প্রধান মন্দিরটি একটি সুপ্রশস্ত মণ্ডপ। বুকে নিয়ে আছে এই মণ্ডপটি একশটি সুষ্ঠু গঠন, অনবদ্য স্তম্ভ, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম ও সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ আর জীবন্ত মূর্তির সম্ভার। দ্বিতল এই মন্দিরটি, গর্ভগৃহে বিরাজ করেন শ্বেত মারবেল প্রস্তরে নির্মিত আদিনাথ। মহামহিমময় এই মন্দিরের পরিকল্পনা, অনবদ্য, সুন্দরতম রূপদান। মহা-মহিমান্বিত হয়ে আছে মন্দিরটি স্থাপত্যের বৈচিত্র্যে, স্তম্ভগুলির অনুপম বিন্যাসে, ছাদের অঙ্গের আর প্রাচীরের গাত্রের অফুরন্ত ভাস্কর্যের প্রাচুর্যে, হয়ে আছে অপরূপ, প্রতীক হয়ে আছে এক মহাগৌরবময় সৃষ্টির, এক অক্ষয়, অবিনশ্বর কীর্তির এই মহাগৌরবময় যুগের।

গড়ে ওঠে এই রাজপুতানায় দামনারে ঝালরা পটমের ষাট মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এক বিরল অভিনব ব্রাহ্মণ্য নাগর মন্দির। নির্মিত হয় জীবন্ত শৈল মালার অঙ্গ কেটে এই মন্দিরটি অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে বুকে নিয়ে কয়েকটি অভিনব বৈশিষ্ট্য। পাহাড়ের অঙ্গ কেটে তৈরী একটি ২৮২ ফুট দীর্ঘ পথ দিয়ে উপনীত হতে হয় এই মন্দিরে। সেই পথের প্রান্তদেশে খোদিত হয় একটি চতুষ্কোণ গর্ত, কেন্দ্রস্থলে নিয়ে একটি সুবিশাল প্রস্তরখণ্ড। সেই প্রস্তর খণ্ড থেকেই নির্মিত হয় মন্দিরটি। নাই কোথাও বিশেষত্ব এই মন্দিরটির

পরিকল্পনায়, সাধারণ, কিন্তু বিশিষ্ট হয়ে আছে মন্দিরটি, সম্পূর্ণ পৃথক সাতটি ক্ষুদ্রতম মন্দির দিয়ে। সুসামঞ্জস্য তাদের প্রতিটির অবস্থিতি, পরিণত হয় তারা একটি জটিল মন্দিরে।

বুকে নিয়ে আছে পাঞ্জাবের হিমালয়ের কাঙড়া জেলায় অবস্থিত মনস্থর একটি পাথর কেটে তৈরী নাগর-মন্দির। সমসাময়িক এই মন্দিরটি দামনারের, নির্মিত হয় শৈলমালার অঙ্গ থেকে খনিত বেলে-পাথর দিয়ে, অঙ্গে নিয়ে জটিল মনস্তত্ত্ব।

রাজত্ব করেন মাড়বারে প্রবল পরাক্রমে গুর্জর প্রতিহার বংশের রাজারা খুব সম্ভব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। পতন হয় প্রতিহার বংশের রাজাদের, গহড়বাল বংশ প্রবল হন কনৌজে প্রতিষ্ঠা করেন এক স্বাধীন রাজ্য একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। স্থাপিত হয় তাঁদের রাজধানী কনৌজে, দ্বিতীয় রাজধানী বারাণসীতে। চন্দ্রদেব এই বংশের প্রথম রাজা, বিস্তার করেন নিজের অধিকার গঙ্গা ও যমুনার উপত্যকায়। প্রবল পরাক্রান্ত তাঁর পৌত্র গোবিন্দ দেব, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, প্রতিহত করেন তুর্কী আক্রমণ। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা মুঙ্গের পর্যন্ত। জয়চ্চন্দ্র, শেষ নৃপতি এই বংশের, নিযুক্ত হন চৌহান রাজ পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সমরে। তাঁরই আমন্ত্রণে অবতীর্ণ হন মুহম্মদ ঘুরি পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে রণে। পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পর ঘুরি আক্রমণ করেন কনৌজ। পরাজিত ও নিহত হন জয়চ্চন্দ্র চন্দবারের যুদ্ধে। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানের অধিকারে আসে কনৌজ। সুগম হয় ভারতে মুসলমান আধিপত্য স্থাপনের পথ, সহজ হয়।

পতন হয় গহড়বাল রাজা জয়চ্চন্দ্রের, উপনীত হন তাঁরই এক বংশধর রাজস্থানে, মরুদেশে, স্থাপন করেন স্বাধীন রাজ্য মাড়বারে, বর্তমান যোধপুরে, অন্যতম প্রধান রাজ্য রাজস্থানের। পরিচিত রাঠোর নামেও, চুণ্ডা, অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, অলঙ্কৃত করেন সিংহাসন ১৩৯৪ থেকে ১৪২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রবল পরাক্রান্ত তাঁর পুত্র যোধাও রাজত্ব করেন ১৪৩৮ থেকে ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনিই নির্মাণ করেন মাণ্ডোরের সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ, নির্মাতা তিনি যোধপুর শহরেরও। মালদেব সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, অলঙ্কৃত করেন মাড়বার সিংহাসন ১৫৩২ থেকে ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। উপনীত হয় রাঠোর

রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে, বাড়ে তাঁদের সমৃদ্ধি, বর্ধিত হয় প্রতিপত্তিও। শেরশাহ দমন করেন রাঠোর শক্তি। মালদেবের রাজত্বের শেষভাগ থেকেই প্রশমিত হতে থাকে রাঠোর শক্তি সুনিশ্চিত হয় তার আশু পতনও। শেষে ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, বাদশাহের কালিঞ্জরের জয়ের পরে, তাঁরা স্বীকার করেন আকবরের বশ্যতা, মেনে নেন একে একে তাঁর বশ্যতা, বিকানীর, জয়শলমীর, বুন্দী, সিরোহী ও আরও অনেক রাজ্য রাজস্থানের। সুপ্রশস্ত হয় মুঘলের সার্বভৌম সাম্রাষ্য প্রতিষ্ঠার আর্যাবর্তে, সুগম হয়, তাঁদের ও তাঁদের বংশধরদের শৌর্যে ও বীর্যে।

মৃত্যু হয় মাড়বারাধিপতি যশোবন্ত সিংহের জামরুদে, ১০ই ডিসেম্বর ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, অধিকার করেন মাড়বার বাদশাহ ঔরঙ্গজেব। মুঘল সাম্রাজ্যর এক অবিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত হয় মাড়বার।

স্বীকৃত হন নামে মাত্র রাজা মাড়বারের, নাগরের রাঠোর ইন্দ্র সিংহ ছত্রিশ লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারী পণের বিনিময়ে। কিন্তু স্বীকার করেন না পরাধীনতা প্রতিটি মাডবারবাসী। মনস্থ করেন তাঁদের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবার।

১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, প্রসব করেন দুইটি পুত্র যশোবন্ত সিংহের মহিষী, তাঁর মৃত্যুর পর লাহোরে। মৃত্যু হয় তাদের মধ্যে একজনের। আনীত হন দিল্লীতে জীবিত অজিত সিংহ আর রাজার মহিষীরা, আসেন রাজার অনুচরবৃন্দ। তাঁরা অনুরোধ করেন মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে অজিতকে মাড়বারের গদীতে বসাতে, স্বীকার করতে তাঁকে মৃত যশোবন্ত সিংহের উত্তরাধিকারী। কিন্তু তিনি তাঁদের মুঘল রাজঅন্তঃপুরে বাস করতে আদেশ করেন। ক্ষুব্ধ হন অনুচরবৃন্দ বাদশাহের এই ঘৃণ্য প্রস্তাবে। ক্রোধান্বিত হন সারা মাড়বার বাসী, সমস্ত রাঠোর কূল, জীবন পণ করেন স্বদেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে। তাঁদের পুরোধা হন রাঠোরশ্রেষ্ঠ দুর্গাদাস, পুত্র তিনি যশোবন্ত সিংহের মন্ত্রী আশকরণের।

মূর্তিমান প্রতীক তিনি রাঠোর শৌর্যের, উজ্জ্বলতম রত্ন, প্রলুব্ধ হন না তিনি মুঘলের অর্থে, ভীত হন না তাদের অগণিত সৈন্য-সামন্তে। দাঁড়ান একাকী তাদের বিরুদ্ধে হৃদয়ে নিয়ে অসীম সাহস, অমিত শৌর্য আর সীমাহীন সমর

কুশলতা, সম্ভব শুধু প্রবীণ মন্ত্রীর পক্ষে। মৃত্যুপণকারী একদল রাজপুত অতর্কিতে আক্রমণ করেন একটি মুঘল বাহিনীকে, প্রেরিত হন তাঁরা মহিষীদের ও অজিতকে বন্দী করতে। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁদের নিয়ে পলায়ন করেন দুর্গাদাস, পরিত্যাগ করেন রাজধানী দিল্লী, উপনীত হন নিরাপদে যোধপুরে ২৩শে জুলাই ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। ক্রোধান্মত্ত বাদশাহ্ প্রেরণ করেন এক বিপুল সৈন্যবাহিনী যোধপুরে তাঁর তিন পুত্র মুয়াজ্জাম, আকবর ও আজমের নেতৃত্বে। নিজে উপস্থিত হন আজমীরে সমর পরিচালনার জন্য। দখল করেন তাঁরা যোধপুর, লুণ্ঠনও করেন।

ক্ষুব্ধ হন মেবারের শিশোদিয়া রাণা রাজসিংহ সম্রাটের এই অন্যায় আচরণে। তাঁদের বংশেরই এক রাজকুমারী মাড়বারাধিপতি যশোবন্ত সিংহের মহিষী, বিক্ষুব্ধ তিনি বাদশাহ্ কর্তৃক জিজিয়া করের পুনঃ প্রচলনেও। তিনি যোগদান করেন রাঠোরদের সঙ্গে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। পরিণত হয় রাঠোর শিশোদিয়ার যুদ্ধ এক স্বাধীনতার যুদ্ধে, রূপ পরিগ্রহ করে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জাতীয় সংগ্রামের।

অবিলম্বে ঔরঙ্গজেব আক্রমণ করেন মেবার। সুকৌশলী রাণা সমস্ত প্রজাবৃন্দ, আর সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে আশ্রয় নেন দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে, পরিত্যাগ করে যান মেবারের নগর আর সমতলভূমি। অতি সহজেই চিতোর বাদশাহের অধিকারে আসে। পুত্র আকবরের উপর চিতোর রক্ষার ভার ন্যস্ত করে তিনি ফিরে যান আজমীরে। সুরু হয় রাজপুত কর্তৃক অতর্কিত আক্রমণ মুঘল বাহিনীর। আক্রমিত হয় আকবরের অধীনস্থ সমস্ত মুঘল বাহিনী, অপহৃত হয় তাঁদের সমস্ত খাদ্যসম্ভার, ভীত ত্রস্ত হয়ে তারা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যায় একেবারে।

অসন্তুষ্ট হন বাদশাহ আকবরের বিফলতায়। প্রেরিত হন মেবারে তাঁর পরিবর্তে শাহজাদা আজম। ক্ষুব্ধ হন আকবর পিতার এই আচরণে, যোগ দেন রাজপুতদের সঙ্গে পিতার বিরুদ্ধে। তিনি ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে উপনীত হন আজমীরে সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে, আছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজপুত সৈন্যও। কিন্তু বিলম্ব করেন আক্রমণ করতে। অবগত হন ঔরঙ্গজেব পুত্রের বিদ্রোহের বিষয়, অবলম্বন করেন এক কৌশল, পরিত্যাগ করেন আকবরের

পক্ষ রাজপুতগণ। ক্ষতিগ্রস্ত হন মুঘল সম্রাট, হন মেবারের রাণা রাজসিংহও। শেষে বাধ্য হন তাঁরা সন্ধি করতে। সন্ধি হয় বাদশাহের রাণা রাজসিংহের পুত্র রাণা জয়সিংহের সঙ্গে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে। দিতে হয় না মেবারের জিজিয়া কর, তার পরিবর্তে ছেড়ে দিতে হয় রাজ্যের কয়েকটি জেলা মুঘল সম্রাটকে।

কিন্তু হয় না কোন সন্ধি মাড়বারের সঙ্গে। চালান অসীম সাহসিক দুর্গাদাস একক স্বাধীনতার সংগ্রাম অসামান্য কৃতকার্যতার সঙ্গে। চলে সেই যুদ্ধ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরেও, চলে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর। শেষে ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র প্রথম বাহাদুর শাহ বাধ্য হন অজিত সিংহকে মাড়বারের অধিপতিরূপে স্বীকার করতে। পরিসমাপ্তি হয় এক মহাগৌরবময় স্বাধীনতার সংগ্রামের। কিন্তু আজও অমর হয়ে আছেন রাঠোর কুলতিলক বীর শ্রেষ্ঠ দুর্গাদাস মাড়বারের ইতিহাসে—তার প্রতিটি অধিবাসীর অন্তঃকরণে।

অজিত সিংহ নিযুক্ত হন দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে, অংশ গ্রহণ করেন তাতে জয়পুরাধিপতি দ্বিতীয় জয়সিংহও। মৃত্যু হয় বাহাদুর শাহের, স্থাপিত হয় রাজপুত নায়কদের যোগাযোগ সৈয়দ-বিরোধী দলের সঙ্গে। অজিত সিংহ সন্ধি করেন হুসেন আলীর সঙ্গে, বিবাহ হয় তাঁর কন্যার মুঘল বাদশাহের সঙ্গে ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিযুক্ত হন আজমীর ও গুজরাটের শাসনকর্তা। নিযুক্ত হন জয় সিংহও সুরাট আর আগ্রার শাসক। অশান্তিপূর্ণ হয় রাজস্থানও মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রমবনতির যুগে-হয় সিংহাসনের অধিকার নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে, বুন্দীতে, জয়পুরে ও মাড়বারে আর মারাঠাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে। তাই ক্ষণস্থায়ী হয় রাজপুত অভ্যুত্থানের যুগও।

শেষে ১৮১৭ থেকে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মাড়বার (যোধপুর), উদয়পুর ও জয়পুর বৃটিশের সঙ্গে আনুগত্য শর্তে রক্ষামূলক মৈত্রীতে আবদ্ধ হয়, হয় কোটা, বুন্দী, কিষণগড়, বিকানীর, জয়শলমীর, সিরোহী ও প্রতাপগড়ের তিনটি রাজ্যও। বিধ্বস্ত তখন সারা রাজস্থান (রাজপুতানা) পারস্পরিক কলহে, আর মারাঠা, পাঠান ও পিণ্ডারীদের উপদ্রবে, উপনীত হয় তাদের প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি এক কাহিনীতে। ঘটে এক পরম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভারতের

ইতিহাসে, সুদৃঢ় হয় বৃটিশের রাজত্বের ভিত্তি, নিষ্কণ্টক হয়, প্রশস্ত হয় তাদের রাজ্য সম্প্রসারণের পথও।

ট্রেন থেকে নেমে যোধপুর শহরে উপনীত হই, একটি হোটেলে স্থান সংগ্রহ করি। পত্তন করেন এই শহরটি রাঠোর শ্রেষ্ঠ রাও যোধা ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা মাড়বারের।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, চা ও কিছু জলযোগ করে আমরা শহর দর্শনে বার হই। প্রথমে উপস্থিত হই দুর্গপ্রান্তে। শহর থেকে ৪০০ ফুট উঁচুতে, চতুর্দিকে সমতল ভূমির শীর্ষদেশে অবস্থিত এই দুর্গটি, বেষ্টিত হয়ে আছে একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে মহামহিমময় মূর্তিতে উচ্চে তুলে তার উন্নত শির, সুন্দরতম আর সুবিখ্যাত দুর্গ সারা রাজস্থানের। তার প্রাচীরের অঙ্গে রচিত হয় কোথাও বৃত্তাকার, কোথাও চতুষ্কোণ গম্বুজ। তার ভিতরে নির্মিত হয় রাজপ্রাসাদ, সৈন্যনিবাস আর অট্টালিকা। বুকে নিয়ে আছে কয়েকটি মন্দিরও এই দুর্গের অভ্যন্তর ভাগ।

দেখি ঘুরে ঘুরে শহরটি, তার অট্টালিকার শ্রেণী, তার প্রাচীন হর্ম্যরাজি। দেখি তালহাতি-কা-মহল আর গুলাব সাগরের তীরে রাজমহল। গঙ্গাশ্যাম মন্দিরে উপস্থিত হই। দেবতাকে দর্শন করে ও প্রণতি জানিয়ে মহামন্দিরে উপনীত হই। বুকে নিয়ে আছে মহামন্দিরটি একশটি স্তম্ভ। হোটেলে ফিরে আসি। শেষ করি ভোজন পর্ব, খাওয়ার টেবিলের তিন দিকে তিন চেয়ারে উপবেশন করে তিনজন। খাওয়া সমাপনান্তে খানিকক্ষণ গল্প গুজবে কাটিয়ে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করি।

পরের দিন ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করি। তারপর প্রচুর জলযোগ ও চা পান করে পাঁচ মাইল দূরবর্তী মাণ্ডোরে উপনীত হই। প্রাচীন রাজধানী এই মাণ্ডোর মাড়বার রাজ্যের, বুকে নিয়ে আছে তার সুবিস্তৃত উদ্যান যোধপুরের শাসনকর্তাদের দেবল বা স্মৃতি স্তম্ভ। মহিমময় এই স্মৃতি-মন্দিরগুলি শীর্ষে নিয়ে আছে সুউচ্চ চূড়া অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম অনবদ্য অলঙ্করণ, প্রতীক হয়ে আছে মাড়বারের এক মহাগৌরবময় যুগের, এক অপরিসীম ঐতিহ্যেরও। দেখি ঘুরে ঘুরে, শ্রদ্ধা নিবেদন করি স্থপতিকে, জানাই রাজাদেরও, ফিরে আসি হোটেলে। ফিরবার পথে যাদুঘর দেখে আসি।

সংগৃহীত হয়ে আছে এই যাদুঘরে নিদর্শন কত যোধপুরের শিল্পের, নিদর্শন ওশিয়া, কিরাড়ু ও আরও অনেক স্থানের। ভোজন সমাপনান্তে, আমরা ওশিয়ার মন্দির দর্শনে যাত্রা করি, উপনীত হই মন্দিরের সামনে।

দাঁড়িয়ে আছে ওশিয়া গ্রাম যোধপুর শহর থেকে ছত্রিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে। বুকে নিয়ে আছে ষোলটি ব্রাহ্মণ্য ও জৈন মন্দিরের সমষ্টি, অঙ্গে নিয়ে ওশিয়ার স্থপতির আর ভাস্করের মহান, সুন্দরতম দান, তাঁদের আপন বৈশিষ্ট্য-প্রতীক হয়ে আছে তাঁদের বিভিন্ন বহুমুখী প্রতিভারও, বুকে নিয়ে আছে তাঁদের অভিনব পরিকল্পনার মহিময়ত্বের নিদর্শন, অম্লান হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে তারা দুইটি সমষ্টিতে, দুইটি অবস্থিতিতে। বুকে নিয়ে আছে গ্রামের প্রত্যন্ত সীমা এগারটি প্রাচীনতম মন্দির নির্মিত অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে। দাঁড়িয়ে আছে তার পূর্ব দিকে পর্বতশীর্ষে অবশিষ্ট মন্দিরগুলি, খুব সম্ভব নির্মিত পরবর্তী কালে। ক্ষুদ্রতর প্রাচীনতর মন্দিরগুলি আকারে কিন্তু অনুপম গঠনে আর সুন্দরতম, অপরূপ অঙ্গের অলঙ্করণে, মহিমময়। বিভিন্ন প্রতিটি মন্দিরও, বিভিন্ন পরিকল্পনার অভিনবত্বে, পৃথক রূপায়ণেও। বুকে নিয়ে আছে প্রতিটি মন্দির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, বৈশিষ্ট্য ওশিয়ার।

আমরা হরিহরের মন্দিরের সামনে উপস্থিত হই। দাঁড়িয়ে আছে তিনটি হরিহরের মন্দির, খুব সম্ভব প্রাচীনতম মন্দির ওশিয়ার, নির্মিত অষ্টম শতাব্দীতে, অপরূপ মূর্তিতে। মহিমান্বিত হয়ে আছে অঙ্গের অলঙ্করণে, সুষমামণ্ডিত হয়ে আছে শিল্প আর মূর্তিসম্ভার দিয়েও। পঞ্চরত্ন তাদের মধ্যে দুইটি বুকে নিয়ে আছে চারিটি করে বাড়তি গর্ভগৃহ। খাজুরাহোর মন্দিরের মত দাঁড়িয়ে আছে তারা সুউচ্চ ভিত্তির উপর, শীর্ষে নিয়ে আছে কিন্তু প্রাচীন কলিঙ্গের (উড়িষ্যার) শিখরের উন্নততর আর সুন্দরতর সংস্করণ। বুকে নিয়ে আছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হরিহরের মন্দির উন্মুক্ত স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ। অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভের নিম্নাংশ আসন, ভূষিত তার সর্বাঙ্গ সুরুচিপূর্ণ, অলঙ্করণ আর জীবন্ত মূর্তি-সম্ভার দিয়ে। বুকে নিয়ে আছে সুন্দরতম মূর্তিসম্ভার আর প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণ দ্বিতীয় মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশ পথ আর প্রথম মন্দিরের গর্ভগৃহের স্তম্ভগুলিও, হয়ে আছে অপরূপ ওশিয়ার স্থপতির অভিনব স্থাপত্যজ্ঞানে আর ভাস্করের দক্ষ, নিখুঁত রূপায়নে।

সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ মন্দির কিন্তু ওশিয়ার সূর্য মন্দিরটি। পঞ্চরত্ন এই মন্দিরটিও শীর্ষে নিয়ে আছে এই মন্দিরের সুমহান শিখর, অনবদ্য শিরাযুক্ত আমলক। আমলকের উপর রচিত হয় কলস। নির্মিত হয় একটি উন্মুক্ত মণ্ডপও বুকে নিয়ে স্তম্ভের শ্রেণী, ব্যতিক্রম উড়িষ্যায় মন্দিরের, বিভিন্নও। অপরূপ সুন্দরতম এই স্তম্ভগুলি, অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভমূল আর তার শীর্ষদেশ পাত্র ও পল্লবের প্রতীক, দুই কোণে রচিত হয় কুলুঙ্গি, অপরূপ এই কুলুঙ্গি অঙ্গের শিল্প সম্পদে, মুখর, বাঙ্ময় ভাস্করের হৃদয়ের ঐশ্বর্যে আর মনের মাধুর্যে।

বুকে নিয়ে আছে মহাবীরের জৈন মন্দিরটিই একটি সম্পূর্ণ মন্দিরের নিদর্শন। অঙ্গে নিয়ে আছে মহাবীর মণ্ডপ, একটি উন্মুক্ত চন্দ্রাতপ, তার সংলগ্ন একটি সুন্দরতম অলঙ্করণে অলঙ্কৃত তোরণ। খুব সম্ভব অষ্টম শতাব্দীতে এই মন্দিরটি প্রথম নির্মিত হয়। সংস্কৃত হয় দশম শতাব্দীতে, বাড়ে তার কলেবরও। তাই বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি দুইটি যুগের স্থাপত্য আর ভাস্কর্যের নিদর্শন, প্রতীক হয়ে আছে তাদের পরিবর্তন আর পরিবর্ধনের, পট-ভূমি হয়ে আছে বিভিন্ন শতাব্দীর স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের, তাদের অনুধাবনেরও। অনবদ্য কিন্তু এই মন্দিরের চাঁদনির স্তম্ভের শ্রেণী, অঙ্গে নিয়ে আছে ভাস্করের কত নতুন আবিস্কার, কত নব অলঙ্করণ, সিঞ্চিত হয়ে আছে তাঁর মনের অপরিসীম মাধুর্যে, মহিমান্বিত হয়ে আছে, হয়ে আছে অপরূপ। শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তারা গুপ্ত পরবর্তী যুগের স্তম্ভের, তাদের পূর্ণ পরিণতির, সমপর্যায়ে পড়ে তারা গিরাসপুরের মল্লদেব আর চিতোরের কালিকামাতার মন্দিরের স্তম্ভের, সমসাময়িকও।

বুকে নিয়ে আছে ওশিয়ার প্রতিটি মন্দির তার স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের নিদর্শনও। তাই বুকে নিয়ে আছে পিপলাদেবীর মন্দির স্তম্ভের পূর্ণ পরিণতির নিদর্শন। অঙ্গে নিয়ে আছে তার সভামণ্ডপ ত্রিশটি স্তম্ভ, সুরু হয় তাদের নির্মাণ খুব সম্ভব দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে। অনবদ্য এই স্তম্ভগুলি অঙ্গের গঠনে, প্রতীক তারা তাদের পূর্ণপরিণতিরও, তাদের সম্পূর্ণরূপ পরিগ্রহের। বুকে নিয়ে আছে অনুরূপ স্তম্ভের শ্রেণী, যোধপুর রাজ্যের সলদির যোগেশ্বরের মন্দিরও, তার সমসাময়িকও।

বুকে নিয়ে আছে ওশিয়া গ্রামের পূর্বদিকে অবস্থিত শচী মাতার মন্দিরটি পূর্ণ পরিণতির ও সর্বশেষ নিদর্শন ওশিয়ার মন্দির নির্মাণের। স্থরু হয় এই মন্দিরটির নির্মাণ অষ্টম শতাব্দীতে সমাপ্ত হয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।

বুকে নিয়ে আছে একটি অষ্টকোণ বেদী মন্দিরটি সভামণ্ডপের কেন্দ্রস্থলে। নির্মিত হয় তার প্রতিটি কোণে একটি করে স্তম্ভ, স্তম্ভের উপরে অনুচ্চ গম্বুজ। স্থরু হয় ভিতরের এই নির্মাণ পদ্ধতি নাগর মন্দিরে একাদশ শতাব্দী থেকে। জটিল এই মন্দিরের শিখরের নির্মাণ পদ্ধতিও অঙ্গে নিয়ে আছে উরুশৃঙ্গ। তাই নির্মিত হয় এই মন্দিরটি পরবর্তী কালে।

বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরগুলির গর্ভগৃহের প্রবেশপথ ওশিয়ার মহাঅভিজ্ঞ ভাস্করের সর্বশ্রেষ্ঠ দান, তাঁদের সীমাহীন কল্পনার অতুলনীয়, অপরাজেয় রূপদান, অবিনশ্বর কীর্তি এক মহাগৌরবময় যুগের। রচিত হয় কত প্রতীক, কত মূর্তিসম্ভার, কত উপাখ্যান, কত গাথা, কাহিনী কত পুরাণের। এক বহুমুখী শিক্ষার পাদপীঠে পরিণত হয় মন্দিরের অঙ্গ। রচিত হয় লিন্টেলের উপর নবগ্রহের মূর্তি তার নিচে অলঙ্কৃত কুলুঙ্গির শ্রেণী, বুকে নিয়ে আছে প্রতিটি কুলুঙ্গি এক একটি বিখ্যাত ঘটনার সমাবেশ। অঙ্গে নিয়ে আছে কত প্রতীকও, কত পার্শ্বদেবতা, সহায়ক তাঁরা মন্দিরের গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত দেবতার. তাঁদের অনুচরও। রচিত হয় বাজুর নিম্নাংশে ফলকের অঙ্গে মূর্তি দিয়ে সমসাময়িক কাহিনী। খোদিত হয় শেষনাগের মূর্তিও। শোভিত হয় বাজুর সর্ব নিম্নদেশ গঙ্গা ও যমুনার মূর্তি দিয়ে

অঙ্গে নিয়ে আছে প্রথম হরিহরের মন্দির একটি মহামহিমময় ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মূর্তি। অধিকার করেন বিষ্ণু তিন পদক্ষেপে সমস্ত বিশ্ব। জন্ম গ্রহণ করেন বিষ্ণু ক্ষুদ্রকায় বামন হয়ে। প্রবল পরাক্রান্ত অসুররাজ বলির নিকট তিনি প্রার্থনা করেন একটি বর, অনুরোধ করেন তাঁকে তাঁর পদস্থাপন করবার জন্য ভূমি দান করতে। খোদিত এই দৃশ্য দক্ষিণ কোণের নিম্নতম প্রদেশে। রূপান্তরিত হন বিষ্ণু এক মহাতেজশালী ব্যক্তিতে, তাঁর শিরে শোভা পায় সুউচ্চ মুকুট, বাম হস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ হস্তে তিনি ধারণ করেন চক্র, করে সর্পের মালা, মণিবন্ধে স্বর্ণকঙ্কণ, বাহুতে জড়োয়ার বাজু। বিস্তৃত তাঁর পদ মহাশূন্যে—তাঁর এক পা স্থাপিত হয় স্বর্গে, দ্বিতীয় পদ তিনি স্থাপন করেন মর্তে, তৃতীয় পা

দিয়ে তিনি বলি রাজাকে পাতালে নিক্ষেপ করেন। সৃষ্টি হয় এক পার্থিব গতি। দক্ষিণ পদে তিনি পরিপূরক হন শিবের, নটরাজের রূপ পরিগ্রহ করেন। উর্ধ্বে বিস্তারিত হয় তাঁর বামপদ, উপনীত হয় রাহুতে। মহাসমৃদ্ধি-শালী হয়ে আছে মূর্তিটি চারিদিকের অলঙ্করণ দিয়ে। অপরূপ এই মূর্তিটি, মধ্যযুগের প্রথম ভাগে রচিত, বুকে নিয়ে আছে প্রাচীনতার ছাপ, সমপর্যায়ে পড়ে না পরবর্তী যুগের মন্দিরের বামন অবতারের মূর্তির।

ওশিয়ার মহাঅভিজ্ঞ স্থপতি আর মহাপারদর্শী ভাস্করের এক সুন্দরতম, মহামহিমময় সৃষ্টি, এক মহাগৌরবময় ঐতিহ্যের, এক অমর কীর্তির। বরণ করি পরম সুন্দরকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করি তার স্থপতি আর ভাস্করকে, জানাই তার স্রষ্টা নৃপতিদেরও। কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ঃ

"ওহে সুন্দর, মরি মরি
তোমায় কী দিয়ে বরণ করি।"

ফিরে আসি যোধপুরে। আজও অক্ষয় হয়ে আছে ওশিয়ার স্মৃতি মনের মণিকোঠায়, উজ্জ্বল হয়ে আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চিতোর

জয়স্তম্ভ

এগিয়ে আসে সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিন। এই মাসের ২৮শে তারিখেই সম্তরের কাজ শেষ করে কলকাতায় গিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। আগ্রা হয়ে যাব, দেখে যাব পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের আলোকে আলোকিত তাজমহল। স্থন্দরের পূজারী শাহজাহান বাদশাহের অপরূপ সৃষ্টি এই তাজমহল, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি সর্বশ্রেষ্ঠ দান। মহাঅভিজ্ঞ মুঘল স্থপতির আর ভাস্করের প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য জগতের, দাঁড়িয়ে আছে তাজমহল আগ্রাতে যমুনার তীরে। দেখেছি তাজমহল এর আগে আরও দু-বার কিন্তু সৌভাগ্য হয় নাই পূর্ণিমার আলোকে দেখবার। শুনি অপরূপ রূপ পরিগ্রহ-করে তার অঙ্গের প্রতিটি প্রস্তর খণ্ড, মুখর হয়, বাঙ্ময় হয় তার অঙ্গের প্রতিটি শিল্পসম্ভার, প্রতিটি অলঙ্করণ, জীবন্ত হয়, রহস্যময় হয়। মহামহিমান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাজ এক রহস্যলোকে, এক অলোক-স্থন্দর পরিবেশে। সহস্র বিন্দুতে পরিণত হয় তার অঙ্গের শুভ্র সমুজ্জ্বল একবিন্দু অশ্রুজল কালের কপোলতলে, মিশে যায় নিকটের নিস্তব্ধ, নিথর, শোকাকুলা যমুনার বুকের জলের সঙ্গে, এক হয়ে যায় একেবারে।

দেখেছি বহুবার পূর্ণিমার রাত্রিতে দিগন্ত প্রসারী সমুদ্র। শুনেছি সৈকতে বসে সিন্ধুর ডাক, কানে ভেসে এসেছে তাঁর অমিত গর্জন। দেখেছি মহামহিম-ময় হয় তাঁর অঙ্গের প্রতিটি উত্তাল তরঙ্গ সেই আলোয়, ছুটে আসে ধরিত্রীর পানে, আসে আকুল আবেগে অশ্রান্ত গতিতে। এক উদ্দাম আনন্দে পরিপূর্ণ হয় সারা অন্তঃকরণ।

দেখেছি দেবতাত্মা হিমালয়ের স্থমহান অঙ্গও পূর্ণিমার রাত্রিতে চাঁদের আলোকে। দাঁড়িয়ে থাকেন হিমালয়, এক ধ্যানমৌন যোগী, উর্ধ্বে তুলে

তাঁর অভ্রভেদী শির সেই আলোকে, এক প্রশান্ত মূর্তিতে। অনুভব করেছি এক পুলকের শিহরণ সর্বাঙ্গে, এক অপরিসীম আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছে মন, এক প্রশান্তিতে ছেয়ে গেছে সারা অন্তঃকরণ।

দেখেছি সন্তরে বসে পূর্ণিমার রাত্রিতে মরুর বুকও, লাল হয়ে যায় তাঁর দিগন্ত প্রসারী বক্ষ, তাঁর বুকের প্রতিটি বালুকণা, তাঁর অঙ্গের বিরল তৃণ-গুল্ম আর নিঃসঙ্গ মহীরুহ। রক্তিম বর্ণ ধারণ করে আকাশ, দিগন্ত হয় লালে লাল। নিশ্চল, নিস্তব্ধ হয়ে শয়ন করে থাকেন মরুভূমি, নিভৃতে, নির্জনে। এক মহা প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয় সারাদেহ, হয় মনও। কানে ভেসে আসে এক অসীমের সুর, প্রবাহিত হয় সেই সুর দেহে আর মনে।

কিন্তু আজও দেখা হয় নাই পূর্ণিমার রাত্রিতে তাজ, তাই এই আকুল আগ্রহ দেখবার জন্য। দেখা হয় নাই মহাপবিত্র পুষ্কর হ্রদ, হয় নাই চিতোরও, বুকে নিয়ে আছে চিতোর কত বীর্যের কাহিনী, কাহিনী কত মহান আত্ম-ত্যাগেরও। ১৮ই সেপ্টেম্বরই স্থির করি পুষ্কর দর্শনে যাত্রার দিন। ভোর থেকেই ঘন মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে, ঘুম ভেঙ্গে যায় ময়ূরের কেকা ধ্বনিতে। বাইরে বেরিয়ে দেখি অঙ্গনে নৃত্যরত চারটি ময়ূর। পাশাপাশি বসে আছে গৃহের ছাদের উপরও তিনটি ময়ূর, বিস্তৃত তাদের পক্ষদ্বয়। অপরূপ তাদের অঙ্গের সুষমা, অভিনব তাদের প্রসারিত বক্ষের বর্ণসম্ভারও, আলো করে আছে সমস্ত ছাদ। বিরল নয় এই ময়ূরের সমাবেশ আমার গৃহে, ঘটে এই ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই।

শুনি ভোরেই শুভাগমন হয়েছে কয়েকটি বন্ধুরও, তাঁরা বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন। গৃহিনীকে যাত্রার প্রস্তুতির জন্য তাগিদ দিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাই, সুরু হয় বর্ষণও, কিন্তু ক্ষীণ তার বেগ, আতঙ্কিত হই যাত্রা স্থগিদের আশঙ্কায়। এমন সময় গৃহিনী এসে বলেন তাঁরা প্রস্তুত, ঘণ্টা খানেক আগেই স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছেন সমস্ত জিনিসপত্র দুইটি কুলির মাথায় দিয়ে। বলেন আহারও প্রস্তুত। তাই বন্ধুদের বিদায় দিয়ে ভিতরে গিয়ে আমরা আহার সমাপন করি। আহার সমাপনান্তে দ্রুতগতিতে সন্তর স্টেশন অভিমুখে পদব্রজে রওনা হই। তখনও বিরাম হয় নাই মৃদু বর্ষণের, হয় নাই সমাপ্তি।

স্টেশনে পৌছাতে মিনিট পনেরো লাগে। টিকিট কিনে আমরা পাঁচ মাইল দূরবর্তী ফুলোরাগামী ট্রেনে চড়ে বসি, ফুলেরাতে ট্রেন বদল করে আজমীরগামী গাড়ীতে আরোহণ করি। ট্রেন ছাড়ে অগ্রসর হয় আজমীর অভিমুখে। দু-পাশে দেখা যায় দিগন্তপ্রসারী মরুভূমি, তার মাঝে কণ্টক বৃক্ষ ও লতাগুল্ম। কোথাও বা এক একটি নিঃসঙ্গ গিরিবর দাঁড়িয়ে আছেন মরুর বুক ভেদ করে উন্নত শিরে। পার হয়ে যাই কত স্টেশনও।

হঠাৎ রুদ্ধ হয় ট্রেনের গতি দুই স্টেশনের অন্তবর্তী স্থানে। দ্রুত গতিতে অগ্রসর হন গার্ড সম্মুখ পানে, হন আরও অনেক যাত্রী। আমিও তাদের অনুগমন করি, দেখি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে লাইনের উপর একটি মানুষ, ছিন্ন তার অঙ্গের বসন, মলিন তার অঙ্গের আবরণ। বেশ কিছুক্ষণ লাগে তাকে সেখান থেকে বার করতে। ঘুরে-ঘুরে দেখতে থাকি চতুর্দিক। মোহিত হই এক সুন্দরতম নয়নাভিরাম পরিবেশ দেখে। অনতিদূরে বিস্তৃত হয়ে আছে একটি হ্রদ সেই মরুর বুকে, তার পাশেই একটি গিরিশৃঙ্গ অঙ্গে নিয়ে আছে শ্যামল আভরণ। বামে দূরে দাঁড়িয়ে আছে শৈলমালা শীর্ষে নিয়ে একটি প্রাসাদ। ট্রেন ছাড়বার বাঁশির ধ্বনি শুনে নিজেদের কামরায় উঠে বসি, গাড়ী ছাড়ে। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় আজমীর স্টেশনে এসে ট্রেন থামে। ট্রেন থেকে নেমে একটি পরিচিত বন্ধুর গৃহে উপনীত হই। বন্ধু এসে সাদরে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে যান, তখন অপরাহ্ণের শেষ আলো মিলিয়ে যায় দিগন্তে।

পরের দিন সকালে তীর্থশ্রেষ্ঠ পুষ্কর দর্শন করি। দেখি প্রথম পুষ্কর। অপরাহ্ণে শহর দর্শন করে গৃহে ফিরে আসি। রাত্রি এগারোটার ট্রেনে চিতোর গড় অভিমুখে রওনা হই। ভোর পাঁচটায় চিতোর গড়ে উপনীত হই, স্থান সংগ্রহ করি একটি হোটেলে। হাত মুখ ধুয়ে, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে চিতোর দুর্গ অভিমুখে রওনা হই। দুর্গদ্বারে উপস্থিত হই।

মেবারের প্রাচীন রাজধানী এই চিতোর। রাজত্ব করেন এই মেবারেই অমিত বিক্রমে প্রবল পরাক্রান্ত গুহিলা বা গুহিলোট বংশের রাজপুতরা, পরিচিত শিশোদিয়া নামেও। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই হয় এই মেবারেই রাজপুত প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ, ছড়িয়ে পড়ে তার খ্যাতি দিকে-দিকে।

জন্মগ্রহণ করেন এখানেই বংশ পরম্পরায় একের পর এক কত অসাম সাহসী সেনাপতি, কত মহাবীর সেনানায়ক, কত শক্তিশালী নেতা, কত মহাঅভিজ্ঞ, বিচক্ষণ নায়ক, কত স্রষ্টা আর কত মহাপ্রতিভাশালী কবিও।

উল্লিখিত আছে তাঁদের কাহিনীতে, লেখেন কর্ণেল টড্, উদ্ভূত তাঁরা সূর্য বংশ থেকে, বংশধর শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লবের। অযোধ্যা থেকে এসে বসতি স্থাপন করেন তাঁদের এক পূর্বপুরুষ কনক সেন সৌরাষ্ট্রে, দ্বারকাতে। সম্ভবতঃ ১৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি অধিকাব করেন পরমার রাজবংশের এক রাজার রাজ্য। স্থাপিত হয় রাজধানী বীরনগরে।

অতিবাহিত হয় কয়েক শত বৎসর, প্রবল পরাক্রান্ত হন তাঁদেরই এক বংশধর, শিলাদিত্য, সূর্যের বরে। উঠে আসে মহাপবিত্র সূর্যকুণ্ড থেকে দেবতার সপ্তাশ্ব তাঁর আহ্বানে। সেই সপ্তাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করে তিনি নিযুক্ত হন রণে, হন সমর বিজয়ী, হন এক দিগ্বিজয়ী বীর। পরাজিত হন তাঁর হস্তে বলভীপুরের নৃপতি, হন তিনি বলভীপুরের অধিপতি।

অপবিত্র করেন সেই মহাপবিত্র সূর্যকুণ্ড তাঁর এক বিশ্বাসী মন্ত্রী। হূনরা আক্রমণ করে বলভীপুর। তিনি সূর্যকুণ্ডে উপনীত হয়ে আহ্বান করেন সপ্তাশ্বকে বারংবার। কিন্তু নিষ্ক্রান্ত হয় না সপ্তাশ্ব কুণ্ডের ভিতর থেকে। পরাজিত ও নিহত হন শিলাদিত্য হূণদের সঙ্গে যুদ্ধে। নিহত হন তাঁর সৈন্য-সামন্ত ও তাঁর পরিজনবর্গ ও বলভীপুরের অধিবাসীরাও। ধ্বংসে পরিণত হয় বলভীপুর সম্ভবতঃ ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে।

বেঁচে থাকেন শুধু রাণী পুষ্পবতী, কন্যা তিনি পরমার বংশের চন্দ্রাবতীর রাজার, গর্ভবতীও তিনি তখন, বাস করেন চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে, পিতৃগৃহে। তিনি শোনেন নৃপতি শিলাদিত্যের মৃত্যুর সংবাদ অতিক্রম করেন যখন মালিয়া পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত বীরনগর, বলভীপুরে ফিরে যাওয়ার পথে। অবগত হন বলভীপুরের ধ্বংসের কথাও, সঙ্গে তাঁর বলভীপুরের আশিজন রাজপুত বীর। আশ্রয় নেন তিনি মালিয়া শৈলমালার একটি গুহায়। সেই গুহার অভ্যন্তরেই জন্মগ্রহণ করে রাণীর একটি পুত্র সন্তান। গুহার ভিতরে জন্ম তাই তার নাম রাখা হয় গোহ। বীরনগরের মন্দিরের পুরোহিতের কন্যা কমলাবতীর হাতে পুত্রের প্রতিপালনের ভার অর্পণ করে, তিনি প্রজ্বলিত চিতায় উঠে মৃত্যুবরণ

করেন। গোহকে বুকে তুলে নিয়ে কমলাবতী যান, বীরনগরে নিজের আলয়ে, সঙ্গে যান সেই রাজপুতগণও, অধিবাসী হন তাঁরাও বীরনগরের।

রাজত্ব করেন তখন এই পাহাড়ের শীর্ষদেশেই এদুরে বন্য ভীলেদের রাজা মণ্ডলিক। পরিণত হন গোহ এক দুর্দান্ত বালকে, খেলার সঙ্গী তাঁর ভীল-বালকেরা। তারাই একদিন খেলার ছলে মনোনীত করেন তাঁকে তাদের রাজা। অবগত হন সেই সংবাদ ভীলরাজা মণ্ডলিকও, অনুমোদন করেন ভীল বালকদের মনোনয়ন। তাঁর আদেশে অঙ্কিত করে গোহর ললাটে, রাজটিকা, নিজের আঙুল কেটে এক ভীল বালক। নিহত হন ভীলরাজ মণ্ডলিক, গোহ অধিরোহণ করেন ভীল-সিংহাসনে। জন্মগ্রহণ করেন তিনি গুহাতে, তাই গুহিলট নামে পরিচিত হয় তাঁর বংশও।

রাজত্ব করেন এই এদুরেই তাঁর বংশধরেরা, শেষে নাগাদিত্য অষ্টম পুরুষ এই বংশের, অধিরোহণ করেন এদুরের সিংহাসনে। মহা অত্যাচারী তিনি, উত্ত্যক্তও ভীলেরা এই বংশপরম্পরা বৈদেশিক শাসনে, শাসনে রাজপুতদের। অতিক্রম করে তাদের সহ্যের সীমা, একদিন তারা আক্রমণ করে নৃপতিকে, তখন তিনি শিকারে নিযুক্ত। হত্যা করে তাঁকে, বঞ্চিত করে এদুরের সিংহাসন থেকেও। তাঁর পুত্র বাপ্পার বয়স তখন তিন বছর। এবারেও এগিয়ে আসেন বীরনগরের ব্রাহ্মণী কমলাবতীর বংশধরেরা বলভীর রাজবংশের রক্ষায়, নিযুক্ত তখন তাঁদেরই এক বংশধর এদুরের রাজপুরোহিত, তিনিই আশ্রয় দেন শিশু বাপ্পাকে। সেই সন্ধ্যাতেই আশ্রয় নেয় তাঁর গৃহে একটি ভীল রমণীও, অঙ্কে নিয়ে দুইটি শিশু পুত্র—বলিয় ও দেব, এঁকে দিয়েছিল গোহর ললাটে তাদেরই এক পূর্ব পুরুষ রাজটিকা।

পরিত্যাগ করেন রাজপুরোহিত বীরনগর, উপনীত হন তাদের নিয়ে ভাণ্ডীরের দূর্গে, অধীনস্থ তখন সেই দুর্গ, যদুবংশের এক ভীল রাজার।

সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত করে তাঁরা বসতি স্থাপন করেন এসে নগেন্দ্র নগরে, এক দিকে তার ত্রিকুট পর্বত অপর দিকে ভয়াল হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল পরাশর অরণ্য, কাছেই এক শোলাঙ্কী নৃপতির রাজপ্রাসাদ। মানুষ হতে থাকেন বাপ্পা এই নগেন্দ্র নগরে. সঙ্গী তাঁর সেই দুই ভীল বালক। ক্রমে তিনি পরিণত হন এক সুদর্শন বীর্যবান যুবকে, পরিপূর্ণ প্রাণের প্রাচুর্যে। এইখানেই

এক ঝুলন পূর্ণিমায়, খেলার ছলে বিবাহ হয় তাঁব শোলাঙ্কি রাজকুমারীর সঙ্গে তার পিতার অজ্ঞাতে। সন্তুষ্ট হন বাপ্পার সেবায় মহর্ষি হারিতও। তিনি আশীর্বাদ করেন দীর্ঘজীবী হও বলে, বলেন হও তুমি বিশ্বজয়ী। দান করেন তিনি বাপ্পাকে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া, দেন ধনুর্বানও। সমর্পণ করেন তাঁর হস্তে একলিঙ্গের মূর্তিটিও, বলেন আজ থেকে হও তুমি "এক লিঙ্গের দেওয়ান" হ'ক তোমার বংশের সমস্ত ভবিষ্যৎ রাজাও।

তারপর একদিন বাপ্পা পরিত্যাগ কবে যান নগেন্দ্র নগর, বিদায় নিয়ে যান তাঁর প্রতিপালক বৃদ্ধ রাজপুরোহিতের কাছ থেকে, সঙ্গে নিয়ে যান একলিঙ্গের মূর্তিটি, খাঁডা আর ধনুশ্বর, তখন তিনি পঞ্চদশ বৎসরের এক যুবক। সঙ্গী হন তাঁর দুই ভীল যুবক বলিয় আর দেবও। তাঁরা চিতোর অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁরা অতিক্রম কবেন কত গ্রাম, পার হয়ে যান কত দেশ, শেষে চিতোরে উপনীত হন, লাগে দীর্ঘদিনও।

রাজত্ব করেন তখন চিতোরে তাঁর মাতুল পরমার বংশের মরি-রাজা। আতঙ্কিত তখন চিতোর আসন্ন বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কায়। মুগ্ধ হন চিতোর-রাজ তাঁর সুগঠিত দেহ আর বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তি দেখে, নিযুক্ত করেন তাঁকে সেনাপতির পদে। তিনি প্রেরিত হন যুদ্ধে। পরাজয় বরণ করে তাঁর কাছে শত্রুপক্ষ। ফিরে আসেন তিনি চিতোরে, উন্নত শিরে, বিজয়ের গৌরব বহন করে। শেষে একদিন বৃদ্ধ মরি-রাজকে হত্যা করে অধিকার করেন চিতোরের সিংহাসন। প্রতিষ্ঠিত হয় গুহিলট রাজবংশ চিতোরে, হয় মেবারে। খুব সম্ভব ঘটে এই ঘটনা ৭২০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি একশত বৎসর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। করেন তিনি বহু বিবাহও, আছে তার মধ্যে মুসলমান ধর্মাবলম্বীও। তাঁর বিজয় অভিযান অতিক্রম করে খোরাসান। পরাজয় বরণ করেন তাঁর কাছে ইস্পাহান, কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাক, ইরাণ, তূরাণ আর কাজাকিস্থানের নৃপতিগণ, হন তিনি এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী।

পরম রূপবতী মেবারের রাণা রতন সিংহের মহিষী পদ্মিনী, শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ভারতের, ছড়িয়ে পড়ে, তাঁর সৌন্দর্যের খ্যাতি দিকে-দিকে। শোনেন দিল্লীর মুসলমান সুলতান আলাউদ্দিনও। তিনি মনস্থ করেন পদ্মিনীকে লাভ করতে, অধিকার করতে মেবার। প্রকৃতির এক সুন্দরতম সুদুর্গম পরিবেশে অবস্থিত

এই মেবার আজও নতিস্বীকার করে নাই মুসলমান বিজেতাদের কাছে, দাঁড়িয়ে আছে সগৌরবে অগ্রাহ্য করে মুসলমান প্রভুত্ব, জ্বালিয়ে রেখেছে স্বাধীনতার উজ্জ্বল প্রদীপ।

তিনি আক্রমণ করেন মেবার সঙ্গে নিয়ে আসেন পদ্মিনীকে লাভ করবার প্রস্তাব। স্বীকৃত হন রাণা, আরশির ভিতর দিয়ে সুলতানকে নিজের পত্নী পদ্মিনীকে দেখাতে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করেন সুলতান, বন্দী করেন রাণাকে নিজের শিবিরে। রাণীকে জানান তাঁর আত্মসমর্পণের বিনিময়েই হবে রাণার মুক্তি। স্বীকৃত হন রাণী সুলতানের প্রস্তাবে। সজ্জিত হন সাতশত বীর, সশস্ত্র রাজপুত যোদ্ধা নারীবেশে, আরোহণ করেন প্রতিটি পাল্কীর মধ্যে এক একটি যোদ্ধা, উপনীত হন মুসলমান শিবিরে। তাদের সাহায্যে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন রাণাকে, উল্লিখিত আছে কর্ণেল টডের বিবরণীতে। কিন্তু বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মত এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে।

তখন আক্রমণ করেন চিতোর সুলতান আলাউদ্দিন। গোরা ও বাদলের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন বীর বিক্রমে রাজপুত সৈন্যরা, প্রতিরোধ করেন মুসলমান আক্রমণ। শেষে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করেন রাণা, করেন প্রতিটি রাজপুত সৈন্যও। নারীরা প্রাণ বিসর্জন করেন প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পালন করেন জহরব্রত। পরাজিত হয় রাজপুত, পরাজয় বরণ করে চির স্বাধীন মেবার, জয়ী হয় মুসলমান, হন সুলতান আলাউদ্দিনও। সুগম হয় মালব ও সৌরাষ্ট্র যাওয়ার পথও, নিষ্কণ্টক হয়। নিযুক্ত হন সুলতানের পুত্র খিজির খাঁ মেবারের শাসনকর্তা, খিজিরাবাদে পরিবর্তিত হয় তার নামও। ঘটে এই ঘটনা ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে।

১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে পরিত্যাগ করেন মেবার খিজির খাঁ, নিযুক্ত হন ঝালোরের অধিপতি মালদেব তার শাসনকর্তা। তিনি শাসন করেন মেবার সাত বছর। শেষে রাণা হাম্মীর পুনরাধিকার করেন মেবার মুসলমান বিজেতাদের হাত থেকে। পুণঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তার হৃতগৌরব, তার খ্যাতি আর প্রতিপত্তিও।

১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেন হাম্মীর। রেখে যান এক সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিস্তৃত রাজ্য। আজও উচ্চারিত হয় তাঁর নাম সসম্মানে প্রতিটি মেবারবাসীর কণ্ঠে-অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা তিনি মেবারের শৌর্যে ও জ্ঞানে।

তাঁর পুত্র ক্ষেত্র সিংহ অধিরোহণ করেন মেবারের সিংহাসনে তাঁর মৃত্যুর পর। নিহত হন ক্ষেত্র সিংহ ১৩৮২ খ্রীষ্টাব্দে, অধিরোহণ করেন মেবারের সিংহাসনে তাঁর পুত্র লাখা। ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয় লাখার, মোকালা আরোহণ করেন মেবারের সিংহাসনে।

নিহত হন মোকালা, ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাণা কুম্ভকরণ অধিরোহণ করেন মেবারের সিংহাসনে। সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা মেবারের, অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি ভারতেরও ছড়িয়ে পড়ে তাঁর খ্যাতি ভারতের দিকে-দিকে। উপনীত হয় মেবার সমৃদ্ধিব, প্রতিপত্তির আর ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ শিখরে তাঁর রাজত্বকালে। তাই অমর তিনি মেবারের ইতিহাসে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই কুম্ভ, সম্মিলিত হয় তাঁর মধ্যে হামীরের অসীম শক্তি, লাখার অসাধারণ শিল্পজ্ঞান আর তাঁদের যুক্ত প্রতিভা, তিনি সাফল্য লাভ করেন তাঁর সমস্ত কার্যে। সফল হয় তাঁর প্রতিটি উদ্যম, তাঁর প্রতিটি মহৎ প্রচেষ্টা। আবার উন্নীত হয় মেবারের রক্ত-পতাকা ঘাঘরের তীরে, এইখানেই পরাজয় বরণ করেন সমষি বলেন মনীষী টড। তাঁর বিজয় অভিযান অতিক্রম করে মালব ও সৌরাষ্ট্র (গুজরাট), তাঁর কাছে পরাজয় বরণ করেন তাদের মুসলমান শাসক।

শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাও, তিনি নির্মাণ করেন মেবারে বহু সুন্দরতম মন্দির। তিনিই নির্মাণ করেন বত্রিশটি দুর্গ, মেবারের চুরাশিটি দুর্গের মধ্যে। সহায়ক তারা মেবারের প্রতিরক্ষার। দুর্ভেদ্যতম তাদের মধ্যে কুম্ভগড়ের দুর্গটি অপরাজেয়, অদ্বিতীয় দুর্গ ভারতে, রণচাতুর্যে, পরিচায়ক তাঁর অসামান্য সমরনীতি জ্ঞানেরও। তিনিই নির্মাণ করেন একটি জয়স্তম্ভ মেবারে, পরিচিত কীর্তি স্তম্ভ নামেও। বুকে নিয়ে আছে এই জয়স্তম্ভটি তাঁর অসামান্য প্রতিভার নিদর্শন, প্রতীক হয়ে আছে এক শাশ্বত কীর্তির, ঐতিহ্যের এক গৌরবময় যুগের। তিনি একাধারে কবি, সুপণ্ডিত, সাহিত্যিক, মহাঅভিজ্ঞ বিভিন্ন সঙ্গীতেও। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুত্র উদয়করণ কর্তৃক নিহত হন।

উদয়করণকে সিংহাসনচ্যুত করে, রাজ্যের প্রধানব্যক্তিরা তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রায়মল্লকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। রায়মল্লের মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম পুত্র সংগ্রাম সিংহ, পরিচিত সঙ্গ নামেও, ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মহাপরাক্রমশালী এই সঙ্গ, বিজেতা শত যুদ্ধের

অঙ্গে তাঁর আশীটি ক্ষতের চিহ্ন, খঞ্জ তাঁর একটি পা, এক চোখ নষ্টও, তিনি পরাজিত করেন মালব, দিল্লী আর সৌরাষ্ট্রের রাজাদের।

সংগ্রহ করেন বহু অর্থ ও সৈন্য, মেবারে, দিল্লীর সুলতানদের আধিপত্য চূর্ণ করবার জন্য, মুক্ত করতে ভারতকে তাদের অধীনতার পাশ থেকে, পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করতে রাজপুত আধিপত্য ভারতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতের, তিনি পরাজয় বরণ করেন মুঘল বিজেতা বাবরের হস্তে আগ্রার পশ্চিমে খানুয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ১৬ই মার্চ ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে, সঙ্গে তাঁর ১২০ জন সমরনায়ক, আট লক্ষ যুদ্ধাশ্ব ও পাঁচশত হস্তী আর মাড়বার, অম্বর, আজমীর, চান্দেরী ও গোয়ালিয়রের নৃপতি। কয়েকজন অনুগামীর সাহায্যে রাণা পরিত্যাগ করেন যুদ্ধক্ষেত্র।[১] মৃত্যুবরণ করেন কিছুদিন পরেই ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে হতাশায় আর পরাজয়ের গ্লানিতে ব্যথিত অন্তঃকরণে। অন্তর্হিত হয় রাজপুতদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনাও ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে, পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাদের আধিপত্যের ভারতে।

রাজত্ব করেন একে একে রত্ন সিংহ, বিক্রমজিত, বনবীর আর উদয় সিংহ—কীর্তিহীন তাঁরা। কিন্তু অনুপ্রাণিত হয় রাণা সঙ্গের অত্যুজ্জ্বল স্বদেশপ্রেমে তাঁর বংশধরেরা তাই প্রত্যাখান করেন তাঁর পরবর্তী মেবারের রাণা শিশোদীয় উদয়সিংহ প্রবল পরাক্রান্ত মুঘল সম্রাট আকবরের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা লাভের প্রস্তাব। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর আক্রমণ করেন রাজধানী চিতোর। উদয়সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করে আশ্রয় নেন মেবারের পার্বত্য অঞ্চলে। গ্রহণ করেন চিতোর রক্ষার ভার মহাপরাক্রমশালী সেনাপতি জয়মল্ল আর পুত্ত। প্রতিরোধ করেন রাজপুত বাহিনী বিপুল মুঘল বাহিনীর আক্রমণ চারমাস, সীমাহীন তাদের বীরত্ব। প্রাণ বিসর্জন করেন জয়মল্ল অতর্কিতে, গোলার আঘাতে, পুত্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে। নেতৃত্ববিহীন হয় রাজপুত সৈন্য, প্রাণ বিসর্জন করে সমরাঙ্গণে অসীম সাহসে যুদ্ধ করতে করতে। মৃত্যু বরণ করেন সমস্ত রাজপুত রমণীরা আর রাজপুত কুলবধূরাও প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে, উদযাপন করেন জহরব্রত। পতন হয় চিতোরের। মুঘলের অধীনস্থ হয় চিতোর, অধিকারে আসে আকবরের। রচিত হয় ইতিহাস এক অবিনশ্বর কীর্তির, এক অতুলনীয় শৌর্যের, এক অমিত বীর্যের।

মাড়বার, বিকানীর, জয়শলমীর, বুন্দী আর সিরোহী একে একে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে, করে আরও অনেক রাজপুত রাজ্য।

পতন হয় চিতোরের কিন্তু সম্ভব হয়না আকবরের সম্পূর্ণ মেবার জয় করা। উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপসিংহ অধিরোহণ করেন মেবারের সিংহাসনে ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে। মহাপরাক্রমশালী তিনি, শিশোদীয় কুলগৌরব, স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী, এক মহাপুরুষ, ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন প্রবল পরাক্রান্ত আকবরের প্রেরিত সন্ধির প্রস্তাব। সঙ্কল্প করেন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে, দুর্জয় সেই সঙ্কল্প, অটল। মুঘলের অধীনস্থ তখন চিতোর আর মেবারের সমতল অঞ্চল। নগণ্য তাঁর সৈন্যের সংখ্যা মুঘলবাহিনীর তুলনায়, অপ্রচুর তাঁর অর্থসম্পদও। পরিণত হয় কমলমীরের গিরি দুর্গ তাঁর প্রধান কর্মস্থলে।

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, প্রেরিত হয় ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত এক মহাশক্তিশালী মুঘল সৈন্য বাহিনী মেবারের বিরুদ্ধে সেনাপতি আসফ খাঁ আর জয়পুরাধিপতি মান সিংহের অধীনে। অগ্রসর হয় তারা গোগুণ্ডার পথে। হলদিঘাটের অপ্রশস্ত গিরিপথে তাদের সম্মুখীন হন সসৈন্যে প্রতাপ, যুদ্ধ করেন অমিতবিক্রমে, অতুলনীয় শৌর্যে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ এই মুঘল সৈন্য, প্রচণ্ড তাদের আক্রমণের শক্তিও, অবশেষে পরাজয় বরণ করেন প্রতাপ, মুঘলের অধিকারে আসে কমলমীরের দুর্গ, অধীনস্থ হয় ভারত সম্রাট আকবরের। রাজ্যচ্যুত হন রাণা, আশ্রয় নেন চৌন্দের গভীর অরণ্যে। তথাপি অটল তাঁর সংকল্প, কঠোর তাঁর তপোশ্চারণ, দুঃসহ তাঁর আত্মপীড়ন, তিনি সংগ্রহ করেন নিত্য নতুন সৈন্য। নির্ভীক তিনি নানা প্রতিকূল অবস্থাতেও। এমনই করেই অতিবাহিত হয় দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর। ক্রমে চিতোর আর মণ্ডল গড় ছাড়া, তিনি একে একে পুনরুদ্ধার করেন মুঘলের অধিকার থেকে সমস্ত গিরিদুর্গগুলিই। সফল হয় তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের সাধনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য মেবারের, ভারতেরও, তিরোধান হয় ৫৭ বৎসর বয়সে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার পূজারীর, সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বদেশের, সর্বযুগেরও চিতোর উদ্ধারের পূর্বেই ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। অবসান হয় এক অতুলনীয়, অসীম স্বাধীনতার সংগ্রামের, এক অভূতপূর্ব তপোশ্চারণের, পূর্ণ পরিণতি লাভ করবার পূর্বেই, সম্পূর্ণরূপ পরিগ্রহের

আগেই। কিন্তু চিরস্মরণীয় হয় হলদিঘাট, হন তার প্রধান নায়ক, সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা, মহারাণা প্রতাপ সিংহও ইতিহাসের পাতায় ভারতের, বিশ্বেরও। মুখর রাজস্থান প্রণেতা মহামতি টড্ হলদিঘাটের যুদ্ধের বর্ণনায়, পঞ্চমুখ শিশোদীয় রাণা প্রতাপের তুলনাহীন শৌর্যের প্রশংসায়।

প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অমরসিংহ অধিরোহণ করেন মেবারের সিংহাসনে ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। রাজত্ব করেন ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করবার। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল বাহিনী পুনরায় আক্রমণ করে মেবার মানসিংহের অধিনায়কত্বে, প্রতিরোধ করেন সেই আক্রমণ অমর সিংহ, যুদ্ধ করেন অসীম বীরত্বের সঙ্গে, কিন্তু পরাজয় বরণ করেন মান সিংহের হস্তে। মৃত্যু এসে প্রতিরোধ করে আকবরের ভবিষ্যৎ মেবার আক্রমণের বাসনা।

মৃত্যু হয় আকবরের দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন জাহাঙ্গীর, তিনিও সচেষ্ট হন মেবার দমনে, জয় করতে মেবার। প্রেরিত হয় বিশ সহস্র সৈন্য নিয়ে গঠিত এক সামরিক অভিযান তাঁর দ্বিতীয় পুত্র পরভেজের অধীনে, কিন্তু বিফল হয় তাঁর প্রচেষ্টা। প্রেরিত হয় দ্বিতীয় অভিযান ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের বিরুদ্ধে সেনাপতি মহবৎ খাঁর নেতৃত্বে। পরাজয় বরণ করে রাজপুত বাহিনী, কিন্তু সক্ষম হন না মুঘল সেনাপতি মেবার অধিকার করতে। প্রেরিত হয় শাহজাদা খুরমের অধিনায়কত্বে তৃতীয় অভিযান ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি পরিত্যাগ করেন সম্মুখ সমরনীতি, অবলম্বন করেন অবরোধের প্রথা। অবরুদ্ধ হয় মেবার, লুণ্ঠিত আর ধ্বংশে পরিণত হয় তার বিভিন্ন অংশ , ছড়িয়ে পড়ে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী তার দিকে দিকে। শেষে বাধ্য হন অমর সিংহ মুঘল সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করতে, বশ্যতা স্বীকার করতে মুঘলের। তিনি ফিরে পান চিতোর দুর্গ, আবদ্ধ হতে হয় না তাঁকে মুঘলের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে, বাধ্য হন না মুঘল দরবারে হাজির হতেও।

মৃত্যু হয় অমর সিংহের। রাজত্ব করেন একে একে করণ ও জগৎ সিংহ ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মহারাণা জগৎ সিংহই নির্মাণ করেন বৈষ্ণব মন্দির জগদীশ। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে রাজ সিংহ অধিরোহণ করেন মেবারের সিংহাসনে রাজত্ব করেন ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রবল পরাক্রান্ত তিনিও, তাঁর নেতৃত্বে মেবার অস্বীকার

করে মুঘলের আনুগত্য। তিনি যোগ দেন মাড়বারের রাজা অজিত সিংহের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, মাতা তাঁর শিশোদীয়া বংশের রাজকন্যা।

সম্মিলিত হন শিশোদিয়া ও রাঠোর কুল, পরিণত হয় স্বাধীনতার যুদ্ধে সেই যুদ্ধ, রূপপরিগ্রহ করে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জাতীয় সংগ্রামের। ঔরঙ্গজেব আক্রমণ করেন মেবার ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। পরিত্যাগ করেন রাণা রাজধানী চিতোর, ছেড়ে যান সমতল ভূমি, যান সৈন্য সামন্ত প্রজাবৃন্দ আর পরিবারবর্গ নিয়ে, আশ্রয় নেন দুর্গম অনতিক্রম্য পার্বত্য প্রদেশে। অধিকৃত আর লুন্ঠিত হয় চিতোর।

পুত্র আকবরের উপর চিতোর রক্ষার ভার ন্যস্ত করে বাদশাহ আজমীরে চলে যান। সুরু হয় রাজপুতদের অতর্কিত আক্রমণ, আক্রমিত হয় মুঘল বাহিনী, হন আকবরও। অপহৃত হয় তাঁর সমস্ত খাদ্য সম্ভার নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে। বিদ্রোহ করেন আকবরও পিতার বিরুদ্ধে। শেষে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি হয় রাণা রাজ সিংহের পুত্র রাণা জয় সিংহের সঙ্গে। দিতে হয় না মেবারের জিজিয়া কর, ছেড়ে দেন রাজ্যের কয়েকটি জেলা মুঘলকে তার পরিবর্তে।

রাজত্ব করেন জয় সিংহ ১৬৮০ থেকে ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অধিরোহণ করেন মেবারের সিংহাসনে তাঁর পরে দ্বিতীয় অমর সিংহ, রাজত্ব করেন ১৬৯৯ থেকে ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কীর্তিহীন তাঁরা। রাজত্ব করেন একে একে তাঁদের পরে দ্বিতীয় সংগ্রাম সিংহ, দ্বিতীয় জগৎ সিংহ, দ্বিতীয় প্রতাপ সিংহ, দ্বিতীয় রাজসিংহ, দ্বিতীয় অরি সিংহ, দ্বিতীয় হামীর ও ভীমসিংহ ১৭১১ থেকে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কীর্তিহীন তাঁরাও। শেষে ১৬ই জানুয়ারী ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মেবার (উদয়পুর) বৃটিশের সঙ্গে আনুগত্য শর্তে রক্ষামূলক মৈত্রীতে আবদ্ধ হয়।

দাঁড়িয়ে আছে চিতোরগড় বা চিতোর দুর্গ মহামহিমময় মূর্তিতে চতুর্দিকের সমতল ভূমি থেকে পাঁচশত ফুট উঁচুতে একটি শৈল শৃঙ্গের উপরে। বুকে নিয়ে আছে এই চিতোর দুর্গ কত অসীম শৌর্যের কাহিনী, কত অমিত বীর্যের, কাহিনী রাজপুত রমণীর কত জহরব্রত উদযাপনের, ছড়িয়ে আছে তার প্রতিটি প্রস্তরের অঙ্গে, মূর্ত হয়ে আছে তার প্রতিটি ধূলিকণায়।

প্রসারিত হয়ে আছে দুর্গটি ৬৯০ একর পরিধি নিয়ে সাড়ে তিন মাইল

বিস্তৃত পর্বতশীর্ষে। বেষ্টিত হয়ে আছে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে বুকে নিয়ে কত প্রাসাদের আর জলাশয়ের ধ্বংসাবশেষ, ভগ্নাবশেষ কত মন্দিরেরও। শুরু হয় তাদের নির্মাণ নবম শতাব্দীতে শেষ হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। রামপোল নামে পরিচিত তার প্রধান প্রবেশ পথ। বুকে নিয়ে আছে প্রবেশপথ প্রস্তরে রচিত একটি বিশালাকৃতির দ্বার, অঙ্গে নিয়ে কত সুন্দরতম অলঙ্করণ, কত সূক্ষ্মশিল্প-সম্ভার, কত অতুলনীয় কারুকার্য, প্রকৃষ্টতম দান তারা রাজপুত ভাস্করের।

দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করি। দেখি কীর্তিস্তম্ভ ও জটাশঙ্করের মন্দির, দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভটির পাশে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি চিতোরের, অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি রাজস্থানেরও, নির্মাণ করেন এই স্তম্ভটি দ্বাদশ শতাব্দীতে জিজো, এক জৈন ধর্মাবলম্বী বণিক। উৎসর্গ করেন স্তম্ভটিকে প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথকে। পঁচাত্তর ফুট উঁচু এই স্তম্ভটি, পঞ্চতল, অনুপম গঠনে, রমণীয়, সুচারু সম্পন্ন, অন্যতম সুন্দরতম স্তম্ভ ভারতের, অলঙ্কৃত তার ভিত্তি থেকে শীর্ষদেশ, তার প্রতিটি অঙ্গ; তার সর্বাঙ্গ সুন্দরতম অলঙ্করণ দিয়ে, ভূষিত তার কুলুঙ্গির অঙ্গ জীবন্ত মহিমময় মূর্তি সম্ভার দিয়েও। দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভটি কুড়ি ফুট চৌরস ও নয় ফুট উঁচু ভিত্তির উপর। রচিত হয় সোপানের শ্রেণী তার দক্ষিণ দিকে, সংযুক্ত হয় ছ ফুট দশ ইঞ্চি উঁচু প্রবেশ পথের সঙ্গে। শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভটি একটি উন্মুক্ত স্তম্ভযুক্ত চন্দ্রাতপ বুকে নিয়ে বারটি স্তম্ভ, তার উপরে পিরামিডাকৃতি ছাদ। সুন্দরতম, মহিমময় এই স্তম্ভগুলিও অঙ্গের অলঙ্করণে আর মূর্তি সম্ভারে। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় তার প্রতিটি তল ছাঁচ, ব্যালকনি সমন্বিত গবাক্ষ ও ক্ষুদ্রায়তন চূড়ার সমষ্টি দিয়ে, কত বিভিন্ন শিল্পের প্রতীক দিয়েও। সৃষ্টি হয় এক সজীব, সতেজ বহুবিধত্ব স্তম্ভের অঙ্গে। কিন্তু নিখুঁত এই সমাবেশ প্রতিটি বিভিন্ন অলঙ্করণের, সুষ্ঠু, সূক্ষ্ম, এই সংমিশ্রণ অনুপম সুষমার আর অসীম তেজস্বীতার, অপরূপ হয় স্তম্ভ, মহিমময় হয়। নির্মিত হয় পাশের মন্দিরটি চতুর্দশ শতাব্দীতে সম্ভবতঃ আদি জৈন মন্দিরটির অবস্থিতিতে। বুকে নিয়ে আছে কত জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তিও। নিরাভরণ, উলঙ্গ এই মূর্তিগুলি পরিচায়ক দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির আর ভাস্করের এক সুন্দরতম মহিমময় সৃষ্টি, কীর্তি এক গৌরবময় যুগের।

স্থপতি আর ভাস্করকে প্রণতি জানিয়ে জয়স্তম্ভের সম্মুখে উপনীত হই। মেবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি রাণা কুম্ভ নির্মাণ করেন এই স্তম্ভটি ১৪৫৮ থেকে ১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। অলঙ্কৃত করেন তিনি মেবারের সিংহাসন ১৪৩০ থেকে ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রবল পরাক্রান্ত তিনি, অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাও ভারতের, পরাজিত করেন ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে মালবের অধিপতি মহম্মদ খিলজীকে। সেই বিজয়ের প্রতীক বুকে নিয়ে আছে এই স্তম্ভটি, পরিচিত জয়স্তম্ভ নামে, মহামহিমান্বিত হয়ে আছে। নয়তল বিশিষ্ট এই স্তম্ভটি দাঁড়িয়ে আছে সাত-চল্লিশ ফুট চৌরস দশ ফুট উঁচু ভিত্তির উপর। স্তম্ভের অভ্যন্তরে রচিত হয় সোপানের শ্রেণী, যুক্ত হয় প্রতিটি তলের সঙ্গে, হয় দুইটি সর্বোচ্চ তলের সঙ্গেও। উন্মুক্ত এই সর্বোচ্চ তল দুইটি, বুকে নিয়ে আছে সর্বাধিক অলঙ্করণ, মহামহিমময় হয়ে আছে অঙ্গের অপরূপ শিল্প সম্ভারে আর জীবন্ত মূর্তিসম্ভারেও। অনুপম গঠনে, ত্রিশ ফুট প্রস্থ এই স্তম্ভটির ভিত্তি, একশত বাইশ ফুট তার শীর্ষদেশের উচ্চতা। অলঙ্কৃত করেন মহাঅভিজ্ঞ রাজপুত ভাস্কর তার সর্বাঙ্গ, তার প্রতিটি প্রস্তরের অঙ্গ কত সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার দিয়ে, কত সুন্দরতম অলঙ্করণ আর জীবন্ত, মহিমময় মূর্তিসম্ভার দিয়ে—মূর্তি কত হিন্দু দেবদেবীর। মূর্তি দিয়েই রচিত হয় কত কাহিনীও স্তম্ভের অঙ্গে। শোভিত করেন ভাস্কর উজাড় করে দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য, মনের অন্তহীন মাধুর্য। পরিমিত এই অলঙ্করণও বাড়ায় স্তম্ভের সৌন্দর্য, রূপময় হয় স্তম্ভ, হয় বাঙ্ময়, হয় অপরূপ, মহামহিমময় হয়। মহাসৌভাগ্যশালী হয় রাজস্থান, হয় ভারত, হয় বিশ্বও। পূর্বাভাস এই স্তম্ভ পরবর্তী কালের চীনদেশীয় স্তম্ভের, পূর্বসূরী মুসলমান স্তম্ভেরও। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি তার অপরূপ রূপ, প্রণতি জানাই মহাসুন্দরকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করি রাজস্থানের মহাঅভিজ্ঞ স্থপতি আর ভাস্করকে। করি রাণা কুম্ভকেও অমর তাঁরা ইতিহাসের পাতায়।

দেখি একে একে রাণা কুম্ভের রাজপ্রাসাদটি ও রাণী পদ্মিনীর প্রাসাদটি। সুন্দরতম এই রাজ প্রাসাদটিও মহিমান্বিত হয়ে আছে রাজপুত শিল্পীর সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে আর মনের মাধুরীতে, প্রতীক হয়ে আছে ঐতিহ্যের এক গৌরবময় যুগের।

এই পদ্মিনীর প্রাসাদেই নাকি দর্শন করেন বাদশাহ আলাউদ্দিন খিলজী

আশির ভিতর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, পরম রূপবতী, রতন সিংহের মহিষী পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব।

সবশেষে দেখি বৈষ্ণব মন্দির কুম্ভশ্যাম আর মীরাবাঈ-এর মন্দির। বুকে নিয়ে আছে মীরাবাঈ-এর ক্ষুদ্র মন্দিরটি একটি গর্ভগৃহ ও নাটমন্দির, অলঙ্কৃত হয়ে আছে তার বহিরাঙ্গও সুন্দরতম শিল্প সম্পদ আর সজীব মূর্তিসম্ভার দিয়ে। শ্রদ্ধা নিবেদন করি মেবারের রাজপুত স্থপতি আর ভাস্করকে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একে একে রাণা কুম্ভ, সংগ্রাম সিংহ, রাণা প্রতাপ আর রাজ সিংহের প্রতিভাদীপ্ত আনন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় উপনীত হয় চিতোর, হয় মেবার সমৃদ্ধি ও গৌরবের উচ্চতম শিখরে, পরিণত হয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে, শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল হয় কৃষ্টিরও, ছড়িয়ে পড়ে তার দ্যুতি সারা ভারতে। কিন্তু আজ দাঁড়িয়ে আছে চিতোর, মেবারও শুধু স্মৃতির প্রতীক হয়ে। কণ্ঠে উচ্চারিত হয় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গীতের চারিটি ছত্র।

মেবার পাহাড়-শিখরে তার
রক্ত নিশান উড়ে না আর।
এ হীন সজ্জা এ ঘোর লজ্জা
—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার।

ফিরে আসি আজমীরে সেখান থেকে সত্বর হ্রদে। আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে তার স্মৃতি মনের মন্দিরে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুষ্কর

ব্রহ্মার মন্দির

বেলা দশটায়, নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টাখানেক পরে, আমাদের ট্রেন ধীরে ধীরে আজমীর স্টেশনে এসে থামে। অজয়মেরু (অজেয় পর্বত) থেকেই তার এই নামাকরণ, তারাগর পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই আজমীর। দেখি, দুই পাঞ্জাবী বন্ধু স্টেশনে উপস্থিত। তাঁদের উপর ন্যস্ত হয় আমাদের ওখানকার বাসের বন্দোবস্ত করবার ভার। শুনি প্রায় দু'মাইল দূরে, আজমীর রেস্ট হাউসে, আমাদের বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত আজমীরের বাস, তাই স্টেশনের অপেক্ষা গৃহেই স্নান সমাপন করে, স্টেশন সংলগ্ন একটি হোটেলে খেয়ে নিয়ে, বেলা বারটা নাগাদ একটি স্টেশন ওয়াগনে চড়ে, আমরা পুষ্কর দেখতে রওনা হই। দর্শন করতে যাই পুষ্কর দ্বিতীয় বার কন্যা মন্দাকিনীকে সঙ্গে নিয়ে।

"সর্বংকৃতযুগে পুণ্যং ত্রেতায়াং পুষ্করং স্মৃতম্।
দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং গঙ্গাকলিযুগে স্মৃতা
যত্ত্বকার্যশতং কৃত্বাং গঙ্গাভিষেচনম্
সর্বং তন্তস্য গঙ্গাম্ভো দহত্যাগ্নিরিবেন্ধনম্।"

মহাভারত বনপর্ব।

কাম্যকবনে অবস্থান করেন পঞ্চপাণ্ডব, সঙ্গে নিয়ে দ্রৌপদী। অর্জুন শিবের আরাধনার জন্য হিমালয়ে গমন করেন। কিরাতরূপী মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করে, পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। সেখান থেকে ইন্দ্রালয়ে গিয়ে বাস করেন। অতিবাহিত হয় দীর্ঘ পাঁচ বৎসর, কিন্তু ফিরে আসেন না অর্জুন কাম্যক বনে। তাঁর বিহনে উৎকণ্ঠিত হন চার ভ্রাতা আর দ্রৌপদী, আকুল হন শোকেতে। তখন মহর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকটে আগমন করে বলেন,

শুদ্ধসত্ব অন্তঃকরণে, জিতেন্দ্রিয় ও সদাচারী হ'য়ে তীর্থদর্শন করলে সুফল হ'বেই। পুষ্করাদি দশকোটি তীর্থের ফলমাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলেন, আদিতীর্থ পুষ্কর হ্রদ, পুণ্যতীর্থ দেবতা, কিন্নর ও দৈত্যের। মোক্ষলাভ করে নর এই তীর্থে স্নান করে-দূর হয় তার সমস্ত পাপ, সকল গ্লানি। এক গুণ দিয়ে কোটি গুণ ফল লাভ করে জীব। প্রাচীনতম মহাতীর্থ ভারতের এই পুষ্কর হ্রদ, বিরাজ করে এখানে সকল তীর্থ, এই হ্রদের পবিত্র জলে স্নান করেই দেবাদিদেব ব্রহ্মা সমাপন করেন তাঁর যজ্ঞ। তপস্যা করেন কতশত মুনিঋষিও এই হ্রদের ধারে, যুগের পর যুগ, লাভ করেন সিদ্ধি, হন পরম জ্ঞানী, হন ব্রহ্মজ্ঞ। মহাপুণ্য লাভ করে জীবও এই হ্রদের জলে স্নান করে হয় পুণ্যবান।

অভিহিত মহাতীর্থ পুষ্কর দুস্কর তীর্থ নামে, অবস্থিত আরাবল্লীর শৈল শিখরে এক অপেক্ষাকৃত সমতল অধিত্যকায়, আজমীর শহরের সাত মাইল উত্তরে। ছিল এই পার্বত্য প্রদেশ হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল, আবাসস্থল ছিল ভয়াল ময়ালেরও, সুদুর্গমও। কষ্টসাধ্য আর বিপদসঙ্কুল ছিল এই তীর্থে গমন, দুঃসাধ্যও। পরে যেতে হত রকসাইড নামে এক প্রকার টাঙা করে। এখন রচিত হয়েছে সুন্দর পীচের রাস্তা আরাবল্লীর শীর্ষদেশে, সহজ আর সুন্দর হয় পুষ্কর গমন ও তীর্থ স্নান।

কয়েকটি সর্পিল রাস্তা অতিক্রম করে, আমাদের মোটর পাহাড়ের সানুদেশে উপনীত হয়। তারপর বঙ্কিম গতিতে সুরু হয় পর্বত আরোহণ, দক্ষিণে, সুন্দরের পূজারী সাজাহান বাদশাহের তৈরী দিগন্ত বিস্তৃত আনাসাগর, বর্ষায় প্রতিহত হয় তার তরঙ্গ আরাবল্লীর চরণতলে, শুনি তার অন্তরের ধ্বনিও। বামে রুক্ষ, উঁচু নীচু জমি, স্পর্শ করে দূরের শৈলমালার পদতল। মাঝে মাঝে দেখা যায় লতাগুল্মে আবৃত অনুচ্চ বৃক্ষের শ্রেণী। আমরা অতিক্রম করি এক সুন্দরতম পরিবেশ, প্রকৃতির এক নয়নাভিরাম লীলাভূমি।

দেখতে দেখতে আমাদের মোটর পুষ্কর হ্রদে এসে থামে। মোটর থেকে নেমে, পাণ্ডাকে সঙ্গে নিয়ে একটি গলির ভিতর দিয়ে, মহাতীর্থ পুষ্কর হ্রদের ঘাটের চাতালে গিয়ে উপবেশন করি।

বেষ্টিত এই হ্রদের চতুর্দিক পাষাণ সোপান শ্রেণী দিয়ে, নির্মিত হয় ঘাট, নির্মাণ করেন পুণ্যশীলা মহারাণী অহল্যাবাই। মহারাণী তিনি ইন্দোরের,

আদর্শ শাসনকর্ত্রী, পুণ্যবতী, বিদুষীও অলঙ্কৃত করেন হোলকারের সিংহাসন ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

আমরা হ্রদের শীতল স্বচ্ছ জলে স্নান ও পিতৃ-পুরুষের তর্পণ করে, কিছুক্ষণ চাতালে বসে, তার অপরূপ শোভা দর্শন করি। তারপর শুদ্ধ দেহে, পবিত্র অন্তঃকরণে, পাণ্ডাজীর সঙ্গে মন্দির দর্শনে নির্গত হই। অক্ষয় স্বর্গবাস হয় এখানে পিতৃপুরুষের তর্পণ করলে, সমপর্যায়ে পড়ে পুষ্কর, গয়ার ও হরিদ্বারের সঙ্গে।

বুকে নিয়ে আছে পুণ্যতীর্থ পুষ্কর বহু মন্দির। প্রধান তাদের মধ্যে ব্রহ্মার, সাবিত্রীর, বদরীনারায়ণের, বরাহের আর আত্মেশ্বরের মন্দির। আমরা প্রথমে ব্রহ্মার মন্দিরে উপনীত হই। বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটি নাগর স্থাপত্যের সুন্দরতম নিদর্শন। মন্দিরের অঙ্গের শিল্পসম্ভার দেখে, দেব দর্শন করে, আমরা একে একে বরাহের ও আত্মেশ্বরের মন্দির দেখি। নাই ভারতের অন্য কোন স্থানে ব্রহ্মার মন্দির, পূজিত হন না ব্রহ্মা মন্দিরে।

আত্মেশ্বরের মন্দির দেখে আমরা বদ্রীনারায়ণে উপনীত হই। নির্মিত এই মন্দিরটি দ্রাবিড় পদ্ধতিতে অঙ্গে নিয়ে আছে দ্রাবিড় স্থাপত্যের সুন্দরতম নিদর্শন। অনুপম সৃষ্টি।

সেখান থেকে আমরা সাবিত্রীর মন্দিরে যাই। হ্রদের চার মাইল পশ্চিমে, একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত এই মন্দিরটি। মাইল দুই সুতপ্ত বালুর রাস্তা পার হ'য়ে, তিনশত কুড়িটি পাহাড়ের অঙ্গের সোপানের শ্রেণী অতিক্রম করে, মন্দিরে উপনীত হই। সহজ ও সুন্দর নয় এই সুতপ্ত বালু অতিক্রম করা, কষ্টসাধ্য এই পর্বত আরোহণও। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, আরোহণের ক্লান্তি দূর করে নিয়ে, মন্দির দেখি। বিরাজ করেন এই মন্দিরে সাবিত্রীদেবী, অধিষ্ঠিতা গায়ত্রীদেবীও। এই মন্দিরটিও নাগর পদ্ধতিতে নির্মিত।

শুনি কার্তিক পূর্ণিমায় একটি মেলা হয় এই পুষ্করে। সমাগত হন তখন এখানে লক্ষাধিক যাত্রী। পুণ্যলোভাতুর তাঁরা, আসেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। পুণ্য সঞ্চয় করেন এই মহাপবিত্র হ্রদের জলে স্নান করে। আমরাও মনে মনে মহাপবিত্র হ্রদকে সহস্র প্রণাম জানাই, প্রণতি জানাই দেবাদিদেব ব্রহ্মা ও সাবিত্রী দেবীকেও, তারপর আবার স্টেশন ওয়াগনে চড়ে,

আজমীর স্টেশনে ফিরে আসি। সেখানে চা পান করে ও অপেক্ষাগৃহ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আজমীর রেস্টহাউসে।

উল্লেখযোগ্য নয় আজমীর ভারতে রাজপুত রাজাদের প্রাধান্য বিস্তারের পূর্বে। পাওয়া যায় না তার বিস্তৃত ইতিহাসও। অধীন থাকে আজমীর ভারতের বিভিন্ন সার্বভৌম সম্রাটদের-মৌর্যদের, সুঙ্গদের, কুষাণদের, গুপ্তদের, মৌখরিদের থানেশ্বরের শীলাদিত্য হর্ষবর্ধনের আর গুর্জর প্রতিহার সম্রাটদের।

খ্রীষ্টীয় নবম শতকে রাজত্ব করেন রাজপুতানার শাকম্ভীর ও আজমীর অঞ্চলে চৌহান বা চাহমান বংশীয় সামন্তেরা। দুর্বল হন প্রতিহার সম্রাটেরা, প্রশমিত হয় তাঁদের ক্ষমতা, স্বাধীনতা ঘোষণা করেন চৌহানরা। চতুর্থ বিগ্রহরাজ অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের অধিকার করেন দিল্লী ও নিকটবর্তী অঞ্চল। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় পৃথ্বীরাজ, সবশ্রেষ্ঠ নৃপতি এই বংশের। লেখা আছে তাঁর কীর্তির কাহিনী রাজকবি চাঁদ বরদাই প্রণীত "পৃথ্বীরাজ রাসো"তে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি কনৌজরাজ গহডবাল জয়চন্দ্রের, বিবাহ করেন তাঁর কন্যা সংযুক্তাকে পিতার বিনা অনুমতিতে। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে, জয়চন্দ্রের প্ররোচনায় মহম্মদ ঘুরী দিল্লী আক্রমণ করেন। যুদ্ধ হয় তরাইনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে। পরাজিত হন ঘুরী। পরবৎসর, দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন পৃথ্বীরাজ, ঘুরীর হাতে। দিল্লী ও আজমীর মুসলমানের অধিকারে আসে। সুরু হয় মুসলমান রাজত্ব ভারতে, স্থাপিত হয় রাজধানী দিল্লীতে। নিযুক্ত হন শাসনকর্তা কুতবুদ্দিন। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয় মহম্মদ ঘুরীর। স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কুতবুদ্দিন, স্থাপিত হয় দাসরাজবংশ দিল্লীতে। রাজধানী দিল্লী, সপ্তনগরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম তৃতীয় পৃথ্বীরাজের নির্মিত নগর, বুকে নিয়ে ছিল বহু মন্দির, অঙ্গে নিয়ে প্রকৃষ্টতম নাগর স্থাপত্যের নিদর্শন। শোভিত ছিল তার কেন্দ্রস্থল একটি মহামহিমময় মন্দির দিয়ে। ধ্বংসে পরিণত করেন সেই সব মন্দির মুসলমান বিজেতা, রচিত হয় কুতবের মসজিদ—সেই সব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে। শোভিত ছিল আজমীর আর নিকটবর্তী অঞ্চলও সুন্দরতম মন্দির দিয়ে, অঙ্গে নিয়ে সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার। কুতবুদ্দিনের আদেশে, ধ্বংসে পরিণত হয় সেই সব মন্দিরও, বুকে নিয়ে হিন্দু স্থপতির অমূল্য দান। রচিত হয় তাদের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে "আড়াই দিন্‌কা ঝোপরা", একটি মসজিদ্‌।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, একটি টাঙায় চড়ে আমরা প্রথমেই আড়াই দিন্ কা ঝোপড়া দেখতে যাই। দেখি, দাঁড়িয়ে আছে মসজিদ্‌টি, একটি বেলেপাথরের পাহাড়ের অঙ্গে, একটি সুউচ্চ সমতল ভিত্তির উপর। সুরু হয় এই মসজিদ্ নির্মাণ ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে। দিল্লীর কুতবের মসজিদের অনুকরণেই রচিত হয় এই মুসলমান উপাসনা মন্দিরটিও। কিন্তু বৃহত্তর এই মসজিদের পরিধি, উচ্চতর স্থপতির নির্মাণ কুশলতাও। অপরূপ শোভন গঠন এই মসজিদের স্তম্ভের শ্রেণী, সরু ও দীর্ঘ। রচিত প্রতিটি স্তম্ভ, তিনটি করে হিন্দু স্তম্ভের সংযোগে। শোভিত এই সব স্তম্ভদণ্ডের অঙ্গ সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম হিন্দুশিল্প সম্ভারে, ভূষিত সুষ্ঠ-গঠন মূর্তিসম্ভারেও, মূর্তি দেবদেবীর। দেখি মুগ্ধ হয়ে আজমীরের প্রাচীনতম হিন্দু স্থপতির সুন্দরতম; গৌরবময় সৃষ্টি, মুসলমান উপাসনা মন্দিরে। দেখি; নাগর স্থপতির স্তম্ভের পূর্ণবিকাশ, শ্রেষ্ঠরূপ। সুষ্ঠুতর এই মসজিদের ভিতরের গলিপথও, রচিত অনবদ্য সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে। উন্নততর তার ছাদের নির্মাণ পদ্ধতিও, দাঁড়িয়ে আছে ছাদ মেঝে থেকে কুড়ি ফুট উঁচুতে। রচিত হয় একটি সুউচ্চ সম্মুখভাগও, পূর্বদিকের প্রাচীরের বহির্ভাগে, নির্মিত হয় সোপানের শ্রেণীও। সেই সোপানের শ্রেণী অতিক্রম করে, উপনীত হতে হয় মসজিদের প্রধান প্রবেশদ্বারের সংলগ্ন অলিন্দে। অলিন্দের দুই প্রান্তে, শোভা পায় দুইটি ক্রমহ্রস্বায়মান চূড়া।

অতিবাহিত হয় পঁচিশ বৎসর, সামসুদ্দিন ইলতুৎমিস নির্মাণ করেন এই মসজিদের সম্মুখভাগ। সম্পূর্ণরূপ লাভ করে এই মস্‌জিদটি, পায় পূর্ণ পরিণতি। আরোহণ করেন তিনি দিল্লীর সিংহাসনে ১২১১ খ্রীষ্টাব্দে, রাজত্ব করেন ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনিই সম্পূর্ণ রূপদান করেন দিল্লীর কুতবের রচিত মসজিদ্‌কেও। রচিত হয় নাই মসজিদে দ্বিতল, হয় নাই মঞ্চও কেন্দ্রস্থলের খিলানের উপর, দিল্লীর কুতবের মসজিদের মত। প্রধান খিলানের নিম্নস্থ গলিপথের প্রাচীরের দুই প্রান্তদেশে নির্মিত হয় দুইটি শোভন গঠন ক্রমশীর্ণায়মান চূড়া। রচিত হয় বহু পার্শ্বখিলানও, চারিটি তাদের মধ্যে বহুসূক্ষ্মাগ্র চূড়াবিশিষ্ট, অনুরূপ অষ্টমশতকে নির্মিত ইরাকের ইউকাইডার মসজিদের, বিরল ভারতীয় স্থাপত্যে।

বুকে নিয়ে আছে সম্মুখভাগ সাতটি খিলান, বিস্তৃত তাদের প্রস্থ দশফুট

পরিধি নিয়ে। ছাপ্পান্ন ফুট উঁচু কেন্দ্রস্থলের বারফুট ঘন প্রাচীরটি। দাঁড়িয়ে আছে মসজিদের সম্মুখভাগ মহামহিমময় মূর্তিতে। এক সুন্দরতম দান ইস্‌লাম স্থপতির। দেখি মুগ্ধ হয়ে।

সেখান থেকে আকবরের নির্মিত দুর্গ দেখতে যাই। নির্মিত হয় এই দুর্গটি ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতীক তার অগ্রগামীর। ক্ষুদ্রতর কিন্তু সুগঠিত এই দুর্গটি, বেষ্টিত দুই থাক দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে রচিত, দেখি, একটি দ্বিতল স্তম্ভযুক্ত সুপ্রশস্ত সভাগৃহ, অঙ্গে নিয়ে সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার। বেষ্টিত হয়ে আছে সভাগৃহ দুইটি করে স্তম্ভ দিয়ে, শীর্ষে নিয়ে বন্ধনী। নির্মিত হয় ভিতরে একটি নাতিদীর্ঘ প্রকোষ্ঠ, রচিত হয় দুই কোণেও দুইটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। দেখি মুগ্ধ হয়ে এই সুন্দরতম রাজপ্রাসাদটি।

সেখান থেকে রাজার প্রাসাদটি অতিক্রম করে, আমরা খাজা সাহেব দরগাতে উপনীত হই। মহাপবিত্র এই দরগাটি পুণ্য তীর্থ ভারতের মুসলমানদের, যাত্রী আসে সারা ভারতবর্ষ থেকে। পুণ্য লাভ করে এই দরগা দর্শন করে। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, সুউচ্চ প্রবেশদ্বারের ভিতর দিয়ে, আমরা দরগা দেখে, ফিরে আসি। প্রবেশদ্বারটিও মুঘল স্থাপত্যের সুন্দরতম নিদর্শন।

সেখান থেকে আমরা জৈন মন্দিরে উপনীত হই। আধুনিক কালে নির্মিত হয় এই মন্দিরটি, তার সারা অঙ্গ আর ছাদ অপরূপ, সুন্দরতম শিল্পসম্ভারে ভূষিত।

সব শেষে আনাসাগরে উপনীত হই। সুন্দরতম দান এই আনাসাগর, আনাজি ও সুন্দরের উপাসক সাজাহান বাদশার। তার এক প্রান্তে, সুউচ্চ শৈলশীর্ষে দাঁড়িয়ে আছে রেসিডেন্সি, বাস করতেন এখানে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা। বিস্তৃত হয়ে আছে তার পদতল থেকে, আনাসাগর, একটি সরোবর, স্পর্শ করে দূরের আরাবল্লীর চরণ। ১১৩৫ থেকে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে অরণোরাজ বা আনাজি নির্মাণ করেন। রচিত হয় তার পারে, অর্ধ মাইল দীর্ঘ, সুপ্রশস্ত শ্বেত মার্বেল পাথরের চত্বর। নির্মিত হয় তার দুই প্রান্তে আর কেন্দ্রস্থলে, সোপানের শ্রেণী, স্পর্শ করে সরোবরের বুক। হয় একটি শ্বেত মর্মর প্রাচীরও, অঙ্গে নিয়ে পাঁচটি সুন্দর মর্মর চন্দ্রাতপ। সোপানের উপর শোভা পায় এক একটি শ্বেত মার্বেল প্রস্তরের তৈরী প্রকোষ্ঠ, অঙ্গে নিয়ে,

লতা পল্লব আর প্রস্ফুটিত পদ্ম ও জালির বাতায়ন, বুকে নিয়ে মুঘল স্থপতির শিল্পসম্ভার। বাদশাহ রচনা করেন। তার পাশে দৌলতবাগ, একটি বৃহৎ প্রমোদউদ্যান। চত্বরে উপবেশন করি, পশ্চাতে উদ্যানের ভিতর বিভিন্ন, বিচিত্র পুষ্পের সম্ভার, ভেসে আসে তার সৌরভ, আমোদিত করে চারিদিক। পদতলে আনাসাগরের, বিস্তীর্ণ জলরাশি নিথর, নীরব, নিস্তব্ধ, প্রতিফলিত হয় তার বুকে পর্বতশীর্ষের অট্টালিকা। সম্মুখে, দূরে, দাঁড়িয়ে আরাবল্লী, ক্রমোন্নত হয়ে, বিস্তৃত হয় দিগন্তে। উপনীত হন দেবদিবাকর পশ্চিম গগনে, ছড়িয়ে পড়ে তাঁর লাল রশ্মি, আরাবল্লীর শীর্ষদেশে। রক্তবর্ণ ধারণ করে আরাবল্লী, রক্তিম হয় সাগরের বুক, হয় দিগন্ত। অস্তাচলে যান দিবাকর, অদৃশ্য হয়ে যান আরাবল্লীর অন্তরালে অতি ধীরে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে, স্তব্ধ হয়ে, কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়,

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।

জহুরী সাজাহান বাদশাহকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, রেস্ট হাউসে ফিরে আসি। তারপর স্টেশনে পৌছে, হোটেলে খাওয়া দাওয়া সেরে রাত্রি দশটার ট্রেনে আজমীর পরিত্যাগ করি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অম্বর

১। গোবিন্দজীর মন্দির। ২। জগৎ শিরোমণির মন্দির।

রাত্রি বারটায় জয়পুরে উপনীত হই। স্থান মেলে শহরের প্রবেশদ্বারের নিকটস্থ অতিথিশালায়।

সকালে উঠে, স্নানান্তে প্রচুর জলযোগ করে, বন্ধুবরের জীপে চড়ে আমরা অম্বরের দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ দেখতে যাই। সঙ্গী হন বন্ধুবর, হন পথ প্রদর্শকও।

আমরা শহর অতিক্রম করে প্রকৃতির এক সুন্দর পরিবেশে উপনীত হই। পশ্চাতে জয়পুর শহর, বুকে নিয়ে আছে সুন্দরতম রাজপ্রাসাদ আর অট্টালিকার শ্রেণী, কত বিপণিও। দক্ষিণে, বামে দিগন্ত বিস্তৃত বালুময় প্রান্তর। সম্মুখে সেই প্রান্তরের বক্ষ ভেদ করে এক শৈলমালা ক্রমোন্নত হ'য়ে বঙ্কিম গতিতে দিগন্তে গিয়ে মেশে। বুকে নিয়ে আছে শৈলমালা সবুজ ঘন বনানী, ভূষিত হ'য়ে আছে সবুজ আভরণ দিয়েও। সেই শৈলমালার বক্ষ ভেদ করে অগ্রসর হয় রাজপথ, সর্পিল গতিতে উপনীত হয় শীর্ষদেশে অবস্থিত দুর্গের প্রধান প্রবেশ পথের সামনে। আমরা অতিক্রম করি সেই প্রকৃতির নন্দন কানন, আনন্দে পরিপূর্ণ হয় আমাদের মন। পথের শেষ প্রান্তে এসে আমাদের জীপ বাম দিকে মোড় নেয়। দক্ষিণে পর্বত গহ্বরে, সবুজ বৃক্ষের অন্তরালে, অর্ধ-লুক্কায়িত হ'য়ে আছে কয়েকটি গ্রাম, বামে দুর্গের সংলগ্ন নার্সারী, সম্মুখে সমস্ত পাহাড় জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে অম্বরাধিপতি মান সিংহের মহামহিমময় দুর্গ আর রাজপ্রাসাদ। আমাদের জীপ সোপান শ্রেণীর নিকট থামে।

রাজত্ব সুরু করেন এই অম্বরে কাছাওয়া বা কচ্ছপঘাত বংশ দশম শতকে ; লেখেন ঐতিহাসিক টড্। বংশধর তাঁরা অযোধ্যার কোশল নৃপতি শ্রীরাম চন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কুশের। পরিত্যাগ করে আসেন কুশ তাঁর পিতৃরাজ্য, স্থাপন

করেন এক বিস্তীর্ণ রাজ্য শোন নদীর তীরে রোহিতাশ্বে বর্তমান রোটাসে। অতিবাহিত হয় কয়েক শত বৎসর, স্থাপন করেন তাঁদেরই এক বংশধর, বীরসেনের পুত্র নল নিষধে এক মহাশক্তিশালী রাষ্ট্র।

মহা পরাক্রমশালী এই নিষধ নৃপতি নল, সর্বগুণান্বিত, পরম রূপবানও, পারদর্শী সর্ববিদ্যায়। বিবাহ হয় তাঁর প্রবল পরাক্রান্ত বিধর্ভ নৃপতি ভীমের পরম রূপবতী কন্যা দময়ন্তীর সঙ্গে। জন্মগ্রহণ করে এই কন্যা মহর্ষি দমনের আশীর্বাদে, তাই সর্বগুণান্বিতা, অদ্বিতীয়া ভারতে।

পুত্র ইন্দ্র সেনকে রাজ্যের ভার অর্পণ করে নল স্বর্গারোহণ করেন। রাজত্ব করেন নিষধে নলের বংশধর সুর সেন পর্যন্ত। ৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বিতাড়িত হন তাঁর শিশু পুত্র ধোলারাই পিতৃরাজ্য থেকে। মলিন ভূষণে ভূষিত হয়ে শিশু রাজকুমারকে অঙ্কে নিয়ে রাজমাতা বর্তমান জয়পুরের পাঁচ মাইল দূরে থগঙ্গ গ্রামে উপনীত হন, অধিবাসী তার মীনেরা। ক্ষুধার্ত ও পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত মাতা পুত্রকে ধরিত্রীর বুকে শুইয়ে রেখে নিকটস্থ এক বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করতে উদ্যত হন। দেখেন শিশুর মস্তকের উপর ফণা বিস্তার করে আছে এক বৃহৎ অজগর। ভীতা উৎকণ্ঠিতা মাতা সন্তানের প্রাণ রক্ষার জন্য চীৎকার করে ওঠেন। তাঁর চীৎকার শুনে এক ব্রাহ্মণ এগিয়ে আসেন, বলেন এই শিশুই একদিন রাজা হবে। তারই নির্দেশক এই ঘটনা। ব্রাহ্মণ তাঁকে গ্রামের মধ্যে পৌঁছে দেন। সেখানে তিনি সপুত্র মীন রাজার গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। নিযুক্তা হন রাণীর পরিচারিকা। এই শিশুই অম্বর বা ঘাটের রাণীর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আশ্রয়দাতা মীন রাজার সিংহাসন অধিকার করে সুরু হয় তাঁর বিজয় অভিযান। মহাপরাক্রমশালী এই বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি পুজুন। তিনি আজমীরের চৌহান বংশের রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামন্ত পৃথ্বীরাজের, পরিচয় দেন তাঁর অপরিসীম শৌর্যের উত্তরের বহু অভিযানে—খাইবার পাসে সাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে, মাহোবাতে। তাঁর পুত্র মালেসি মাণ্ডুর রাজাকে পরাজিত করেন।

রাজা বিহারীমলই প্রথম মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করেন। বাদশাহ আকবর তাঁকে পাঁচ হাজার মনসবদারীর পদে নিযুক্ত করেন, বিবাহ করেন তাঁর কন্যাকে। কলঙ্কিত হয় রাজপুত। মহাপরাক্রমশালী তাঁর পুত্র মান সিংহ,

মধ্যমণি তিনি আকবরের রাজসভার, বর্ধিত হয় তাঁর শৌর্যে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা সমুদ্র পর্যন্ত। তিনিই পরাজিত করেন উড়িষ্যার পাঠান রাজাকে, নতি স্বীকার করে তাঁর কাছে আসাম। নিযুক্ত হন তিনি একে একে বাংলার, বিহারের, দাক্ষিণাত্যের ও কাবুলের শাসনকর্তা। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

প্রবল পরাক্রান্ত জয় সিংহ মীর্জা রাজাও। তিনি ঔরঙ্গজেবের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। তিনিই বন্দী করেন মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীকে। কিন্তু সীমাহীন তাঁর গর্ব, শোনেন বাদশাহ ঔরঙ্গজেব, তাঁর পুত্রের হাত দিয়ে বিষ-পান করিয়ে তাঁর মৃত্যুসাধন করেন বাদশাহ। পরিসমাপ্তি হয় তাঁর জীবনের। অধিরোহণ করেন জয়পুরের সিংহাসনে তাঁর পুত্র রাম সিংহ। সুরু হয় অম্বরের অবনতি, প্রশমিত হয় তাদের প্রতিপত্তি মুঘল দরবারে। অধিরোহণ করেন জয়পুরের সিংহাসনে ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় জয় সিংহ, পরিচিত সোয়াই জয় সিংহ নামেও। শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, শ্রেষ্ঠ রাজা সমসাময়িক ভারতেরও, মহা অভিজ্ঞ রাজনীতিতে, মহাপারদর্শী রাজ্য শাসনেও, তিনি যোগ দেন মাড়বারের অজিত সিংহের সঙ্গে, অস্বীকার করেন মুঘলের অধিকার। শেষে নিযুক্ত হন মুঘল কর্তৃকই স্বরাষ্ট্র ও আগ্রার শাসনকর্তা। তিনি পরাজিত করেন বীরগুজার রাজাকে। মহাঅভিজ্ঞ তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে, নির্মাণ করেন নির্ভুল মানমন্দির, দিল্লীতে, জয়পুরে, বারাণসীতে, মথুরাতে ও উজ্জয়িনীতে, বাঙ্গালী মনীষী বিদ্যাধরের সহায়তায়, রচয়িতা তিনিই জয়পুর নগরের নকসারও। শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাও তিনি, লাল ও গোলাপী প্রস্তর দিয়ে স্থাপন করেন জয়পুর শহর, বুকে নিয়ে আটটি প্রবেশ পথ। অন্যতম সুন্দরতম শহর ভারতের, বেষ্টিত হ'য়ে আছে শহরটির তিন দিক—পূর্ব, পশ্চিম আর উত্তর—রুক্ষ পর্বতমালা দিয়ে, শীর্ষে নিয়ে দুর্গ আর বুরুজ। নির্মাণ করেন বহু মন্দিরও। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থানান্তরিত হয় রাজধানী অম্বর থেকে জয়পুরে। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরী সিংহ অধিরোহণ করেন অম্বরের সিংহাসনে তাঁর মৃত্যুর পর। অধিকারী হন এক বিস্তৃত রাজ্যের, অপরিমিত ঐশ্বর্যের আর সুযোগ্য রাজ কর্মচারীর। কিন্তু মেবারের রাণার প্রচেষ্টায় ও সাহায্যে, তাঁর

ভ্রাতা মেবারের রাণার দৌহিত্র মাধো সিংহ তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন। পরাক্রমশালী তিনিও রাজত্ব করেন বিপুল বিক্রমে সতের বৎসর। তিনিও নির্মাণ করেন কয়েকটি শিল্পনগর, শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে রাজবাড়া। পরিণত হয় জয়পুর শ্রেষ্ঠ শিল্পের কেন্দ্রস্থলেও।

বাস করেন তাঁর রাজসভায় বারাণসী থেকে আগত বহু মনীষীও। তিনিই প্রতিহত করেন জাঠ সর্দারের আক্রমণ জয়পুরে। মৃত্যু হয় মাধো সিংহের সুরু হয় অম্বরের পতন। রাজত্ব করেন একে একে দ্বিতীয় পৃথ্বী সিংহ, প্রতাপ সিংহ আর জগৎ সিংহ। কীর্তিহীন সকলেই। অন্তর্দ্বন্দ্বে ও ষড়যন্ত্রে ছেয়ে ফেলে অম্বর, অতিষ্ঠ হয় বাইরের আক্রমণেও, আক্রমণ মহারাষ্ট্রের, সিন্ধিয়ার, জাঠদের ও পাণ্ডারীদের। শেষে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুর ইংরাজের অধিকারে আসে, পরিণত হয় করদরাজ্যে।

প্রতিষ্ঠিত হয় অম্বর ৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার রাজা অম্বরিষের নামানুসারে। কিন্তু নির্মাণ করেন এই দুর্গ ও রাজ প্রাসাদ মহারাজা মান সিংহ ১৫৯২ থেকে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জয় সিংহ মীর্জা বাড়ান তার কলেবর, মহিমময় হয় প্রাসাদ।

নির্মিত মুঘল রাজপ্রাসাদের অনুকরণে, বুকে নিয়ে আছে অট্টালিকা আর হর্ম্যের সমষ্টি। বিস্তৃত হয়ে আছে শৈলমালার শীর্ষদেশে এক বিস্তীর্ণ ঈষৎ ভগ্ন পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে, এক গিরি সঙ্কটের মুখে, বেষ্টিত হয়ে আছে দিগন্ত প্রসারী সুউচ্চ শৈল শ্রেণী দিয়ে। কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে প্রধান প্রাসাদটি মহামহিমময় মূর্তিতে। বেষ্টন করে আছে মূলপ্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন প্রধান প্রকোষ্ঠগুলিকে একটি সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। উপনীত হ'তে হয় প্রাসাদে একটি সুন্দরতম শ্বেত মার্বেল প্রস্তরে রচিত সোপানের শ্রেণী ও একটি প্রবেশ পথ অতিক্রম করে।

আমরা জীপ থেকে নেমে একটি দীর্ঘ সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। পার হ'য়ে যাই প্রাঙ্গণ, অতিক্রম করি প্রবেশ পথও পরিচিত সিংহ পোলশো নামে উপনীত হই যশেশ্বরীর কালী মন্দিরে। বাংলার যশোরের মহাশক্তিশালী রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করে, মহারাজ মান সিংহ যশোর থেকে তাঁর আরাধ্য দেবী এই বিগ্রহটিকে নিয়ে

আসেন, প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দিরে। সমপর্যায়ে পড়েন বাংলার প্রতাপাদিত্য শৌর্যে ও স্বদেশ প্রেমে সহস্র মাইল দুরবর্তী শিশোদিয়া বীর রাজা প্রতাপের। সঙ্গে আসেন বাঙ্গালী পুরোহিতও। দেখি আজও তাঁদেরই এক বংশধর নিযুক্ত দেবীর পূজায়, তারাই পূজা করেন বংশ পরম্পরায়। দেখি নির্মিত হয় এই মন্দিরটি শ্বেত মার্বেল প্রস্তর দিয়ে। এক একটি সম্পূর্ণ প্রস্তরখণ্ড কেটে রচিত হয় মন্দিরের দুইটি দ্বার, শোভিত তার চারি ধার সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম বিভিন্ন লতা পল্লবে, কেন্দ্রস্থল দশমহাবিদ্যার মূর্তি দিয়ে। অপরূপ, সুন্দরতম, সুষ্ঠু গঠন এই মূর্তিগুলি। সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ দিয়ে অলঙ্কৃত এই মন্দিরের সম্মুখভাগ, তার ভিতরের প্রাচীরের গাত্র আর ছাদের অঙ্গও। রচিত হয় এক অমরাবতী, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। দেবীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে আমরা দেওয়ানিআমে উপনীত হই।

নির্মিত হয় দেওয়ানীআম বা দরবার কক্ষও মুঘল পদ্ধতিতে, বুকে নিয়ে আছে জোড়াস্তম্ভ। শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভ বন্ধনী, শিরে নিয়ে হস্তীমূর্তি। ছাদের অঙ্গে শোভা পায় প্রশস্ত ছাঁ-চ, সুউচ্চ প্রাচীরের গাত্রে সূক্ষ্ম জালির কাজ। সুন্দরতম এই দরবার কক্ষটি, উন্নততম তার নির্মাণ শৈলী। সর্বশ্রেষ্ঠ দান অম্বরের মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির। দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ানী আমের বিপরীত দিকে রাজপ্রাসাদের প্রবেশ কক্ষ—প্রবেশ পথ অন্দরমহলের—এক মহামহিমময় মূর্তিতে। অনুরূপ সপ্তদশ শতকে ওয়াজির খাঁন নির্মিত লাহোরের মস্‌জিদের পরিকল্পনায়, রচিত হয় এই প্রবেশ পথটি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, বুকে নিয়ে আছে উন্নততর আর সুন্দরতর স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রতীক অম্বরের স্থপতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরও। চাকচিক্য সমন্বিত টাইলের পরিবর্তে রং আর কাঁচ দিয়ে অম্বরের স্থপতি রচনা করেন তাদের ছাদ। এক রহস্যলোকে পরিণত হয় এই প্রবেশ পথ, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। ক্রমবর্ধমান সূক্ষ্ম কোণ আর খিলান দিয়ে সংযুক্ত হয় দরবার কক্ষ আর প্রবেশ পথ। সুসামঞ্জস্য হয় দরবার গৃহের সঙ্গে অন্দরমহলের সংযোজন। পরিচায়ক স্থপতির অপরিসীম স্থাপত্য জ্ঞানের, তাঁর অভিজ্ঞতারও।

প্রবেশ পথ অতিক্রম করে অন্দরমহলে প্রবেশ করে আমরা শিশ্‌মহলে উপনীত হই। নির্মিত হয় এই প্রকোষ্ঠটি অসংখ্য ক্ষুদ্র দর্পণের সমষ্টি দিয়ে

মীর্জা রাজা জয় সিংহ তৈরী করান। প্রতিফলিত হয় দর্শকের প্রতিমূর্তি প্রতিটি দর্পণে। মুগ্ধ হয়ে দেখি এই কক্ষের নির্মাণ কুশলতা। সেখান থেকে রংমহলে উপনীত হই। অনবদ্য, সুন্দরতম শিল্প সম্ভারে ভূষিত এই রংমহলও। দেখি একে একে কত প্রকোষ্ঠ, বিভিন্ন তাদের আকৃতি, কারও অঙ্গে শোভা পায় অলিন্দ, কেউ অলিন্দ বিহীন। সবগুলিই সমৃদ্ধশালী হয়ে আছে নিখুঁত সুন্দরতম অলঙ্করণ দিয়ে, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অম্বরের স্থপতির আর ভাস্করের। দেখি কত প্রাঙ্গণ, কত ছাদ, কত উদ্যানও।
বিদায় নেই তাদের স্রষ্টাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, জানাই সুন্দরের পূজারী মহারাজা মান সিংহকেও।

বর্হিপ্রাঙ্গণের প্রাচীর অতিক্রম করে সুদুর্গম উঁচু নিচু বন্ধুর স্খলিত আর অর্ধস্খলিত প্রস্তর খণ্ডের উপর পা রেখে অবতরণ করে আমরা জগৎ শিরোমণির মন্দিরে উপনীত হই। বিষ্ণু মন্দির, শুনি বিরাজ করেন এই মন্দিরের গর্ভগৃহে মীরাবাই-এর পূজিতা গিরিধারী গোপালের বিগ্রহ, তাঁর ইষ্ট দেবতা। আজন্ম সাধিকা গিরিধারী গোপালের মীরাবাই, শ্রেষ্ঠ সাধিকা ভারতের, বিবাহ হয় তাঁর শিশোদিয়া বংশের রাণা কুম্ভের সঙ্গে। কিন্তু তিনি নিযুক্ত থাকেন গিরিধারীর পূজায় ও উপাসনায় রাত্রি দিন। সহ্য করতে পারেন না তাঁর শ্বশুরকুল, হন তিনি নির্বাসিতা। কিছুদিন অতিবাহিত করেন বৃন্দাবনে, ব্রজধামে। সেখান থেকে প্রভাস তীর্থে উপনীত হ'য়ে তিনি মিশে যান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সঙ্গে। নির্মিত হয় এই মন্দিরটি নাগর পদ্ধতিতে। বিস্মিত হই এই মন্দিরের সর্বাঙ্গের অনবদ্য সুন্দরতম ও সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার আর তার প্রাচীরের গাত্রের ও ছাদের অঙ্গের অনুপম অলঙ্করণ দেখে। দাঁড়িয়ে আছে একটি তোরণ মন্দিরের সম্মুখে। দেখি অপরূপ, অনুপম, সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম অলঙ্করণে ভূষিত তার সর্বাঙ্গও। অভিনব গরুড় মন্দিরের অঙ্গের ভূষণও শ্রেষ্ঠ দান অম্বরের ভাস্করের। অনবদ্য শিল্পসম্ভার দিয়ে শোভিত হয় এই মন্দিরের মর্মর প্রস্তরে নির্মিত প্রবেশ পথটিও। দুই পাশে নিয়ে আছে প্রবেশ পথ দুইটি জীবন্ত হস্তী মূর্তি। শিল্পীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে জীপে উঠে বসি। অতিথিশালায় ফিরে আসি, তখন বেলা তিনটে।

সন্ধ্যায় চা পান করে ঐ জীপে করেই গোবিন্দজীর মন্দিরে উপনীত হই।

বিরাজ করেন শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ব্রজনাভের প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দদেব বৃন্দাবনে, এক মহামহিমময় মন্দিরে। দেখা যায় তার চূড়ার শীর্ষদেশের আলো দূর দূরান্তর থেকে। দেখেন দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেবও। আদেশ করেন ধ্বংস করতে মন্দির। ধ্বংস হয় মন্দির, বিচূর্ণ হয় তার গর্ভগৃহ। বিগ্রহ বুকে নিয়ে মন্দিরের পুরোহিত জয়পুরে পলায়ন করেন। স্থান লাভ করেন বিগ্রহ রাজ অন্তঃপুরের এই মন্দিরে। তাই মহা পবিত্র এই বিগ্রহ। নির্মিত এই মন্দিরটিও, মুঘল পদ্ধতিতে, শ্বেত মার্বেল প্রস্তর দিয়ে বুকে নিয়ে আছে সূক্ষ্ম শিল্পসম্ভার। দেখি আবৃত মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বার একটি কাল পর্দা দিয়ে। শোনা যায় পর্দার অন্তরাল থেকে পুরোহিতের উদাত্তকণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণ আর ঘণ্টার ধ্বনি। শেষে অপসারিত হয় পর্দা, আবরণমুক্ত হন দেবতা, পরিদৃশ্যমান হন। ধূপাধার হস্তে নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হন পুরোহিতও, নিযুক্ত হন বিগ্রহের আরতিতে। নৃত্য করেন একটি পরম রূপবতী যুবতী, ঘণ্টার তালে তালে, করেন সঙ্গীতের সঙ্গেও। সুমিষ্ট তাঁর স্বর লহরি মুগ্ধ হই শুনে। আরতি সমাপনান্তে দেবতাকে পূজা দিয়ে অতিথিশালায় ফিরে আসি।

পরের দিন সকালে বন্ধুবরকে সঙ্গে নিয়ে "ওয়াটার ওয়ার্কস' দেখতে যাই। অতিক্রম করি ত্রিশ মাইল পথ। অপরূপ রাস্তার দু-পাশের দৃশ্য। কোথাও বা মরুপ্রান্তর বুকে নিয়ে আছে এক একটি নিঃসঙ্গ মহীরুহ। কোথাও বা শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র, বিচরণ করে সেই ক্ষেতে কত নৃত্যপরায়ণ ময়ূর। কোথাও বন কোথাও উপবন। কোথাও বা ঘন বনবীথি। অতিক্রম করি কোথাও স্বচ্ছ কলনাদিনী স্রোতস্বিনী। একটি "রেজারভয়ার"-এর ধারে উপনীত হই। বেষ্টিত হয়ে আছে "রেজারভয়ার" ঘন বনবীথিতে, প্রকৃতির এক লীলানিকেতনে। এই "রেজারভয়ার" থেকেই জয়পুর শহরে জল নিয়ে যাওয়া হয়।

বিকেলে শহরের বিপণি থেকে কিছু শ্বেত পাথরের বাসন কিনি। মহা অভিজ্ঞ জয়পুরের শিল্পী শ্বেত পাথরের আধার নির্মাণে, দক্ষ তাদের রূপায়ণে, অলঙ্কৃত করতে তাদের অঙ্গ সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ দিয়ে। দেখি ঘুরে ঘুরে হাওয়া মহল বা হাওয়া প্রাসাদ, অবস্থিত শহরের কেন্দ্রস্থলে। নির্মিত পিরামিডের আকৃতিতে পঞ্চতল এই প্রাসাদটি, অঙ্গে নিয়ে আছে ঝোলানা অর্ধঅষ্টভুজাকার গবাক্ষ, শীর্ষে নিয়ে আছে বক্ররেখা বিশিষ্ট ছাদ আর গম্বুজ। মহারাজা

প্রতাপ সিংহ নির্মাণ করেন এই মহলটি। মুগ্ধ হই দেখে। শহর আর চিড়িয়াখানা দেখে গোপীনাথের মন্দিরে উপনীত হই। এই মন্দিরটিও নাগর পদ্ধতিতে নির্মিত। দেবতার আরতি দর্শন করে অতিথিশালায় ফিরে আসি।

পরের দিন সকালে জগন্নাথের মন্দিরে উপনীত হই। অবস্থিত এই মন্দিরটি শহরের কেন্দ্রস্থলে। সুউচ্চ প্রবেশপথ অতিক্রম করে মন্দিরের ভিতরে উপনীত হই। দেখি সুন্দরতম অলঙ্করণে শোভিত এই মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রও। বিকেলে গলতা দেখতে যাই। শহর অতিক্রম করে আমাদের জীপ একটি গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করে। পথের দুই পাশে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ শৈলমালা। অঙ্গে নিয়ে আছে শৈলমালা কোথাও গাঢ় সবুজ ঘন বনবীথি, কোথাও বা লতাগুল্ম, কোথাও কণ্টক গুচ্ছ। কোথাও বা বালু। তার মাঝ দিয়ে সর্পিলগতিতে যায় সঙ্কীর্ণ পথ। কোথাও এগিয়ে আসে দু-পাশের গিরিশ্রেণী, রুদ্ধ হয় পথ। কোথাও যুক্ত হয় দু-পাশের শৈলমালার শীর্ষদেশ, রচিত হয় আচ্ছাদন পথের উপর।

জীপ অগ্রসর হয় অতি সাবধানে, মন্থর তার গতি। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি প্রকৃতির এক সুদুর্গম সুন্দরতম পরিবেশ, এক রহস্য লোক। ভেসে ওঠে চোখের সামনে একটি দৃশ্য, চিত্র এক পুরাকাহিনীর। মহাপরাক্রমশালী বাদশাহ ঔরঙ্গজেব। তিনি পত্র লেখেন বিক্রম সোলাঙ্কিকে তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থনা করে। প্রেরিত হয় রূপনগরে দ্বিসহস্র সৈন্য ভাবীবধূকে নিয়ে আসবার জন্য। আশ্রয় ভিক্ষা করেন কন্যা রাজপুত কুলতিলক বীরশ্রেষ্ঠ মেবারের রাণা রাজ সিংহের। রাজগুরু পত্রবাহক হন। একশত যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে রাণা মুঘলের হাত থেকে রাজকুমারীকে হরণ করে নিয়ে আসেন নিজের আশ্রয়ে। বন্ধ করেন "জিজিয়া" কর দানও। বহু সহস্র সৈন্য আর পুত্র আকবর, আজিম ও সেনাপতি দিলদারকে সঙ্গে নিয়ে বাদশাহ মেবার আক্রমণ করেন। রাণার কৌশলে শাহাজাদা আকবর প্রবেশ করেন একটি গিরিসঙ্কটে। কর্তিত বৃক্ষ দিয়ে রুদ্ধ হয় তার দুই মুখ। এক মুখে তার মাড়বারের রাঠোর বীর দুর্গাদাস দাঁড়িয়ে, অপর মুখে অম্বরের সোয়াই জয়সিংহ। উপর থেকে অবিরাম প্রস্তর বৃষ্টি হয়। মৃত্যু বরণকরে অগণিত মুঘল সৈন্য। পিঞ্জরাবদ্ধ হন শাহাজাদা।

শেষে জয় সিংহের করুণায়, সসৈন্যে মুক্তি লাভ করেন, রক্ষা পান অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে।

আছে এই গলতাতে একটি নির্ঝর, রচিত হয় একটি ক্ষুদ্র সরোবর সেই নির্ঝরের জল নিয়ে। তপস্যা করতেন এখানে বসে গল্ভ ঋষি। নির্মিত হয় বহু মন্দিরও অঙ্গে নিয়ে নাগর পদ্ধতি। মন্দির দিয়ে শোভিত হয় গলতা। হোটেলে প্রত্যাবর্তন করি। খাওয়া দাওয়া সেরে স্টেশনে উপস্থিত হই। দিল্লীতে ফিরে আসি। আজও অক্ষয় হয়ে আছে অম্বরের স্মৃতি মনের মন্দিরে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সৌরাষ্ট্র

(খ্রীষ্টাব্দ ৯৪১—১৩১১)

প্রথম পরিচ্ছেদ

সোমনাথ পত্তন

সোমনাথের মন্দির

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ, দ্বিতীয় বার বদলি হয়ে বোম্বাইতে যাই, সুযোগ ও সৌভাগ্য হয় মহাপ্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির দর্শনের। দাঁড়িয়ে আছে মহাপবিত্র মন্দিরটি সোমনাথ পত্তনে, পরিচিত প্রভাস-পত্তন অথবা দেবপত্তন নামেও, সৌরাষ্ট্রের বর্তমান গুজরাটের দক্ষিণ উপকূলে ভেরাবল থেকে তিনমাইল দূরে। যেতে হয় রাজকোট ও জুনাগড় হয়ে ভিরমগ্রামে, সেখান থেকে ট্রেন বদল করে ভেরাবলে।

অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে আছে সৌরাষ্ট্র ভারত-আফরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের, পরিচিত গণ্ডওয়ানা নামে, হিমালয়ের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই, প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগ থেকেই বাস করেন তার নদীর তীরে মানবগোষ্ঠী। তাই প্রাচীনতম এই প্রভাসের সোমনাথের মন্দিরটিও।

পরিচিত সৌরাষ্ট্র কুশব্রত নামেও, এইখানেই পূর্বতন কুশস্থলিতে যাদবরা স্থাপন করেন দ্বারকা নগর। মহাপবিত্র এই দ্বারকাও পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের আমল থেকেই। উল্লিখিত আছে তার নাম মহাভারতে। এই দ্বারকাতেই পবিত্র নদী সরস্বতী সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হন।

এইখানেই এই সাগর আর সরস্বতীর সঙ্গমেই, প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ মুক্ত হন দেবতা সোম। তিনি দক্ষের সপ্তবিংশতি কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু রোহিনীই শুধু তাঁর প্রিয়তমা। ক্ষুব্ধ হন, মর্মাহত হন তাঁর অন্য স্ত্রীরা তাঁর এই আচরণে, অভিযোগ করেন পিতার নিকট। অসন্তুষ্ট হন প্রজাপতি চন্দ্রের এই পক্ষপাতিত্বে, আদেশ করেন তাঁকে সমান ব্যবহার করতে সকল স্ত্রীর সঙ্গে। কিন্তু মানেন না দেবতা সোম এই আদেশ, শোনেন না তাঁর নিষেধ। মহাক্রুদ্ধ হন দক্ষ, অভিশাপ দেন চন্দ্রকে। তাঁর অভিশাপে ক্ষীণতনু

হ'তে থাকেন চন্দ্র দিনের পর দিন। জন্মায় না কোন শাকসবজি, শুকিয়ে যায়, লতাপল্লব ধরিত্রীর বুকে। শেষে অন্য দেবতারা দক্ষের নিকট উপস্থিত হন, অনুরোধ করেন অভিশাপ মুক্ত করতে সোমকে। বলেন প্রজাপতি পবিত্র সরস্বতী নদী ও সাগরের সংগমে গিয়ে চন্দ্রকে দেবাদিদেব আশুতোষের তপস্যায় নিযুক্ত হ'তে। তুষ্ট হন যদি আশুতোষ তাঁর তপস্যায়, ক্ষীণতনু হবেন সোম এক পক্ষ কাল প্রতিদিন, পুণর্লাভ করবেন সেই তনু পরবর্তী পক্ষে দিনের পর দিন, ফিরে পাবেন সম্পূর্ণ রূপ দ্বিতীয় পক্ষের অবসানে। চলবে এই ক্ষয় আর পুণপ্রাপ্তি আবাহমান কাল।

দেবতাদের অনুরোধে, চন্দ্র প্রভাসে, সঙ্গম স্থলে উপনীত হন, নিযুক্ত হন দেবাদিদেব শিবের তপস্যায়, করেন কঠোর তপস্যা। সন্তুষ্ট হন দেবাদিদেব তাঁর তপস্যায়, হন তিনি প্রজাপতির অভিশাপ মুক্ত, ফিরে পান তাঁর আলোক, লাভ করেন দ্যুতি। পরিণত হয় প্রভাসও ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থে, পুণ্যতীর্থ নর আর নারীর, তীর্থ মুনি ঋষিদেরও। লাভ করেন তাঁরা অক্ষয় স্বর্গ তার মহাপবিত্র জলে স্নান করে। আসেন এই তীর্থ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব সঙ্গে নিয়ে ভ্রাতা বলরামকে। আসেন যুধিষ্ঠির আদি পাণ্ডুপুত্রগণ, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনও আসেন। দর্শন করেন এই পবিত্র তীর্থ জন্মেজয় পরীক্ষিত, করেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও। সমবেত হন প্রতিদিন কত পুণ্যলোভাতুর নর আর নারীও, অবগাহন করেন সিন্ধুর পবিত্র জলে লাভ করেন অক্ষয় স্বর্গ।

বুকে নিয়ে আছে এই সৌরাষ্ট্র দশাবতারের অন্যতম অবতার শ্রীকৃষ্ণের কত কীর্তির নিদর্শন, স্মৃতির প্রতীক। প্রবল পরাক্রান্ত হন গিরিব্রজরাজ জরাসন্ধ আক্রমণ করেন মথুরা, তিনি মথুরা পরিত্যাগ করে প্রভাসে এসে বসতি স্থাপন করেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন যাদবদের। স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী দ্বারকা নগরে। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা মহাকাব্য মহাভারতের, বহু বিস্তৃত তাঁর অভিনয়ও। সুরু হয় সেই অভিনয় দৌপদ্রীর সয়ংবর সভায়। তিনি নিহত করেন মথুরাধিপতি প্রবল পরাক্রান্ত মহাঅত্যাচারী কংশকে। অধিষ্ঠিত হন মথুরার সিংহাসনে উগ্রসেন। তিনি সাহায্য করেন দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমকে পরাজিত ও নিহত করতে মহাপরাক্রমশালী নৃপতি জরাসন্ধকে। তীর্থ দর্শনে যান অর্জুন প্রভাসে, তিনি তাঁকে দ্বারকায় নিয়ে যান। তাঁরই পরামর্শে

দ্বারকা থেকে হরণ করে নিয়ে আসেন অর্জুন তাঁর ভগ্নী সুভদ্রাকে, বিবাহ করেন তাঁকে। উপস্থিত হন তিনি যুধিষ্ঠিরেব রাজসূয় যজ্ঞে, গ্রহণ করেন অগ্রপূজা যজ্ঞ সমাপনান্তে।

হন তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেব প্রারম্ভে শান্তির দূত, উপনীত হন কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুরে, করেন শান্তির প্রস্তাব। মানেন না তাঁর প্রস্তাব কৌরবরাজ দুর্যোধন। সংঘটিত হয় এক মহাসমর কুরুক্ষেত্রে। অংশ গ্রহণ করেন তাতে ভারতের প্রায় সমস্ত নৃপতি। যোগদান করেন যাদব সৈন্য কৌরবপক্ষে। কিন্তু অংশ গ্রহণ করেন না তিনি যুদ্ধে, হন অর্জুনের রথের সারথি, হন সখা ও সচিব, অনুপ্রাণিত করেন তাকে যুদ্ধে নিযুক্ত হতে। পরিচয় দেন এক মহা অভিজ্ঞ সমর কুশলীর, অগাধ রাজনীতি জ্ঞানেরও। দেখান তাঁকে তাঁর বিশ্বরূপও। রচিত হয় গীতা, সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ভারতের, সর্বদেশের, সর্ব যুগেরও।

পরাজিত ও নিহত হন কৌরবগণ, অধিষ্ঠিত হন পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরের সিংহাসনে, তিনি দ্বারকায় ফিরে আসেন। প্রমত্ত হন যাদবকুল, মৃত্যু বরণ করেন সকলে অন্তর্দ্বন্দ্বে। জীবিত থাকেন শুধু তিনি নিজে, ভ্রাতা বলরাম আর সারথি দারুক। তিনি সঁপে দেন অর্জুনের হাতে শোকাকুলা যাদব রমণীদের আর তাঁর একমাত্র জীবিত পৌত্র মথুরার সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী বজ্রকে। মৃত্যু হয় বলরামেরও। তিনি উপনীত হন এক গভীর অরণ্যে, নিমগ্ন হন ধ্যানে। মৃত্যু বরণ করেন এক ব্যাধের তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে, হানে সে সেই তীর তাঁকে হরিণ মনে করে। বালকতীর্থ নামে খ্যাতি লাভ করে সেই স্থান। ভস্মীভূত হয় তাঁর নশ্বর দেহ পবিত্র নদী হিরণ্য, সরস্বতী আর কপিলার সঙ্গমস্থলে। সর্বশ্রেষ্ঠ আর পবিত্র তীর্থ ভারতের এই ত্রিবেণী, এই খানেই হয় তাঁর দেহোৎসর্গ।

আর্যেরা প্রবেশ করেন সৌরাষ্ট্রে বসতি স্থাপন করেন সম্ভবতঃ ৮০০ থেকে ৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বের মধ্যে। রাজত্ব করেন অবন্তীতে, অন্যতম চারিটি প্রাচীনতম মহাশক্তিশালী রাজ্যের আর্যাবর্তের চণ্ড প্রদ্যোৎ মহাসেন, সমসাময়িক তিনি বৎসরাজ উদয়নের, মগধ নৃপতি বিম্বিসারের আর কোশল নৃপতি মহাকোশল ও তাঁর পুত্র প্রসেনজিতের। স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী শিপ্রা নদীর তীরে

উজ্জয়িনীতে। সম্ভবতঃ তাঁর অধীনস্থ হয় সৌরাষ্ট্র, আসে মহাপরাক্রমশালী অবন্তী রাজ্যের অধিকারে। বৎসরাজ উদয়ন তাঁর কন্যা রাজকুমারী বাসবদত্তাকে হরণ করেন। তাদের অবলম্বন করেই রচনা করেন মহাকবি ব্যাস তাঁর বিখ্যাত নাটক "স্বপ্ন বাসবদত্তা"। মহাপরাক্রমশালী হন বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু, অধিকার করেন অবন্তী। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করে অবন্তী তাঁর পুত্র উদয়ীর রাজত্বকালে।

প্রবল পরাক্রান্ত হন মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মগধে ৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে, তাঁর অধিকার আসে সৌরাষ্ট্র।

প্রশমিত হয় মৌর্যদের ক্ষমতা মগধে খ্রীষ্ট পূর্ব ১৮৪ অব্দে, সৌবাষ্ট্র গ্রীকরাজ মিনান্দার বা মিলিন্দের অধিকারে আসে। তাঁরা ব্যাক্‌টিয়া থেকে আসেন। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা কাবুল ও পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে কাথিয়াবাড পর্যন্ত বলেন ষ্ট্রাবো। শাকলে বা শিয়ালকোটে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী।

অধীনস্থ হয় "ক্ষহরাত" শাখার শক ক্ষত্রপদের খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষ ভাগ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত, দীর্ঘ তিনশত বৎসর। অধিকারে আসে ভূমক ও ক্ষত্রপ নহপানের। নহপানই শ্রেষ্ঠ নৃপতি এই বংশের, তাঁব কাছে পরাজিত হন সাতবাহন রাজারা। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা মালবে, কাথিয়াবাড়ে, আর মহারাষ্ট্রের এক অংশে, প্রসারিত হয় পুণা ও নাসিক থেকে আজমীব পর্যন্ত, উল্লিখিত আছে তাঁর জামাতা উষভদত্তের শিলা-লিপিতে। সম্ভবত: তিনি ১১৯ থেকে ১২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হয় নহপানের এই রাজনৈতিক প্রাধান্য। পরাজিত হন তিনি সাতবাহন রাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর হস্তে, বিলুপ্ত হয় ক্ষহরাত শক্তিও। উৎকীর্ণ আছে কালি ও নাসিকের অঙ্গের চিত্রসারির ফলকে ব্রাহ্মণ নহপান উপনীত হন সোমনাথের মন্দিরে, করেন দেবদর্শন।

প্রবল পরাক্রান্ত হন কর্দমক বংশের রুদ্রদমনও। শ্রেষ্ঠ নৃপতি এই বংশের তিনি, রাজত্ব করেন ১৩০ থেকে ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি পরাজিত করেন সাতবাহনরাজ পুলুমায়িকে, মালব, সৌরাষ্ট্র ও কঙ্কন তাঁর অধিকারে আসে। হন তিনি মহাক্ষত্রপ। প্রজা হিতৈষী, সুশাসক এই নৃপতি, বিদ্বান ও গুণগ্রাহী অভিজ্ঞ ন্যায়শাস্ত্রে, রাষ্ট্রনীতিতে আর সংস্কৃত ভাষায়। প্রশমিত হ'তে থাকে

তাঁদের ক্ষমতা তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে তাঁদের হস্তচ্যুত হয় কঙ্কন, সিন্ধু, রাজপুতানা আর মালব। শেষে বিলুপ্ত হয়ে যায় একেবারে শক রাজ্য, শক শাসন, শকবংশ গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক। পরাজিত ও নিহত হন তাঁর হস্তে শক ক্ষত্রপ রুদ্র সিংহ শেষ রাজা এই বংশের, বাকাটকরা তাঁকে সাহায্য করেন।

প্রতিষ্ঠা করেন বিন্ধ্যশক্তি বাকাটক রাজ্য, নন্দীবর্ধনে স্থাপিত হয় রাজধানী। বিস্তৃত হয় তাঁদের রাজ্য মধ্যভারত আর দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশ নিয়ে। সমসাময়িক তাঁরা মগধের গুপ্ত সম্রাটদের, রাজত্ব করেন চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত। মৃত্যু হয় বিন্ধ্যশক্তির প্রবর সেন, প্রথম রুদ্র সেন, পৃথিবী সেন; দ্বিতীয় রুদ্র সেন ও দিবাকর সেন— অলঙ্কৃত করেন একে একে বাকাটক সিংহাসন। বিবাহ হয় দ্বিতীয় রুদ্রসেনের গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে। সুদূর-প্রসারী হয় এই মৈত্রীর বন্ধন। সুদৃঢ় হয় পশ্চিম-ভারতে গুপ্ত ক্ষমতা গুপ্তরাজ্য, নিরাপদ হয় বাকাটকগণও গুপ্ত আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে। পরিণত হয় বাকাটক রাজ্য মধ্যভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে। গড়ে ওঠে কত মহা-অভিজ্ঞ স্থপতির অনবদ্য দান মধ্যভারতে, তাঁদের রাজ্যের দিকে দিকে, অঙ্গে নিয়ে সুনিপুণ ভাস্করের কত অতুলনীয় সৃষ্টি, কত গৌরবময় শাশ্বত কীর্তি। পরাজয় বরণ করেন শেষ বাকাটক রাজা কলচুরিদের হস্তে, পরিসমাপ্ত হয় বাকাটক শাসন মধ্যভারতে।

প্রশমিত হয় গুপ্ত ক্ষমতা মগধে প্রতিষ্ঠা করেন এক স্বাধীন রাজ্য সৌরাষ্ট্রে মৈত্রক বংশীয় ভটার্ক পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে। বলভীতে স্থাপিত হয় তার রাজধানী। ছিলেন তিনি গুপ্ত সম্রাটদের সেনাপতি ও সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্তা। মহাপরাক্রমশালী হন এই বংশের রাজা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শিলাদিত্য, বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা রাজস্থানের (রাজপুতানার) দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত। পরাজিত হন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় ধ্রুবসেন বা ধ্রুবভট্ট কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের হস্তে, বাধ্য হন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতেও। বিবাহ দেন হর্ষ তাঁর কন্যার সঙ্গে বলভীরাজ ধ্রুবভট্টের, স্থাপিত হয় মিত্রতার বন্ধন সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে কনৌজের। আবার স্বাধীনতা লাভ করে বলভী হর্ষের মৃত্যুর পরে। চতুর্থ ধ্রুব সেন, ধ্রুবভট্টের

পুত্র, হর্ষের দৌহিত্র পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর চক্রবর্তী উপাধি গ্রহণ করেন। পরিণত হয় বলভীরাজ্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল সাহিত্যের, শিক্ষার ও সংস্কৃতির, হয় কৃষ্টিরও। শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হয় বাণিজ্যেরও, মহাসমৃদ্ধি-শালী হয় বলভী হন মৈত্রক রাজারাও।

অষ্টম শতকের শেষভাগে বিজিত হয় বলভি সিন্ধুর আরবগণ কর্তৃক। পরি-সমাপ্তি হয় এক গৌরবময় রাজ্যের, অবসান হয় এক শিক্ষার ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলের ভারতের।

পতন হয় বলভীর মৈত্রকদের, অধীনস্থ হয় সৌরাষ্ট্র বাতাপির চালুক্য রাজাদের। অবসান হয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের আর্যাবর্তে সার্বভৌম আধিপত্য নিয়ে যুদ্ধ হয় বাংলার শশাঙ্কের, থানেশ্বরের হর্ষবর্ধনের আর কনৌজের যশোধর্মনের। প্রতিষ্ঠিত হয় দুইটি মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতে—কাঞ্চীতে পল্লবরা প্রতিষ্ঠা করেন, দাক্ষিণাত্যে, মহারাষ্ট্র দেশে চালুক্য রাজ বংশের প্রথম পুলকেশী ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করেন। বিজাপুর জেলায় বাতাপিতে বর্তমান বাদামিতে স্থাপিত হয় তার রাজধানী। অনুরূপ সাতকর্ণি ও বৈজয়ন্তীর কদম্বদের মানব গোত্রীয় এই চালুক্যরা। হারীতি পুত্র নামেও পরিচিত। কেউ বলেন উদ্ভূত তাঁরা অযোধ্যার এক ক্ষত্রিয় রাজবংশ থেকে বিন্ধ্য অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্যে এসে বসতি স্থাপন করেন।

পুলকেশীর পুত্র প্রথম কীর্তিবর্মণ অধিরোহণ করেন চালুক্য সিংহাসনে ৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। অধিকার করেন তিনি কানাড়া আর কোঙ্কণ, বাড়ে রাজ্যের সীমানা। তাঁর ভাই মঙ্গলেশ রাজত্ব করেন ৫৯৭ থেকে ৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরাজিত হন তাঁর কাছে কলচুরি অধিপতি, রত্নগিরি চালুক্যের অধিকারে আসে।

অলঙ্কৃত করেন চালুক্য সিংহাসন ৬০৯ থেকে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কীর্তি—বর্মণের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, সর্বশ্রেষ্ঠ সমসাময়িক রাজাদের মধ্যেও। তাঁর কাছে পরাজিত হন উত্তরকানাড়ার কদম্বরাজ, মহীশূরের গঙ্গরাজা ও কোঙ্কণের মৌর্যরাজ, হন পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণও। তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন মালব আর দক্ষিণ গুজরাটের অধিবাসীরা। তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন মহাকোশল আর কলিঙ্গের রাজারা, নতি স্বীকার করেন চোল

কেরল আর পাণ্ড্যের অধিপতি। প্রতিরুদ্ধ হয় থানেশ্বরের অধিপতি হর্ষবর্ধনের দাক্ষিণাত্য আক্রমণও। তিনি পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর রাজসভায় দূত প্রেরণ করেন। পরিদর্শন করেন তাঁর রাজসভা চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং, মুখর তাঁর লেখনী তাঁর প্রশংসায়। উল্লিখিত আছে তাঁর বিজয়ের কাহিনী আইহোলের শিলালিপিতে। কিন্তু ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র নরসিংহ বর্মণ কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। রুদ্ধ হয় তাঁর বিজয়ের অভিযান।

তাঁর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করেন ৬৫৫ থেকে ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত। তিনি পল্লব নৃপতি নরসিংহ বর্মণকে পরাজিত করে পল্লব রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেন। আবার দাক্ষিণাত্যে চালুক্য ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর কাছে পরাজিত হন চোল, কেরল আর পাণ্ড্য রাজারাও।

রাজত্ব করেন একে একে বিনয়াদিত্য, (৬৮০—৬৯৬ খ্রীঃ) বিজয়াদিত্য (৬৯৬—৭৩৩খ্রীঃ) আর দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য (৭৩৩—৭৪৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যই শেষ পরাক্রমশালী রাজা এই বংশের, পাণ্ড্য ও চোল রাজারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন, করেন মালাবার উপকূলের অধিবাসীরাও। পরাজিত হন তাঁর কাছে পল্লবরাজা, তাঁর অধিকারে আসে রাজধানী কাঞ্চী। ব্যাহত হয় সিন্ধু বিজেতা আরবদের গুজরাট আক্রমণও। ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সামরিক খ্যাতি দিকে দিকে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তিনি, নির্মিত হয় রাজধানী বাতাপিতে এক সুন্দরতম মহিমময় মন্দির, কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথের মন্দিরের অনুকরণে।

দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ, শেষ রাজা এই বংশের রাজত্ব করেন ৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূট দন্তিদুর্গ অধিকার করেন চালুক্য সিংহাসন, পরাজিত ও নিহত হন তাঁর হস্তে শেষ চালুক্য রাজা। অস্তমিত হয় চালুক্য ক্ষমতা, চালুক্য প্রভাব দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রে, সুরু হয় রাষ্ট্রকূট শাসন, রাজত্ব করেন তাঁরা প্রবলপ্রতাপে দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে দীর্ঘ দ্বিশত বৎসরেরও বেশী, হন সার্বভৌম সম্রাট।

পরাজিত ও নিহত হন শেষ রাষ্ট্রকূট নৃপতি দ্বিতীয় কক্ক বা চতুর্থ অমোঘবর্ষ চালুক্য বংশের তৈলপ বা দ্বিতীয় তৈলের কাছে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় চালুক্য

ক্ষমতা দাক্ষিণাত্যে। বংশধর তিনি বাতাপির চালুক্য বংশের স্থাপন করেন এই স্বাধীন রাজ্য খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে। মহাপরাক্রমশালী এই তৈল রাজত্ব করেন ৯৭৩ থেকে ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর কাছে পরাজয় বরণ করেন শেষ রাষ্ট্রকুটরাজ, করেন মালবের অধিপতি পরমার বংশের মুঞ্জও। কল্যাণে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী। তাই পরিচিত এই বংশ কল্যাণের চালুক্য নামে।

তারপর রাজত্ব করেন একে একে সত্যাশ্রয়, পঞ্চম বিক্রমাদিত্য, দ্বিতীয় জয় সিংহ আর সোমেশ্বর ১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রবল পরাক্রান্ত এই সোমেশ্বরও (১০৪২—১০৬৮ খ্রীঃ) তাঁর কাছে পরাজিত হন মালব ও চোলের অধিপতি, হন কাঞ্চীর রাজা আর চেদীরাজ কর্ণদেবও; বাড়ে রাজ্যের সীমানা।

তাঁর পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, অধিরোহণ করেন কল্যাণের সিংহাসনে ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন ১১২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরাজিত হন তাঁর কাছে চোল রাজা রাজেন্দ্র চোল কুলোত্তুঙ্গ। বঙ্গদেশের কিছু অংশও তাঁর অধিকারে আসে। বিদ্যোৎসাহী তিনি, অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা 'বিক্রমাঙ্কচরিত' প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি বিহ্লন আর মিতাক্ষরা রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে চালুক্য সেনাপতি বিজ্জল কলচুর্য অধিকার করেন সমস্ত চালুক্য রাজ্য, প্রতিষ্ঠিত হয় লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় তাঁর রাজত্ব কালে। পরিসমাপ্তি হয় কল্যাণের চালুক্য সাম্রাজ্যের ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে। গড়ে ওঠে দাক্ষিণাত্যে তিনটি মহাশক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য—দেবগিরিতে যাদব, বরঙ্গলে কাকতীয় আর মহীশূরে দোরসমুদ্রে হোয়সল।

শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এই বাতাপির ও কল্যাণের চালুক্য আর মহীশূরের হোয়সল রাজারাও। গড়ে ওঠে দিকে দিকে চালুক্যভূমে ও মহীশূরে অসংখ্য মন্দির, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্থাপত্যের, অঙ্গে নিয়ে জীবন্ত, মহামহিমময় মূর্তির সম্ভার, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির এক মহাগৌরবময় যুগের, এক অবিনশ্বর কীর্তির।

বাতাপির চালুক্য রাজারাই নির্মাণ করেন আইহোলে দুর্গামন্দির, প্রাচীনতম নাগর মন্দির ভারতের, সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে। নির্মিত হয় বিজাপুর জেলায় আইহোলেই সত্তরটি মন্দির, অঙ্গে নিয়ে মন্দির নির্মাণের

ক্রমবিকাশ। নির্মিত হয় বাদামিতেও ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে কয়েকটি গুহা-মন্দির অঙ্গে নিয়ে উচ্চতর সৃষ্টির নিদর্শন চালুক্য স্থপতির, পরিচায়ক তাদের অগ্রগতিরও। নির্মিত হয় পট্টদকলেও, বাদামি থেকে দশ মাইল দূরে দশটি মন্দির। বুকে নিয়ে আছে তাদের মধ্যে চারিটি নাগর পদ্ধতি অবশিষ্ট দ্রাবিড়। নির্মিত হয় নাগর পদ্ধতিতে পাপনাথের মন্দির ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে, জম্বুলিঙ্গ, করসেদেশ্বর (করসিদ্ধেশ্বর) আর কাশীনাথ (কাশী বিশ্বনাথ), দ্রাবিড় পদ্ধতিতে সঙ্গমেশ্বর, (৭২৫ খ্রীঃ) বিরুপাক্ষ (খ্রীঃ ৭৪০) মল্লিকার্জুন (খ্রীঃ ৭৪০) গলগনাথ (খ্রীঃ ৭৪০), সুন্মেশ্বর ও জৈন মন্দির।

অধিকারে আসে সৌরাষ্ট্র চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি রাজাদের চালুক্যদের পতনের পর। মহাপরাক্রমশালী হন তাঁরা সৌরাষ্ট্রে বর্তমান গুজরাটে। স্থাপিত হয় তাঁদের প্রাধান্য মূলরাজ নামে এক নায়কের নেতৃত্বে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে। অনহিল-পাটকে বা অনহিলবাডা পটনে স্থাপিত হয় রাজধানী।

লুণ্ঠিত হয় মহাপ্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির এই বংশের রাজা প্রথম ভীমের রাজত্বকালে। গজনার সুলতান মামুদ লুণ্ঠন করেন, ধ্বংসে পরিণত হয় ইঁট আর কাঠের তৈরী দেবতার মন্দিরটি। তিনিই নির্মাণ সুরু করেন প্রস্তর দিয়ে মন্দির সোমনাথে। তাঁর সেনাপতি বিমলও, অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা সৌরাষ্ট্রের নির্মাণ করেন মহাপবিত্র আবু পর্বতের শীর্ষদেশে সুপ্রসিদ্ধ, মহামহিমময় মন্দিরটি পরিচিত "বিমল বশাহী" নামে।

প্রবল পরাক্রান্ত হন ভীমের পৌত্র সিদ্ধরাজ জয় সিংহ। তিনি জয় করেন সুরাষ্ট্র আর পরমার রাজ্য। বিস্তৃত হয় তাঁর প্রতিপত্তি, বাড়ে প্রভাব। পরাক্রমশালী পরবর্তী নৃপতি কুমারপালও, বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা গঙ্গা থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত, হয় বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলেও। দীক্ষা গ্রহণ করেন তিনি জৈন ধর্মে আচার্য হেমচন্দ্রের নিকট। অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এই বংশের সিদ্ধরাজ জয়সিংহ আর কুমারপাল, নির্মাণ করেন বহু মহিমময় মন্দির, শোভিত করেন সৌরাষ্ট্র আর রাজস্থানের বুক।

খ্যাতিমান নৃপতি দ্বিতীয় মূলরাজও এই বংশের, প্রতিহত করেন তুরস্ক বাহিনীর আক্রমণ। প্রশমিত হ'তে থাকে চৌলুক্য ক্ষমতা, চৌলুক্য প্রতিপত্তি তাঁর পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় ভীমের রাজত্ব কাল থেকে।

শেষে লবণ প্রসাদ এক সামন্ত গ্রহণ করেন সর্বময় কর্তৃত্ব এই রাজ্যের, প্রতিষ্ঠা করেন স্বাধীন বাঘেলা রাজবংশ সৌরাষ্ট্রে। প্রবল পরাক্রান্ত তাঁর পুত্র বীরধবল, অন্যতম শ্রেষ্ঠস্রষ্টা ভারতের, তাঁর মন্ত্রী দুই ভাই বস্তুপাল ও তেজপালও, সাজান গির্ণার, ও আবু পর্বতের শীর্ষদেশ সুন্দরতম আর মহামহিমময় জৈন মন্দির দিয়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত হন এই বংশের শেষ রাজা কর্ণদেব সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর হস্তে। সৌরাষ্ট্র তাঁর অধিকারে আসে, অধীনস্থ হয় মুসলমানের।

নির্মিত হয় সৌরাষ্ট্রে চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি রাজাদের রাজত্বকালেই অধিকাংশ মহামহিমময় সুন্দরতম মন্দির, বুকে নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভারতের স্থপতির আর ভাস্করের, শ্রেষ্ঠ প্রতীক নাগর পদ্ধতিরও। কিন্তু দুর্ভাগ্য সৌরাষ্ট্রের ভাগ্যহীন ভারত, ধ্বংসে পরিণত হ'য়েছে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই কালের করালে আর মুসলমান বিজেতাদের ক্ষমাহীন অত্যাচারে, লুপ্ত হয়েছে কত অমূল্য সম্পদ বুকে নিয়ে বহু শত বৎসরের ভারতের স্থপতির আর ভাস্করের অক্লান্ত সাধনার দান। কিন্তু যেগুলি আজও অবশিষ্ট আছে, দাঁড়িয়ে আছে অক্ষত অথবা অর্ধধ্বংস অবস্থায়, সাক্ষী হ'য়ে আছে তাদের পূর্ব গৌরবের, অঙ্গে নিয়ে আছে সৌরাষ্ট্রের মহাঅভিজ্ঞ শিল্পীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য, প্রতীক হ'য়ে আছে তাঁদের অসীম সৌন্দর্য আর শিল্প জ্ঞানেরও।

যদিও নির্মিত হয় অধিকাংশ মন্দিরই সোলাঙ্কি নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায়, তাঁদের অর্থে আর প্রেরণায়, নির্মাণ করেন কয়েকটি সুমহান মন্দির দেশের সমৃদ্ধিশালী, অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরাও—নির্মিত হয় তাঁদের অর্থে, তাঁদের উদ্যমে, তাঁদের প্রেরণায়। সাহায্য করেন প্রতিটি গুজরাটবাসী, তার প্রতিটি জৈন আর হিন্দু অধিবাসী অংশ গ্রহণ করেন মন্দির নির্মাণের কাজে। তাই বুকে নিয়ে আছে প্রতিটি মহিমময় মন্দির সারা দেশবাসীর যুক্ত প্রচেষ্টার দান, রূপ পরিগ্রহ করে তার অঙ্গের প্রতিটি প্রস্তর খণ্ড, প্রতিটি শ্বেতপ্রস্তর দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মজ্ঞানের, তাদের সম্মিলিত আশাআকাঙ্খার, তাদের ঐতিহ্যের, ঐতিহ্যের এক মহাগৌরবময় যুগের। তাই অপরূপ এই মন্দিরগুলি।

অবলম্বিত হয় শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসন তাদের নির্মাণে, তাই বুকে নিয়ে আছে সৌরাষ্ট্রের মন্দিরও গঠন পদ্ধতি, অনুরূপ অধিকাংশ নাগর মন্দিরের।

নির্মিত হয় প্রথমে একটি মন্দির সঙ্গে নিয়ে গর্ভগৃহ আর একটি স্তম্ভযুক্ত কক্ষ বা মণ্ডপ। কিন্তু অভিনব, নিখুঁত এই দুইটি প্রচলিত যুক্ত কক্ষের অংশের নির্মাণ কৌশল, তাদের সংযোজনও, পরিচায়ক তার মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির অগাধ পাণ্ডিত্যের, বহুমুখী প্রতিভার আর নিত্য নূতন আবিষ্কারের—তাই মহিমময় হয় মন্দিরগুলি, অপরাজেয় হয়, অপরূপ হয়।

বিভক্ত এই মন্দিরের পরিকল্পনা প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে। যুক্ত হয় কক্ষ দুইটি, রূপ পরিগ্রহ করে এক সামান্তরিক ক্ষেত্রে অবস্থিত অবিচ্ছেদ্য যুগ্মভবনের প্রথম শ্রেণীতে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আয়তক্ষেত্রের রূপ ধারণ করে প্রতিটি কক্ষ, যুক্ত হয় তারা কোণাকুণি। সাধারণতঃ আদিমন্দিরগুলি প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে, প্রতীক হ'য়ে আছে পরবর্তী মন্দিরগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর। উভয় শ্রেণীতেই বিভক্ত হয় তাদের পার্শ্বদেশ পর্যায়ক্রমে অধিক্ষিপ্ত অথবা কুলুঙ্গির অন্তর্নিহিত আবরণ দিয়ে, রচিত হয় কোণ। সৃষ্টি হয় প্রাচীরের ঊর্ধ্বাংশে আলোছায়ার সমাবেশ। বিভক্ত এই কোণও দুইটি শ্রেণীতে প্রথম শ্রেণীতে পার্শ্বে নিয়ে আছে সরলরেখা বৃত্তাকার অথবা পত্রপুষ্প সমন্বিত দ্বিতীয় শ্রেণীতে। নির্মিত হয় দ্বিতল আর ত্রিতল মন্দিরও—সোলাঙ্কি নৃপতিরা নির্মাণ করেন।

বিভক্ত সোলাঙ্কি পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দিরগুলি তিনটি প্রধান অংশে—ভিত্তি বা পীঠ, মণ্ডোভর অথবা প্রাচীরের সম্মুখভাগ, বিস্তৃত স্তম্ভশীর্ষ অথবা কানিস পর্যন্ত আর ঊর্ধ্বাংশ। অঙ্গে নিয়ে আছে এই ঊর্ধ্বাংশ ছাদ-মন্দিরের শীর্ষদেশে চূড়া অথবা শিখর।

রচিত ছাঁচের গ্রন্থির অনুক্রম দিয়ে এই পীঠ, অলঙ্কৃত হয় তার অঙ্গ কত প্রচলিত প্রতীক দিয়ে, অধিকার করে তারা তাদের নির্ধারিত স্থান। সর্বনিম্নে গরম্পাত্তি অথবা রাক্ষসবৃন্দ, শিরে নিয়ে শৃঙ্গ, তাদের উপর গজপীঠ, বা হস্তীর সারি, তাদের উপর অশ্বতর বা অশ্বের শ্রেণী, সবশেষে নরতর বা মনুষ্যমূর্তি। রচিত হয় এই পীঠের সর্বোচ্চ পৃষ্ঠে মন্দিরের হর্ম্যতল।

নির্মিত হয় এই অলঙ্কৃত পীঠের উপর দ্বিতীয় বা মাঝের অংশ মণ্ডোভর, পরম গুরুত্বপূর্ণ অংশ মন্দিরের সারা ঊর্ধ্বাংশের পরিকল্পনার, স্থান শুধু মূর্তি রচনারও। রচনা করেন সৌরাষ্ট্রের মহাঅভিজ্ঞ স্থপতি উল্লম্ব, ঋজু প্রাচারের সম্মুখভাগ, রূপ পরিগ্রহ সেই প্রাচীর সুপ্রশস্ত পাড়ের, ব্যতিক্রম শুধু মধ্যবর্তী

অবস্থিতিতে। রচিত হয় সেই প্রাচীরের অঙ্গে কুলুঙ্গির ভিতরের মন্দিরে আর ভজনালয়ে কত দেবদেবীর মূর্তি, মূর্তি কত মুনি ঋষিদেরও, সঙ্গী তাঁরা মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতার। অবিচ্ছিন্ন এই মূর্তির সম্ভারও, বেষ্টন করে আছে মন্দিরের চতুর্দিক। পরিণত হয় মন্দির এক দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত মন্দিরে।

সমাপ্ত হয় মন্দিরের রচনা, নিযুক্ত হন স্থপতি উর্দ্ধাংশের নির্মাণে, তৃতীয় গঠন স্তর এই সব মন্দিরের। নির্মিত হয় মণ্ডপের অনুচ্চ পিরামিডাকৃতি ছাদ, অনুভূমিক তার গতি, উর্দ্ধে ওঠে ক্রমহ্রস্বায়মান হয়ে, শীর্ষে নিয়ে পাত্রাকৃতি চূড়া। কিন্তু বুকে নিয়ে আছে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য সৌরাষ্ট্রের স্থপতির গর্ভগৃহের শীর্ষদেশের শিখরের নির্মাণকৌশল। রচিত হয় না শুধু একটি মাত্র শিখর, সমষ্টিবদ্ধ হ'য়ে উর্দ্ধে ওঠে সৌরাষ্ট্রের শিখর, বেষ্টিত হয় তাদের নিম্নাংশ চূড়ার শৃঙ্খলা বা উরুশৃঙ্গের শ্রেণী দিয়ে। ক্ষুদ্র সংস্করণ তারা মূল বা কেন্দ্রস্থলের শিখরের তাদের নিখুঁত সুন্দরতম প্রতীক, অনবদ্য, সুসমন্বিত, সুষম তাদের সমাবেশ, অঙ্গে নিয়ে আছে মহামহিমময় মূর্তির সম্ভার আর সুন্দরতম অলঙ্করণ। তারা অর্ধবিচ্ছিন্ন হয়ে পরিবেষ্টন করে মূল শিখরকে। মহামহিমময় হয় শিখর, মহিমান্বিত হয় মন্দিরও।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই সব মন্দিরের বুকে নিয়ে আছে তাদের স্তম্ভের নির্মাণ পদ্ধতি। রচিত হয় স্তম্ভের শ্রেণী, সর্বাঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম আভরণ, ভূষিত হয় তারা মহাসমৃদ্ধিশালী অলঙ্করণে। এই স্তম্ভের শ্রেণীর জ্যামিতিক বিন্যাস দিয়েই রচিত হয় মণ্ডপের কেন্দ্রস্থলে অষ্টকোণ বেদী, তাদের বহির্ভাগে গলি পথের শ্রেণী, রূপ ধারণ করে মন্দির উপাসনা গৃহের। দুই অংশে বিভক্ত প্রতিটি স্তম্ভের অঙ্গের অলঙ্করণ—অনুভূমিক ক্রমশীর্ণায়মান উর্দ্ধাংশ, থাকে থাকে উর্দ্ধে ওঠে শীর্ষে নিয়ে অপরূপ, সীমাহীন, সুন্দরতম অলঙ্করণে ভূষিত মহিমময় বন্ধনী। রচিত হয় বন্ধনীর শীর্ষদেশেও খর্বাকৃতি নকল স্তম্ভের শ্রেণী, শিরে নিয়ে বন্ধনী। বাড়ে স্তম্ভের উচ্চতা, মহামহিমময় হয় স্তম্ভ। নিচের বন্ধনীর অঙ্গ থেকে নির্গত হয় কোণ বিশিষ্ট শ্বেতপাথরের দণ্ড, কোথাও বন্ধনী, বুকে নিয়ে পরম রূপবতী যৌবনমদমত্তা নারীমূর্তি। সুন্দরতম রূপ-পরিগ্রহ করে সৌরাষ্ট্রের স্তম্ভ, মহিমান্বিত হয়, লাভকরে শ্রেষ্ঠত্বের আসন।

এই অলঙ্কৃত উত্তম (অ্যান্টিক) স্তম্ভের শ্রেণীর উপরেই স্থাপিত হয়

কেন্দ্রস্থলের গম্বুজ, অঙ্গে নিয়ে অনুচ্চ পাত্রাকৃতি ছাদ (সিলিং), রচিত জড়ান গতির অনুগমন দিয়ে। লুক্কায়িত থাকে মহাসমৃদ্ধিশালী জটিল ভূষণ দিয়ে তাদের সংযোজন, রূপায়িত হয় সম্পূর্ণ ছাদটি একটি মাত্র গঠিত খণ্ডে।

সাজান পশ্চিম দেশের ভাস্কর অপরূপ, মহিমময়, জীবন্ত মূর্তিরসম্ভার দিয়ে—মূর্তি কত দেব দেবীর, কত রূপবান নর ও পরমাসুন্দরী নারীর, কত জন্তুর আর কত পল্লব ও লতা দিয়েও মন্দিরের অভ্যন্তর আর তার গর্ভগৃহের প্রবেশপথ। অপরূপ হয় তাদের অন্তরতম প্রদেশের প্রতিটি অঙ্গ, তাদের সর্বাঙ্গ মহাঅভিজ্ঞ ভাস্করের বাটালির যাদুকরী স্পর্শে, মহামহিমময় হয় তাঁদের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে আর মনের অপরিসীম মাধুর্যে, বাঙ্ময় হয়—বাদ থাকে শুধু মহাপবিত্র অংশটি। ব্যতিক্রম মন্দির নির্মাণের পূর্ববর্তী শাস্ত্রীয় অনুশাসনের—পৃথক উড়িষ্যার মন্দির নির্মাণ পদ্ধতির সঙ্গেও।

বিস্তৃত এই সোলাঙ্কি নৃপতিদের মন্দির নির্মাণ চারিটি শতাব্দীতে, দশম শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। বুকে নিয়ে আছে তারা প্রতিটি শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য।

নির্মিত হয় মন্দির দশম শতাব্দীতে সুনাকে, কনোদে, ডেলমলে আর কসরাতে—সবগুলিই গুজরাটে (সৌরাষ্ট্রে)। একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয় কাথিয়াবাড়ে ঘুমলিতে আর সেজাকপুরে নবলক্ষ মন্দির, গুজরাটে মধেরাতে সূর্য মন্দির, আবু পর্বতে বিমল বশাহী মন্দির আর কারডুতে মেবারে। নির্মিত হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রুদ্রমলের মন্দির সিদ্ধাপুরে, গুজরাটে আর সোমনাথের মন্দির সৌরাষ্ট্রে (কাথিয়াবাড়ে)। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয় আবু পর্বতে তেজপালের মন্দির।

বুকে নিয়ে আছে দশম শতাব্দীতে নির্মিত চারিটি মন্দির তাদের রাজধানী পত্তন আর তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল। ক্ষুদ্রতর এই মন্দিরগুলি—ক্ষুদ্রতর পরিকল্পনায় আর অঙ্গের গঠনে, বুকে নিয়ে আছে গর্ভগৃহ, সম্মুখে নিয়ে একটি করে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ, শীর্ষে নিয়ে আছে গর্ভগৃহ শিখর। সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে সুনাকের নীলকান্তের মন্দিরটি-অনবদ্য শিখরের অঙ্গের গঠনে আর তার আমলক শিলার সমাবেশে, হ'য়ে আছে তাদের শিরোমণি।

নির্মিত হয় একাদশ শতাব্দীতেই বৃহত্তম আর সুন্দরতম মন্দিরগুলি

কাথিয়াবাড়ে, রাজস্থানে (রাজপুতানাতে) আর গুজরাটে। মহামহিমান্বিত পরিকল্পনায়, নিখুঁত সুন্দরতম রূপদানে। এই সময়েই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে তাঁদের মন্দির নির্মাণের দক্ষতা, পায় শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম বিকাশ, মহামহিমময় হয়। সুন্দরতম আর মহামহিমময় তাদের মধ্যে মধেরার সূর্য মন্দির, আবু পর্বতের বিমল বশাহীর ও তেজপালের মন্দির।

ধ্বংসে পরিণত হয়েছে সূর্য মন্দিরটি, নির্মাণ করেন ১০২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে সোলাঙ্কি রাজা প্রথম ভীম, ভগ্ন আজ তার মহামহিমময় শিখর, চূর্ণ বিচূর্ণিত তার মণ্ডপের সুন্দরতম ছাদ, সঙ্গে নিয়ে চতুর্দিকের পারিপার্শ্বিক। দাঁড়িয়ে আছে প্রেতাত্মা এক মহামহিমময় সুন্দরতম সৃষ্টির, ধ্বংসস্তূপ এক অমর কীর্তির, ঐতিহ্যের এক মহাগৌরবময় যুগের। দাঁড়িয়ে আছে মন্দির উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ করে এক পবিত্রতম পরিবেশে, এক অলোকসুন্দর পটভূমিতে, সাক্ষী হ'য়ে আছে তার প্রতিটি অঙ্গের অনবদ্য নিখুঁত সমাবেশের, প্রতীক হ'য়ে আছে এক অভিনব ঐক্যের. এক অতুলনীয় সুষমার, এক মহামহিমময়ত্বেরও।

অভিষিক্ত হয় উদয়ভানুর রক্তিম কিরণে তার সম্মুখভাগ। স্পর্শ করে সেই রশ্মি প্রবেশ দ্বার, দ্বার অতিক্রম করে সেই স্বর্ণকিরণ অনুরঞ্জিত করে তার অলিন্দ, তার স্তম্ভযুক্ত কক্ষের শ্রেণী, উপনীত হয় গর্ভগৃহে বিরাজিত দেবতা সূর্যের অঙ্গে। অনুরঞ্জিত হয়, উদ্ভাসিত হয় দেব দিবাকরের স্বর্ণ কিরণে তার স্তম্ভের অঙ্গ, তার চন্দ্রাতপের গাত্র, তার গর্ভগৃহের প্রবেশ পথ। সৃষ্টি হয় এক রহস্যলোক, এক অমরাবতী। মূর্ত হয় প্রস্তরের অঙ্গে এক মহাঅভিজ্ঞ ঋষি স্থপতির মহামহিমময় পরিকল্পনা, এক স্বপ্ন বিলাসীর।

বুকে নিয়ে আছে সৌরাষ্ট্রের পবিত্র গিরিশীর্ষও কয়েকটি মহিমময়, সুন্দরতম জৈন মন্দির, নির্মিত নাগর পদ্ধতিতে। মধ্যপন্থী তাঁরা বৌদ্ধদের ধর্মে তাই গড়ে ওঠে তাঁদের স্থাপত্য সমসাময়িক ও নিকটবর্তী হিন্দু অথবা বৌদ্ধ স্থাপত্যের অনুকরণে। তীর্থস্থানে পরিণত হয় কয়েকটি গিরি, নির্মিত হয় সেই সব পরম পবিত্র শৈল-শীর্ষে এক বা একাধিক মন্দির, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের নিদর্শন, প্রতীক এক গৌরবময় যুগের। রচিত হয় এক একটি শাশ্বত অলোকসুন্দর মন্দির-নগর। পূজিত হন সেই সব মন্দিরে জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথ, নেমিনাথ, শান্তিনাথ, পার্শ্বনাথ, হন মহাবীরও। সমাগত

হন কত যাত্রী, সমবেত হন দেশ বিদেশ থেকে দর্শন করেন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত তীর্থঙ্করকে, ভক্তিভরে পূজা দেন, সফল হয় তাঁদের মনস্কাম, ধন্য হয় জীবন।

বৃহত্তম আর সুন্দরতম নগরে পরিণত হয় কাথিয়াবাড়ের পবিত্র শৈলমালার শীর্ষদেশে, পলিতনা নগরের দক্ষিণে করলার—বসিতুকের উত্তর প্রান্তে শত্রুঞ্জয়। নির্মিত হয় সেখানে শত শত মন্দির, অঙ্গ নিয়ে মণ্ডপ আর গর্ভগৃহ। এইখানেই চৌমুখ মন্দিরে পূজিত হন প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ। অঙ্গে নিয়ে আছে চৌমুখের মন্দির চারিটি সম্মুখভাগ, পূজিত হন তাদের গর্ভগৃহে চৌমুখ জৈন তীর্থঙ্কর। পৃষ্ঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কোথাও একজন তীর্থঙ্কর, কোথাও বা চারিটি বিভিন্ন তীর্থঙ্কর। তাই সম্ভব হয় তাঁদের দর্শন আর পূজা করা চারিদিক থেকেই, প্রধান চার স্থান থেকেই। তাই ক্রুশাকারে নির্মিত এই সব মন্দিরের গর্ভগৃহ, বুকে নিয়ে আছে প্রতিটি দিকেই এক একটি প্রবেশ পথ। অভিনব এই মন্দিরের পরিকল্পনা, পরিচায়ক জৈন স্থপতির উন্নততর নির্মাণ কুশলতার—তার অগ্রগতিরও। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়।

বিপরীত দিকে বিমলবাসী তুকও বুকে নিয়ে আছে একটি মহিমময় মন্দির, অঙ্গে নিয়ে আছে জৈন স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের নিদর্শন। পূজিত হন এই মন্দিরেও শ্রীআদিশ্বর। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি শৈলমালার পবিত্রতম প্রদেশে, তাই মহাপবিত্র এই মন্দিরটি. পুণ্যতীর্থ জৈনদের বিমলবাসী তুকও। নির্মিত হয় এই মন্দিরটি ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত হয়।

গড়ে ওঠে কাথিয়াবাড়েই জুনাগড়ের নিকটে গির্ণারের গিরিশীর্ষেও একটি শাশ্বত মন্দির নগর। নির্মিত হয় সেখানে নেমিনাথের মন্দির ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। একশ নব্বই ফুট দীর্ঘ ও একশ ত্রিশ ফুট প্রস্থ প্রাঙ্গণের মধ্যে। একশ কুড়ি ফুট দীর্ঘ ও ষাট ফুট প্রস্থ মন্দিরটির আয়তন। নির্মিত হয় তেতাল্লিশ বর্গ একটি সুন্দরতম মহিমময় মণ্ডপ, বিভক্ত তার অভ্যন্তর ভাগ বেদী আর গলিপথে। বাইশটি অপরূপ নিখুঁত স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে পৃথক করা হয় চারিদিকের গলিপথকে মণ্ডপের কেন্দ্রস্থল থেকে। একটি বিমানও নির্মিত হয়। বুকে নিয়ে আছে মণ্ডপ আর স্তম্ভের অঙ্গ অনুপম শিল্পসম্ভার আর জীবন্ত মূর্তিসম্ভার। মহামহিমান্বিত হ'য়ে আছে মন্দিরটি।

নির্মিত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই গির্ণারের শৈল শিখরে আরও একটি মন্দির, পরিচিত বস্তুপাল—তেজপালের মন্দির নামে। নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি দুই প্রখ্যাত ভ্রাতা বস্তুপাল ও তেজপাল, মন্ত্রী তাঁরা সৌরাষ্ট্রের সোলাঙ্কি অধিপতির। পূজিত হন তার গর্ভগৃহে ঊনবিংশ তীর্থঙ্কর মল্লিনাথের বিগ্রহ। তিনটি মন্দিরের সমষ্টি এই মন্দিরটি, সংযুক্ত হয় তারা কেন্দ্রস্থলের একটি মণ্ডপের সঙ্গে। চতুর্থ দ্বারে রচিত হয় প্রবেশ পথ মন্দিরের।

পরের দিন সকালে স্নান সমাপনান্তে পবিত্র দেহ ও মনে মন্দির দর্শনে যাত্রা করি। মন্দিরের সামনে উপস্থিত হই। দাঁড়িয়ে আছে সোমনাথের মন্দির, বিস্তৃত হয়ে আছে তার মূল মন্দিরটির আয়তন একশ ত্রিশ ফুট দীর্ঘ ও পঁচাত্তর ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। চূর্ণ বিচূর্ণিত তার অঙ্গ, বিকৃত তার দেহ, দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের তীরে প্রেতাত্মা এক মহামহিমময় আর মহাগৌরবময়সৃষ্টির, ধ্বংসাবশেষ এক মহান ঐতিহ্যের, বুকে নিয়ে আছে প্রতীক এক অবদানের মহামহিময়ত্বের, নিদর্শন এক মহাঅভিজ্ঞ সোলাঙ্কি স্থপতির দুঃসাহসিক পরিকল্পনার আর বহুবিস্তৃত রূপদানের। দাঁড়িয়ে আছে একাকী, নির্জনে, নিঃসঙ্গে, পরিত্যক্ত হয়ে, সহ্য করে আছে কালের নির্মম অত্যাচার হৃতগৌরব সোমনাথের মন্দির। পুনঃনির্মাণ করেন এই মন্দিরটি সোলাঙ্কি নৃপতি কুমার পাল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে।

সম্ভবতঃ নির্মিত হয় প্রথম মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। এই সময়েই পরিণত হয় প্রভাসক্ষেত্র শৈব পাশুপত ধর্মমতের প্রধান কেন্দ্রস্থলে, হয় সুপ্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দিরও পাশুপত মতের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে ভারতের।

সম্ভবতঃ বলভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুব সেনের পুত্র শ্রীহর্ষের দৌহিত্র চতুর্থ ধর সেনের রাজত্বকালে দ্বিতীয় মন্দিরটি নির্মিত হয়, প্রথম মন্দিরটির অধিকৃত স্থানে, বুকে নিয়ে সম্ভবতঃ একটি উন্মুক্ত সভামণ্ডপ। এই সময়েই উৎকীর্ণ হয় মন্দিরের অঙ্গের ব্রাহ্মী শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে মন্দির খননের কালে। রাজত্ব করেন ধর সেন ৬৪০ থেকে ৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রভাসে এসে দর্শন করেন এই সোমনাথের মন্দির গুর্জর-প্রতিহাররাজ প্রবল পরাক্রান্ত দ্বিতীয় নাগভট্ট, হন তিনি একচ্ছত্র সম্রাট সারা উত্তর ভারতের ৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী কনৌজে, পূজা করেন সোমেশ্বরকে। তাই

নির্মিত হয় সোমনাথের তৃতীয় মন্দিরটি সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে অথবা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে। মহাপ্রসিদ্ধ হয় সোমনাথের তৃতীয় মন্দিরটি, হন দেবতা সোমনাথও সারা ভারতে ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে। মহামহিমময় হয় মন্দির, হয় মহাসমৃদ্ধিশালীও গুর্জর প্রতিহার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ছড়িয়ে পড়ে তার প্রসিদ্ধির খ্যাতি দিকে দিকে।

প্রবল পরাক্রান্ত হন গজনীতে সুলতান মাহমুদ। সুলেমান পর্বত অঞ্চলে গজনীতে স্থাপন করেন এই স্বাধীন রাজ্য আলপ্তগীন, এক তুর্কী বীর ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে। পরাক্রমশালী তাঁর জামাতা ও ক্রীতদাস সবুক্তগীনও অধিরোহণ করেন গজনীর সিংহাসনে তার মৃত্যুর পর। মৃত্যু হয় সবুক্তগীনের তাঁর পুত্র সুলতান ইসমাইল অধিরোহণ করেন গজনীর সিংহাসনে। তাঁকে বিতাড়িত করে তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাহমুদ অধিকার করেন গজনীর সিংহাসন। বিস্তৃত তখন তাঁর রাজ্যের সীমানা পারস্য থেকে সিন্ধু পর্যন্ত।

১০০১ খ্রীষ্টাব্দে মাহমুদ অগ্রসর হন ভারতের দিকে সঙ্গে নিয়ে আসেন সংহারের, লুণ্ঠনের আর ধ্বংসের লীলা। অগ্রসর হন শাহিরাজ জয়পালও বিপুল সৈন্য সঙ্গে নিয়ে। প্রবল পরাক্রান্ত হন দশম শতাব্দীর শেষভাগে শাহি বংশের হিন্দু রাজারাও হন এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিকারী। পরাজিত ও বন্দী হন শাহিরাজ সুলতান মাহমুদের সঙ্গে যুদ্ধে, মুক্তিপণ দিয়ে ফিরে আসেন নিজ রাজ্যে। মনস্তাপে আর অপমানে পুত্র আনন্দপালের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করে প্রাণ বিসর্জন করেন প্রজ্বলিত চিতাগ্নিতে।

১০০৪ খ্রীষ্টাব্দে পরাজয় বরণ করেন মাহমুদের হস্তে আনন্দপাল। তিনি সাহায্য প্রার্থনা করেন ভারতের অন্যান্য রাজাদের কাছে। এগিয়ে আসেন তাঁর সাহায্যে দিল্লী, কনৌজ, কালিঞ্জর আর উজ্জয়িনীর রাজারা, সাহায্য করেন নিজের নিজের সৈন্য পাঠিয়ে। অগ্রসর হন হিন্দু রমণীরাও, দান করেন তাঁদের অলঙ্কার এই দুর্দিনে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ব্যয় নির্বাহের জন্য। ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে সংঘর্ষ হয় উদ্ভাণ্ডপুরের কাছে মাহমুদের সঙ্গে হিন্দুদের সম্মিলিত বাহিনীর। জয়ী হন মাহমুদ বিফল হয় হিন্দুদের মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধের সমস্ত প্রচেষ্টা। তিনি লুণ্ঠন করেন নগরকোট, বর্তমান কাংড়া। পরাজিত ও নিহত হন আনন্দ পালের পুত্র ত্রিলোচন পাল, ১০২১-২২ অব্দে, হন তাঁর পুত্র

ভীম পালও ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে, মাহমুদের অধীনস্থ হয় শাহি রাজ্য, বিলুপ্ত হয়ে যায় একেবারে।

১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে মাহমুদ লুণ্ঠন করেন থানেশ্বর। লুণ্ঠিত হয় মথুরাও ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাছে পরাজয় বরণ করেন গুর্জর-প্রতিহার-রাজ রাজ্যপাল, লুণ্ঠিত হয় তাঁদের রাজধানী কনৌজ, ধ্বংসে পরিণত হয় তার সমস্ত মন্দির। পরাজয় স্বীকার করেন জেজাকভুক্তির (বুন্দেলখণ্ডের) চন্দেল্ল রাজা গণ্ডও, লুণ্ঠিত হয় হয় তাঁর রাজধানীও সম্ভবতঃ ১০২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে. কিন্তু নাই কোন স্বীকৃতি এই ঘটনার চন্দেল্ল ইতিহাসে।

১০২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মনস্থ করেন সোমনাথের বিখ্যাত শৈব মন্দির লুণ্ঠনের। মহামহিমময় এই মন্দিরটি মহাসমৃদ্ধিশালীও ছড়িয়ে পড়ে তার মহা-সমৃদ্ধির, তার সঞ্চিত বিপুল ধনরাশির কথা দিকে-দিকে। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উপনীত হন সোমনাথে বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে। বাধা দেন তাঁকে গুজরাটের চৌলুক্যরাজ প্রথম ভীম, কিন্তু সক্ষম হন না তাঁর গতিরোধ করতে, প্রতিরোধ করতে তাঁর আক্রমণ। মাহমুদ অধিকার করেন সোমনাথ। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় তার গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত মহাপবিত্র স্বর্ণনির্মিত শিবলিঙ্গটি। মাহমুদ নিয়ে আসেন তার ভগ্নাবশেষ গজনীতে, নিক্ষিপ্ত হয় সেগুলি তাঁর বড় মসজিদের চত্বরে। লুণ্ঠিত হয় তার সঞ্চিত সমস্ত ধনরত্ন, তাঁর হস্তগত হয় রাশি রাশি হীরামুক্তা ও জহরত, হয় প্রায় দুইকোটি স্বর্বর্ণ মুদ্রাও। শেষে ধ্বংসে পরিণত হয় সমস্ত মন্দিরটি তাঁর আদেশে। পরিসমাপ্তি হয় এক মহামহিমময় মন্দিরের ভারতের, মহাসমৃদ্ধিশালীও, অঙ্গে নিয়ে বহুশত বৎসরের ঐতিহ্য, দান মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির আর ভাস্করের, সৃষ্টি কত মহাগৌরবময় যুগের।

পর বৎসর তিনি দমন করেন কচ্ছ, পরিসমাপ্তি হয় তাঁর ভারত অভি-যানেরও। এক মরুভূমিতে পরিণত হয় সারা হিন্দুস্থান সেই সব অভিযানে বলেন মনীষী অল্‌বিরুণী, তাঁর অন্তরঙ্গ সভাসদ, সহযাত্রী তাঁর ভারত অভি-যানেরও। হন তিনি অভিজ্ঞ সংস্কৃত ভাষায়। লেখেন আরবী ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিবরণ। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে মাহমুদ গজনীতে মৃত্যুবরণ করেন। লেখেন অল্‌বিরুণী ১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গ্রন্থে একশ বছর পূর্বে এই দুর্গটি নির্মিত হয়, অবস্থিত তার মধ্যে দেবতার বিগ্রহ আর ধনরত্ন। দাঁড়িয়েছিল মন্দিরটি সমুদ্র

সৈকতে, বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের সমষ্টির উপর, বেষ্টিত ছিল প্রাচীর দিয়ে। প্রবেশ করতো মন্দিরের ভিতর সমুদ্রের জল নির্দিষ্ট সময়ে। লেখেন সুমহান এই মন্দিরটি, দাঁড়িয়ে ছিল তার ছাদ ছাপ্পান্নটি স্তম্ভের উপর। অঙ্গে নিয়ে ছিল তাদের মধ্যে ছয়টি মণি-মাণিক্য, হীরা, জহরৎ ও আরও কত মূল্যবান প্রস্তর, বুকে নিয়ে ছিল বহু নৃপতিদের প্রতিমূর্তিও, তাঁরা দান করেন অর্থ এই মন্দির নির্মাণে। সেগুন কাঠের তৈরী এই স্তম্ভগুলি।

চৌলুক্যরাজা প্রথম ভীম ও রাজা ভোজ পুনঃনির্মাণ করেন চতুর্থ মন্দিরটি, দর্শন করেন এই চতুর্থ মন্দিরটি জয় সিংহ। ধ্বংসে পরিণত হয় ভীমের তৈরী মন্দিরটি তাঁর মন্ত্রীদের নির্বুদ্ধিতায়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সেই ভিত্তির উপরেই পুনঃনির্মিত হয় পঞ্চম মন্দিরটি, নির্মাণ করেন চৌলুক্যরাজ জয় সিংহের উত্তরাধিকারী কুমারপাল, উল্লিখিত আছে ভদ্রকালীর উৎকীর্ণ লিপিতে। নির্মিত হয় এক মেরুপ্রাসাদ, এক মহামহিমময় মন্দির। যুক্ত করেন মূল মন্দিরের সঙ্গে একটি সোমেশ্বর মণ্ডপ, পরিচিত মেঘনাদ মণ্ডপ নামেও চৌলুক্য রাজা দ্বিতীয় ভীমদেব ১২১৬ খ্রীষ্টাব্দে, বর্ধিত হয় তার আয়তন। উল্লিখিত আছে ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দের সারঙ্গদেবের চিত্র প্রশস্তিতে গণ্ড ত্রিপুরান্তক নির্মাণ করেন সোমেশ্বর মণ্ডপের উত্তরে পাঁচটি মন্দির। নির্মিত হয় দুই স্তম্ভযুক্ত একটি তোরণও, তিনিই নির্মাণ করেন। মহামহিমময় হয় সোমনাথের পঞ্চম মন্দিরটি—মহাপ্রসিদ্ধও।

দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাপতি আলফ খাঁনের। তিনি ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আক্রমণ করেন সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়) কলুষিত হয় মহাপবিত্র সোমনাথের মন্দিরটি তাঁর হস্তে হন দেবতা সোমনাথ। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন আলফখাঁন, সুরু করেন পুনঃনির্মাণ এই মন্দিরের চুদাস্মার অধিপতি মহিপালদেব, রাজত্ব করেন তিনি ১৩০৮ থেকে ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরিসমাপ্ত করেন সেই পুনঃনির্মাণ রাখখঙ্গর, তিনি ১৩২৫ থেকে ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন একটি শিবলিঙ্গ পুনঃনির্মিত মন্দিরে।

ধ্বংস করেন এই মন্দিরটি গুজরাটের মুসলমান শাসনকর্তা মুজাফর খাঁন ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ও তাঁর পৌত্র আহমদ শাহা ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে; কিন্তু দাঁড়িয়ে

থাকে সোমনাথের মন্দির, অব্যাহত থাকে তার পবিত্রতাও হিন্দুদের কাছে, প্রতীক হয়ে থাকে এক পুণ্যতীর্থের। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব আদেশ করেন ধ্বংসে পরিণত করতে এই মহাপবিত্র মন্দিরটি। শেষে ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে পরিণত হয় মসজিদে তাঁর আদেশে, সমগোত্রীয় হয় ভারতের বহু প্রসিদ্ধ মন্দিরের, সম্পূর্ণ বদলে যায় তার রূপও।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয় ঔরঙ্গজেবের অরাজকতায় ও বিশৃঙ্খলায় ছেয়ে ফেলে সারা গুজরাট। শেষে মারাঠাদের অধিকারে আসে গুজরাট। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হোলকারের মহারাণী পুণ্যশীলা অহল্যা বাঈ নির্মাণ করেন সোমনাথের নতুন মন্দির, নির্মিত হয় পূর্বের বহুবার বিধ্বস্ত মন্দিরের কিছু দূরে। পূজিত হন দেবতা সোমনাথ সেই মন্দিরে।

আসত কত তীর্থযাত্রী সমবেত হত কত হিন্দু আর জৈন পুণ্যলোভাতুর, তারা আসত হাজারে হাজারে, আসত যুগে যুগে, অনাদিকাল থেকে দর্শন করত সোমনাথের মহাপবিত্র জ্যোতির্লিঙ্গ, পূজা দিয়ে ফিরে যেত নিজের দেশে, আপন আলয়ে। সার্থক হ'ত তাদের জন্ম, ধন্য হত জীবন। আজ বুকে নিয়ে আছে সোমনাথ শুধু তার স্মৃতি, প্রতীক হয়ে আছে এক মহাপুণ্য স্মৃতির মহাগৌরবময় ঐতিহ্যের।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অর্বুদ

১। বিমল বশাহী মন্দির ২। তেজপালের মন্দির

সমাপ্ত হয় যোধপুর আর ওশিয়া দর্শন, আমরা মহাপবিত্র অর্বুদ অভিমুখে রওনা হই। পরিচিত আবুপর্বত নামেও অন্যতম সুন্দরতম স্বাস্থ্য নিবাস ভারতের, দাঁড়িয়ে আছে পর্বতটি যোধপুর থেকে একশত পয়ষট্টি মাইল দূরে, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে চার হাজার ফুট উচ্চে, একটি বিচ্ছিন্ন মালভূমির উপরে, পৃথক হয়ে আছে চারিদিকের দিগন্ত প্রসারিত মরুভূমি থেকে। শীর্ষে নিয়ে আছে এক সুন্দরতম, নয়নাভিরাম উপত্যকা, বিস্তৃত প্রায় ছয় মাইল দীর্ঘ ও দুই অথবা তিন মাইল প্রস্থ পরিধি নিয়ে। মহামহিমময় হয়ে আছে বুকে নিয়ে বিভিন্ন আকারের স্ফটিক প্রস্তর, বিচিত্রও, আর ঘন সবুজ বনানী—পরিণত হয়ে আছে এক নন্দন-কাননে। জৈন মহাতীর্থ এই আবু, বিখ্যাত হয়ে আছে বুকে নিয়ে পাঁচটি দিলওয়ারা মন্দির। অঙ্গে নিয়ে আছে তাদের মধ্যে দুইটি বিমল বশাহী আর তেজপাল, সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন মধ্যযুগের ভারতীয় স্থাপত্যের, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক ভাস্কর্যেরও, মহামহিমান্বিত হয়ে আছে।

আমরা অতিক্রম করি কত মরু প্রান্তর, কত জোয়ারের খেত, করি লুনী, পরিচিত লবণাবতী নামেও, বৃহত্তম স্রোতস্বিনী মাড়বারের, পার হয়ে আসি মারোয়াড়, কুম্ভলগড় রণকপুর আর বনাস নদীও অবশেষে উপনীত হই আবু-রোড স্টেশনে।

সেখান থেকে আবু আঠার মাইল দূরে অবস্থিত, বাসে চড়ে যেতে হয়। গাড়ী থেকে নেমে, চা ও কিছু খাবার খেয়ে আমরা বাসে উঠে বসি। অতিক্রম করি মাইল চারেক সমতল পথ। তারপর অর্বুদের অঙ্গ বেয়ে অগ্রসর হতে থাকে আমাদের বাস, সর্পিল তার গতি, মন্থরও। আমরা অতিক্রম করি কত ঘন বনবীথি, কত জানা অজানা বৃক্ষের শ্রেণী, কত গভীর অরণ্যানী, পার হয়ে

যাই কত নৃত্য-চপল নিঝ´রও, পাহাড়ের শীর্ষদেশে উপনীত হই। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি তার অনুপম শোভা। স্থান সংগ্রহ করি একটি হোটেলে।

ত্রেতাযুগে মহর্ষি ভৃগুর পুত্র, মহাতেজস্বী জমদগ্নির ঔরসে ও প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন রাম। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার তিনি, আভির্ভূ´ত হন পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের অত্যাচার দমন করতে, বিমুক্ত করতে ধরিত্রীকে দৈত্য ও দানবদের পীড়ন থেকে।

দেবাদিদেব মহাদেবের আদেশে নিযুক্ত হন তিনি কঠোর তপস্যায়। সন্তুষ্ট হন আশুতোষ, দান করেন তাঁকে পরশু নামে এক প্রচণ্ড তেজোদীপ্ত, মহাশক্তিশালী অস্ত্র, খ্যাতিলাভ করেন তিনি পরশুরাম নামে, ভার্গব নামেও। তাঁর কাছে পরাজিত ও নিহত হয় দানবরা, মুক্ত হয় ধরাধাম তাদের অত্যাচার থেকে।

একদিন পুত্রদের অনুপস্থিতিতে, রাজা কার্তবীর্য প্রবেশ করেন জমদগ্নির আশ্রমে, হরণ করে নিয়ে যান তাঁর সমস্ত হোমধেনু। আশ্রমে ফিরে এসে পরশুরাম অবগত হন এই সংবাদ, আক্রমণ করেন নৃপতিকে এক তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্র দিয়ে, নিহত করেন তাঁকে। তারপর কার্তবীর্যের পুত্রেরা এসে তপস্যা পরায়ণ জমদগ্নিকে হত্যা করেন, প্রতিশোধ নেন পিতৃহত্যার। মর্মাহত হন পরশুরাম আশ্রমে এসে পিতাকে নিহত দেখে, উন্মত্ত হন শোকে, প্রমত্ত হন ক্রোধে। প্রতিজ্ঞা করেন একাই সমস্ত ক্ষত্রিয় কুলকে নির্মূ´ল করে এই অন্যায় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন সসৈন্যে কার্তবীর্যের পুত্ররা। তিনি একে একে নিঃক্ষত্রিয় করেন ধরিত্রীকে একবিংশতি বার। সমস্ত-পঞ্চক প্রদেশে পাঁচটি রুধিরময় হ্রদ তৈরী করে তিনি পিতৃপুরুষের তর্পণ করেন। অবশেষে পিতামহ ঋচীকের অনুরোধে তিনি ক্ষত্রিয় হত্যা থেকে নিবৃত্ত হন। গুরু কশ্যপকে সমস্ত পৃথিবী দান করে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে বাস করেন।

সক্ষম শুধু ব্রাহ্মণরা আশীর্বাদ করতে আর অভিশাপ দিতে। নিঃক্ষত্রিয়া ধরিত্রী, বীরশূন্যা পৃথিবী, নির্বীর্য, এক বিশৃঙ্খলতায় ছেয়ে ফেলে সারা বিশ্ব। অজ্ঞতায় আর অসততায় পূর্ণ হয় ভুবন, অত্যাচারীর অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয় সারা দেশ। পদদলিত হয় কত ধর্মগ্রন্থ, কত বেদ, কত অমূল্য সম্পদ।

শেষে দেবতাদের অস্ত্রশিক্ষা গুরু বিশ্বামিত্র মনস্থ করেন ক্ষত্রিয় পুনরুৎপাদনে, পুনর্বার সৃষ্টি করতে ক্ষত্রিয়দের। স্থির করেন মুনি ও ঋষি অধ্যুষিত ও তাঁদের কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণে ও বেদ পাঠে নিয়ত মুখরিত মহাপবিত্র আবু পর্বতের শৃঙ্গই, প্রকৃষ্টতম স্থান ক্ষত্রিয় পুনরুৎপাদন যজ্ঞের।

তিনি উপস্থিত হন আবুতে, সেখান থেকে ক্ষীর সমুদ্রে শেষনাগের উপরে অনন্তশয়ানে শায়িত বিষ্ণুর নিকটে উপনীত হন। তাঁর সঙ্গে যান আবুর মুনি ঋষিরাও। বিষ্ণুও আদেশ করেন পুনঃসৃষ্টি করতে ক্ষত্রিয় জাতি। তাঁরা আবুতে ফিরে আসেন সঙ্গে নিয়ে আসেন দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও আরও কত দেবতা আর দেবী। রচিত হয় একটি অনল কুণ্ড, মহাপবিত্র গঙ্গাজল দিয়ে অভিষিক্ত হয় সেই কুণ্ড, অনুষ্ঠিত হয় হোমও। স্থির হয় ইন্দ্রই স্থরু করবেন এই পুনঃসৃষ্টির কাজ। তিনি তৈরী করেন দূর্বাদল দিয়ে একটি মূর্তি, নিক্ষেপ করেন সেই মূর্তি অনল কুণ্ডে, উচ্চারণ করেন সঞ্জীবন মন্ত্র, অগ্নিশিখার অন্তরাল থেকে অতি ধীরে নির্গত হয়ে আসে একটি প্রতিমূর্তি। তাঁর দক্ষিণ হস্তে শোভা পায় গদা, কণ্ঠে উচ্চারিত হয় “মার” “মার” শব্দ। অভিহিত হন তিনি পরমার নামে, নিযুক্ত হন আবু, ধারা ও উজ্জয়িনীর অধিপতি।

তখন ব্রহ্মাকে অনুরোধ করা হয় তাঁর নিজের অংশ থেকে সৃষ্টি করতে। তিনিও একটি দূর্বার মূতি রচনা করে তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। নির্গত হন সেই কুণ্ড থেকে একটি প্রতিমূর্তি, দক্ষিণ হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন একটি খড়্গ, বাম হস্তে চতুর্বেদ। অভিহিত হন তিনি চৌলুক্য অথবা সোলাঙ্কি নামে, অধিপতি হন অনহলপুর আর পতনের।

রুদ্র রচনা করেন তৃতীয় মূর্তিটি। অভিষিক্ত করেন তাকে গঙ্গার পবিত্র জলে! উচ্চারিত হয় তাঁর কণ্ঠে সঞ্জীবন মন্ত্রও। নিষ্ক্রান্ত হয় কুণ্ড থেকে একটি কৃষ্ণবর্ণ, ভীষণদর্শন, কদাকার প্রতিমূর্তি হস্তে নিয়ে ধনুর্বাণ। তাঁর নাম রাখা হয় পুরিহার, নিযুক্ত হন তিনি প্রতিহারী, অধীশ্বর হন নয়নগল, মরুস্থলী প্রভৃতি নয়টি মরু প্রদেশের।

সৃষ্টির অধিপতি বিষ্ণু সৃষ্টি করেন চতুর্থ প্রতিমূর্তিটি। নির্গত হন অনলকুণ্ড থেকে চতুর্ভূজ চৌহান, তাঁর চারি হস্তে শোভা পায় বিভিন্ন অস্ত্র, অনুরূপ বিষ্ণুর

হস্তের অস্ত্রের। তিনি লাভ করেন উপস্থিত সকল দেবতার আর দেবীর আশীর্বাদ, নিযুক্ত হন মকাবতী নগরের অধিপতি।

দৈত্যরা নিকটে দাঁড়িয়ে দর্শন করেন এই পুনঃসৃষ্টির কাজ। তাঁরা আক্রমণ করেন এসে দেবতাদের, বিঘ্ন সাধন করেন তাঁদের কাজের। শেষে পরাজিত ও নিহত হন দৈত্যরা, এক আনন্দের কোলাহলে মুখরিত হয় সারা আবু, হয় দিগন্ত, বর্ষিত হয় পুষ্প বৃষ্টিও স্বর্গ থেকে। ঘটে এই পবিত্র আবু শীর্ষে ক্ষত্রিয় পুনোরুৎপাদনের জন্য দেবতাদের মহাসম্মেলন ত্রেতাযুগে, উল্লিখিত আছে মহাভারতেও, লেখেন মনীষী জেম্‌স্ টড্ তাঁর রাজস্থান গ্রন্থে। তাই মহাপবিত্র তীর্থ হিন্দুদের এই আবু।

পরের দিন সকালে স্নান সমাপনান্তে, চা ও খাবার খেয়ে আমরা দিলওয়ারা বা দেবলওয়ারা অভিমুখে রওনা হই। বিমল বশাহীর মন্দিরের সামনে উপনীত হই। ১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে শুধু শ্বেত প্রস্তর দিয়ে বিমলশাহ এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। ছিলেন তিনি সৌরাষ্ট্রের বর্তমান গুজরাটের সোলাঙ্কি বংশের প্রথম ভীমদেবের মন্ত্রী। অন্যতম প্রাচীনতম মন্দির জৈন স্থপতির, নিদর্শন তাঁদের পূর্ণ পরিণতিরও, প্রতীক এক মহামহিমময় পরিকল্পনার সম্পূর্ণ আর নিখুঁত রূপদানের, এক মহামহিময়ত্বের, বিস্তৃত হয়ে আছে আটানব্বই ফুট দীর্ঘ ও বিয়াল্লিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, বেষ্টিত হয়ে আছে সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে।

শোভন নয় এই মন্দিরটি বহিঃদর্শনে, নয় সুমহানও, লুক্কায়িত থাকে তার ভিতরের অনুপমত্ব, থাকে তার মহিময়ত্বও বাইরের সাধারণত্বের অন্তরালে। তাই বিস্ময়ে স্তব্ধ হই, মূক হয়ে যাই একেবারে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে দেখে তার সুষমা, তার সুমহানত্ব।

একটি তোরণের ভিতর দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি, শীর্ষে নিয়ে আছে তোরণ একটি গম্বুজ, সম্মুখে নিয়ে একটি চতুষ্কোণ কক্ষ বা চন্দ্রাতপ। বুকে নিয়ে আছে কক্ষটি ছয়টি স্তম্ভ আর দশটি চার ফুট উঁচু শ্বেত প্রস্তরের তৈরী হস্তী, পৃষ্ঠে নিয়ে হাওদা আর আরোহী। তাঁরা বিমলশাহ আর তাঁর পরিবারবর্গ, হস্তীপৃষ্ঠে শোভাযাত্রায় মন্দির দর্শনে যান। নিশ্চিহ্ন হয়েছে মুসলমানের অত্যাচারে অধিকাংশ আরোহীর মূর্তিগুলিই, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে আজও হস্তীগুলি আর তাদের পৃষ্ঠের সুন্দরতম অলঙ্করণে অলঙ্কৃত হাওদা, জীবন্ত হয়ে আছে রাজস্থানের

মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির ও ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে, প্রতীক হয়ে আছে এক মহাগৌরবময় সৃষ্টির, এক গৌরবময় যুগের।

দাঁড়িয়ে আছে একটি একশ আটাশ ফুট দীর্ঘ আর পঁচাত্তর ফুট প্রস্থ অঙ্গনের মধ্যে মন্দিরটি শীর্ষে নিয়ে শিখর গর্ভগৃহে নিয়ে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ-নাথ বা আদিনাথের পদ্মাসন মূর্তি, বিগ্রহ দেবতা এই মন্দিরের। অনুচ্চ এই আবুর শিখর সমপর্যায়ে পড়ে না শিখরের। সম্মুখে নিয়ে আছে গর্ভগৃহ একটি মণ্ডপ। দাঁড়িয়ে আছে মণ্ডপটি আটচল্লিশটি শ্বেতপ্রস্তব নির্মিত স্তম্ভের উপর।

দেখি বেষ্টন করে আছে সারা অঙ্গনটি বাহান্নটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ সম্মুখে নিয়ে আছে প্রতিটি প্রকোষ্ঠ জোড়াস্তম্ভেব শ্রেণী। রচিত হয় অলিন্দ প্রকোষ্ঠের। বিরাজ করেন পদ্মাসনে প্রতিটি প্রকোষ্ঠে এক একটি জৈন তীর্থঙ্কর। উৎকীর্ণ আছে প্রতিটি আসনের অঙ্গে তাঁদের পরিচয়।

দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণ পশ্চিম কোণেও, উচ্চতরস্তরে অম্বা দেবীর মন্দিরটি নির্মিত পূর্ববর্তী কালে। সম্পূর্ণ রূপপরিগ্রহ করে বেষ্টনীর সীমা।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের বুকে নিয়ে আছে তার স্তম্ভের শ্রেণী। সমউচ্চ বৃহৎ সুমহান স্তম্ভগুলি, বাইরের অলিন্দের স্তম্ভের শ্রেণীর, শীর্ষে নিয়ে আছে বন্ধনী, বৈশিষ্ট্য প্রাচ্যের। রচিত হয় তাদের শীর্ষদেশে ক্ষুদ্রকায় স্তম্ভ, বাড়ে স্তম্ভের আকার, বাড়ে শক্তিও। নির্মিত হয় এই উর্ধ্বদেশের ক্ষুদ্র স্তম্ভের শীর্ষদেশে সুমহান কড়ি, দাঁড়িয়ে আছে এই কড়ির উপর মহামহিমময় গম্বুজটি। সঙ্গে নিয়ে আছে এই ক্ষুদ্র স্তম্ভগুলি, তাদের অন্তর্বর্তী, জড়ান অবলম্বন, শিরে নিয়ে চারশাখা বিশিষ্ট বন্ধনী।

বিভিন্ন এই স্তম্ভগুলির গঠন পৃথক তাদের অঙ্গের পরিকল্পনাও। বিচিত্র, সুন্দরতম, সুষমাময়, অনুপম, সূক্ষ্মতম তাদের সর্বাঙ্গের আর বন্ধনীর অঙ্গের আভরণ আর ভূষণও। মুগ্ধ হয়ে দেখি।

মণ্ডপে উপনীত হই। সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের এই মণ্ডপটি। অনবদ্য মহামহিমময় তার সুপ্রসিদ্ধ গম্বুজের নির্মাণ কুশলতা, অভিনব তার পরিকল্পনাও। রচিত হয় আটটি স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে তার অষ্টভুজ স্থান বা বেদীটি, শীর্ষে নিয়ে গম্বুজ। পঁচিশ ফুট তার অষ্টভুজ বেদীটির ব্যাস, মেঝে থেকে বার ফুট তার শুধু কড়ির দূরত্ব বা ব্যবধান, ত্রিশ ফুটেরও কম তার গম্বুজের চূড়ার উচ্চতা।

বুকে নিয়ে আছে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান, চরম বিকাশ, মহামহিমময়, সুন্দরতম প্রকাশ তার প্রস্তর শিল্পীর, তার মহাঅভিজ্ঞ ঋষি ভাস্করেরও এই বেদীর খিলান যুক্ত ছাদের (সিলিং-এর) রচনা। নির্মিত হয় এগারটি এককেন্দ্রিক বৃত্তের সমষ্টি দিয়ে তার গম্বুজটি। অঙ্গে নিয়ে আছে তাদের মধ্যে সুষম দূরত্বে মধ্যবর্তী পাঁচটি কত মূর্তির সম্ভার—মূর্তি কত বিভিন্ন জন্তুর। মূর্তি দিয়েই মূর্ত হয় শ্বেত প্রস্তরের বুকে, ছাদের অঙ্গে, কাহিনী এক বহু অতীত অর্ধবিস্মৃত যুগের। সর্বনিম্নে, পুরোভাগে শোভা পায় হস্তীর মূর্তি জৈনদের কল্যাণের প্রতীক এই হস্তী। দাঁড়িয়ে আছে মুখোমুখী হয়ে অল্প ব্যবধানে একশত পঞ্চাশটি বীর্যবান হস্তী, আবদ্ধ তাদের শুঁড় পরস্পরের শুঁড়ের সঙ্গে। ভূষিত হয়ে আছে অপর প্রান্তের কয়েকটি সাঁচের অঙ্গ কুলঙ্গির সমষ্টি দিয়ে, বুকে নিয়ে মূর্তি কত অসংখ্য রূপবান নৃত্যপরায়ণ নরের, কত পরম রূপবতী নারীরও। পুনরাবৃত্ত হয় নৃত্য চপল মূর্তিগুলি বারংবার, বিভ্রম জাগায় মনে। তাদের ঊর্ধ্বে রচিত হয় অবতল, শোভিত হয় তার অঙ্গও, কত বলবান, তেজোদৃপ্ত অশ্বারোহীর মূর্তি দিয়ে। সবার উপরে, সর্বোচ্চ তলে, নর্তকের দল, অনবদ্য সুষম তাদের নৃত্যের ছন্দ, নিখুঁত তাদের তাল-বিরামহীন এই নৃত্য, শাশ্বত।

অলঙ্কৃত করেন মহাঅভিজ্ঞ রাজপুত ভাস্কর এই সব অলঙ্করণের অন্তর্বর্তী স্থানও কত বিভিন্ন অলঙ্করণ দিয়ে, কত বিচিত্র ভূষণেও। পুনরাবৃত্ত হয় কত আভরণেরও বারংবার, বাড়ে তাদের মহিমময়ত্ব, হয় তারা সুন্দরতম অগ্রসর হয় চূড়ার দিকে রূপপরিগ্রহ উজ্জ্বলতম দুলের (পেণ্ডেণ্টের), পরিণত হয় দুই পুষ্পমালার অন্তর্বর্তী বিন্দুতে, বিলম্বিত সেই পল্লবগুচ্ছ অরণ্যের বৃক্ষের উচ্চ শাখা থেকে।

এইখানেই পরিসমাপ্তি হয় নাই ছাদের অলঙ্করণের কাজের। নিম্নতর বৃত্তাকার চক্রের অঙ্গে গ্রথিত হয় ষোলটি বন্ধনীর সারি বুকে নিয়ে বিদ্যাদেবীর মূর্তি। তাঁরা শিরে নিয়ে আছেন এক একটি জ্যোতির চক্র। অবিচ্ছিন্ন এই দেবী মূর্তিগুলি, প্রক্ষিপ্ত, রূপধারণ করে খিলানের অঙ্গের বন্ধনীর।

এক মহামহিমময় পরিকল্পনার অভিনব রূপদান, এক অনবদ্য, সুন্দরতম, সূক্ষ্মতম, অনুপম মহামহিমময় সৃষ্টি। রচনা করেন নাই ভারতের অন্য কোন স্থপতি আর ভাস্কর ভারতের অন্য কোন মন্দিরে—তাই বিশ্বজিৎ হয়।

গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত তীর্থঙ্কর ঋষভনাথকে প্রণতি জানিয়ে দেখতে থাকি অলিন্দের ছাদের অলঙ্করণ। দেখি অলঙ্কৃত অলিন্দের ছাদের প্রতিটি অংশও তার প্রতিটি প্রস্তরের অঙ্গ, তার সর্বাঙ্গ মহামহিমময় মূর্তির সম্ভার দিয়ে—মূর্তি কত জৈন তীর্থঙ্করের, কত হিন্দু দেবতা আর দেবীর। মূর্তি কত নৃত্য-পরায়ণ রূপবান নরের, কত যৌবনপুষ্টা, পীনোন্নতবক্ষা আয়তলোচনা নারীর। শোভিত কত কাহিনী আর বিভিন্ন প্রতীক দিয়েও। তারা শ্রেষ্ঠ দান মহাজ্ঞানী জৈন ভাস্করের, পরিচায়ক তাঁদের অসামান্য ধর্ম জ্ঞানেরও। নাই এই মহা-মহিমময়, জটিলতম, মহাসমৃদ্ধিশালী, বিচিত্র অলঙ্করণ ভারতের অন্য কোন মন্দিরে।

মহাঅভিজ্ঞ স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা জানাই, নিবেদন করি বিমল-শাহকেও, তেজপালের মন্দিরে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে তেজপাল বিমল বশাহীর উত্তর পূর্বে—তার পাশে। নির্মিত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দে শুধু শ্বেত প্রস্তর দিয়ে, বুকে নিয়ে আছে তেজপাল বিমল বশাহীর অনুরূপ পরিকল্পনা আর নির্মাণ পদ্ধতি, তার সুষ্ঠু অনুকরণ, তার ক্রমবিকাশ। বীর-ধবলের মন্ত্রী, দুই ভাই বস্তুপাল ও তেজপাল নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি। কিন্তু ক্ষুদ্রতর আয়তনে, বিস্তৃত হয়ে আছে একশত পঞ্চান্ন ফুট দীর্ঘ ও বিরানব্বই ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে।

দেখি দাঁড়িয়ে আছে শোভাযাত্রার হস্তীগুলি গর্ভগৃহের পিছনে বেষ্টনীর পূর্বপ্রান্তে, অধিকার করে আছে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের স্থান। রচিত হয় একটি অলিন্দ, পৃথক হয় সেই অলিন্দ একটি সচ্ছিদ্র গাঁথনির পর্দা দিয়ে অঙ্গন থেকে। নির্মিত হয় তার পিছনে একটি সুন্দরতম পর্যাপ্ত অলঙ্করণে অলঙ্কৃত চৌমুখ, তার দুই পাশে দশটি হস্তী, এক এক পাশে পাঁচটি করে। অপসারিত হয়েছে স্রষ্টাদের ও তাঁদের পরিবারবর্গের মূর্তি তাদের পৃষ্ঠ থেকেও।

জীবন্ত এই হস্তী মূর্তিগুলিও, অপরূপ গঠনে, সুন্দরতম, অতুলনীয় তাদের অঙ্গের ভূষণও, বুকে নিয়ে আছে জালির কাজ—এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জৈন স্থপতির আর ভাস্করের, অবিনশ্বর কীর্তি।

হস্তী মূর্তির শোভাযাত্রা দেখে, আমরা ঘুরে ঘুরে দেখি সমস্ত মন্দিরটি। অঙ্গে নিয়ে আছে তার চতুর্দিকের উনচল্লিশটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের অলিন্দের ছাদও

কত সুন্দরতম অলঙ্করণ, কত মূর্তির সম্ভার, অনুরূপ বিমল বশাহীর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের অলিন্দের ছাদের। মূর্তি দিয়েই রচিত হয় তাদের গাত্রে তীর্থঙ্কর নেমিনাথের জীবনের কত ঘটনাবলীর কাহিনী, কাহিনী কত জৈন পুরাণের, কত হিন্দু দেবদেবীর আর হিন্দু উপাখ্যানের—কাহিনী কালীয়দমনের আর কৃষ্ণলীলারও, মুগ্ধ হয়ে দেখি।

দেখি দীর্ঘতর এই মন্দিরের তোরণের স্তম্ভগুলি, বিভক্ত আটটি বিভিন্ন শ্রেণীতে। সর্বাঙ্গে নিয়ে আছে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম ভূষণ আর মহামহিমময় মূর্তির সম্ভার, পড়েও বিমল বশাহীর স্তম্ভের সমপর্যায়ে, গঠনে আর সর্বাঙ্গের আভরণে।

মণ্ডপে উপনীত হই। সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরটিরও এই মণ্ডপটি। ক্ষুদ্রতর এই গম্বুজটির ব্যাস, বিমল বশাহীর মণ্ডপের গম্বুজের ব্যাসের তুলনায়, কিন্তু সমপর্যায়ে পড়ে তার অলঙ্করণের বিস্তৃতে ও বিচিত্রতায় আর পরিকল্পনার সৌন্দর্যে ও মহিময়ত্বে। গ্রথিত হয় ষোলটি বন্ধনীও অলঙ্করণের দ্বিতীয় সারির উপরে অঙ্গে নিয়ে মূর্তির সম্ভার। তাদের কেন্দ্রস্থলে রচিত হয় একটি দুল, অপরিসীম তার সৌন্দর্য আর সুষমা। নির্মিত শুধু শ্বেত প্রস্তর দিয়ে বুকে নিয়ে আছে তার অলঙ্করণ, মাধুর্যপূর্ণ বিস্তৃতি, সুষ্ঠু নিখুঁত সমাবেশ আর সুষম বিন্যাস, তাই অপরাজেয় এই অলঙ্করণ, নাই অন্য কোন স্থানে, বলেন মনীষী ফারগুসান। তার কাছে পরাজয় বরণ করে ওয়েস্ট মিনিস্টারের সপ্তম হেনরির ভজনালয়ের (ধর্মমন্দিরের) গথিক স্থাপত্য পদ্ধতির অলঙ্করণ, হার মানে অক্সফোর্ডের ভূষণও—নিকৃষ্টতর তারা তুলনায়, কুৎসিতও।

বলেন ফারগুসান সম্ভব নয় দুলের আভরণের অপরিসীম সৌন্দর্যের – তার তুলনাহীন মাধুর্যের সঠিক বর্ণনা করা, সক্ষম নয় আলেখ্যের অঙ্গের অলঙ্করণও তাদের সৌন্দর্যের সম্যক রূপায়নে। রচিত হয় পরিধির চতুর্দিকে প্রতিটি বন্ধনীর অঙ্গে ষোলটি চতুর্ভুজা বিদ্যাদেবীর মূর্তি, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁরা।

মুখর কোজেন্সও (Cousens) এই মন্দির দুইটির প্রশংসায়। বলেন, বহু বিস্তৃত, সূক্ষ্মতম এই মন্দিরের ছাদের অঙ্গের, স্তম্ভের গাত্রের, প্রবেশ পথের কপাটের খোবের আর কুলুঙ্গির ভিতরের অলঙ্করণ—মহামহিমময়। ভঙ্গুর সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ,

শঙ্খের কাজের অনুরূপ এই শ্বেত প্রস্তরের অঙ্গের ভূষণ। তার কাছে পরাজয় বরণ করে যে কোন স্থানের যা-কিছু দর্শনীয় বস্তু। বুকে নিয়ে আছে কয়েকটি পরিকল্পনা মহাসুন্দরের স্বপ্নও।

তাই বিশ্বজিৎ হয় এই মন্দির দুইটি অলঙ্করণের সীমাহীন অতি-প্রাচুর্যের মধ্যেও। মহাসুন্দরকে বরণ করি। প্রণতি জানাই গর্ভগৃহে অধিষ্টিত দ্বাবিংশ-তিতম তীর্থঙ্কর নেমিনাথকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করি দুই ভাই বস্তুপাল ও তেজ-পালকে, অমর তাঁরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বার হ'য়ে আসি।

দেখি আরও দুইটি মন্দির। দাঁড়িয়ে আছে আদিনাথের মন্দিরটি তেজ-পালের নিকটে দক্ষিণ-পূর্বে। অর্ধসমাপ্ত তার চতুর্দিকের বেষ্টনীর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলি।

আদিনাথের সুমহান চৌমুখ মন্দিরটিও দেখি। ত্রিতল এই মন্দিরটি, নির্মিত পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে; বুকে নিয়ে আছে তার চতুর্দিক উন্মুক্ত অলিন্দ শীর্ষে নিয়ে গম্বুজ। প্রধান তাদের মধ্যে পশ্চিম দিকের অলিন্দটি অঙ্গে নিয়ে আছে ছিয়াত্তরটি স্তম্ভ। স্থপতি ও ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে হোটেলে ফিরে আসি।

পরের দিন পরিত্যাগ করি আবু। সত্বরে ফিরে আসি। আজও অক্ষয় হ'য়ে আছে মনের মন্দিরে মহাপবিত্র আবুর স্মৃতি, হয় নাই ম্লান।

সপ্তম অধ্যায়

দাক্ষিণাত্য

(শতাব্দী একাদশ—ত্রয়োদশ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

অম্বরনাথ

অম্বরনাথের মন্দির

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। দ্বিতীয়বার কলিকাতা থেকে বোম্বাইতে বদলি হয়ে যাই, আতিথ্য গ্রহণ করি সায়নে বন্ধুবর প্রফুল্ল বাগচীর গৃহে। একদিন সকালে প্রাতরাশ সমাপন করে রওনা হই অম্বরনাথ অভিমুখে, দেখতে যাই অম্বরনাথের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরটি। সঙ্গী হয় আমার বোম্বাই অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হরি সিং।

অবস্থিত এই অম্বরনাথ দাক্ষিণাত্যে, বোম্বাই থেকে পুণার যাত্রার পথে, বোম্বাই-এর ভি-টি, স্টেশন থেকে ষাট মাইল দূরে। অতিক্রম করে যেতে হয় প্যারেল, দাদর, কুরলা, থানা আর কল্যাণ। দাদরে গিয়ে আমরা বোম্বাই পুনাগামী একটি মন্থরগতি ট্রেনে উঠে বসি। ট্রেন ছাড়ে অম্বরনাথ স্টেশনে এসে থামে, পার হয়ে আসে দু-পাশের কত শস্য শ্যামল ক্ষেত, কত স্রোতস্বিনী কত গিরিবর আর কত খাঁড়ি, রূপ পরিগ্রহ করে তারা সাগরের, কত নয়নাভিরাম অলোকসুন্দর পরিবেশও। তখনও উপনীত হন নাই দেবদিবাকর মধ্যাহ্ন গগণে।

বৈদিকযুগের শেষভাগে সুরু করেন আর্যগণ বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম। উপনীত হন দাক্ষিণাত্যে। বিস্তৃত দাক্ষিণাত্য উত্তরে নর্মদা নদী ও দক্ষিণে কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর অন্তর্বর্তী ভূভাগ নিয়ে, পরিচিত দক্ষিণাপথ নামেও। স্থাপিত হয় বিদর্ভ রাজ্য বর্তমান বেরারে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বে, সাত্বতগণ স্থাপন করেন। তাঁদেরই এক শাখা প্রতিষ্ঠা করেন দণ্ডক রাজ্য নাসিকের কাছে। প্রতিষ্ঠিত হয় চেদীরাজ্য, বর্তমান বুন্দেলখণ্ডে। তারপরে ইক্ষ্বাকুবংশের আর্যরা স্থাপন করেন গোদাবরী অঞ্চলে অশ্মক ও মূলকরাজ্য। কিন্তু সুদৃঢ় হতে পারে না আর্যপ্রভাব, আর্য প্রতিপত্তি দাক্ষিণাত্যে, তার অধিবাসী অনার্যদের প্রতিকূলতায়, প্রবল পরাক্রান্ত তাঁরাও—স্বাধীন।

গড়ে ওঠে আর্যাবর্তে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ষোড়শ মহাজনপদ। প্রবল পরাক্রান্ত হন যখন গণতান্ত্রিক শাক্যরা কপিলাবস্তুতে বর্তমান নেপালে আর লিচ্ছবীরা বৈশালী নগরীতে, হয় মগধ, অঙ্গ, কোশল, বৎস, অবন্তী আর উত্তর পশ্চিমে গান্ধার রাজ্য ৬০০ থেকে ৩২৫ খ্রীষ্টপূর্বে, মহাপরাক্রমশালী হন দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র জাতি পশ্চিমে, হয় অন্ধ্ররাজ্য কেন্দ্রস্থলে আর কলিঙ্গরাজ্য ও ইক্ষ্বাকু বংশ পূর্বে। প্রবল পরাক্রান্ত হয় সুদূর দক্ষিণ-পূর্বে চোলরাজ্য, স্থাপিত হয় তার রাজধানী উরইয়ুরে, দক্ষিণে পাণ্ড্য রাজ্য, বিস্তৃত তাদের রাজ্যের সীমা বর্তমান মাদুরা ও টিনেভেলী জেলা নিয়ে আর কেরল র‍্যাজ্য পশ্চিমে, বর্তমান মালাবার, কোচীন, ত্রিবাঙ্কুর আর সিংহল তার অন্তর্গত।

মহাপরাক্রমশালী হন মগধে মৌর্য সম্রাটরা ৩০০ থেকে ১৮৪ খ্রীষ্টপুর্বে সারা দাক্ষিণাত্য তাঁদের অধিকারে আসে, অধীনস্থ হয় মগধের। অধীনস্থ হয় দাক্ষিণাত্য অন্ধ্র বা পূর্বসাতবাহন সাম্রাজ্যের ১৮৪ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ২৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মহাপরাক্রমশালী হন তাঁরা মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের যুগে, স্থাপন করেন এক অতিশক্তিশালী সাম্রাজ্য সমগ্র দাক্ষিণাত্যে, বিস্তৃত তার সীমানা উত্তর-ভারতের এক অংশেও।

বিভক্ত হয় সাতবাহন সাম্রাজ্য বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে সাতবাহনদের পতনের পর খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে। প্রবল হন দাক্ষিণাত্যে—অভীররা আর নাসিকের ও মহারাষ্ট্রদেশের বিদর্ভের (বেরারের) বাকাটকরা, হন ইক্ষ্বাকুরা আর কৃষ্ণা ও পশ্চিম গোদাবরী জেলার সালঙ্কারণরা। প্রবল হন কাঞ্চীর পল্লবরা আর বৈজয়ন্তীর কদম্বরা উত্তর কানাড়ায়।

অধীনস্থ হয় দাক্ষিণাত্য বাতাপির চালুক্য বংশের ৫৫০ থেকে ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, হয় রাষ্ট্রকূট রাজাদের ৭৫৩ থেকে ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অধিকারে আসে দাক্ষিণাত্য কল্যাণের চালুক্য রাজাদের ৯৭৩ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

অস্তমিত হয় চালুক্য ক্ষমতা চালুক্য প্রভাব দাক্ষিণাত্যে, মহারাষ্ট্রে সুরু হয় রাষ্ট্রকূট শাসন, রাষ্ট্রকূট প্রতিপত্তি। রাজত্ব করেন তাঁরা প্রবল প্রতাপে দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে দীর্ঘ দ্বিশত বৎসরেরও বেশী। হন সার্বভৌম সম্রাট। দন্তিদুর্গই স্থাপন করেন এই রাজবংশ।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মত তাঁদের উৎপত্তি সম্বন্ধে। উল্লিখিত আছে নবম শতাব্দীর রাষ্ট্রকূট অনুশাসন লিপিতে মহাভারতের যদু বংশের শ্রীকৃষ্ণের সহচর, সাত্যকী তাঁদের পুর্বপুরুষ। কেউ বলেন অশোকের অনুশাসন লিপিতে উল্লিখিত রথিক বা রাষ্টিকদের বংশধর তাঁরা। কারও মতে তাঁরা ছিলেন দ্রাবিড় কৃষিজীবী কর্ণাটকের অধিবাসী, প্রথমে নিযুক্ত হন সামন্ত রাজা চালুক্য রাজাদের অধীনে, পরে প্রতিষ্ঠা করেন এক সাম্রাজ্য।

মহাপরাক্রমশালী এই দন্তীদুর্গ, অতিক্রম করে তাঁর সামরিক অভিযান কাঞ্চী, মহাকোশল, মালব আর দক্ষিণ গুজরাট। প্রবল পরাক্রান্ত তাঁর ভাই প্রথম কৃষ্ণও। অলঙ্কৃত করেন রাষ্ট্রকূট সিংহাসন ৭৬৮ থেকে ৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরাজিত হন তাঁর কাছে বেঙ্গীর চালুক্যরাজ চতুর্থ বিষ্ণু বর্ধন, হন মহীশূরের গঙ্গ রাজাও। মহীশূর রাষ্ট্রকূটদের অধিকারে আসে। বাড়ে রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সীমানা বর্ধিত হয় প্রতিপত্তি। নির্মিত হয় তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এলোরায় বিখ্যাত কৈলাশনাথের মন্দির, সর্বশ্রেষ্ঠ গুহামন্দির ভারতের, বিশ্বেরও।

কীর্তিহীন প্রথম কৃষ্ণের পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ, অধিরোহণ করেন রাষ্ট্রকূট সিংহাসনে পিতার মৃত্যুর পর। অলঙ্কৃত করেন সিংহাসন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুব পরিচিত নিরুপম নামেও (৭৭৯—৭৯৩ খ্রীঃ), পরাজয় বরণ করেন গঙ্গরাজ রাষ্ট্রকূটদের অধিকারে আসে তাঁর রাজ্য। বশ্যতা স্বীকার করেন কাঞ্চীর পল্লব রাজা। পরাজিত হন গুর্জর-প্রতিহার রাজা বৎসরাজও। প্রবেশ করে তাঁর বিজয়ের অভিযান আর্যাবর্তেও। নতি স্বীকার করেন তাঁর কাছে, গৌড়াধিপতি পাল শ্রেষ্ঠ ধর্মপালও। বাড়ে রাজ্যের সীমানা বর্ধিত হয় রাষ্ট্রকূট প্রতিপত্তিও। অলঙ্কৃত করেন তৃতীয় গোবিন্দ ৭৯৩ থেকে ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের তিনি পরাজিত করেন পল্লবরাজ দন্তীবর্মণকে, দমন করেন মহীশূরের বিদ্রোহ। পরাজিত হন তাঁর কাছে গুর্জর-প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট, বাংলার ধর্মপাল আর তাঁর আশ্রিত কনৌজরাজ চক্রায়ুধ, নতি স্বীকার করেন। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা উত্তরে বিন্ধ্যপর্বত থেকে দক্ষিণে কাঞ্চী পর্যন্ত। ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সামরিক খ্যাতি দিকে দিকে। হন তিনি সার্বভৌম সম্রাট সমস্ত দক্ষিণ ভারতের।

তাঁর পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ রাজত্ব করেন ৮১৪ থেকে ৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরাজিত হন তাঁর কাছে বেঙ্গীর চালুক্য রাজা। উৎকীর্ণ আছে শিলালিপিতে বিস্তৃত তাঁর অধিকার পূর্বভারতে, বঙ্গ ও বিহার অঞ্চলেও। রচয়িতা তিনি "রত্নমালিকা" ও "কবিরাজমার্গ" নামক ধর্মগ্রন্থের, পৃষ্ঠপোষক সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মের। মান্যখেটে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী। বিশ্বের চারিজন শ্রেষ্ঠ নৃপতির অন্যতম, সমপর্যায়ে পড়েন তিনি চীনের সম্রাট, বাগদাদের খলিফা ও রোমের সম্রাটের, বলেন আরবদেশীয় পর্যটক সুলেমান।

রাজত্ব করেন দ্বিতীয় কৃষ্ণ (৮৭৭—৯১৩ খ্রীঃ) তাঁর মৃত্যুর পর। রাজত্ব করেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র ৯১৫ থেকে ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রবল পরাক্রান্ত তিনিও, পরাজিত হন তাঁর কাছে কনৌজের গুর্জর-প্রতিহার রাজা।

রাজত্ব করেন একে একে দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ, চতুর্থ গোবিন্দ আর তৃতীয় অমোঘবর্ষ। কীর্তিহীন তাঁরাও। প্রশমিত হয় তাঁদের রাজত্ব কালে রাষ্ট্রকূট ক্ষমতা, লাঘব হয় তাঁদের প্রাধান্য, দাক্ষিণাত্যে।

তৃতীয় কৃষ্ণই শেষ পরাক্রমশালী নৃপতি এই বংশের, অলঙ্কৃত করেন রাষ্ট্র-কূট সিংহাসন ৯৩৯ থেকে ৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর কাছে পরাজিত হন প্রতিহার রাজা মহীপাল। কালঞ্জর আর চিত্রকূট রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। পরাজয় বরণ করেন পাণ্ড্য, চোল ও কেরল রাজাও। বশ্যতা স্বীকার করেন সিংহল রাজাও, আবার বাড়ে রাষ্ট্রকূট ক্ষমতা বর্ধিত হয় তাদের প্রতিপত্তিও।

মৃত্যু হয় তৃতীয় কৃষ্ণের। হীনবল হতে থাকে রাষ্ট্রকূট, অস্তমিত হতে থাকে তাঁদের ক্ষমতা। শেষে অস্তহৃত হয়ে যায় একেবারে ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। পরাজিত হন শেষ রাষ্ট্রকূট নৃপতি দ্বিতীয় কর্ক বা চতুর্থ অমোঘবর্ষ চালুক্য বংশের তৈলপ বা দ্বিতীয় তৈলের কাছে। আবার প্রতিষ্ঠিত হয় চালুক্য ক্ষমতা, চালুক্য প্রভুত্ব দাক্ষিণাত্যে।

শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা রাষ্ট্রকূট রাজারাও। সাজান তাঁদের রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত মন্দির দিয়ে, বুকে নিয়ে অনবদ্য স্থাপত্যের নিদর্শন, অঙ্গে নিয়ে অতুলনীয় সুন্দরতম শিল্পসম্ভার আর মহামহিমময় মূর্তিসম্ভার। তাঁরাই

নির্মাণ করেন এলোরার ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দির। শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে কৈলাস—বিশ্বের পরমাশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য এই স্বপ্নপুরী কৈলাস, যে কোন জাতির পরম গৌরবের ধন, মহামহিমময়। শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির কৈলাস ভারতের, বিশ্বেরও, সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বদেশের, সর্বযুগেরও।

প্রবল হন দাক্ষিণাত্যে দেবগিরিতে যাদব, বরঙ্গলে কাকতীয় আর মহীশূরে দোরসমুদ্রে হোয়েসল রাজারা কল্যাণের চালুক্য বংশের রাজাদের পতনের পর। তাঁরা স্থাপন করেন তিনটি স্বতন্ত্র রাজ্য।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বপুরুষ যদুর বংশধর এই যাদব নৃপতিরা, অবতীর্ণ হন দাক্ষিণাত্যের রঙ্গমঞ্চে রাষ্ট্রকূট আর কল্যাণের চালুক্য রাজাদের অধীনে সামন্ত রাজ রূপে। দ্বাদশ শতাব্দীতে কল্যাণের চালুক্য রাজাদের পতন হলে, ১১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ভিল্লম স্থাপন করেন এক স্বাধীন রাজ্য দেবগিরিতে, বর্তমান দৌলতাবাদে। সিংঘন (১২১০—১২৪৬ খ্রীঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি এই বংশের পরাজিত করেন চোলদের। বিস্তৃত হয় যাদব রাজ্যের সীমানা উত্তরে নর্মদা থেকে দক্ষিণে মলপ্রভা পর্যন্ত। পারদর্শী সংগীতশাস্ত্রেও, তিনি ভাষ্য রচনা করেন তাঁর মন্ত্রী সারঙ্গধর প্রণীত সংগীত গ্রন্থের। তাঁর সভাসদ হন জ্যোতির্বিদ চঙ্গদেব আর অনন্তদেব।

সিংঘনের মৃত্যুর পর রাজত্ব করেন একে একে তাঁর দুই পৌত্র কৃষ্ণ আর মহাদেব। ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণের পুত্র রামচন্দ্র অধিরোহণ করেন দেবগিরির সিংহাসনে। বিদ্যোৎসাহী তিনি অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা "চতুর্বর্গ চিন্তামণি" প্রণেতা হিমাদ্রি, করেন মনীষী বোপদেব আর জ্ঞানেশ্বর। ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী দেবগিরি আক্রমণ করেন। লুণ্ঠিত হয় দেবগিরি। ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুর দ্বিতীয়বার দেবগিরি আক্রমণ করেন। পরাজিত হন রামচন্দ্র, বাধ্য হন কর প্রদানে। নিহত হন তাঁর পুত্র ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দে, হন তাঁর জামাতা হরপালও ১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দে। অধিকারে আসে দেবগিরি দিল্লীর সম্রাট মুসলমান আলাউদ্দিনের। অবসান হয় দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র প্রভুত্ব, সুপ্ত থাকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

আলাউদ্দিনের হাতে পরাজিত হয়ে এই দেবগিরিতেই রামচন্দ্রের কাছে আশ্রয় নেন গুজরাটের রাজা বাঘেলা রাজপুত বংশের দ্বিতীয় রায় কর্ণদেব,

সঙ্গে নিয়ে পরম রূপবতী কন্যা দেবলাদেবী। হৃতা হন তাঁর পত্নী কমলাদেবী, পরিণত হন সম্রাটের অন্যতমা প্রিয়তমা মহিষীতে। রাজা রামচন্দ্রের পরাজয়ের পর ধৃতা হন দেবলাদেবীও। বিবাহ হয় তাঁর সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খানের সঙ্গে।

প্রতিষ্ঠিত হয় এক স্বাধীন রাজ্য অন্ধ্রদেশে কাকতীয় বংশের অধীনেও প্রথমে অণুমকোণ্ড পরে বরঙ্গলে স্থাপিত হয় তার রাজধানী। দ্বিতীয় প্রোলরাজ প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা এই বংশের, তাঁর কাছে পরাজিত হন কল্যাণের সমসাময়িক চালুক্যরাজ। রাজত্ব করেন প্রবল পরাক্রান্ত তাঁর পৌত্র গণপতি (১১৯৯—১২৬১) পর্যন্ত, বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা দক্ষিণে কাঞ্চী পর্যন্ত। তাঁর কন্যা রুদ্রাম্বা আরোহণ করেন কাকতীয় সিংহাসনে ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সেই সময় পরিদর্শন করেন দাক্ষিণাত্য প্রসিদ্ধ ইটালীয় পর্যটক মার্কোপোলো। মুখর তিনি তাঁর শাসন দক্ষতার প্রশংসায়। প্রতাপরুদ্রদেব শেষ পরাক্রান্ত রাজা এই বংশের। চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে মালিক কাফুর পরাজিত করেন প্রতাপরুদ্রদেবকে অধিকারে আসে বরঙ্গল কাফুরের অধীনস্থ হয় আলাউদ্দিন খিলজীর।

সামন্ত রাজার রূপ নিয়ে হোয়সলরা দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। নিযুক্ত হন প্রথমে চোল অথবা কল্যাণের চালুক্য সম্রাটদের অধীনে সামন্ত। শেষে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিত্তিগ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মহীশূরে স্থাপন করেন এক স্বাধীন রাজ্য। দোরসমুদ্রে, বর্তমান হলেবিদে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী। দীক্ষা গ্রহণ করেন তিনি বৈষ্ণবধর্মে আচার্য শ্রেষ্ঠ রামানুজের কাছে, বিষ্ণু বর্ধন নামে পরিচিত হন। তিনি পরাজিত করেন চের, চোল আর পাণ্ড্যদের। বাড়ে রাজ্যের সীমানা। ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পৌত্র দ্বিতীয় বীরবল্লাল অধিরোহণ করেন হোয়সল সিংহাসনে, রাজত্ব করেন ১২২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রবল পরাক্রান্ত তিনি, তাঁর কাছে পরাজয় বরণ করেন দেবগিরির যাদবরাজ। পরাজিত হন আরও অনেক রাজা। বিস্তৃত হয় হোয়সল ক্ষমতা হোয়সল গৌরব দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে।

১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাপতি মালিক

কাফুরের কাছে পরাজিত হন হোয়েসল রাজা তৃতীয় বীর বল্লাল, শেষ উল্লেখ-যোগ্য নৃপতি এই বংশের। অস্তমিত হয়ে যায় একেবারে হোয়সল রাজ্য ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে। পরাজিত হন দেবগিরির যাদব রামচন্দ্রদেব ও বরঙ্গলের কাকতীয় প্রতাপরুদ্রদেব। বিজাপুর, বিদর, কুলবর্গা আর হায়দারাবাদ মুসলমানের অধিকারে আসে।

শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এই হোয়েসল রাজারাও, সাজান রাজধানী দোরসমুদ্রের বুক কত সুন্দরতম আর মহিমময় মন্দির দিয়ে, শোভিত হয় সোমনাথপুর আর বেলুড়ের বুকও। বুকে নিয়ে আছে তারা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বেসর পদ্ধতির, সুন্দরতমও।

গড়ে ওঠে দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও—উত্তরে তার তাপ্তী নদী দক্ষিণে কৃষ্ণা, মধ্যযুগে একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নাগর পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দির, বুকে নিয়ে দাক্ষিণাত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, আপন স্বকীয়তা। অনুপ্রাণিত তাঁদের পূর্ব গৌরবের ঐতিহ্যে, অজন্তা ও এলোরার শৈলমালার অঙ্গ কেটে মন্দির নির্মাণে, তাঁরা সুরু করেন এক নতুন যুগ মন্দির নির্মাণে। হয় মহাঅগ্রগতি তাঁদের স্থাপত্যেও।

তার উত্তরে সৌরাষ্ট্র (গুজরাট), গড়ে ওঠে সেখানে এক অভিনব স্থাপত্য পদ্ধতি, নিমিত হয় কত মন্দির, বুকে নিয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, সোলাঙ্কি বংশের নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় আর উদ্যমে। দক্ষিণে তার কল্যাণের চালুক্য নৃপতিদের রাজ্য, নির্মিত হয় সেখানেও কত সুন্দরতম মহিমময় মন্দির বুকে নিয়ে এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন নির্মাণ পদ্ধতি, এক অভিনব বৈশিষ্ট্য, চালুক্য রাজারা নির্মাণ করেন। তাই প্রভাবান্বিত হয় তাদের মন্দির নির্মাণ পদ্ধতি এই দুই নিকটবর্তী স্বতন্ত্র পদ্ধতি দিয়ে। তথাপি বুকে নিয়ে আছে দাক্ষিণাত্যের নাগর মন্দির তাদের স্বাতন্ত্র্য, তাদের অভিনবত্ব, তাদের মৌলিকতা। এক বিশিষ্ট দান, ভারতের স্থাপত্যে-দান তার মহা-অভিজ্ঞ স্থপতির আর ভাস্করের।

মন্দিরের শিখরের পরিকল্পনাই বুকে নিয়ে আছে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, সর্ব-প্রধান মৌলিকতা, দাক্ষিণাত্যের স্থপতির। বিভিন্ন ভারতের অন্য অঞ্চলের নাগর মন্দিরের শিখরের পরিকল্পনায়, রচিত হয় সুস্পষ্ট উল্লম্ব বন্ধন, প্রসারিত

হয় প্রতিটি কোণে হয় না উরুশৃঙ্গের বা ক্ষুদ্রায়তন চূড়ার সারি শিখরের নিম্নাংশের চতুর্দিকে। রূপ পরিগ্রহ করে মেরুদণ্ডের বা কোণের কৌণিক প্রস্তরের, বিস্তৃত হয় এই গঠন নিম্নতম কার্নিস থেকে একেবারে চূড়ার অগ্রভাগ পর্যন্ত বুকে নিয়ে সুন্দরতম, মহিমময় রচনাকৌশল। অনুসরণ করে শিখরের প্রধান বহিঃসীমারেখা, নিবদ্ধ থাকে শিখরের সম্পূর্ণ আকৃতি সুদৃঢ়-বহিঃসীমা রেখার মধ্যে। তারপর পূর্ণ করা হয় এই কৌণিক প্রস্তরের অন্তর্বর্তী স্থানগুলি প্রধান বা মূল শিখরের সুষ্ঠু ক্ষুদ্রায়তন পুনরুৎপাদনের শ্রেণী দিয়ে—তাদের নিখুঁত ক্ষুদ্রকায় প্রতিরূপের সারি দিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে প্রতিটি শিখরের ক্ষুদ্রায়তন প্রতিরূপ এক একটি স্তম্ভমূলের উপর, বেদীর রূপ পরিগ্রহ করে স্তম্ভমূলগুলি। অবলম্বিত হয় অনুরূপ পদ্ধতি, মন্দিরের অন্য অংশ রচনাতেও। রচিত হয় মণ্ডপের পিরামিডাকৃতি ছাদও, ক্রমহ্রস্বায়মান ক্ষুদ্রায়তন মণ্ডপের গুণক দিয়ে, তাদের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ দিয়ে। এই অভিনব সুরুচিপূর্ণ শিল্প শৈলীই, বুকে নিয়ে আছে মূখ্য অবদান সমস্ত দাক্ষিণাত্যের রচনা পদ্ধতির তার মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির।

মৌলিক এই সব মন্দিরের পরিকল্পনাও। বিন্যস্ত বৃহত্তর মন্দিরগুলি কোণাকুণি, বুকে নিয়ে আছে বিশিষ্ট অগ্রগতি প্রাচীরের আকৃতিতে। উপনীত হয় প্রাচীরের গাত্রের অধিক্ষেপণ আর কুলুঙ্গির সমাবেশ চরমে এই সব দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি মন্দিরেও, বিস্তৃততর হয় মন্দিরের অঙ্গের পরিবর্তন, হয় সজীবতরও, বাঁশির আকার বিশিষ্ট বৃহত্তর মন্দিরের তুলনায়। এই অধিক্ষেপণ আর কুলুঙ্গির ঊর্ধ্বগতির পথেই সৃষ্টি হয় মন্দিরের অঙ্গে আলোছায়ার সমাবেশ, বর্ধিত হয় তার ঊর্ধ্বাংশের সজীবতাও, অসাধারণ এই বৃদ্ধি।

রচিত হয় সংলগ্নীভূত অনুভূমিক পথের সারিও, রূপ পরিগ্রহ করে তারা ছাঁচের। সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে প্রাচীরের অঙ্গ এই দুই রীতির সংযোজনে। বুকে নিয়ে আছে তাদের মধ্যে অনেকগুলি ছাঁচ ছুরির ফলার ধারের আকৃতি পরিচিত কানি নামে। বিষয়বস্তু হয় দাক্ষিণাত্যের মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির, এই কাণির ছাঁচের আভরণ মন্দিরের অপরাংশ রচনাতেও, এক রৈখিক রূপ ধারণ করে মন্দির, অভিনব হয়, স্বতন্ত্র হয় দাক্ষিণাত্যের মন্দির, হয় সুন্দরতম আর মহিমময়ও।

কিন্তু অধিকার করে এই কানি এক বিশিষ্ট স্থান তাদের স্তম্ভের রচনার নক্সাতেও। মৌলিক এই দাক্ষিণাত্যের স্তম্ভের নির্মাণ পদ্ধতিও, বুকে নিয়ে আছে অন্যতম বৈশিষ্ট্যও দাক্ষিণাত্যের মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির। শীর্ষে নিয়ে নাই স্তম্ভ ভারগ্রাহী প্রস্তরের আভরণ, নাই কোন স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন বন্ধনীও। রচনা করেন স্থপতি তাদের পরিবর্তে স্থূলাকৃতি আভরণ তাদের শীর্ষদেশে, সর্বোচ্চ ছাঁচের উপরে, "আইওনিক" তাদের অঙ্গের সুষমামণ্ডিত অলঙ্করণ। অঙ্গে নিয়ে নাই পাত্র ও পত্রের প্রতীকও এই সব স্তম্ভ। যদিও অলঙ্কৃত করেন দাক্ষিণাত্যের মহাপারদর্শী ভাস্কর মহাসমৃদ্ধিশালী পর্যাপ্ত, সুন্দরতম অলঙ্করণ দিয়ে এই স্তম্ভ দণ্ডের অঙ্গ, অলঙ্কৃত হয় না তার নিম্নাংশের এক তৃতীয়াংশ কোনও ভূষণ দিয়ে, দাঁড়িয়ে থাকে চতুষ্কোণ স্তম্ভ নিরাভরণ হয়ে, কিন্তু বাড়ায় না তাতে তাদের সৌন্দর্য। বুকে নিয়ে আছে কিন্তু কয়েকটি বৃহৎ মন্দির ব্যতিক্রম এই স্তম্ভের নির্মাণ রীতির। অলঙ্কৃত তাদের নিম্নাংশও সুন্দরতম মূর্তির সম্ভার দিয়ে, রূপ পরিগ্রহ স্তম্ভের অঙ্গ ক্ষুদ্র মন্দিরের।

বৃহৎ নয় দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের আকারও, মাঝারি। বিস্তৃত হয়ে আছে তাদের মধ্যে সিনারের বৃহত্তম মন্দিরটি, অন্যতম বৃহত্তম মন্দির দাক্ষিণাত্যের, আশি ফুট দীর্ঘ পরিধি নিয়ে। নির্ভর করে বিস্তারের সীমা, আকার প্রতিটি মন্দিরের, তার গঠন রীতির উপরে। সংখ্যায় পঞ্চাশেরও কম এই পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দির, ছড়িয়ে আছে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে, উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্যে দশটি। বিস্তৃত হয়ে আছে তাদের নির্মাণের কাল তিনটি শতাব্দী নিয়ে একাদশ থেকে ত্রয়োদশ।

নির্মিত হয় একাদশ শতাব্দীতে থানা জেলায় অম্বরনাথের মন্দির, খান্দেশে, বালসেনেতে ত্রিরত্ন মন্দির আর মহেশ্বরের মন্দির।

দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয় নাসিক জেলায় সিনারে গণ্ডেশ্বরের মন্দির ও ঝোগদাতে মহাদেবের মন্দির, আহমেদনগর জেলায় পেদগাঁওতে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির।

নির্মিত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আউন্ধে নাগনাথের মন্দির। বেরারে, লোনারে দৈত্যসুন্দর, সাতগাঁও-এ বিষ্ণু মন্দির মহকরের মন্দির, বুকে নিয়ে হেমাদপন্থী পদ্ধতি।

সম্ভবতঃ সুন্দরতম, মহিমময়, প্রাচীনতম তাদের মধ্যে অম্বরনাথের মন্দিরটি। অভিনব অঙ্গের আর শিখরের গঠনে, মহাসমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে পর্যাপ্ত অলঙ্করণ আর মূর্তি সম্ভার দিয়ে, হয়ে আছে অপরূপ।

খান্দেশের বালসেনও বুকে নিয়ে আছে নয়টি মন্দিরের সমষ্টি, অঙ্গে নিয়ে দাক্ষিণাত্যের বৈশিষ্ট্য। বিস্তৃত তাদের নির্মাণের কাল একশত পঞ্চাশ বৎসর। অঙ্গে নিয়ে আছে ত্রিরত্ন মন্দিরটি, তাদের মধ্যে অম্বরনাথের পরিকল্পনা, সম্ভবতঃ সমসাময়িকও তারা। কিন্তু ক্ষুদ্রতর এই মন্দিরটি অম্বরনাথের মন্দিরের তুলনায় বিস্তৃত হয়ে আছে পঁয়ষট্টি ফুট দীর্ঘ ও পঞ্চাশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। কিন্তু অপরূপ, সুষমামণ্ডিত এই মন্দিরটি অঙ্গে নিয়ে আছে সুন্দরতম পর্যাপ্ত অলঙ্করণ। মহাসমৃদ্ধিশালী, অপর্যাপ্ত, চিত্তাকর্ষক তাদের মধ্যে মন্দিরের প্রবেশ পথের অঙ্গের ভূষণ, শ্রেষ্ঠ দান দাক্ষিণাত্যের ভাস্করের, তাঁর অবিনশ্বর সৃষ্টি। ভূষিত করেন সুনিপুণ ভাস্কর এই প্রবেশ পথের সর্ব নিম্নাংশ দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে। রচিত হয় প্রতি পাশে তার উপরে সুন্দরতম অলঙ্করণে অলঙ্কৃত, স্তম্ভদণ্ড-বৈশিষ্ট্য এই সব মন্দিরের। স্তম্ভদণ্ডের শীর্ষদেশে রচিত হয় সুস্পষ্ট কার্নিস, তাব উপরে ক্ষুদ্রায়তন ভজনালয়ের সারি, কত অলঙ্কৃত প্রতীকও। নিখুঁত, অনবদ্য তাদের সমাবেশ, সুন্দরতম, মহিমময় তাদের অঙ্গের পরিকল্পনাও।

ভূষিত হয় তাদের মধ্যবর্তী স্থান মূর্তির সম্ভার আর পল্লব দিয়ে। এই মূর্তিসম্ভার, পল্লব আর পৌরাণিক উপকথা ও প্রতীক দিয়েই বর্ণনা করেন ঋষি ভাস্কর কত কাহিনী কত স্মরণাতীত ঘটনার, যা উদিত হয় তাঁর স্মরণে, রচনা করেন কত কল্পিত দৃশ্যের সমাবেশও, মহাসমৃদ্ধিশালী তাঁর সীমাহীন উদ্ভাবন শক্তির কল্পনা দিয়ে। সুন্দরতম হয় প্রবেশ পথ, মহিমময় হয়, হয় অপরূপ।

নির্মিত হয় সম্ভবতঃ বালসেনের "দ্বিতীয়" বা "তৃতীয়" মন্দির ত্রিরত্ন মন্দিরের নির্মাণের অর্ধশতাব্দী পরে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। বুকে নিয়ে আছে চতুর্থ মন্দিরের বহিঃঅঙ্গ তারকাকৃতি গঠন, তাই যুক্ত হয়ে আছে মহীশূরের চালুক্য মন্দিরের সঙ্গে, অঙ্গে নিয়ে তার প্রভাব। অঙ্গে নিয়ে আছে পঞ্চম মন্দিরটি সুষ্ঠু অনুকরণ নিকটবর্তী অজন্তা ও এলোরার শৈলমালার অঙ্গ কেটে নির্মিত বিহারের। এইখানেই, এই অজন্তা ও এলোরাতেই লাভ করে

শৈলমালার অঙ্গ কেটে মন্দিরের নির্মাণ চরম উৎকর্ষ, পায় পূর্ণ পরিণতি, মহামহিমময় হয়।

বুকে নিয়ে আছে দাক্ষিণাত্যের স্থপতির পরবর্তী ক্রমোন্নতির নিদর্শন নাসিক জেলার সিনারের গণ্ডেশ্বরের মন্দিরটি। নিমিত দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পঞ্চরত্ন এই মন্দিরটি, দাঁড়িয়ে আছে একশত পঁচিশ ফুট দীর্ঘ পঁচানব্বই ফুট প্রস্থ মঞ্চের উপর, বেষ্টিত হয়ে আছে চারিটি ক্ষুদ্রতর, অপ্রধান মন্দির দিয়ে। নিমিত হয় নন্দী মণ্ডপটি পূর্ব প্রধান প্রবেশ পথের দিকে মুখ করে, সুসামঞ্জস্য হয় সম্পূর্ণ মন্দিরটির নির্মাণ, মহিমময় হয়। দাঁড়িয়ে আছে মূল মন্দিরটি মঞ্চের কেন্দ্রস্থলে, বুকে নিয়ে অনবদ্য অঙ্গ সৌষ্ঠব। যুক্ত হয় তার দুইটি অংশ শুভামণ্ডপ আর তার পিছনের ঊর্ধ্বগতি স্বতন্ত্র বিমান, রূপ পরিগ্রহ করে এক অবিচ্ছিন্ন মন্দিরের। কিন্তু বিভিন্ন তাদের ছাদের অঙ্গের রচনা, বুকে নিয়ে আছে তাদের নিজেদের ক্ষুদ্রায়তন সংস্করণ, বর্ধিত হয় দুইটি অংশের স্বাতন্ত্র্য, মহিমান্বিত হয় মন্দির। শীর্ষে নিয়ে আছে শুভামণ্ডপের ছাদ ক্ষুদ্রাকৃতি সমতল আভরণ, বিমান দীর্ঘতর শিখারার অনুকরণ। বিস্তৃত হয়ে আছে মন্দিরটি আটাত্তর ফুট দীর্ঘ সাতষট্টি ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, একুশ ফুট বর্গ তার শুভা-মণ্ডপের, (স্তম্ভযুক্ত কক্ষের) আয়তন। কিন্তু সমধিক বর্ধিত হয় মন্দিরের সুষমা, তিনটি অপরূপ সুন্দরতম স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ দিয়ে, এই অলিন্দ দিয়েই মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। মহামহিমান্বিত হয় মন্দির, অপরূপ হয়।

গণ্ডেশ্বর ছাড়াও বুকে নিয়ে আছে সিনার ধ্বংসাবশেষ একটি মন্দিরের, পরিচিত ঈশ্বরের মন্দির নামে। অঙ্গে নিয়ে আছে উত্তর-প্রত্যন্ত চালুক্য পদ্ধতি, এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে নাগর পদ্ধতির অবয়ব। রচিত হয় তার স্তম্ভের শীর্ষদেশে কিচক বন্ধনী অজ্ঞাত চালুক্য স্থপতির। একাদশ শতাব্দীতে নিমিত হয় এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে নাগর স্থপতির বিস্ময়কর অবদানের নিদর্শন, প্রতীক এক যুগ্ম পদ্ধতির।

বুকে নিয়ে আছে দাক্ষিণাত্যের স্থপতির অগ্রগতির নিদর্শন, তার সৃষ্টি, অনবদ্য প্রতীক আহমেদনগর জেলার পেদগাঁও গ্রামের নিকটবর্তী লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির। ক্ষুদ্রতর এই মন্দিরটি, বিস্তৃত হয়ে আছে চুয়ান্ন ফুট দীর্ঘ আর পঁচিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, বুকে নিয়ে আছে অপর্যাপ্ত সুন্দরতম

মহামহিমময় মূর্তির সম্ভার। অনবদ্য, নিখুঁত তাদের গঠন সৌষ্ঠব, সুন্দরতম তাদের বিন্যাস, রূপ পরিগ্রহ করে মন্দির দাক্ষিণাত্যের আদর্শ ক্ষুদ্রায়তন মন্দিরের-হয় অপরূপ। বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের তার স্তম্ভের শ্রেণী, অঙ্গে নিয়ে আছে মহাসমৃদ্ধিশালী আভরণ, শোভিত হয়ে আছে পাত্র ও পল্লবের অলঙ্করণ দিয়েও। অঙ্গে নিয়ে নাই এই পাত্র ও পল্লবের প্রতীক পূর্ববর্তী দাক্ষিণাত্যের নাগর মন্দির, সম্ভবতঃ আনিত হয় এই প্রতীক সৌরাষ্ট্র (গুজরাট) থেকে, আনেন দাক্ষিণাত্যের ঋষি স্থপতি। ভূষিত করেন তাঁর মন্দির, সমৃদ্ধিশালী হয় মন্দির এই আভরণে, অপরূপ হয়। অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বুকে নিয়ে আছে তার স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহের প্রাচীর। রচিত হয় এই প্রাচীর চতুষ্কোণ ছিদ্রযুক্ত প্যানেল বা কপাটের খোব দিয়ে, বাড়ে আলো ও বাতাসের প্রবেশ কক্ষের ভিতরে, পূর্ববর্তী মন্দিরের তুলনায়। রচনা করেন চালুক্য স্থপতিও মহাসমৃদ্ধিশালী অলঙ্করণে অলঙ্কৃত সচ্ছিদ্র জটিল পর্দা, তাই খুব সম্ভব বুকে নিয়ে আছে এই বৈশিষ্ট্য তাঁদের প্রভাব।

নির্মিত হয় বহু নাগর মন্দির ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সারা দাক্ষিণাত্যে, অঙ্গে নিয়ে হেমাদপন্তী পদ্ধতি। নির্মিত হয় তারা হেমাদপন্তের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রচেষ্টায়, প্রধানমন্ত্রী তিনি দেবগিরির শেষ যাদব নৃপতি রামচন্দ্রদেবের, শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক মন্দির নির্মাণেরও। তাই পরিচিত এই মন্দিরগুলি হেমাদপন্তী মন্দির নামে। অধিরোহণ করেন দেবগিরির সিংহাসনে রামচন্দ্রদেব ১২৭২ খ্রীষ্টাব্দে। বুকে নিয়ে আছে হেমাদপন্তীর পরিকল্পিত মন্দিরগুলি ভারী অঙ্গ সৌষ্ঠব, তীক্ষ্ণ নয় তাদের অবয়বও, অপ্রচুর তাদের বহিরাঙ্গের মূর্তির সম্ভারও। যদিও ছড়িয়ে আছে এই মন্দিরগুলি সারা দাক্ষিণাত্যে, বুকে নিয়ে আছে তাদের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বেরার। অনুপ্রেরণা বর্জিত তাদের পরিকল্পনাও, বুকে নিয়ে আছে পতনের যুগের প্রতীক, পতন এক মহামহিমময় আদর্শ থেকে।

ট্রেন থেকে নেমে আমরা অম্বরনাথের মন্দিরের সামনে উপস্থিত হই। সুন্দরতম মন্দির সারা দাক্ষিণাত্যের, প্রাচীনতমও এই অম্বরনাথ, নির্মিত ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়িয়ে আছে অর্ধভগ্ন অবস্থায়, একটি দীর্ঘ, গভীর জলাশয়ের পাশে, প্রকৃতির এক নন্দনকাননে, বোম্বাই-এর থানা জেলায়। যখন সম্পূর্ণ

ছিল এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে ছিল মহাসুন্দরের প্রতীক, দাক্ষিণাত্যের মহা-অভিজ্ঞ স্থপতির চরমোৎকর্ষ দান—তাঁদের বহুশত বৎসরের সাধনার আর অগাধ স্বাধীনতার, বহুমুখী প্রতিভারও। পরিণত হয়ে ছিল দাক্ষিণাত্যের আদর্শ মন্দিরে, মহামহিমান্বিত হয়ে ছিল মন্দিরটি। বুকে নিয়ে নাই অন্য কোন নাগর মন্দির এমন সুরুচিপূর্ণ স্থাপত্যের অনুভূতি, অঙ্গে নিয়ে জটিলতম, পর্যাপ্ত অলঙ্করণের এমন সুষ্ঠু নিখুঁত সমাবেশ।

শৈব মন্দির এই অম্বরনাথ বিস্তৃত হয়ে আছে নব্বই ফুট দীর্ঘ ও পঁচাত্তর ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, পশ্চিম দিকে মুখ করে। অঙ্গে নিয়ে আছে মন্দিরটি একটি তেইশ ফুট বর্গ মণ্ডপ ও গর্ভগৃহ, আয়তন তার তের ফুট বর্গ। মণ্ডপের হর্ম্যতলের সাত ফুট নয় ইঞ্চি নিচে অবস্থিত এই গর্ভগৃহটি, যুক্ত হয় মণ্ডপের মেঝের সঙ্গে একটি সোপান দিয়ে, এক অসাধারণ বিন্যাস। দাঁড়িয়ে আছে মণ্ডপটি চারিটি মহাসমৃদ্ধিশালী অলঙ্করণে অলঙ্কৃত স্তম্ভের উপর, শীর্ষে নিয়ে কেন্দ্রস্থলে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজ, অনুরূপ সিনারের মন্দিরের। রচিত হয় মণ্ডপের তিন দিকে তিন তোরণ, প্রবেশ পথ মন্দিরের।

প্রথমে যুক্ত হয় কোণাকুণি ভাবে মন্দিরের দুইটি প্রধান অংশ, অক্ষের দুই পাশে, তারা যুক্ত হয় আভ্যন্তরিক কোণের সঙ্গে। রচিত হয় তার পর ঘন সন্নিবিষ্ট উল্লম্ব অধিক্ষেপন ও কুলুঙ্গির শ্রেণী অনুরূপ পোস্তার, অলঙ্কৃত হয় মন্দিরের অঙ্গ এই ঋজু পথের সারি দিয়ে, সৃষ্টি হয় আলোছায়ার সমাবেশও, বাড়ে মন্দিরের সজীবতা, গতিচঞ্চল হয়। রচিত হয় তারপর মন্দিরের অবশিষ্ট অংশ-অনুভূমিক কাণির ছাঁচ, শিখরের কৌণিক প্রস্তর, অবয়বের সংখ্যার কিছু বর্ধন ও গুণন, সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে মন্দির।

দেখি অলঙ্কৃত তার বহিরাঙ্গ, তার প্রতিটি প্রস্তরের অঙ্গ কত অলঙ্করণ আর শোভন গঠন, মহিমময়, জীবন্ত মূর্তির সম্ভার দিয়ে, মূর্তি কত দেবদেবীর, কত নর আর নারীরও। মূর্তি দিয়েই বর্ণিত হয় কত দৃশ্য আর কাহিনীও। অপর্যাপ্ত, সীমাহীন এই মূর্তির প্রাচুর্য, কিন্তু ব্যহত হয় না ভাস্করের উদ্দেশ্য, লাঘব হয় না মন্দিরের অলঙ্করণের মহিমত্বও এই ভূষণের অতিপ্রাচুর্যে-মহা-মহিমান্বিত, সুন্দরতম হয় মন্দির। দেখি ঘুরে ঘুরে তার সর্বাঙ্গের অলঙ্করণ আর মূর্তির সম্ভার, একটি প্রবেশ পথ দিয়ে মন্দিরের অভ্যন্তরে উপনীত হই।

বুকে নিয়ে আছে সভাগৃহের (মণ্ডপের) অষ্টকোণের প্রতিটি কোণ এক একটি সংলগ্ন স্তম্ভ। রচিত হয় চতুষ্কোণ বেদী তার কেন্দ্রস্থলে চারিটি স্তম্ভের সমষ্টি দিয়ে। দেখি অলঙ্কৃত হয় সুন্দরতম আর অপরূপ অলঙ্করণ ও মূর্তির সম্ভার দিয়ে ছাদের অঙ্গ, প্যানেলের আর অগভীর গম্বুজের গাত্রও। কিন্তু বুকে নিয়ে আছে মণ্ডপের স্তম্ভই ভাস্করের সীমাহীন দান, চরম অবদান মহা-অভিজ্ঞ ভাস্করের, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, অবিনশ্বর কীর্তি। অলঙ্কৃত করেন তাদের সর্ব নিম্নাংশ থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত, তাদের প্রতিটি অঙ্গ, কত জটিলতম অলঙ্করণ দিয়ে, ভূষিত করেন প্রচলিত প্রতীক আর মহামহিমময় মূর্তির সম্ভার দিয়েও। সুন্দরতম আর সুচারুতম তাদের মধ্যে কেন্দ্রস্থলের বেদীর চারিটি পৃথক স্তম্ভের অঙ্গের ভূষণ। রচিত হয় স্তম্ভের অঙ্গে কত চিত্রাবলী, কুলুঙ্গির ভিতরস্থ কত দেবতার মূর্তি, পাড়ের অঙ্গে কত নর ও নারীর মূর্তিও, ভজনালয়ের রূপ পরিগ্রহ করে প্রতিটি স্তম্ভের অঙ্গ, পরিণত হয় এক পূজার স্থানে। ভূষিত হয় প্রায় অনুরূপ অলঙ্করণে অষ্টকোণের সংলগ্ন স্তম্ভগুলির অঙ্গও। অভিনব হয় মন্দিরের স্তম্ভগুলির অঙ্গ এই অলঙ্করণের অতি প্রাচুর্যে আর সুষ্ঠু নিখুঁত, অনবদ্য সমাবেশে, মহামহিমান্বিত হয় মণ্ডপ, হয় অম্বরনাথের মন্দিরও। সমপর্যায়ে পড়ে এই স্তম্ভগুলি সৌরাষ্ট্রের গঠন পদ্ধতির, পড়ে আবু পর্বতের বিমল বশাহীর মন্দিরের স্তম্ভের গঠনে আর অঙ্গের অলঙ্করণে। খুব সম্ভব প্রভাবান্বিত হন দাক্ষিণাত্যের স্থপতি আর ভাস্কর সৌরাষ্ট্রের স্থপতি আর ভাস্কর কর্তৃক তাদের নির্মাণে। তথাপি বুকে নিয়ে আছে তারা দাক্ষিণাত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তার মৌলিকত্ব।

আমরা স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখি ভিতরের সুন্দরতম, মহামহিমময় অলঙ্করণ, দেখি তার প্যানেলের, গম্বুজের আর ছাদের অঙ্গের অলঙ্করণ। দেখি স্তম্ভের অঙ্গের ভূষণও, শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম সৃষ্টি তারা দাক্ষিণাত্যের মহাপারদর্শী ঋষি ভাস্করের, এক অবিনশ্বর, শাশ্বত কীর্তি এক মহাগৌরবময় যুগের। স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বোম্বাইতে গৃহে ফিরে আসি।

অষ্টম অধ্যায়

কামরূপ

(শতাব্দী ষোড়শ—অষ্টাদশ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

কামাখ্যা

কামাখ্যা দেবীর মন্দির

১৯৪৫ সাল, বোম্বাই থেকে বদলি হয়ে কলিকাতায় এসেছি—এপ্রিল মাস, নিদাঘ তপ্ত কলিকাতা, তার উপর শারীরিক নানা অসুস্থতা—মনে সুখ নাই, তিরোহিত অন্তরের শান্তিও। শেষে একদিন ডাক্তারও নিষিদ্ধ করেন কলিকাতায় অবস্থিতি, বলেন প্রয়োজন আশু শৈলবাসের—নইলে পুনরুদ্ধৃত হবে না হৃত স্বাস্থ্য।

বসে বসে ভাবছি কোথায় যাওয়া যায় দার্জিলিং-এ না সিমলাতে। এমন সময় শিলং যাওয়ার আমন্ত্রণ আসে পরমাত্মীয় কল্যাণীয় কালিদাসের কাছ থেকে। দু-পুরুষের অধিবাসী তারা শিলং-এর, বাস করে পিতার স্বোপার্জনে নির্মিত বৃহৎ গৃহে, পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী ও ভ্রাতৃ-বধূ পরিবৃত হয়ে, মহা আনন্দে আর শান্তিতে, বিলাসে আর বৈভবে। কিছুদিনের জন্য সে বোম্বাই প্রবাসী হয়, সেই সময়েই আমাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মে, পুনরুজ্জীবিত হয় অদর্শন জনিত আত্মীয়তার শিথিল বন্ধন, সুদৃঢ় হয়।

লেখে কালিদাস, স্থান মিলবে ভাল হোটেলে—বিদূরিত হবে প্রবাসবাসের অসুবিধা, লাঘব হবে কষ্ট তাদের সাহচর্যে ও পরিচর্যায়, সহজ ও সুন্দর হবে বাস। পত্রোত্তরে সম্মতি জানাই, লিখি শিলং-এ পৌঁছাবার দিন ও ক্ষণও। তারপর এক অপরাহ্ণে, জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে আর নিয়ে স্ত্রী ও কন্যা, শিয়ালদহ স্টেশনে উপনীত হয়ে, শিলং মেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরা অধিকার করে বসি। তখনও দ্বিধা বিভক্ত হন নাই জননী বঙ্গভূমি—পরভূমিতে পরিণত হন নাই আমার দেশমাতৃকা র‍্যাড্‌ক্লিফ সাহেবের লেখনীর এক নিষ্ঠুর আঘাতে।

এখন যেতে হয় শিয়ালদহ থেকে নর্থ বেঙ্গল, অথবা হাওড়া থেকে আপার ইণ্ডিয়া একস্‌প্রেসে চড়ে সাহেবগঞ্জ হয়ে সকরিগলি ঘাট। সেখান থেকে

ষ্টীমারে করে গঙ্গা পার হয়ে মণিহারী ঘাট। মণিহারী ঘাট থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের গাড়ীতে চড়ে, কাঠিহার হয়ে আমিন গাঁও। আমিন গাঁও থেকে ফেরিতে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে পাণ্ডু। দীর্ঘ ৬২৬ মাইল যেতে ৩৮ ঘণ্টা লাগে। কষ্টসাধ্য এই যাত্রা। দমদম এরোড্রোম থেকে প্লেনে চড়েও গৌহাটী যাওয়া যায়—৩১০ মাইল—মোটে দুই ঘণ্টায় যাওয়া যায়।

শিলং মেল ছাড়ে, ধীরে ধীরে অতিক্রম করে 'প্ল্যাটফর্ম,' অস্পষ্টতর হতে থাকে স্টেশনে আগত প্রিয় পুত্র পরিজনদের মুখ, শেষে অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে। ক্রমে বাড়ে ট্রেনের গতি, চলে বিদ্যুৎ গতিতে। আমরা অতিক্রম করি কত শস্য শ্যামল প্রান্তর দিগন্তে গিয়ে মেশে। পার হয়ে যাই কত স্রোতস্বিনী, কত খাল বিল, জলাভূমি, কত বন উপবন, অরণ্য পরিবৃত কত গ্রামও, কত খড়ের তৈরী কুটির, শোভা পায় তাদের প্রাঙ্গণে কত বিভিন্ন ফলে ভরতি বৃক্ষ। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি অট্টালিকাও দেখি। ট্রেন এসে থামে রাণাঘাটে। অ্যাটাচি খুলে একখানি গল্পের বই বার করে পাঠে নিমগ্ন হই।

চমক ভাঙে এক কর্কশ গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে। দেখি, ট্রেন সাঁড়ার সেতু অতিক্রম করে। বৃহত্তম রেল-সেতু ভারতের, দীর্ঘতমও, এক পরমাশ্চর্য দান ভারতে বৃটিশ যন্ত্রবিদের—অবিনশ্বর কীর্তি, প্রতীক এক মহিমময় নির্মাণ কুশলতার—বিস্তৃত হয়ে আছে এক মাইলেরও বেশী পরিধি নিয়ে। মথিত তার বুকের নিচে প্রমত্ত, রোষদীপ্ত, ক্রোধোন্মত্ত, গর্জিত পদ্মা, বুকে নিয়ে ধ্বংসের কত কীর্তি, বিক্ষুব্ধ পরাজয়ের গ্লানিতে। প্রকম্পিত সেই উন্মত্ত গর্জনে সেখানকার আকাশ বাতাস—চারিদিক। সাক্ষী হয়ে আছে সেতুটি কত মহৎ জীবনান্তেরও, জীবন অবসানের কত কর্মীর। বাতায়নে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি বহুবার দেখা এই সেতুটি। এক মহা বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয় সারা অন্তঃকরণ যত দেখি বিস্ময় বাড়ে তত। প্রণতি জানাই তার মহা অভিজ্ঞ নির্মাতাকে, জানাই তার স্রষ্টাকে, নিবেদন করি শ্রদ্ধার অঞ্জলি—ডালি উজাড় করে দিয়ে। সান্তাহার অতিক্রম করে, ট্রেন পার্বতীপুরে উপনীত হয়। তখন রাত্রির ঘন অন্ধকারে দিগন্ত অবলুপ্ত। যুক্ত ছিল পার্বতীপুর কাটিহারের সঙ্গে, সেখান থেকে সারা উত্তর বিহারের।

পরিসমাপ্তি হয় ব্রড্ গেজের, সুরু হয় মিটার গেজ; ট্রেন বদল করে, জিনিস-পত্র নিয়ে, ছোট লাইনের ট্রেনে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কামরায় উঠি। ট্রেন ছাড়ে। খাওয়া দাওয়া সেরে, জানালা দরজা ভাল করে, লক করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পরেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হই।

প্রত্যুষেই ঘুম ভাঙে। দেখি ট্রেন অতিক্রম করে দু-পাশের বন্ধুর জমি, বুকে নিয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কণ্টকগুচ্ছ আব লতা গুল্ম। দূরে দেখা যায় দিগ্বলয়ের অঙ্গে আঁকা শৈল মালা। আমিন গাঁও-এ এসে ট্রেন থামে—এইখানে এসেই পরিসমাপ্ত হয় তার যাত্রা। গাড়ী থেকে নেমে, কুলির মাথায় জিনিস-পত্র চাপিয়ে, আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকি। ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় জুড়িয়ে যায় আমাদের সর্বাঙ্গ—এক প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয় সারা অন্তঃকরণ। ব্রহ্মপুত্রের তীরে উপনীত হই। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি প্রকৃতির এক সুন্দরতম লীলাভূমি, এক অলোকসুন্দর পরিবেশ। সম্মুখে প্রবাহিত কলনাদ ব্রহ্মপুত্র, শ্রেষ্ঠ সম্পদ আসামের, শোনা যায় তাঁর অন্তরের ধ্বনি। এপারে, বামে, তাঁর বক্ষভেদ করে, উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছেন এক মহিমময় গিরিবর—ধ্যান মৌনী। ওপারে, যতদূর দৃষ্টি যায় দাঁড়িয়ে আছেন সারি সারি শৈলমালা—ঘন সবুজ তাঁদের অঙ্গের আভরণ, লাল তাঁদের শীর্ষদেশ উদয় ভানুর রক্তিম কিরণে, প্রদীপ্ত। ক্রমে সেই অরুণিমা বিস্তৃত হতে থাকে, রক্তিম হয় শৈলমালার অঙ্গ—রক্তবর্ণ ধারণ করে ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গায়িত বুক, দিগন্ত হয় লালে লাল। দেখি মূক হ'য়ে, দৃষ্টি প্রসারিত হয় সুদূরের পানে, স্পর্শ করতে চায় হৃদয় দেব-দিবাকরের রক্তিম চরণ—প্রণতি জানাতে চায়—কণ্ঠে উচ্চারিত হয় "জবাকুসুম সঙ্কাশং"। সম্বিৎ ফিরে আসে স্ত্রীর ডাকে। ধীরে ধীরে সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে, আমরা স্টীমারে উঠি, সম্মুখের ডেকে উপস্থিত হই।

দেখি, সজ্জিত ডেকের উপরের প্রতিটি টেবিল নানা খাদ্যসম্ভারে। আমরা তিনজন একটি টেবিল অধিকার করে বসি, চা ও কিছু খাবার খাই। তারপর বিস্মিত হয়ে দেখতে থাকি প্রকৃতির সেই অপরূপ রূপ। স্টীমার এসে লাগে অপর পারে, পাণ্ডুতে। স্টীমার থেকে নেমে, জিনিস-পত্র আবার কুলির মাথায় চাপিয়ে দিয়ে, আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে উপনীত হই। শিলং পর্যন্ত টিকিট করা ছিল, রেল কর্তৃপক্ষই বাসের আসনও ঠিক করে রেখেছিলেন। তাই

সহজ হয় আমাদের বাসে উঠে নিজেদের নির্দিষ্ট আসন অধিকার করে বসা। আরও অনেক যাত্রীও বসেন। অতিক্রম করতে হবে আটষট্টি মাইল, করেছি পঞ্চাশ মাইল দার্জিলিং ও সিমলা যেতে, দু'শ মাইল কাশ্মীর দর্শনে।

বাস নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়ে। সর্পিল গতিতে অগ্রসর হয়, স্পর্শ করে যায় শৈলমালার পাদদেশ। বঙ্কিম গতিতে অগ্রসর হয় একটি রেলের ছোট লাইনও সমান্তরালে, কখনও পাশাপাশি চলে, দূরে সরে গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে যায় কখনও অরণ্যের অন্তরালে, লুকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ বেরিয়ে চমক লাগায়, পাশে এসে দাঁড়ায় পাল্লা দেয় বাসের গতির সঙ্গে, শেষে অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে ঘন বনানীর গহনে। অতিক্রম করে যায় কত গভীর অরণ্যানী, কত নৃত্য চপল নির্ঝর, কত কলনাদিনী স্রোতস্বিনী, কত গিরিসঙ্কট, কত পর্বত কন্দর, কত শৈল শিখরও, উপনীত হয় ডিব্রুগড়ে, সেখান থেকে আসামের উচ্চ ভূমিতে। আমাদের বাসও, গৌহাটী শহর পেছনে ফেলে, বঙ্কিমগতিতে শিলং-এর রাস্তায় উপনীত হয়, অতিক্রম করে আসে কত সর্পিল পথ।

বাস অগ্রসর হতে থাকে, দ্রুত তার গতি, অতিক্রম করে দু'পাশের উঁচু-নিচু বন্ধুর প্রান্তর, দূরের শৈলমালার পাদদেশে গিয়ে মেশে, স্পর্শ করে চরণ, প্রণতি জানায়। জোড়াবাটের প্রথম দ্বার অতিক্রম করে, দ্বিতীয় দ্বার, নং-পোতে এসে বাস থামে। দেখি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে আমাদের অগ্রগামী সবগুলি ট্যাক্সি আর নিজস্ব মোটর। বিস্মিত হই দেখে। শুনি একমুখী এই পথ, দুর্গমও, উভয়মুখী নয় অন্য সকল পার্বত্য পথের মত। এই নংপো থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয় সমস্ত যানের গতি। তাই অপেক্ষা করতে হয় এখানে সমস্ত শিলংগামী যানের, যে পর্যন্ত গৌহাটীগামী সমস্ত যান শিলং থেকে এখানে না পৌঁছায়। তাই অপেক্ষা করতে হয় আমাদের, সমস্ত শিলংগামী যাত্রীরই প্রতীক্ষা করতে হয় গৌহাটীগামী সকল যানের আগমনের। প্রথমে, দ্রুতগামী ট্যাক্সি ও নিজস্ব মোটর উপর থেকে আসে, তাদের অনুগমন করে বাসগুলি, সমবেত হয় একে একে, গৌহাটী থেকেও আসে। সমাপ্ত হয় দুই দিকেরই আসা যাওয়া, উন্মুক্ত হয় সম্মুখের রুদ্ধ দ্বার, সুরু হয় ছাড়ার পালা। প্রথমে বাড়ীর মোটর ও ট্যাক্সি ছাড়ে, তাদের অনুসরণ করে মন্থরগতি বাস। অনুমতি পেয়ে আমাদের বাসও ছাড়ে।

সুরু হয় পর্বত আরোহণ, মন্থর গতিতে কখনও উপরে উঠে, কখনও নিচুতে নামে, দ্রুততর তার গতি। উপর থেকে দেখা যায় নিচের অতিক্রমিত সর্পিল পথ, কখনও সুস্পষ্ট শৈলমালার বুকে, অস্পষ্ট কখনও বৃক্ষের অন্তরালে। নিকটস্থ হয় কখনও দু-পাশের ঘন বনানী আর অরণ্য, কখনও সরে গিয়ে দূরে দাঁড়ায়, অঙ্কে নিয়ে বিস্তৃত সহস্র ফুট গভীর অনতি-ক্রমনীয় গহ্বর, হস্তে নিয়ে নিষেধের বাণী। দুর্গমতর হয় পথ, ভীতিপ্রদও, বাস মন্থরগতিতে অগ্রসর হতে থাকে অতি সাবধানে - নইলে নিমজ্জিত হবে বাস পর্বতের অতল গহ্বরে, বিচূর্ণিত হবে তার সর্বাঙ্গ, জীবনান্ত হবে সকল যাত্রীর, সমাধিস্থ হবে শৈল কন্দরে। এক অজানা আতঙ্কে কণ্টকিত হয় দেহ, মন অবসন্ন হয়।

দুর্গমতম হয় পথ, যত ঊর্ধ্বে ওঠে বাস, বিপদ সঙ্কুল হয়। আতঙ্কিত হয় আমাদের মন, কণ্টকিত হয় দেহ। পার হয়ে আসি কত স্রোতস্বিনীও, কানে ভেসে আসে তাদের অন্তরের ধ্বনি। বাস অগ্রসর হতে থাকে। দেখি, দক্ষিণে রাস্তার পাশে, গভীর অরণ্যের অঙ্কে, প্রবাহিতা এক কলনাদিনী, বুকে নিয়ে অসংখ্য ছোট বড় উপলখণ্ড। বামে যতদূর দৃষ্টি চলে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে কত মহীরুহ। রচিত হয় এক মহারণ্য, বাসস্থান কত হিংস্র পশুর, কত গণ্ডারের, হস্তীর, কত ব্যাঘ্রের আর চিতার, কত বন্য মহিষের, বাইসনের আর মৃগেরও। বাস করে এই সব অরণ্যের বৃক্ষের শাখায় কত ভয়াল অজাগর, কত বিভিন্ন নানা বর্ণের পক্ষিও। বাস যত অগ্রসর হতে থাকে, পশ্চাৎ অপসারণ করতে থাকে স্রোতস্বতী তত। প্রবাহিত হয় বাসের সমান্তরালে বহুদূর পর্যন্ত, প্রতিযোগিতা হয় বাসে আর প্রবাহিনীতে, শেষে হারিয়ে যায় গভীর অরণ্যের অন্তরালে, অন্তর্হিত হয়ে যায় একেবারে, দিগন্তে মিলিয়ে যায় তার অন্তরের ধ্বনিও। কোথাও সে কিশোরী, তন্বঙ্গী, অপরিণত, অপ্রশস্ত তার বক্ষ, ক্ষীণ তার কটিদেশ, মৃদুভাষিণী, সুহাসিনী সে। কোথাও পূর্ণ যৌবনা ; যৌবনপুষ্টা, পীনোন্নত চঞ্চলবক্ষা, মুখরিত তার কলহাস্যে আকাশ বাতাস, প্রকম্পিত চারিদিক। কিন্তু প্রমত্তা নয়, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পথের পাশের চন্দ্রভাগার মত।

আবার পর্বত আরোহণ সুরু হয়। দুর্গমতর হয় পথ, ঋজুতর হয়, হ্রস্বতর হয় প্রতিটি বাঁক, মন্থর হয় বাসের গতিও, তৃতীয় বা শেষ দ্বার মাওয়ালিতে

এসে উপনীত হয়। পার হয়ে আসে কত কলার গাছ, কত বাঁশের ঝাড়, কত পাইন কুঞ্জ, অতিক্রম করে আসে কত নৃত্যচপল নির্ঝরও—নেমে আসে তারা ঋজু শৈলমালার অঙ্গ বেয়ে, কলধ্বনিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে। দ্বার অতিক্রম করে, ডাকঘরের প্রাঙ্গণে এসে বাস থামে। পরিসমাপ্তি হয় যাত্রার। উপস্থিত কালিদাস সেখানে মোটর নিয়ে। বাস থেকে নেমে, তার মোটরে উঠে বসি। কিছুক্ষণ পরেই তাদের মূলকির গৃহে, 'প্রভাতী'তে পৌঁছাই।

আসামের রাজধানী, খাসী ও জয়ন্তীয়া জেলার যুক্ত সদর শিলং, দাঁড়িয়ে আছে খাসী ও জয়ন্তী শৈলমালার একেবারে কেন্দ্রস্থলে, সমুদ্র বক্ষ থেকে ৪৯০৮ ফুট উঁচুতে, বিস্তৃত হয়ে আছে ৪০৮ স্কোয়ার মাইল পরিধি নিয়ে। এর অধিবাসীর সংখ্যা ৫৩৭৫৬। মহাসুন্দরের লীলাভূমি শিলং, বুকে নিয়ে আছে কত নির্ঝর, কত জলপ্রপাত, বিভিন্ন তাদের আকৃতি, বিভিন্ন তাদের অঙ্গের স্ফীতিও, কত স্রোতস্বিনী। শোভা পায় কত পাইন কুঞ্জ, কত সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, কত প্রকৃতির নন্দন কানন।

প্রাগজ্যোতিষ বর্তমান আসাম, প্রাচীনতম যুগ থেকেই ভারতের পূর্বসীমান্ত প্রদেশ, বুকে নিয়ে আছে এক মহামিলনের ইতিহাস, মিলন বিভিন্ন জাতির, তাদের বিভিন্ন সংস্কৃতির আর কৃষ্টির। পরিণত হয় এক মহামিলন ক্ষেত্রে—মিলনক্ষেত্র আদিমতম গুহাবাসী কিরাতদের সঙ্গে চীন থেকে আগত অষ্ট্রীকদের, দ্রাবিড়দের, টিবেটো বর্মন ও বোরাদের। বিভক্ত বোরোরা আবার বিভিন্ন জাতিতে—চুতিয়া, কাচারি আর কচে, আসে এখানে আরও অনেক মানব-গোষ্ঠী, সঙ্গে আনে তাদের নিজস্ব সভ্যতা, আপন সংস্কৃতি, প্রতিফলিত হয় তার জন-জীবনে-তার রীতি নীতিতে।

আর্যরাও আসেন সঙ্গে নিয়ে তাঁদের উন্নততর সভ্যতা আর সংস্কৃতি, জানা যায় না কবে। মিথিলা থেকে বিজয় অভিযানে আসেন নরক বা নরকাসুর। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, তিনি জন্মগ্রহণ করেন ধরিত্রীর গর্ভে। পালন করেন তাঁকে বিদেহ নৃপতি রাজর্ষি জনক, কাত্যায়নী তাঁর ধাত্রীমাতা। তিনি উপনীত হন প্রাগজ্যোতিষপুরে বর্তমান গৌহাটীতে জলপথে, লৌহিত্যের বর্তমান ব্রহ্মপুত্রের বুকের উপর দিয়ে। বিষ্ণুও সঙ্গে আসেন। আদিমতম অধিবাসী কিরাতদের নৃপতি ঘটকাসুরকে পরাজিত করে তিনি অধিপতি হন সারা

প্রাগজ্যোতিষের, রাজ্যাভিষেক করেন তাঁকে স্বয়ং বিষ্ণু। দানবভূমি নামে পরিচিত ছিল এই দেশ—খ্যাতিলাভ করেছিল অসুরদের স্থান নামেও। দানব মহিরাঙ্গই আদি রাজা এই দেশের। রাজত্ব করেন তাঁর পরে একে একে হটকাসুর, সম্বাসুর, রত্নাসুর ও ঘটকাসুর। উল্লিখিত আছে বিষ্ণু পুরাণে, হরিবংশে, কালিকা পুরাণেও আছে। কামরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজধানী। ক্রমে পরিচিত হয় সমস্ত দেশটিই কামরূপ নামে। উল্লিখিত আছে যোগিনীতন্ত্রে, বিস্তৃত এই কামরূপ নেপালের কাঞ্চনগিরি থেকে ব্রহ্মপুত্র ও করোতোয়ার সংগমস্থল পর্যন্ত, করোতোয়া থেকে দিক্করবাসিনী পর্যন্ত। উত্তরে তার কঞ্জ পর্বত, দক্ষিণে লাক্ষা আর ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম, পশ্চিমে করোতোয়া, পূর্বে দিক্ষু। তাই সমস্ত ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা, ভূটান, রংপুর আর কোচবিহার তার সীমানার অন্তর্গত ছিল। বিভক্ত ছিল কামরূপ চারিটি পীঠেও—রত্ন, কাম, স্বর্ণ ও সৌমার পীঠে। উল্লিখিত আছে কামরূপের কথা মহাকবি কালিদাস রচিত রঘুবংশে মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয়ের বর্ণনায়। পরাজয় স্বীকার করেন তার অধিপতি রঘুর কাছে। উল্লিখিত আছে এলাহাবাদে প্রাপ্ত পঞ্চম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ, মগধ অধিপতি সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে, চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন স্যানের বিবরণেও আছে। ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই রাজ্য পরিদর্শন করেন, অতিথি হন কামরূপের শ্রেষ্ঠ রাজা ভাস্কর বর্মণের। বর্ণিত আছে জৈন ঐতিহাসিক হেমচন্দ্রের রচনাতে আছে আরও অনেক প্রাচীন গ্রন্থে।

দক্ষযজ্ঞে প্রিয়তমা সতীর দেহাবসানের পর, শোকার্ত দেবাদিদেব মহাদেব স্বর্গ পরিত্যাগ করে এসে এইখানে নিদারুণ শোকে নিমগ্ন হন, কাটান নিভৃতে, নির্জনে। বিঘ্ন হয় সৃষ্টির কাজে। শঙ্কিত হন দেবকুল, প্রেরিত হন কামদেব রতিপতি মদন। তিনি শিবের সামনে উপস্থিত হ'য়ে তাঁকে শোক পরিত্যাগ করতে বলেন, অনুরোধ করেন স্বর্গে ফিরে যেতে, মিনতি জানান। মহাক্রুদ্ধ হন মহাদেব, উন্মিলিত হয় তাঁর তৃতীয় নয়ন, নির্গত হয় বহ্নি, ভস্মীভূত হন তার তেজে কামদেব। অনুনয় করেন তখন কামদেব, কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করেন মহাদেবকে তাঁর রূপ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে। প্রসন্ন হন আশুতোষ, কামদেবও ফিরে পান তাঁর হৃতরূপ। কামরূপ নামে পরিচিত হয় এই স্থানটিও, পরিণত হয় মহাতীর্থে।

মহারাজ নরকাসুরই নির্মাণ করেন নীলাচল শৈলমালার শীর্ষদেশে একটি মন্দির, প্রতিষ্ঠিত হন সেই মন্দিরে যোনি দেবী কামাখ্যা, নিযুক্ত হন নিজে তাঁর সেবাইত। রাজকুল বিগ্রহে পরিণতা হন দেবী কামাখ্যা। শ্রেষ্ঠ তন্ত্রপীঠে পরিণত হয় কামাখ্যা দেবীর মন্দির, হয় কামরূপও। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ভগদত্ত অধিরোহণ করেন কামরূপের সিংহাসনে। তিনি কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে কৌরবপক্ষে যোগদান করেন, নিহত হন তৃতীয় পাণ্ডব বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে। তাঁর মৃত্যুর পর বজ্রদত্ত অলঙ্কৃত করেন কামরূপের সিংহাসন। রাজত্ব করেন একে একে এই বংশের, উনিশ জন নৃপতি দ্বিসহস্র বৎসর। সুধাই, শেষ রাজা এই বংশের, সুপর্ণাকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

তাঁকে পরাজিত করে পুষ্য বর্মণ অধিকার করেন কামরূপের সিংহাসন। প্রতিষ্ঠিত হয় বর্মণ বংশ কামরূপে। মগধ সম্রাট দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক এই পুষ্য বর্মণ, কেউ বলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্তের, রাজত্ব করেন চতুর্থ শতাব্দীতে। চতুর্থ শতাব্দীতেই একে একে রাজত্ব করেন তাঁর পুত্র সমুদ্র বর্মণ ও পৌত্র বল বর্মণ। সমুদ্রের মতই বিশাল সীমাহীন সমুদ্র বর্মণের কীর্তি। মহা পরাক্রমশালী তাঁর পুত্র বল বর্মণও, সমরে অপরাজেয়। সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন একে একে পঞ্চম শতাব্দীতে বল বর্মণের পুত্র কল্যাণ বর্মণ, তাঁর পুত্র গণপতি বর্মণ সর্ব গুণাধার, তাঁর পুত্র যজ্ঞ বিধিনাম আস্পদম, অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী মহেন্দ্র বর্মণ ও তাঁর পুত্র নারায়ণ বর্মণ, মহাঅভিজ্ঞ সমর বিদ্যায়, মহা পারদর্শী রাজনীতিতেও। অধিরোহণ করেন কামরূপের সিংহাসনে ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাঁর পুত্র মহাভূতি বর্মণ ভূতিবর্মণ নামেও পরিচিত। মহাপরাক্রম-শালী তিনিও অনুষ্ঠান করেন অশ্বমেধ যজ্ঞ। তাঁর পর, তাঁর পুত্র চন্দ্রমুখ বর্মণ ও তাঁর পুত্র স্থিত বর্মণ একে একে রাজত্ব করেন। প্রবল পরাক্রান্ত তাঁরাও, অনুষ্ঠিত হয় দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ। প্রবল পরাক্রান্ত স্থিত বর্মণও, উল্লিখিত আছে তাঁর বীরত্বের কাহিনী মহাকবি বাণভট্ট প্রণীত হর্ষচরিতে। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করেন মহাপরাক্রমশালী গুপ্ত সম্রাট মহাসেন গুপ্তের কাছে। গৌরবময় এই পরাজয়, আজও বুকে নিয়ে আছে তার স্মৃতি লৌহিত্যের বুক, মুখরিত তার দুই তীরের তটভূমি। তাঁর

পুত্র সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মণ অধিরোহণ করেন কামরূপের সিংহাসনে, পিতার মৃত্যুর পর, সপ্তম শতাব্দীতে। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নয় তাঁর রাজত্ব। মৃত্যু এসে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। শত্রু হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন তাঁর দুই নাবালক বীর পুত্র, বলরাম ও অচ্যুৎ বর্মণ। সিংহাসনে অধিরোহণ করেন তাঁদের পিতৃব্য ভাস্কর বর্মণ খুব সম্ভব, ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে, রাজত্ব করেন ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি তিনি এই বংশের, সুপণ্ডিত, পৃষ্ঠপোষক বিদ্যার আর বিদ্বানের। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি সমসাময়িক থানেশ্বরের অধিশ্বর হর্ষবর্ধন শীলাদিত্যের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন, হর্ষবর্ধনের ভ্রাতা প্রভাকরবর্ধন হন্তা, বঙ্গাধীশ প্রবল পরাক্রান্ত শশাঙ্কের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধাভিযান। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় ও কর্ণসুবর্ণ তাঁর অধিকারে আসে, অধীনস্থ হয় কামরূপ রাজ্যের। মৃত্যু হয় হর্ষবর্ধনের, বিস্তৃত হয় তাঁর প্রতিপত্তি—একছত্র আধিপত্য কামরূপের সারা পূর্ব ভারতে। ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন স্যান তাঁর রাজ্য পরিদর্শন করেন, লিপিবদ্ধ করেন তাঁর বিবরণীতে কামরূপের কাহিনী। বলেন, বিদ্বান এই ব্রাহ্মণ নৃপতি, পৃষ্ঠপোষক বিদ্বানের।

নিঃসন্তান ভাস্কর বর্মণ। ম্লেচ্ছ শালস্তম্ভ অধিকার করেন কামরূপের সিংহাসন, তাঁর মৃত্যুর পর, সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে। রাজত্ব করেন একে একে বিজয়, বিগ্রহস্তম্ভ নামেও পরিচিত, পালক, কুমার, বজ্রদত্ত, বল বর্মণ, প্রলম্ভ, হজ্র, বনমাল, জয়মল, পরিচিত বীরবাহু নামেও, ত্যাগসীমা দশম শতাব্দী পর্যন্ত। কীর্তিহীন তাঁরা।

জন্মায় না কোন সন্তান ত্যাগসীমার, শেষ নৃপতি এই বংশের, নরকের বংশধর, ভৌমবংশের ব্রহ্মপালকে প্রজারা তাঁদের রাজা মনোনীত করেন। দশম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজত্ব করেন এই বংশের, একে একে পরমেশ্বর পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ, রত্ন-পাল, ইন্দ্রপাল, গোপাল, হর্ষপাল, ধর্মপাল আর জয়পাল দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। মহাপরাক্রমশালী তাঁদের মধ্যে রত্নপাল তিনি দুর্গম, অনতিক্রম্য, দুর্জয়তে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, প্রতিরোধ করেন প্রবল পরাক্রান্ত চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের কামরূপ আক্রমণও। পরাজিত হন জয়পাল, শেষ নৃপতি এই বংশের, গৌড়েশ্বর রামপালের কাছে। অধিষ্ঠিত হন কামরূপের

সিংহাসনে তাঁর অনুগত তিঙ্গদেব। ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়েশ্বর তিঙ্গদেবকে সিংহাসনচ্যুত করে, নিজের মন্ত্রী বৈদ্যদেবকে কামরূপের সিংহাসনে বসান। পরাজিত ও নিহত হন তিঙ্গদেব বৈদ্যদেব ও তাঁর ভ্রাতা ভূদেবের হস্তে।

গৌড়েশ্বর কুমার পালের মৃত্যুর পর, বৈদ্যদেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন—হন কামরূপের স্বাধীন অধিপতি, মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক হন। প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণ বংশ কামরূপের সিংহাসনে। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নয় তাঁদের রাজত্ব। সিংহাসনে অধিরোহণ করেন একে একে রায়ারিদেব, ত্রৈলোক্য-সীমা নামেও পরিচিত, উদয়কর্ণ আর বল্লভদেব। প্রবল পরাক্রান্ত ত্রৈলোক্য-সীমা, তাঁর কাছে বঙ্গাধীশ বিজয়সেন পরাজিত হন। মহাপরাক্রমশালী বল্লভদেবও, পরাজিত ও ধ্বংসে পরিণত হন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে সসৈন্যে তুর্কী বখতিয়ার ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে। পরাক্রমশালী নৃপতি বিশ্বসুন্দরদেবও, প্রতিরোধ করেন কামরূপে সুলতান গিয়াসুদ্দিনের আক্রমণ ১১২৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তুঘ্রীল খাঁন আক্রমণ করেন কামরূপ। বিভক্ত হয় কামরূপ রাজ্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। ক্ষুণ্ণ হয় তার সংহতি, লাঘব হয় প্রতিপত্তি। সুবর্ণশ্রী ও দিসাং নদীর পূর্ব পারে চুতিয়া বংশের রাজারা রাজত্ব করেন, উৎপন্ন তারা বোরো আর শানের সংমিশ্রণে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ভূভাগ বোরোদের অধিকারে আসে। তাঁদের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পাড় কাচারিদের অধীনস্থ হয়। বিস্তৃত সেই রাজ্য নওগাঁও জেলার অর্ধাংশ পর্যন্ত। চুতিয়ার পশ্চিমে ভুঁইয়ারা। সর্ব পশ্চিম প্রান্ত কামরূপের রাজাদের অধিকারে আসে, বিস্তৃত তার পশ্চিম সীমা করোতোয়া নদীর বুক পর্যন্ত, পরিচিত এই রাজ্য কামতা রাজ্য নামে।

ব্রহ্মদেশ থেকে বিজয় অভিযানে আসেন দুর্ধর্ষ শান জাতির একটি শাখাও ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে। অবতীর্ণ হন ব্রহ্মপুত্রের মহাসমৃদ্ধিশালী শস্যশ্যামল উপত্যকায়, তার রঙ্গমঞ্চে, প্রধান অংশ গ্রহণ করেন তার ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত, দীর্ঘ ছয়শত বৎসর। বিজিত হয় ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার অধিবাসীরা, সুশাসিত হয়। সম্বোধিত হন বিজেতারা বিজিত কর্তৃক আহোম বা অতুলনীয় নামে। আহোম থেকেই আসাম বা অপরাজেয় নামে পরিচিত হয় সমস্ত দেশটিও। স্থাপিত হয় তাঁদের

রাজধানী শিবসাগর জেলার রংপুরে। পূর্ব দিকে বিস্তার করতে পারে না কামতা রাজ্যের প্রতাপে, কামরূপের পশ্চিমাংশে নিবদ্ধ থাকে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় খেমেরা প্রবল হন কামতায়, রাজত্ব করেন প্রবল প্রতাপে পঁচাত্তর বৎসর ধরে। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত হন তাঁদের শেষ নৃপতি নীলাম্বর বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন সাহের কাছে। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গল কচ বংশের বিশ্বসিংহ স্থাপন করেন একটি শক্তিশালী রাজ্য, রাজধানী স্থাপিত হয় কচবিহারে বর্তমান কোচবিহারে। প্রবল পরাক্রান্ত তাঁর পুত্র নরনারায়ণ, শ্রেষ্ঠ নৃপতি এই বংশের, উপনীত হয় কচ রাজ্য সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ শিখরে, হয় রাজ্যের প্রতিপত্তি আর ক্ষমতাও। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে ছেড়ে দিতে হয় তাঁকে সঙ্কোস নদীর পূর্বাংশের রাজ্যাধিকার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেবকে। দুই ভাগে বিভক্ত হয় কচ রাজ্য কচবিহারে আর কচহাজোতে—বিস্তৃত কচহাজো বর্তমান গোয়ালপাড়া আর কামরূপ জেলা নিয়ে। অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রশমিত হয় তাঁদের ক্ষমতা, লাঘব হয় প্রতিপত্তিও।

প্রবলতর হন আহোমরা পূর্বদিকে, প্রবলতম হন, বিস্তৃত হতে থাকে তাঁদের রাজত্ব পশ্চিম দিকে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে। প্রবলতর হন পশ্চিম দিকে বাংলার মুসলমান সুলতানরাও শেষে, ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমাংশ কচহাজো মুসলমানের অধিকারে আসে, আহোমরা পূর্বাংশ কচবিহার অধিকার করেন। ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের নৃপতি সুসেন গ্রহণ করেন হিন্দুধর্ম, রাজধর্মে পরিণত হয় হিন্দুধর্ম। হিন্দুসংস্কৃতি আর হিন্দুকৃষ্টি পরিণত হয় আহোমদের ধর্মে। তাঁরা মিশে যান অধিবাসীদের সঙ্গে—এক হয়ে যান ধর্মে, সংস্কৃতিতে আর কৃষ্টিতে। বিস্তৃত হয় তাঁদের রাজত্ব, তাঁদের প্রতাপ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর পশ্চিমে বারনদী থেকে, দক্ষিণ পশ্চিমে কালাঙ্গ পর্যন্ত। বারনদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয় মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্বসীমাও কচহাজো জয় করায়। অবশ্যম্ভাবী হয় মুঘলের সঙ্গে আহোমদের নিত্য বিরোধ আর সংঘাত। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলের কাছ থেকে তাঁরা গৌহাটী অধিকার করেন। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ আহোম দমনে প্রেরিত হন ঔরংজেবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মীরজুমলা। তিনি আহোমদের রাজধানী, গড়গ্রামে বা গড়গাঁওতে উপনীত হন। রাজধানী পরিত্যাগ করে পলায়ন করেন আহোম নৃপতি জয়ধ্বজ

পরাজিত হয়ে, বাধ্য হন মুঘলের সঙ্গে সন্ধি করতে, স্বীকৃত হন বাৎসরিক করদানে, প্রতিশ্রুতি দেন। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে, ২৩ এ মার্চ মৃত্যু বরণ করেন মুঘল সেনাপতি মীরজুম্‌লা, ক্ষণস্থায়ী হয় মুঘলের আসাম বিজয়ও।

১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে, তুংখুঙ্গীয়া বংশের স্বর্গদেব গদাধর সিংহ অধিকার করেন কামরূপের সিংহাসন। প্রতিষ্ঠিত হয় তুংখুঙ্গীয়া শাসন আসামে, অন্যতম শাখা তাঁরা আহোম রাজবংশের। প্রবর্তিত থাকে এই শাসন ১৬৭১ থেকে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, একশত পঁয়তাল্লিস বৎসর। তিনি কঠোর হস্তে বিদ্রোহ আর বিদ্রোহীদের দমন করেন। সফলতা লাভ করে তাঁর ধর্ম সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি দমনের প্রচেষ্টাও। অন্তরায় হন তিনি তাদের সমৃদ্ধির প্রাচুর্যেরও। রাজত্ব করেন একে একে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গদেব রুদ্র সিংহ, রুদ্র সিংহের চারি পুত্র—শিব সিংহ, প্রমত্ত সিংহ, রাজেশ্বর সিংহ, লক্ষ্মী সিংহ ও লক্ষ্মী সিংহের পুত্র গৌরীনাথ সিংহ ১৬৯৬ থেকে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মহাপরাক্রমশালী রুদ্র সিংহও, তাঁর অধীনতা স্বীকার করে কাছাড় ও জয়ন্তিয়া। স্রষ্টা প্রমত্ত সিংহ নির্মাণ করেন রুদ্রেশ্বরের মন্দির, প্রতিষ্ঠিত হন সেই মন্দিরে রুদ্রেশ্বরের বিগ্রহ, রুদ্রেশ্বর নামে পরিচিত হয় স্থানটিও। অপুত্রক গৌরীনাথ সিংহ, আহোম সিংহাসনে অধিরোহণ করেন একে একে গদাধর সিংহের দ্বিতীয় পুত্র লোচাই নামরূপিয়া রাজার পৌত্র কদম দীঘলের দুই পুত্র স্বর্গদেব কমলেশ্বর সিংহ ও চন্দ্রকান্ত সিংহ। যোরহাটে স্থানান্তরিত হয় রাজধানীও। তীব্রতর হয় বহুদিনের অন্তর্নিহিত ধূমায়মান বৈষ্ণব ও শাক্তের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ধর্ম-দ্বন্দ্ব রাজেশ্বর সিংহ ও তাঁর উত্তরাধিকারী লক্ষ্মী সিংহের রাজত্ব কালে, তীব্রতম হয় কমলেশ্বর সিংহের আমলে, বহুবিস্তৃত হয়, প্রজ্বলিত হয়, বিদ্রোহে রূপায়িত হয়। অসমর্থ চন্দ্রকান্ত সিংহ মেমোরিয়া মোহান্তের ও তাঁর পুত্রের নেতৃত্বে পরিচালিত মেমোরিয়া বিদ্রোহ দমনে অশক্ত দিহিং মোহান্তের বিদ্রোহ দমনে ও বাংলার বরকন্দাজদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে। সক্ষম হন না রাজ্যজোড়া অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা নিরসনেও। স্বাধীনতা ঘোষণা করেন স্থানীয় ক্ষুদ্র রাজারাও। বিফল হয় মহামন্ত্রী পুরন্দর বড়গোহেনের শান্তি ফিরিয়ে আনার সমস্ত প্রচেষ্টা। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি হরনাথ ফুকনের পুত্র বদন চন্দ্র কলিকাতায় পলায়ন করেন। সেখান থেকে ব্রহ্ম দেশে উপনীত হন। ফিরে

আসেন সঙ্গে নিয়ে আসেন এক বিপুল ব্রহ্ম সৈন্যবাহিনী। সর্বময় কর্তা হন রাজ্যের নিজে। নামে মাত্র রাজায় পরিণত হন চন্দ্রকান্ত সিংহ। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী তাঁর এই প্রতিপত্তি, নিহত হন তিনি খুবসম্ভব সুবেদার রূপ সিংহ কর্তৃক। চন্দ্রকান্তের পর, কামরূপের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন রাজ্যেশ্বর সিংহের প্রপৌত্রের পুত্র পুরন্দর সিংহ।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে আসাম ব্রহ্মদেশের অধিকারে আসে। প্রতিষ্ঠিত হন তার সিংহাসনে ব্রহ্মদেশের নির্বাচিত যোগেশ্বর সিংহ, তুংখুঙ্গীয়া বংশেরই রাজকুমার। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড়ের সমরাঙ্গনে ইংরাজের কাছে বর্মীরা পরাজয় বরণ করেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি হয় বর্মীদের সঙ্গে ইংরাজের খান্দাবুতে। আসাম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ হয়। অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিসমাপ্তি হয় দীর্ঘ ছয়শত বৎসরের আহোমদের শাসন আসামে—এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সমাপ্তি হয়, ইতিহাস এক প্রবল পরাক্রান্ত, এক দুর্ধর্ষ জাতির। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আসাম বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। দৃঢ় হয় মৈত্রীর বন্ধন, সংস্কৃতির আদান প্রদান বাংলায় ও আসামে, সমৃদ্ধিশালী হয় আসাম বাঙ্গালীর মনীষায়, তার সংস্কৃতির অবদানে-দৃঢ়তর হয় তাদের পরস্পরের সংস্কৃতির আদান প্রদানে, বহু বিস্তৃত হয়, যুক্ত হয় যখন আসাম পূর্ববঙ্গের সঙ্গে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে, স্থাপিত হয় তাদের যুক্ত রাজধানী ঢাকাতে। শিলং স্বাস্থ্য নিবাসে পরিণত হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আবার বাংলার সঙ্গে পৃথক হয় আসাম, শিলং-এ স্থাপিত হয় তার রাজধানী। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে আসাম, পরিণত হয় স্বাধীন রাষ্ট্রে।

প্রথমেই বিসপ ও বিডন জলপ্রপাত দেখ্‌তে যাই। সর্বশ্রেষ্ঠ জলপ্রপাত শিলং-এর, সর্বোত্তমও গৌহাটী রাজপথের নিকটে অবস্থিত। জলপ্রপাতে পরিণত হয় শিলং অধিত্যকার দুই প্রধান স্রোতস্বিনী উম্‌সিরপি আর উমখারা, নেমে আসে স্তরে স্তরে, দুই বিপরীত শৈল শিখর থেকে, ঘন সবুজ বুক বেয়ে, উপনীত হয় সহস্র ফুট গভীর অনতিক্রমনীয়, দুর্গম গিরিসঙ্কটে। আসে নৃত্য-চপল ভঙ্গীতে, সর্পিল গতিতে, মহামহিমময় মূর্তিতে আসে। যত নামে বর্ধিত হয় স্ফীতি, বাড়ে গর্জনও। শেষে পরিণত হয় একটি মাত্র ধারায়-এক কলনাদিনী, বেগবতী স্রোতস্বিনীতে রূপায়িত হয়—রূপ পরিগ্রহ করে উনিয়ামের।

বিসপ আর বিডন নামে খ্যাতি লাভ করে জলপ্রপাত দুইটি। বিডন থেকেই শিলং-এর বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। স্থাপিত হয় তার গিরি কন্দরে একটি জল বিদ্যুতের কারখানা। মুগ্ধ হয়ে দেখি প্রকৃতির এক সুন্দরতম লীলাভূমি—এক মহৎ দান। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে আমরা গিরিগহ্বরে উপনীত হই দেখতে দেখতে যাই দুই নির্ঝরের অপরূপ রূপ। একটি উপল খণ্ডের উপরে বসি—প্রসারিত হয় দৃষ্টি মিশে যায় তাদের গতির সঙ্গে, গতি অতিক্রম করে উপনীত হয় অসীমে—কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, "সীমার মধ্যে অসীম তুমি···তাই এত মধুর।" মহা সুন্দরকে বরণ করে, জলবিদ্যুৎ তৈরীর কারখানা দেখে ফিরে আসি গৃহে।

একদিন সেক্রেটারিয়েট, বিধানসভা ও রাজভবন দেখে "ওয়ার্ডস" হ্রদে উপনীত হই। অশ্বক্ষুরাকৃতি এই হ্রদটি দাঁড়িয়ে আছে রাজভবনের নিকটে, বুকে নিয়ে আছে একটি সেতু। তার দুইপাশে ঘন সবুজ বনানী, সৃষ্টি হয় এক নন্দন কানন, এক অলোকসুন্দর পরিবেশ। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি সমস্ত পরিবেশটি। দেখি সেতুর দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে, মাঝ সেতুতে দাঁড়িয়েও দেখি। নেমে গিয়ে সবুজ, কোমল তৃণে আচ্ছাদিত পাড়ে বসে থাকি কিছুক্ষণ। তারপর গৃহে ফিরে আসি। সুন্দর রাজভবনের সম্মুখের দৃশ্য আর পরিবেশটি অপরূপ।

একদিন এলিফ্যাণ্টা জলপ্রপাতটি দেখতে যাই। শহর থেকে সাত মাইল দূরে, চেরাপুঞ্জির রাজপথে অবস্থিত এই জলপ্রপাতটি দাঁড়িয়ে আছে প্রকৃতির এক নয়নাভিরাম পরিবেশে। ঘন সবুজ শৈলমালার বুক বেয়ে, সোপানাকারে নেমে আসে ক্রমবিস্তারমান প্রপাত, নৃত্যের ছন্দে,রূপ পরিগ্রহ করে হস্তীপৃষ্ঠের—পদতলে সৃষ্টি হয় এক বিস্তীর্ণ বিক্ষুব্ধ জলাশয় তাই পরিচিত এলিফ্যাণ্টা নামে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। নিকটস্থ ঊর্ধ্ব ও নিম্ন "ইলিসিয়াম" জলপ্রপাতও দেখে আসি।

একদিন বড়বাজার দেখে আসি। বৃহত্তম সাপ্তাহিক হাট শিলং-এর দেখি খাসি রমণীরাই অধিকার করে প্রধান স্থান এই বাজারে। তারাই বিক্রেতা-মোচাকৃতি বেতের তৈরী সুদৃশ্য ঝুড়ি ভরতি করে নিয়ে আসে পণ্যের সম্ভার, বহুদূরের গ্রাম থেকে আসে। আবার অধিকাংশ ক্রেতাও তারাই। মুখর হয় সারা বাজার তাদের কলহাস্যে।

দেখি একদিন শিলং পিক। উপনীত হই তার ৬৪৪৫ ফুট উচ্চ শিখরে, সর্বোচ্চ শিখর খাসি ও জয়ন্তিয়া শৈলমালার। নির্মেঘ আকাশ, রবিকরোজ্জ্বল দিগন্ত, দেখি, বহুদূরে দিগ্বলয়ের বুকে আঁকা দেবতাত্মা হিমালয়ের শুভ্র হিমরেখা। দেবতাত্মাকে প্রণাম জানিয়ে নিচে নেমে আসি।

একদিন স্মিতে গিয়ে নংক্রেম উৎসব দেখি। সজীব হয় আট-মাইল দূরবর্তী এই নগণ্য গ্রামটি প্রতি মে আর জুন মাসে, অনুষ্ঠিত হয় যখন নংক্রেম উৎসব। মুখর হয় তার প্রতিটি নর, তার প্রতিটি নারী ও তার প্রতিটি গ্রামবাসী, নৃত্যের ছন্দে প্রণতি জানায় তাদের দেবতাকে শস্যশ্যামল হয় যখন ধরণী। সজ্জিতা হন নারীরা বহুমূল্য বসনে আর অপর্যাপ্ত মূল্যবান ভূষণে, তাদের শিরে শোভা পায় রৌপ্য মুকুট। ধীর, সুষম, তাঁদের নৃত্যের ছন্দ। পরিপূর্ণ প্রাণের প্রাচুর্যে পুরুষরা, সজ্জিত হন সৈনিকের বেশে। উত্তোলিত অসি হস্তে, বীর দর্পে, নৃত্যের তালে তালে তাঁরা বেষ্টন করতে থাকেন যৌবনমদমত্তা পরমা-রূপবতী নৃত্যরতা যুবতীদের। যোগদান করেন এই উৎসবের অনুষ্ঠানে জমিদারের (সায়েমের) ভ্রাতুষ্পুত্রীও। তিনি শিরে পরিধান করেন স্বর্ণমুকুট তাঁর মস্তকের উপর বহুমূল্য চন্দ্রাতপ। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি নৃত্যোৎসব, মুক হয়ে যাই।

সুপ্রসিদ্ধ এখানকার গল্‌ফ কোর্ট, অধিকার করে মর্যাদায় দ্বিতীয় স্থান বিশ্বে, প্রসিদ্ধ পোলো খেলবার মাঠটিও। গল্‌ফ কোর্ট আর পোলো গ্রাউণ্ড দেখে, এক মাইল দূরবর্তী "স্প্রেড্ ইগল" জলপ্রপাতটি দেখতে যাই। প্রসারিতপক্ষ ঈগল্ পক্ষীর রূপ ধারণ করে এই জলপ্রপাতটি তাই পরিচিত স্প্রেড্ ঈগল্ প্রপাত নামে, স্থানীয় নাম উরকলিয়ার। অপরূপ পারিপার্শ্বিক আরণ্যিকে সমাবেশ, রূপ পরিগ্রহ করে নন্দন কাননের এই জলপ্রপাতটি, শ্রেষ্ঠ স্থান পিকনিকের (চড়িভাতির)ও। মুগ্ধ হয়ে দেখি।

দেখি আরও কত জলপ্রপাত। দেখি একে একে ১৯০ ফুট উঁচু "ক্রিপলিন্" আর ৮০ ফুট উচ্চ "গানার", মিশেছে গানারের জল বিসপের প্রপাতে। দেখি, হ্যাপিভ্যালি থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত "সুইটও", পরিচিত উৎটডেম বা ধূম্রপানি নামেও। অন্যতম সুন্দরতম জলপ্রপাত শিলং-এর, পতিত হয় তার জল, ৩২০ ফুট উঁচু শৈল শিখর থেকে, পর্বত কন্দরে, গভীর গর্জনে। বিস্মিত হয়ে দেখি, প্রণতি জানাই তার স্রষ্টি কর্তাকে।

দেখি, বোটানিক্যাল গার্ডেন। পরিক্রমা করি কত সকাল সন্ধ্যায় হ্রদের ধার দিয়ে, অতিক্রম করে যাই তার বিদ্যালয় ও কলেজগুলি-সেণ্টএড্‌মণ্ড, সেণ্ট মেরি. লেডি কীন আর সেণ্ট অ্যাণ্টনি। একদিন রামকৃষ্ণ আশ্রমে উপস্থিত হই, দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর পরিবেশে আশ্রমটি।

শিকারীর স্বর্গ আসাম, তার অরণ্যে অরণ্যে কত বিভিন্ন হিংস্র জন্তু, বৃক্ষ শাখায় কত জানা অজানা বিহঙ্গ তাই অতিবাহিত হয় শিকারে, গৌহাটী রোডের ধারে ধারে, শহর থেকে ২২ মাইল দূরে, দুইদিন। সঙ্গী হন ভ্রাতৃকুল সহ বঙ্কিম সঙ্গে যায় গোটা পাঁচেক বিভিন্ন আকৃতি ও শক্তির রাইফেল, কয়েকটি বন্দুক, অজস্র গোলাগুলি আর উপাদেয় খাদ্য সম্ভারে পরিপূর্ণ চারিটি বৃহদাকৃতি টিফিন ক্যারিয়ার। কিন্তু বিফল হয় আমাদের সকল প্রচেষ্টা, ব্যর্থ হয় শ্রম, শুধু হাতেই ফিরে আসতে হয়।

শেষে এক প্রত্যুষে, ৩১ মাইল দূরে অবস্থিত চেরাপুঞ্জি অভিমুখে রওনা হই। ৪৪৫৫ ফুট উঁচু চেরাপুঞ্জি, খাসী ও জয়ন্তিয়ার পূর্বতন সদর, বুকে নিয়ে আছে পৃথিবীর সর্বাধিক বারিপাতের কাহিনী ৯০১ ইঞ্চি। সারথি হন স্বয়ং বঙ্কিম, বাহন তার অতি প্রিয় চক্‌লেট রং-এর 'অষ্টিন' খানি। আট দশ মাইল অপেক্ষাকৃত সমতল রাস্তায় চলবার পর, একটি দ্বার অতিক্রম করে, আমরা চেরাপুঞ্জির রাস্তায় উপনীত হই। সুদুর্গম এই রাস্তা, অপ্রশস্তও, সর্পিল গতিতে অগ্রসর হয়। একপাশে সহস্র ফুট গভীর নয়নাভিরাম পর্বত কন্দর, অন্য পাশে ঋজু পাহাড়, আভরণ হীন। গহ্বরের অপর পারে, শৈলমালার সবুজ বুকে কত মহীরুহ, কত নৃত্যচপল নির্ঝর, কত বঙ্কিম জলপ্রপাত, অঙ্গে নিয়ে রূপালী রেখা, কানে ভেসে আসে তাদের অন্তরের ধ্বনি। মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকি। পরমুহূর্তেই, উঠে আসে গিরি সঙ্কট থেকে, এক ক্রমবিস্তারমান ঘন কুয়াশার আভরণ, বিদ্যুৎ গতিতে আসে, আচ্ছাদিত হয় তার অন্তরালে একে একে, পর্বত কন্দর, গিরিগাত্র, শৈলশিখর, অদৃশ্য হয় দিগন্ত, অন্তহিত হয়ে যায় একেবারে সম্মুখের পথও, বিলুপ্ত হয়ে যায়। এক ভীষণ আতঙ্কে আতঙ্কিত হয় সারা অন্তঃকরণ, বিচূর্ণ হয় বুঝি মোটর পাশের গিরিগাত্রের সংঘাতে, অথবা গড়িয়ে গিয়ে, সহস্র ফুট গভীর গিরি কন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করে—জীবনান্ত হয় সকলের। কিন্তু নির্ভীক বঙ্কিম, শ্রেষ্ঠ চালক, মহা অভিজ্ঞ সারথি, দৃঢ়

মুষ্টিতে স্টিয়ারিং ধারণ করে, সম্মুখ পানে চালিয়ে যায় রথ—হয় না কোন বিপদ। কেটে যায় কুজ্ঝটিকার অবগুণ্ঠনও অদৃশ্য হয়ে যায় গিরি সঙ্কটে। আবার দৃশ্যমান হয় পথ, উচ্ছসিত হাস্যে এগিয়ে আসে মহিমময় শৈলমালা, অঙ্কে নিয়ে অপরূপ সহস্র ফুট গভীর ঘন সবুজ গিরি কন্দর, প্রজ্জ্বোল হয় সারা প্রকৃতি দেব দিবাকরের কিরণে, দিগন্ত প্রদীপ্ত হয়। আমরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। পুনরাবৃত্তি হয় প্রকৃতির সঙ্গে কুয়াশার এই লুকোচুরি খেলা। শেষে আমরা নির্বিঘ্নেই চেরাপুঞ্জিতে পৌছাই, মুসামাই জলপ্রপাতের সামনে উপস্থিত হই।

ঘন কুয়াশার অন্তরালে অদৃশ্য তখন সারা মুসামাই, তাই ফিরে যেতে হয় না দেখেই। দেখি দূর থেকে দড়ির সেতুটি। উপর থেকে সিলেটের প্রান্তর দেখি, বিস্তৃত হয়ে আছে দিগন্তে। আবার ফিরে আসি মুসামাই-এর সামনে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, দর্শন মেলে মুসামাই-এর। দেখি, তার নিরাভরণ, সুপ্রশস্ত, আঠারশ' ফুট উচ্চ, ঋজু বক্ষে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন রূপালী রেখা, দেখি প্রেতাত্মা এক বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জলপ্রপাতের, ধ্বংসাবশেষ এক অতীত গৌরবের, প্রতীক ১০৯৭ সালের ভূমিকম্পের এক নিষ্ঠুরতম পরিণতির। ব্যথায় পরিপূর্ণ হয় সারা অন্তঃকরণ, তার স্রষ্টাকে প্রণাম নিবেদন করে, শিলং-এ ফিরে আসি।

দেখতে দেখতে অতিবাহিত হয় দেড়মাস, আমাদের শিলং-এর স্থিতির কাল, নিঃশেষ হয় তার আয়ু এক বহু বিস্তৃত রঙ্গীন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে, বহু বিচিত্রও, ঘনিয়ে আসে বিদায়ের দিন। অতি প্রত্যুষেই রওনা হতে হবে, তাই রাত্রির আহারের পরেই সুরু করে দেই বিদায়ের পালা। বিদায় নেই একে একে গৃহকর্তা খান মহাশয় ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে, সগৃহিনী বঙ্কিম ভায়ার কাছ থেকে, অকুলবাবু ও তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে, পটুর কাছ থেকেও নেই। ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দেই অশ্রুসজল হয় চোখ, এক বিয়োগ ব্যথায় পরিপূর্ণ হয় সারা অন্তঃকরণ। সারথি হবেন কালিদাস ভায়া, পথ প্রদর্শক হবেন কামাখ্যা দর্শনেরও। সবান্ধব তাঁর ভ্রাতা কামাখ্যা ভায়া সহযাত্রী হবেন, অনুগামী হবেন কামাখ্যা দর্শনের। অনিদ্রায় কেটে যায় বাকী রাতটুকু।

শেষ রাত্রিতে রুদ্ধদ্বারে কালিদাস ভায়ার মৃদু করাঘাত শুনে, দরজা খুলে

বার হয়ে আসি, সঙ্গে নিয়ে স্ত্রী ও কন্যা। সদর দরজা অতিক্রম করে বহিঃপ্রাঙ্গণে উপনীত হই। দেখি প্রস্তুত কালিদাসের নিজস্ব মোটরখানি। আমরা একে একে মোটরে উঠে বসি, উঠেন সবান্ধব কামাখ্যা ভায়াও, কালিদাস অধিকার করেন সারথির আসন। মোটর ছাড়ে। পিছনে তাকিয়ে দেখি সকলেই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন, সমবেত হয়েছেন বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী আর শিশু, নিঃশব্দ হস্ত সঞ্চালনে, অশ্রুসিক্ত নয়নে আমাদের বিদায় জানাচ্ছেন। অশ্রুসজল হয় আমাদের চোখও। দেখতে দেখতে মোটর রাজপথে উপনীত হয়—পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায় 'প্রভাতী', অন্তর্হিত হয় বিদায় ব্যথায় বিধুর, অশ্রুসিক্ত মুখগুলিও। বেলা দশটায় আমাদের মোটর মহাপবিত্র নীলাচলের পাদদেশে এসে থামে, অতিক্রম করে আসে শিলং-গৌহাটী রাজপথ। এই নীলাচলের শীর্ষদেশেই মন্দিরে বিরাজ করেন যোনি পীঠ কামাখ্যা দেবী।

দক্ষ যজ্ঞে, স্বামীর নিন্দা শ্রবণে, ব্যথিত ও অপমানিত হয়ে পিতার সম্মুখেই প্রাণবিসর্জন করেন শিবপ্রিয়া, প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, সতী। কৈলাসে বসে, কৈলাসপতি মহাদেব অবগত হন এই খবর। মহাক্রুদ্ধ হন মহাদেব, উন্মাদ হন শোকে, প্রমত্ত হন। অনুচরবৃন্দ সঙ্গে নিয়ে উপনীত হন দক্ষপুরীতে, যজ্ঞস্থলে। পণ্ড হয় দক্ষের যজ্ঞ শিবের তাণ্ডবে, ছাগমুণ্ডে পরিণত হয় তাঁর শিব-নিন্দা কলুষিত মস্তক। তারপর, প্রিয়ার মৃতদেহ নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে, সুরু করেন প্রলয় নাচন নটরাজ। ভয়ঙ্কর এই নৃত্য, ধ্বংস হয় বুঝি পৃথিবী, লুপ্ত হয় সৃষ্টি। আতঙ্কিত হন বিষ্ণু, অগ্রসর হন, হস্তে নিয়ে সুদর্শন-চক্র। একান্ন খণ্ডে খণ্ডিত হয় সতীর দেহ সুদর্শনের আঘাতে, নিক্ষিপ্ত হয় একান্ন স্থানে ধরিত্রীর বুকে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে। খ্যাতি লাভ করে এই সব পুণ্য স্থান একান্ন মহাপীঠে ; পরিণত হয় মহাতীর্থে।

অঙ্গে নিয়ে ছিলেন এই গিরিবর শিবের দেহের গঠন, তাই নিক্ষিপ্ত হয় তাঁর অঙ্গেই সতীর যোনি—নীলবর্ণ ধারণ করেন সারা গিরি, পরিচিত হন নীলাচল নামে, কামাখ্যা নামে খ্যাতিলাভ করেন দেবীও, কালিকা দেবী নামে, দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা। অভিসারিণী কামাখ্যা দেবাদিদেব মহাদেবের—তাঁর গোপন প্রণয়ের প্রতিদানের—চরম চরিতার্থের।

বিদেহ নৃপতি জনকপুত্র নরক কামরূপ জয় করে, নিযুক্ত হন দেবীর সেবাইত। মন্দির নির্মাণ করে, সেই মন্দিরে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। পূজিতা হন কামাখ্যা দেবী, রাজকুল বিগ্রহে পরিণতা হন। তাঁকে আর তাঁর বিভিন্ন রূপকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে আসামে ধর্মের সুদীর্ঘ ইতিহাস, ইতিহাস বহু শত যুগের। মৃত্যু হয় নরকের, মূর্ত হন দেবীও কামনার এক প্রকৃষ্টতম আধারে, পার্বতীতে পরিণত হন, রূপায়িত হন দেবাদিদেব মহাদেবের অভিন্ন, অচ্ছেদ্য প্রেমাস্পদাতে, এক অভিনব প্রতীকে—এক নতুন রূপ। সবশেষে রূপ পরিগ্রহ করেন এক অনন্ত যৌবনা, পরম রূপবতী কুমারীর, এক মূর্তিমতি কামনার। পূজিতা হন কামাখ্যা বিভিন্ন রূপেও, দুর্গা, কালী, তারা, কমলা, উমা আর চামুণ্ডা রূপে। শ্রেষ্ঠ তন্ত্রপীঠে পরিণত হয় সারা কামরূপ, হন কামাখ্যা দেবীও। শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল হয় শাক্ত ধর্মেরও। শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে শাক্ত ধর্মই সারা আসামে মধ্যযুগে।

গাড়ী থেকে নেমে, আমরা ধীরে ধীরে সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে, মন্দিরের সামনের প্রাঙ্গণে উপনীত হই। কষ্টসাধ্য এই আরোহণ, বিপদ-সঙ্কুলও। নবনির্মিত রাজপথ অতিক্রম করে, এখন মোটর মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌঁছায়। দূর হয় আরোহণের কষ্ট-সহজ ও সুন্দর হয়। দেখি, মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি ক্ষুদ্র শহর। পাণ্ডার নির্দেশে, আমরা প্রথমে একটি দ্বিতল গৃহের দ্বিতলে আশ্রয় নেই। তার পর স্নান করে, পবিত্র দেহ ও মন নিয়ে, মন্দিরের সম্মুখে উপনীত হই।

মহা পরাক্রমশালী কচ বংশের নৃপতি নরনারায়ণ, অলঙ্কৃত করেন তিনি কামতার সিংহাসন ১৫৪০ থেকে ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রবলপরাক্রান্ত তাঁর ভ্রাতা চিলারায়ও। উপনীত হয় তাঁদের বিজয় অভিযান আহোমদের দেশে, কাচারি রাজ্যে, মণিপুরে আর ত্রিপুরাতে, জয়ন্তিয়াতেও পৌঁছায়। উপনীত হয় কচ ক্ষমতা, কচ প্রতিপত্তি উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। বিস্তৃত হয় কচরাজ্যের সীমানা পশ্চিমে, করোতোয়া অতিক্রম করে তিরহুত পর্যন্ত, দক্ষিণ-পশ্চিমে, রংপুর ও ময়মনসিংহ জেলায়। পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব পার পর্যন্ত, দক্ষিণে সারা দক্ষিণকুল। বর্তমান গোহাটী শহর ও তার নিকটবর্তী স্থানসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল তাঁর রাজ্যের সীমানার। মহাসমৃদ্ধিশালীও হয় নৃপতির বিজয় অভিযান,

তিনি ভ্রাতা চিলারায়কে সঙ্গে নিয়ে উপনীত হন কামাখ্যায়, পুজা করেন দেবীকে। দেখেন ধ্বংসে পরিণত হয়েছে নরকের নির্মিত মন্দিরটি। তার পর, তিনি বাংলা আক্রমণ করেন, ফিরে আসেন পরাজয়ের গ্লানি শিরে বহন করে। বাংলার সুলতান সুলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় প্রতিআক্রমণ করেন তাঁর রাজ্য ধ্বংসে পরিণত হয় সমস্ত মন্দির—হয় হাজো আর কামাখ্যা দেবীর মন্দিরও কলুষিত হন মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আর দেবী ম্লেচ্ছের হস্তের স্পর্শে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী মুসলমান স্থিতি কচরাজ্যে। ফিরে যান তাঁরা বাংলায় উড়িষ্যার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে, কচদের প্রতিআক্রমণের আশঙ্কায় ভীত হয়েও। ঘটে এই ঘটনা ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে।

মুসলমানরা আসাম পরিত্যাগ করার অব্যবহিত পরেই, নৃপতি নরনারায়ণ নরকের তৈরী ভগ্ন মন্দিরটির পুনঃনির্মাণে নিযুক্ত হন। প্রেরিত হন সেনাপতি মেঘ মুকুন্দম কামাখ্যায়। তাঁর প্রচেষ্টাতেই পুনঃনির্মিত হয় মন্দিরটি, ছয় মাস লাগে। সমাপ্ত হয় মন্দির নির্মাণ, ভ্রাতা চিলারায়কে সঙ্গে নিয়ে, নৃপতি কামাখ্যায় উপনীত হন, নব নির্মিত মন্দিরে মহা আড়ম্বরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন কামাখ্যা দেবীও। এক লক্ষ পশু বলি দেওয়া হয় মায়ের সম্মুখে—অনুষ্ঠিত হয় হোমও। নিযুক্ত হন দেবীর সেবায় ও মন্দিরের পরিচর্যায় একশত চল্লিশটি পাইক বা সেবায়িত পরিবার—তাদের মধ্যে আছেন জ্যোতিষী, আছে নাট, ভাট, তাঁতী, মালী, কামার, কাহারু, ধোপা, ছুতোর, তেলী, স্যাকরা, ময়রা, মুচি, জেলে আর ঝাড়ুদার। দেবীকে দান করেন নৃপতি বহু স্থাবর সম্পত্তি, মাছ ধরবার স্থান, দেন কত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র; কত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র নির্মিত বাসন, ঘণ্টা আর শ্বেত চামরও দেন, সিংহাসনও দান করেন। নির্মিত হয় মন্দিরের অভ্যন্তরে তাঁর ও তাঁর ভ্রাতার মর্মর মূর্তি। উৎকীর্ণ হয় প্রস্তর ফলকের অঙ্গে: "মহাগৌরবময় কীর্তি নৃপতি মল্লদেবের (নরনারায়ণের), তিনি দয়ার অবতার, সীমাহীন তাঁর করুণা প্রজাবৃন্দের প্রতি। ধনুর্বিদ্যায় তিনি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সমান, দধীচি ও কর্ণের মত দাতা, সদগুণে সাগরের তুল্য। মহাঅভিজ্ঞ তিনি সর্বশাস্ত্রে, অনবদ্য তাঁর চরিত্র, কন্দর্পের মত রূপবান, ভক্ত পূজারী তিনি মহাদেবী কামাখ্যার।" "তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর শুক্লদেব (চিলারায়) দুর্গা দেবীর পূজার জন্যে, মহাপবিত্র নীলাচলের শীর্ষদেশে এই

মন্দিরটি নির্মাণ করেন, ১৪৮৭ শকে, অঙ্গে নিয়ে উজ্জ্বল প্রস্তর খণ্ড। তাঁর প্রিয়তম ভ্রাতা শুক্লদেবই বিশ্বজোড়া যাঁর খ্যাতি, অপরাজেয় যিনি বীর্যে, অতুলণীয় শৌর্যে, দানে কল্প তরু-দান করেন যিনি সর্বস্ব, সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত যিনি দেবীর, প্রস্তরের উপর প্রস্তর সাজিয়ে, ১৪৮৭ শকে, (১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মাণ করেন এই অতি সুন্দর, মহামহিমময় মন্দিরটি মহা পবিত্র নীলাচলের শৈল শিখরে।"

তাই নৃপতি নরনারায়ণের প্রিয় ভ্রাতা চিলারায় পুনঃ নির্মাণ করেন নরকের তৈরী ভগ্ন মন্দিরটি, তিনিই বর্তমান মন্দিরের প্রকৃত নির্মাতা—নরনারায়ণ শুধুই মহাদেবীর ভক্ত পূজারী।

প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মন্দিরের উন্মুক্ত দ্বারে উপনীত হই। অপরূপ এই দেবী মূর্তিটি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। তারপর, ভক্তিভরে পূজা করে, অন্ধকার সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে এক অন্ধকারতর প্রকোষ্ঠে পৌছাই। এই প্রকোষ্ঠের গহ্বরেই, রক্তবর্ণ সালুর অন্তরালে, নিভৃতে বিরাজ করেন মহাপবিত্র যোনি দেবী—সম্মুখে তাঁর এক চির প্রবাহমান নির্ঝর। নির্ঝরের জল স্পর্শ করে, যোনি মহাদেবীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি। পবিত্র কুণ্ডের জল স্পর্শ করে, আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকি সমস্ত মন্দিরটি। দেখি তার নির্মাণ পদ্ধতি, তার প্রাচীরের গাত্রের ও প্রবেশ পথের অলঙ্করণ, তার অঙ্গের মূর্তিসম্ভারও। দেখি, খোদিত প্রাচীরের গাত্রে দুইটি মিথুনের দৃশ্য। অনুপম সৃষ্টি তারা কামরূপের ভাস্করের, কিন্তু সমপর্যায়ে পড়ে না উড়িষ্যার মন্দিরের গাত্রের মিথুনের দৃশ্যের গঠনের সৌকুমার্যে। নিকৃষ্টতর সংস্করণ তারা খাজুরাহোর মন্দিরের অঙ্গের মিথুনের মূর্তির-প্রাণের প্রাচুর্যে আর অঙ্গের নিখুঁত গঠনে। দেখি মূর্তিদিয়েই বর্ণিত হয় রামায়ণের আর মহাভারতের কাহিনী, কাহিনী পুরাণের, কাহিনী তাদের সামাজিক জীবনেরও। দেব-দেবীর মূর্তি, মূর্তি বিদ্যাধরের আর যক্ষিনীর লাভ করে এক বিশিষ্ট স্থান আসামের মন্দির অলঙ্করণেও। ভূষিত হয় মন্দিরের অঙ্গ কত শোভন গঠন নর ও আয়তনয়না, পীনোন্নত বক্ষা, পরম রূপবতী নারী মূর্তি দিয়েও।

দেখি, পশ্চিমের প্রবেশ পথের অঙ্গে নিযুক্ত এক গৃহস্থ পূজায়। সন্তানকে স্তন দানে নিযুক্তা এক পরমা সুন্দরী নারীকেও দেখি। অপরূপ এই মূর্তিটি,

জীবন্ত, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কামরূপের ভাস্করের। দেখি, অপর একটি পাড়ের অঙ্গেও খোদিত একটি সুন্দরতম দৃশ্য—কমণ্ডলু উপুড় করে জল দান করেন এক পরমা রূপবতী নারী পূজারিণী একটি জন্তুর ব্যাদিত আননে। দেখি, নিযুক্ত শঙ্খবাদনে একটি নর, তাঁর শিরে শোভা পায় ইউনিসা, স্থাপিত সেই শঙ্খ তাঁর ওষ্ঠে, বিস্তৃত তাঁর গণ্ডদ্বয়। সমপর্যায়ে পড়ে এই দৃশ্যগুলি দেও পর্বতের অঙ্গের অলঙ্করণের-খোদিত দৃশ্যের-প্রসাধনে নিযুক্তা এক পরমা রূপবতী নারীর, পড়ে একটি পতিতা নারীকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় একটি নরের দৃশ্যের, প্রতিরোধ করে অপর এক নারী হস্তে নিয়ে নিষেধের বাণী ও আরও কয়েকটি দৃশ্যের। পশ্চিমের প্রবেশ পথের অঙ্গেই দেখি এক অপরূপ, বেণু গোপাল, মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। তাঁর শিরে শোভা পায় বহুমূল্য মুকুট—প্রদীপ্ত, কণ্ঠে মূল্যবান মুক্তার হার, জানু পর্যন্ত বিস্তৃত, অঙ্গে বহুমূল্য সূক্ষ্ম বসন, গ্রন্থি দিয়ে আবদ্ধ তার প্রান্তদেশ, নিযুক্ত তিনি দুই হস্তে ধৃত বংশী বাদনে। জীবন্ত তাঁর প্রতিটি অঙ্গ, বাঙ্ময়, মুখর, মহা অভিজ্ঞ ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে আর মনের অপরিসীম মাধুর্যে—তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এক অবিনশ্বর, শাশ্বত কীর্তি। সমপর্যায়ে পড়ে চরদোয়ারের মন্দিরের ভগ্নাবশেষে আবিষ্কৃত মুরলীধরের মূর্তির, দুই পাশে নিয়ে দুই পরমা সুন্দরী নারী। দেখি মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে বাহন মূষিকের পৃষ্ঠে নৃত্য করেন এক চতুর্ভুজ গণপতি গণেশ। অপরূপ এই মূর্তিটিও, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কামরূপের ভাস্করের।

অলঙ্কৃত ছিল নাকি এই কামাখ্যা দেবীর মন্দিরই একটি মধু বধের দৃশ্য দিয়ে, একটি ভীষণ দর্শনা চামুণ্ডার মূর্তি দিয়েও। প্রক্ষিপ্ত তাঁর দন্তের পাটি, দীর্ঘ তাঁর লোল জিহ্বা, উৎক্ষিপ্ত তাঁর কেশগুচ্ছ, কোটরগত অক্ষি তারকা, সঙ্কুচিত তাঁর উদর, তাঁর কণ্ঠে নর মুণ্ডের মালা। এক হস্তে তিনি ধরে আছেন একটি ত্রিশূল, অপর হস্তে নরকপাল, ভূষিত তাঁর সিংহাসনের অঙ্গ কত দানবের মূর্তি দিয়ে। এই দানবের স্কন্ধে আরোহণ করেই তিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেন, বিশ্ব পরিক্রমায় বার হন। নওগাঁওতেও আবিষ্কৃত হ'য়েছে একটি ভীষণ দর্শনা নারী চামুণ্ডা মূর্তি। ভীষণ দর্শনা, ভয়ঙ্করা চামুণ্ডার মূর্তি আর শাস্ত্রোনুমোদিত মহিষমর্দিনীর মূর্তিই অধিকার করে প্রধান স্থান শাক্ত মন্দিরের অঙ্গের অলঙ্করণে।

বাদ যায় না জন্তুব মূর্তিও আসামের মন্দিরের আভরণে। বুকে নিয়ে আছে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলেন, কে এন দীক্ষিত, কামাখ্যার মন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত ঘণ্টাকর্ণের মন্দিরের নিম্নতল। পরবর্তীকালে নির্মিত এই মন্দিরটি, কিন্তু বুকে নিয়ে আছে তার সর্বনিম্নতল, প্রাচীন মন্দিরের কয়েকটি ভগ্নাবশেষ, অঙ্গে নিয়ে মহাঅভিজ্ঞ কামরূপের ভাস্করের তৈরী অপরূপ পাড়ের মালা। অলঙ্কৃত তার নিম্নাংশ স্ক্রলের কাজ দিয়ে, ঊর্ধ্বাংশে শোভা পায় জন্তুর মূর্তি— জীবন্ত, বীর্যবান, তেজোদীপ্ত এই মূর্তিগুলি। অবশিষ্ট আছে তাদের মধ্যে শুধু চারিটি মূর্তি—একটি মহিষের, একটি মৃগের, একটি সিংহের ও একটি ব্যাঘ্রের। অতুলনীয় এই মূর্তিগুলি ভাস্করের হৃদয়ের ঐশ্বর্যে আর মনের মাধুরীতে। প্রতীক তারা তাঁদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, নিদর্শন অবিনশ্বর কীর্তির। অনবদ্য, জীবন্ত শৈব মন্দিরে দেবতার বাহন বৃষের মূর্তিগুলিও। ভূষিত হয় মন্দিরের অঙ্গ বিভিন্ন নক্সা আর লতাপল্লব দিয়েও, সম্পূর্ণ রূপ লাভ করে মন্দিরের অলঙ্করণ, মহিমময় হয়।

কামাখ্যা দেবীর মন্দির দেখে; আমরা ভুবনেশ্বরীর মন্দির দেখি। তারপর, একটি অপেক্ষাকৃত সমতল শৈল শিখরের উপরে গিয়ে বসি। দেখতে থাকি চারিদিকের নয়নাভিরাম দৃশ্য। দেখি গৌহাটী শহর (প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর) বুকে নিয়ে আছে কত লাল টাইলের ছাদ বিশিষ্ট গৃহ। তার একদিকে প্রবাহিত কলনাদ ব্রহ্মপুত্র, অপর দিকে ক্রমউর্ধ্বমান সারি সারি শৈলমালা, অঙ্গে নিয়ে ঘন সবুজ আভরণ, দিগন্তে গিয়ে মেশে। দেখি মুগ্ধ হয়ে। দেখি দূরে, ব্রহ্মপুত্রের তীরে, শৈলমালার পাদমূলে, একটি সুদৃশ্য নিভৃত বাঁধান ঘাট। ঘাটের সন্নিকটে পৃথক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মহীরুহ, মহিমময় মূর্তিতে। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন যুধিষ্ঠির, রক্ষক হন সেই অশ্বের তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন, ভ্রমণ করেন অশ্বের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষে। শুনি, ঐ বৃক্ষতলেই নাকি বিশ্রাম করেছিলেন তৃতীয় পাণ্ডব অশ্ব নিয়ে মণিপুর যাওয়ার পথে। এই মণিপুরেই তিনি উপনীত হন, নির্বাসিত হন যখন বহু বৎসর পূর্বে। মণিপুর-রাজ চিত্র বাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন। জন্ম গ্রহণ করেন চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তাঁর ঔরসে বভ্রুবাহন। অপুত্রক মাতামহের মৃত্যুর পর তিনিই অধিরোহণ করেন মণিপুরের সিংহাসনে। যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করে নিয়ে যান

বভ্রুবাহন। যুদ্ধ হয় পিতাপুত্রে। পরাজিত ও নিহত হয়ে, পিতা ধরিত্রির বুকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্যথিতা, শোকান্বিতা মাতা, মনস্থ করেন প্রায়োপবেশনে মৃত্যু বরণের। অবগত হন বিমাতা নাগ-কন্যা উলুপী। নাগলোক থেকে মৃতসঞ্জীবন মণি নিয়ে উপনীত হন। স্থাপন করেন বভ্রুবাহন পিতার বক্ষে সেই মণি। মণির স্পর্শে পুনর্জীবিত হন পিতা অর্জুন, বিমুক্ত হন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে, অন্যায় সমরে অপরাজেয়, মহাবীর, পিতামহ ভীষ্মের হত্যার মহা পাতক থেকেও। পুনর্জীবিত ও শাপমুক্ত হয়ে, তিনি অনুসরণ করেন যজ্ঞীয় অশ্বের। মাতা ও বিমাতাকে সঙ্গে নিয়ে, বভ্রুবাহনও অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হন।

শুনি ওর কাছেই, শহর থেকে চার মাইল দক্ষিণে বাস করতেন মহর্ষি বশিষ্ঠ, প্রকৃতির এক সুন্দরতম লীলা নিকেতনে, এক অলোকসুন্দর পরিবেশে, কলনাদিনী নৃত্যচপলা সন্ধ্যা, ললিতা আর কান্তার সমাবেশে। তাই বশিষ্ঠাশ্রম নামে খ্যাতিলাভ করে এই স্থানটি, মহাতীর্থে পরিণত হয়। দূরে, ব্রহ্মপুত্রের বুকে, ঘন সবুজ বনানীর অন্তরালে উমানন্দের মন্দিরটিও দেখি।

তারপর, পাণ্ডার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। আহারে বসে পাণ্ডাজি ও তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে আলাপ সুরু করি। সংগ্রহ করি বহু তথ্য ও তত্ত্ব কামাখ্যা দেবীর মন্দির সম্বন্ধে—দেবীর সম্বন্ধেও।

আবার সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে মহা পবিত্র নীলাচলের পাদদেশে আমাদের জন্য অপেক্ষায়মান মোটরে উঠে বসি। মোটর ছাড়ে। কিছুক্ষণ পরেই গৌহাটীর আদালতের বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে এসে থামে। মোটর থেকে নেমে আমরা একটি ক্ষুদ্র নৌকায় চড়ে, উমানন্দের মন্দির অভিমুখে রওনা হই। দাঁড়িয়ে আছে বিপরীত দিকে, মাঝ নদীতে, ময়ূর দ্বীপে মন্দিরটি, ঘন সবুজ অরণ্যানী পরিবেষ্টিত হয়ে এক অপরূপ সুন্দরতম পরিবেশে। বিরাজ করেন সেই মন্দিরে ভৈরব উমানন্দ, প্রিয়তম পতি উমার। আতঙ্কিত চিত্তে, কম্পিত বক্ষে আমরা অতিক্রম করি উদ্দাম, উত্তাল, ভীতিসঙ্কুল ব্রহ্মপুত্র সাক্ষী কত জীবনাবসানের। মন্দিরে উপস্থিত হয়ে দেবতাকে ভক্তিভরে পূজা দিয়ে ফিরে আসি তীরে—ফেলি স্বস্তির নিশ্বাস।

পাণ্ডুতে উপনীত হই, সেখান থেকে কলিকাতায়। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি। স্মৃতি মহাপবিত্র পুণ্যতীর্থ কামাখ্যার আর অনতিক্রমনীয় উমানন্দের. স্মৃতি সুন্দরের রানী শিলং, আর তার প্রতিটি সৌন্দর্যের প্রস্রবণের। স্মৃতি বৃদ্ধ খান দম্পতির—তাঁদের অপরিসীম স্নেহের, সীমাহীন আদর যত্নের। স্মৃতি বঙ্কিমাদি খাঁন ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ ও ভগ্নীদেরও—তাদের মধুর সাহচর্যের - তুলনাহীন প্রীতির আর অকুণ্ঠ সেবার। আজও অক্ষয় হয়ে আছে মনের মণিকোঠোয় হয় নাই ম্লান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাগর শিখরের ক্রমবিকাশ

মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, বাসস্থান দ্রাবিড় মনীষীর আর আর্য ঋষির। ধর্মপরায়ণ তার অধিবাসীরা, অভ্যস্থ আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে, মোক্ষলাভই তাদের একমাত্র কামনা। মহাঅভিজ্ঞ তার স্থপতি আর ভাস্করও নির্মাণ করেন যুগের পর যুগ কত মহিমময় স্তূপ, চৈত্য আর বিহার, কত মহামহিমময় মন্দিরও অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম অলঙ্করণ, সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার, কত মহিমময়, জীবন্ত মূর্তি সম্ভারও—মূর্তি কত দেবদেবীর দান তাঁদের যুক্ত প্রতিভার, যুক্ত ভাবধারার, সম্মিলিত সভ্যতার আর সংস্কৃতির।

মূর্তি ত্রিমূর্তির, সৃষ্টিকর্তা মহাধ্যানী ব্রহ্মার, রক্ষাকর্তা বিষ্ণুর, নীল তাঁর অঙ্গের বর্ণ আর ধ্বংসকর্তা কল্যাণরূপী শিবের—বিভিন্ন বিকাশ তাঁরা পরম ব্রহ্মের পৃথকরূপ তাঁরা একই পুরুষের, প্রতীক তাঁরা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের। মূর্তি বিষ্ণুর দশাবতারের, মূর্তি শিবের বিভিন্ন রূপেরও-মহাযোগী মহাদেবের, ভৈরবের, কাল ভৈরবের আর কপাল ভৈরবের—প্রতীক তাঁরা ধ্বংসের তাঁর তাণ্ডব নৃত্যের-অধিকর্তা তিনি বিশ্বের, আত্মা বিশ্ববাসীর, পরিণত হন তিনি বাস্তবে, নৃত্য করেন অপরূপ ছন্দে ডমরুর তালে তালে। মহারহস্যময় এই নৃত্য—বিকশিত হয় তাঁর সর্বাঙ্গে এক সীমাহীন আনন্দ, উপলব্ধি করেন তিনি সেই আনন্দ তাঁর সৃষ্টিতে, ধ্বংসে আর পুনঃসৃষ্টিতে। দর্শন করেন এই নৃত্য তাঁর প্রিয়তমা পত্নী পার্বতী—দেবতারাও দেখেন। বিষ্ণুর শঙ্খের মতই অনুকম্পনের প্রতীক এই ডমরুর ধ্বনি। মূর্তি তাঁদের বাহনের—হংস ব্রহ্মার বাহন, গড়ুর বিষ্ণুর, শিবের বাহন নন্দী (বৃষ)।

মূর্তি তাঁদের শক্তিরও - মূর্তি ব্রহ্মার শক্তি বিদ্যাদায়িনী রাজহংস বাহনে সরস্বতীর, বিষ্ণুর শক্তি মকর বাহনে ধনদাত্রী লক্ষ্মীর আর শিবের শক্তি কল্যাণময়ী পার্বতীর। মূর্তি ময়ুর বাহনে দেব সেনাপতি বীর্যের প্রতীক কার্তিকেয়র, মূষিক বাহনে মহাজ্ঞানী সিদ্ধিদাতা গণেশের, সপ্তাশ্বচালিত রথ

আরোহণে সূর্যনারায়ণের আর ঐরাবত আরোহণে দেবরাজ ইন্দ্রের। মূর্তি বিদ্যাধরের, গণের আর অপ্সরারও তাঁরা সকলেই অধিকার করেন তাঁদের নির্দিষ্ট স্থান মন্দির অলঙ্করণে।

মূর্তি কত বুদ্ধেরও—পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধের বীরোচনার, অক্ষভ্যের, রত্নসম্ভবের, অমিতাভের আর অমোঘ সিদ্ধের। বলেন মহাযান বৌদ্ধরা আদি বুদ্ধই সৃষ্টিকর্তা জগতের, তিনিই ঈশ্বর, প্রজ্ঞা জননী। সৃষ্টি করেন তাঁরা পাঁচ দেবতা ধ্যানী বুদ্ধের, বহুতে পরিণত হন। জন্ম দেন প্রতিটি ধ্যানী বুদ্ধ এক একটি ধ্যানী বোধিসত্ত্বকে। জন্ম গ্রহণ করেন সামন্তভদ্র, বজ্রপাণি, বৌদ্ধদের ইন্দ্র, হস্তে নিয়ে বজ্র, রত্নপাণি, পদ্মপাণি, পরিচিত অবলোকিতেশ্বর নামেও, তাঁদের বিষ্ণু—সৃষ্টি ও রক্ষাকর্তা আর বিশ্বপাণি—অধিকর্তা তাঁরা বিশ্বের তার ক্রমবিবর্তনেরও। শ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর।

স্মৃতির পূজারী হীনযান বৌদ্ধরা—নাই তাদের স্তূপে, চৈত্যে আর বিহারে দেবতা বুদ্ধের প্রতিমূর্তি, বোধিসত্ত্বদের মূর্তিও নাই, অঙ্গে নিয়ে আছে শুধু বুদ্ধের স্মৃতির প্রতীক।

মূর্তি চব্বিশ জন জৈন তীর্থঙ্করের—আদিনাথের, নেমিনাথের, পার্শ্বনাথের, মহাবীরের ও আরও অনেকের, সঙ্গে নিয়ে তাঁদের প্রতীক।

মূর্তি দিয়েই বর্ণিত হয় প্রাচীরের গাত্রে কত পৌরাণিক কাহিনী, কাহিনী রামায়ণের আর মহাভারতের, কত উপকথা। রচিত হয় তাদের আশা আকাঙ্খার চিত্র, চিত্র কত সমসাময়িক সামাজিক জীবনের ও প্রথার, মূর্ত হয় কাঠের, প্রস্তরের, ইষ্টকের আর শ্বেত পাথরের অঙ্গে যুগে যুগে। পরিণত হয় মন্দির, স্তূপ, চৈত্য আর বিহার এক বিস্তৃত, বিরাট ধর্মগ্রন্থে, এক ইতিহাসে—হয় যুগে যুগে, ইতিহাস ধর্মজীবনের, ইতিহাস সামাজিক রীতিনীতির, ইতিহাস তাদের সভ্যতার, সংস্কৃতির আর কৃষ্টির, তাদের আশা আকাঙ্খার, তাদের সুখ দুঃখেরও। অতিক্রম করে তারা বাস্তব, মহিমান্বিত হয় শিল্পীর সীমাহীন কল্পনায়, তাঁর হৃদয়ের অতুল ঐশ্বর্যে আর মনের অন্তহীন মাধুর্যে, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বের স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের দরবারে—বিশ্বজিৎ হয়। তাই অপরিসীম তাঁদের দান ভারতীয় স্থাপত্যে আর ভাস্কর্যে, মহাসমৃদ্ধিশালী হয় ভারত বুকে নিয়ে তাঁদের বহুশত বৎসরের

অমূল্য দান—কত মহা মহিমময় সৃষ্টি, কত সুন্দরতম অবিনশ্বর শ্রেষ্ঠ কীর্তি, হয় যুগের পর যুগ। ম্লান হয়ে যায় তাদের কাছে কীর্তি বিশ্বের অন্য সব জাতির, সৃষ্টি সর্বযুগের সভ্যতার, সংস্কৃতির আর কৃষ্টির—কীর্তি প্রাচীন অসুরদের, অ্যাসারিয়ার, বাবিরুষের সুমেরিয়ার, মিশরের, গ্রীসের, রোমের আর ইটালির, পরাজয় স্বীকার করে।

ধর্মই অধিকার করে প্রধান স্থান ভারতের মন্দির নির্মাণে, আধ্যাত্মিকতার সুষ্ঠু বিকাশই তার মুখ্য উদ্দেশ্য, অন্যতম সোপান তার ধর্মজ্ঞানের, তার মোক্ষ লাভেরও। তাই মূর্ত হয় তার অঙ্গে বৈদিক ঋষিদের মন্ত্রের প্রতিটি অক্ষর, সামগানের প্রতিটি কলি আর উপনিষদের প্রতিটি ছত্র, সাম্যের ও শান্তির বাণী দেবতা বুদ্ধেরও, অহিংসার বাণী।

রূপায়িত হয় প্রতিটি দেশের ও জাতির আদর্শ তাদের শিল্পে, তাদের স্থাপত্যে আর ভাস্কর্যে, মূর্ত হয়। তাই বিভিন্ন তাদের রূপ ও আদর্শ ভাষার বিভিন্নতায়।

প্রকৃতির পূজারী ইউরোপের শিল্পীরা, কিন্তু বাস্তব এই প্রকৃতি তাই সীমায়িত তাদের রূপদানও, সীমাবদ্ধ থাকে অনুকরণে, লাভ করে না শ্রেষ্ঠত্ব। বিভিন্ন কিন্তু ভারতের শিল্পীর প্রকৃতির রূপ। অনিত্য এই প্রকৃতি, অসার, মিথ্যা, নিত্য শুধু পরমব্রহ্ম। তাই প্রচেষ্টা তাঁর পূর্ব সাধক মিশরের শিল্পীর মত সনাতন, শাশ্বত, নিত্য, সর্বব্যাপী আর অসীমের রূপদানে, নিবদ্ধ থাকে না গ্রীক-শিল্পীর মত নিছক দৈহিক সৌন্দর্যেও। তাই পূজারী ভারতের শিল্পী আদর্শের, অতীন্দ্রিয়ের, রূপকের, প্রতীকের আর অতিলৌকিকের—একাধারে তিনি পুরোহিত ও কবি। সমপর্যায়ে পড়েন তিনি গথিক শিল্পীর সঙ্গে।

রূপদান করেন গথিক শিল্পী পূর্বের ভাবধারাকে, তার চেতনার মহিময়ত্বকে পশ্চিমের পরিবেশে। কিন্তু আবেগপূর্ণ এই গথিক শিল্পীর রূপায়ন, নিবদ্ধ থাকে শুধু মানবের দৈহিক সুখ-দুঃখের রূপদানে। ঊর্ধ্বে ওঠে ভারতের ঋষির কল্পনা, দেহ অতিক্রম করে উপনীত হয় এক অতিঅলৌকিকের রাজ্যে, এক অলৌকিক সৌন্দর্যের রূপায়নে, তাই প্রেরণাদাত্রী প্রকৃতির মতই স্বতঃস্ফূর্ত, জীবন্ত তাদের শিল্প, মহাঐশ্বর্যশালী কল্পনায়, বাঙ্ময়। কিন্তু গ্রীক শিল্পীর মত কামজ নয় এই ভারতীয় শিল্পীর প্রকৃতির পূজা। বিশ্বপ্রকৃতিরই এক

অনুপম প্রকাশ এই প্রকৃতি মহাসমৃদ্ধিশালী আধ্যাত্মিকতায়—লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন জগৎ সভায়।

পরিচিত হয় মন্দির, বিমান ও প্রাসাদ নামে ভারতের অধিকাংশ স্থানে, তার শীর্ষদেশের পিরামিডাকৃতি অথবা ক্রমশীর্ণায়মান অংশ শিখর বা চূড়া নামে খ্যাতিলাভ করে। আছে আরও নাম মন্দিরের, পরিচিত হয় মন্দির দেবগ্রহম, দেবাগার, দেবায়তন, দেবালয় আর দেউল নামেও। নির্মিত হয় বিমানের অভ্যন্তরে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠ, পরিচিত গর্ভগৃহ নামে, পূজিত হন সেখানে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অথবা দেবী, মন্দিরের বিগ্রহ। উপনীত হতে হয় সেই গর্ভগৃহে ভিতরের পূর্ব দিকের একটি প্রবেশ পথ দিয়ে।

নির্মিত হয় গর্ভগৃহের প্রবেশ পথের সম্মুখে একটি স্তম্ভযুক্ত কক্ষ বা মণ্ডপ, একটি চন্দ্রাতপ, সমবেত হন সেখানে মন্দিরে অধিষ্ঠিত বিগ্রহের ভক্তপূজারী, হন দর্শনার্থীও। বুকে নিয়ে আছে কয়েকটি আদিমন্দির পৃথক মণ্ডপ, পৃথকাকৃত হয়ে আছে মণ্ডপ আর গর্ভগৃহ একটি উন্মুক্ত স্থান দিয়ে। অঙ্গে নিয়ে আছে তার নিদর্শন মাদ্রাজের নিকটবর্তী মামাল্লাপুরমের "জলশয়ানে"র মন্দির আর কাঞ্চীপুরমের কৈলাশনাথের আদি মন্দিরটি, নির্মিত ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে।

অতিবাহিত হয় কিছুকাল, যুক্ত হয় দুইটি গৃহ—হয় গর্ভগৃহ আর মণ্ডপ। সাধিত হয় এই সংযোজন একটি অন্তর্বর্তী প্রকোষ্ঠ অথবা তোরণ দিয়ে, পরিচিত অন্তরালয় নামে। রচিত হয় একটি তোরণ বা অর্ধমণ্ডপ, উপনীত হয় মণ্ডপে। বাড়ে মন্দিরের আকার, নির্মিত হয় মহামণ্ডপও, বিস্তৃত এই মহামণ্ডপ মণ্ডপের প্রতিটি দিকে, সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে মন্দির। বুকে নিয়ে আছে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন খাজুরাহোর কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দির, নির্মিত দশম শতাব্দীতে। শীর্ষে নিয়ে আছে এই সব সম্পূর্ণ মন্দিরের প্রতিটি অংশ—অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ, মহামণ্ডপ, অন্তরালয় আর গর্ভগৃহ—পৃথক পিরামিডাকৃতি ছাদ। ঊর্ধ্বে ওঠে প্রতিটি ছাদ, নিয়মিত তাদের ক্রমোন্নয়ন, সুসামঞ্জস্যও। সুরু হয় সেই ক্রম-ঊর্ধ্ব গতির নিম্নতম অধমণ্ডপের ছাদ থেকে, পরিসমাপ্তি হয় উচ্চতম গর্ভগৃহের মহামহিমময় শিখরে।

কোথাও বেষ্টিত হয় সম্পূর্ণ মন্দিরটি একটি আয়তক্ষেত্রের ভিতরে অবিচ্ছিন্ন-

অন্তর্মুখী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের শ্রেণী দিয়ে। রচিত হয় প্রাচীর মন্দিরের, পৃথক হয় মন্দির পারিপার্শ্বিক থেকে, নিভৃত হয়। বুকে নিয়ে আছে কাঞ্চীপুরমের বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দির, নির্মিত ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে, অন্যতম প্রাচীনতম নিদর্শন এই যুক্তসমন্বয় পদ্ধতির। অঙ্গে নিয়ে আছে অধিকাংশ আদি মন্দিরই প্রদক্ষিণের পথ, বুকে নিয়ে বেষ্টিত অলিন্দ, বেষ্টন করে সেই অলিন্দ গর্ভগৃহের চতুর্দিক।

মন্দিরই ভারতবাসীর দেবতাদের বাসের স্থান। তাই গর্ভগৃহে মন্দিরের অধিষ্ঠিত বিগ্রহ ছাড়াও, অঙ্গে নিয়ে আছে মন্দির কত কুলুঙ্গী, কত নিভৃত স্থান, প্রাচীরের গাত্রে কত অগভীর খিলানযুক্ত প্রকোষ্ঠ, কত বেদীও বুকে নিয়ে পবিত্র দেবদেবীর মূর্তি। এক দেবালয়ে পরিণত হয় সারা মন্দিরের অঙ্গ, রূপ পরিগ্রহ করে দেবতার মিলন ক্ষেত্রের।

আসে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী, সুরু হয় ভারতে মন্দির নির্মাণের যুগ, সীমাহীন এই নির্মাণের সংখ্যা, অতুলনীয়। অনতিকালের মধ্যেই গড়ে ওঠে মহামহিমময় সুন্দরতম মন্দির ভারতের দিকে দিকে, অঙ্গে নিয়ে প্রস্তরের কাজ, নির্মিত হয় গুহা মন্দিরও জীবন্ত পাহাড়ের অঙ্গ কেটে-নির্মিত হয় অসংখ্য মন্দির। আসে এক ধর্মের অভ্যুত্থানের যুগ সারা ভারতে, আসে কর্মে নিষ্ঠা, এক সীমাহীন শক্তি ও প্রচেষ্টা, মন্দির নির্মাণের এক অন্তহীন প্রেরণা, প্রস্তর-শিল্পীতে পরিণত হয় প্রতিটি ভারতবাসী। অনুরূপ এই যুগ ইউরোপের মধ্যযুগের। শোভিত হয় মন্দিরের সমষ্টি দিয়ে ভারতের পল্লীর প্রতিটি গৃহের অঙ্গন, ভূষিত হয় প্রতিটি নগরের বুক এক বা একাধিক মহিমময় মন্দির দিয়ে, শীর্ষে নিয়ে সুউচ্চ মহামহিমময় শিখর, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম অলঙ্করণ আর মূর্তিসম্ভার, অলঙ্কৃত হয় সমষ্টিবদ্ধ মন্দির দিয়েও। আজও বুকে নিয়ে আছে তার নিদর্শন ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত-সারা ভারতের বুক। রচিত হয় এই সব সুন্দরতম সুমহান মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে কত মহিমময় প্রকৃষ্টতম গুহামন্দিরও অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে, হয় সুপ্রসিদ্ধ এলোরাতে, আর এলিফ্যাণ্টাতে। রচনা করেন হিন্দু আর জৈন স্থপতি নিবদ্ধ ছিল যা শুধু বৌদ্ধ স্থাপত্যে। এই মন্দিরের নির্মাণই পরিচায়ক ভারতের স্থপতির মন্দির নির্মাণ শৈলীর, প্রকৃত নির্ধারক তাঁদের দক্ষতারও।

বিভিন্ন নাগর শিখরের, সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য নাগর মন্দিরের, উৎপত্তি সম্বন্ধে মতও। কেউ বলেন উদ্ভূত এই চূড়া পূর্ব ও মধ্য ভারতের চূড়া অথবা গম্বুজ সমন্বিত কুটির থেকে, তৈরী হত এই কুটির সেখানে খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে। কেউ বলেন বৌদ্ধ স্তূপই ক্রমদীর্ঘায়মান হয়ে রূপ পরিগ্রহ করে নাগর শিখরের। মিশে যায় বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সঙ্গে, মেশে মহাপবিত্র বৌদ্ধ চৈত্যের প্রতীক নাগর শিখরের অঙ্গে, রূপায়িত হয় শিখরে। আবার কেউ বলেন পবিত্র রথের উঁচু ছাদই রূপ পরিগ্রহ করে শিখরের, এই রথে আরোহণ করেই নগর পরিক্রমা করেন মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতা উৎসবের সময়—যান শোভা-যাত্রায়।

এই নাগর শিখর বিস্তৃত হয়ে আছে কচ্ছে, গুজরাটে, কাথিয়াবাড়ে, গোয়ালিয়রে, মালবে, বাংলায়, উড়িষ্যায় ও দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশে। কিন্তু বুকে নিয়ে আছে তাদের শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম নিদর্শন, প্রতীক তাদের পূর্ণ পরিণতির উড়িষ্যা (কলিঙ্গ) আর বুন্দেলখণ্ড (জেজাকভুক্তি), শীর্ষে নিয়ে আছে জাভা, চণ্ডী ভীমা ও ইন্দোনেসিয়ার কয়েকটি মন্দিরও নাগর শিখর।

বক্রাকার গতিতে ধাপে ধাপে উর্ধ্বে ওঠে তাদের গর্ভগৃহের ছাদ, বা শিখর, রূপ ধারণ করে পুরাণে বর্ণিত শুক পাখীর নাসিকার। পরিচিত তারা রেখ শিখর নামেও। আছে উড়িষ্যার রেখ শিখরের প্রতিটি অংশের বিভিন্ন নাম। পরিচিত হয় ছাদ গন্দি নামে, উর্ধ্বাংশকে মস্তক বলা হয়, মস্তকের নিচের অংশকে বেঁকী ও খাপুরি বা কর্পূরী বলা হয়। প্রতীক তারা মনুষ্য-দেহের বিভিন্ন অংশের।

পিরামিডাকৃতি শিখরের মত সহজ নয় তাদের উৎপত্তি নিরূপণ, সম্ভব নয় তাদের ক্রমবির্বতনের ইতিহাস অবগত হওয়াও। মেলে তাদের পূর্বাভাস পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে, দেওঘরের দশাবতার আর ভিটাগাঁওয়ের মন্দিরে, নির্মিত হয় এই মন্দির দুইটিই ষষ্ঠ শতাব্দীতে, গুপ্ত যুগে। মেলে অজয়গড়ের নীলকান্ত মহাদেবের মন্দিরেও, তাদের এক শতাব্দী পরে নির্মিত হয়, সপ্তম শতাব্দীতে। প্রতীক তারা মধ্যযুগের শিখরের। শীর্ষে নিয়ে আছে এই শিখর আমলক। সমসাময়িক নীলকান্ত মন্দিরের শিখরের, শিরপুরের ইষ্টকের তৈরী লক্ষ্মণের মন্দিরটির শিখর, বুকে নিয়ে আছে তাদের উন্নততর সংস্করণ

রচিত হয় স্তম্ভমূলের উপর নিরাভরণ নিম্নতল, বা ভিত্তি তার উপরে উদ্গাত স্তম্ভযুক্ত প্রাচীর, প্রাচীরের শীর্ষদেশে ছাদ, বক্রাকারে উর্ধ্বে ওঠে তার শির। দুই সম্মুখ দেশে শোভা পায় ঋজু পগ। সুসম হয় তাদের সন্মুখের অনুভূমিক রেখা-গুলি। রচিত হয় উদ্গাত স্তম্ভের শ্রেণী চার কোণে, শোভিত হয় কেন্দ্রস্থলের গবাক্ষের দুইপাশ ক্ষুদ্রায়তন হর্ম্যরাজি দিয়ে। স্থাপিত হয় শিরদেশে আমলকও। দুই সম্মুখ ভাগের কেন্দ্রস্থলে রচিত হয় দীর্ঘ অঙ্গশিখরও, ক্ষুদ্র সংস্করণ মূল-শিখরের, সঙ্গে নিয়ে চৈত্য গবাক্ষ। অভিনব হয় শিখর, মহিমময় হয়।

নির্মিত হয় এই সময় থেকেই নাগর মন্দির, ঋজু হয়ে উর্ধ্বে ওঠে তাদের গর্ভগৃহের ছাদ ঈষদবক্র রেখায়, শিখরাকৃতি হয়ে। সঙ্গে নিয়ে কোথাও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, কোথাও বা ক্রমবিবর্তন। রূপায়িত হয় শিখর দুই প্রধান রূপেও। নির্মিত হয় প্রথমে শিখর, নাই তাদের অঙ্গে কোন অঙ্গশিখর। শোভিত হয় শিখরের অঙ্গ পরস্পর সংলগ্ন ভূমি দিয়ে। উন্নততর হয় শিখরের নির্মাণ, স্পষ্টতর হয় তাদের অঙ্গের ভূমিও। গ্রথিত হয় প্রতি কোণে ঋজু চৈত্য গবাক্ষ, তাদের ফাঁকে ফাঁকে আমলক, স্ফীত হয় শিখর, লুক্কায়িত হয় কোণকপগ সেই স্ফীতির অন্তরালে, স্পষ্টতর হয় সম্মুখ দেশের কেন্দ্রস্থলের রাহাপগ। শোভিত হয় ভিত্তির গাত্রও চৈত্য গবাক্ষ দিয়ে-গুপ্ত যুগের চৈত্যের (বৌদ্ধ ধর্মমন্দিরের) শ্রেষ্ঠ অলঙ্করণ এই গবাক্ষ, সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যও। বক্রাকার তাদের ছাদের বা শিখরের শীর্ষদেশ, রূপধারণ করে বন্দুকের গোলার। বুকে নিয়ে আছে তার নিদর্শন আইহোলের দুর্গা মন্দির আর পট্টদকলের জম্বুলিঙ্গের মন্দির, আছে ভুবনেশ্বরের শিশিরেশ্বরের মন্দিরও, তারাও সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত হয়।

ক্রমোন্নত হয় মন্দিরের নির্মাণ পদ্ধতি, রচিত হয় শীর্ষদেশে আমলক, কলস, উর্ধ্বে নিয়ে ক্রমউর্ধ্বমান স্তূপিকা। বুকে নিয়ে আছে তার প্রতীক পট্টদ-কলের গলগনাথের মন্দির, ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বরের মন্দির, নির্মিত ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে, বাংলার বরাকরের চতুর্থ বেগুনিয়া মন্দির আর খরোদের (বিলাসপুরের) ইষ্টকের তৈরী মন্দির। ক্রমে সুন্দরতর হয় তাদের অঙ্গের চৈত্যের গঠন, সুপরিকল্পিত হয়, মহিমময় হয় শিখরের রূপ; বুকে নিয়ে আছে তার নিদর্শন পট্টদকলের কাশীবিশ্বনাথের মন্দির, ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বরের মন্দির, ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে

নির্মিত. পট্টদকলের সুবৃহৎ শিবের মন্দির, ওশিয়ার সূর্য মন্দির, আলোয়ারের মহাদেব নীলকান্ত মন্দির, গোয়ালিয়রের গিরাসপুরের বজ্রমাতার মন্দির ও আরও অনেক মন্দির।

বাড়ে স্থপতির আর ভাস্করের অভিজ্ঞতা, সুন্দরতম হয় এই পদ্ধতিতে নির্মিত শিখর, মহামহিমময় হয়, অপরূপ হয়, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি। পরিণত হয় মহামহীরুহে ভুবনেশ্বরের, আইহোলের ও পট্টদকলের শিশু, অঙ্গে নিয়ে জালির অলঙ্করণ। ম্লান হয় তার অঙ্গের সূর্যের কিরণের প্রবেশ, নিবদ্ধ হয় দর্শকের দৃষ্টি শিখরের শীর্ষদেশে। বুকে নিয়ে আছে তার প্রতীক খাজুরাহোর আদিনাথের, বামনের ও চতুর্ভুজের মন্দির। আছে বরাকরের তিনটি বেগুনিয়া মন্দিরও।

সুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রমোন্নয়ন দশম শতাব্দী থেকে, অঙ্গে নিয়ে অঙ্গ-শিখর, পরিচিত উরুশৃঙ্গ নামেও। বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে নাগর শিখর। করে তিনটি বিশিষ্ট রূপ। প্রতীক হয়ে আছে তাদের একটির ভুবনেশ্বরের সুমহান লিঙ্গরাজের মন্দির, ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। অঙ্গে নিয়ে আছে তার শিখরের সম্মুখভাগ অঙ্গশিখর, বিস্তৃত সেই অঙ্গশিখর ভিত্তি থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত। সমপর্যায়ে পড়ে মৈত্রেশ্বর ও অনন্তবাসুদেবের মন্দির। উন্নততম সংস্করণ তারা সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত শিখরের, তাই সুন্দরতম, মহামহিমময়ও। পঞ্চান্ন মিটার ঊর্ধ্বে ওঠে লিঙ্গরাজের মন্দিরের উন্নত শিখর, মহামহিমময় মূর্তিতে অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম অলঙ্করণ, সর্বশ্রেষ্ঠ শিখর উড়িষ্যার, সর্বশ্রেষ্ঠ দান তার মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির আর ভাস্করের।

বুকে নিয়ে আছে দ্বিতীয় রূপের প্রতীক ঝোগদার মন্দির, বালসানের মন্দির, উদয়পুরের উদয়েশ্বরের মন্দির, সিনারের গণ্ডেশ্বরের মন্দির আর অম্বরনাথের মন্দির। নির্মিত দ্বাদশ শতাব্দীতে অঙ্গে নিয়ে আছে তারাও অঙ্গশিখর, ক্রুশাকৃতি তাদের আকার, নয় তত বক্রাকার।

তৃতীয় রূপ পরিগ্রহ করে এই নাগর শিখর, লাভ করে চরম উন্নতি, পূর্ণ পরিণতি, উন্নততম হয় তার রূপ, সুন্দরতম হয়, মহামহিমময় হয়, খাজুরাহোতে, গুজরাটে, কাথিয়াবাড়ে, ভুবনেশ্বরে আর কচ্ছে। শোভিত হয় তার দুই সম্মুখ ভাগের রাহাপগের অঙ্গ ক্ষুদ্রায়তন হর্ম্য দিয়ে। সুপরিকল্পিত, সুসন্নিবদ্ধ হয়

তার অঙ্গের অঙ্গশিখরও। সুরু হয় তাদের রচনা নবম শতাব্দী থেকেই। কিন্তু শোভন নয় আদি অঙ্গশিখরগুলি অঙ্গের গঠনে, নয় দীর্ঘ, পরিমিতও নয়। যুক্ত হয় তারা জালির অলঙ্করণের আর চৈত্য গবাক্ষের সঙ্গে। বুকে নিয়ে আছে তাদের নিদর্শন ভুবনেশ্বরের রাজারানীর মন্দির আর গুজরাটের নীলকান্ত মহাদেবের মন্দির।

ক্রমে লাভ করে তারা পূর্ণপরিণতি, সুসম, শোভনতম হয় তাদের অঙ্গের গঠন, মহামহিমময় হয় খাজুরাহোর চিত্রগুপ্ত, দেবীজগদম্বা, চতুর্ভুজ, দুলাদেব, বিশ্বনাথ আর কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দিরে, হয় কচের, ভদ্রেশ্বরের, নাসিকের সুন্দরনারায়ণের আর তরিঙ্গের জৈন মন্দিরেও। নির্মিত হয় এই মন্দিরগুলি একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে। রচিত হয় চারিটি করে মহান, সুষ্ঠু গঠন, সুচারু অঙ্গশিখর প্রতিটি রাহাপগের উপরে, অলঙ্কৃত হয় নিম্নাংশ ক্ষুদ্রতর উরুমঞ্জরী দিয়ে। মহাপবিত্র শৈলশিখরের রূপ পরিগ্রহ করে শিখর, করে মন্দিরও। মহামহিমময় হয় মন্দির, অপরূপ হয়। ক্রমে দীর্ঘতম হয় অঙ্গশিখর, রূপ ধারণ করে বৃহৎ পত্রের পলিতানার শত্রুঞ্জয়ের মন্দিরে।

পরিশিষ্ট

কলিঙ্গ (উড়িষ্যা)

জানা যায় না চেত বা চেদী বংশীয় নৃপতি খারবেলের মৃত্যুর পর থেকে চোড়-গঙ্গ বা গঙ্গা বংশের মহাবীর অনন্ত বর্মণ চোড় গঙ্গের অভ্যুত্থান পর্যন্ত উড়িষ্যার কোন সঠিক ইতিহাস। তাই নির্ভর করতে হয়েছে এই প্রাচীন ইতিহাস রচনায় M. M. Ganguly প্রণীত Orissa And Her Remains-Ancient And Mediaval নামক গ্রন্থের উপর। লেখেন মনীষী ফারগুসান, কেশরী বংশের যযাতি কেশরী রাজত্ব করেন উড়িষ্যায় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে, শ্রীগাঙ্গুলীর মতে তিনি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করেন। উল্লিখিত আছে শ্রীহরিগোপাল দাস প্রণীত "শ্রীভুবনেশ্বর ক্ষেত্র" নামক গ্রন্থে রাজত্ব করেন কর বংশের নৃপতিরা উড়িষ্যায় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে। আছে এই পুস্তকে কয়েকটি মন্দির নির্মাণের তারিখও। উল্লিখিত আছে ডঃ R. C. Majumdar প্রমুখ প্রণীত An Advanced History of India-তে উদারপন্থী ধর্মমতে উড়িষ্যার করেরা।

বিভিন্ন মনীষীদের মতও উড়িষ্যার মন্দিরের নির্মাণের সময়ের বিষয়-বিভিন্ন ফারগুসান, পার্শি ব্রাউন, বিভিন্ন শ্রীগাঙ্গুলীরও। তাই আমি অবলম্বন করেছি মনীষী ফারগুসান, পার্শি ব্রাউন, গাঙ্গুলী ও শ্রী দাসের মত এই গ্রন্থের রচনায়। সন্নিবদ্ধ হয়েছে আনুমানিক নির্মাণের কাল Percy Brown-এর Indian Architecture নামক গ্রন্থ অবলম্বনে, অবলম্বিত হয়েছে অবশিষ্ট অধ্যায়ের বেলায়ও। তিনি ভাগ করেন উড়িষ্যার মন্দিরগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে তাদের গঠনরূপ ও নির্মাণের তারিখ অনুসারে আদি ৭৫০—৯০০ খ্রীঃ, মধ্য ৯০০—১১০০ খ্রীঃ আর পরবর্তী ১১০০—১২৫০ খ্রীঃ, করেন শ্রেণীবিন্যাসও কুড়িটি মন্দিরের তাদের নির্মাণের তারিখ অনুযায়ী। লেখেন ফারগুসান নির্মিত হয় ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি সাধারণতঃ দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে।

উল্লিখিত আছে তাঁর প্রদত্ত উড়িষ্যার প্রধান মন্দিরগুলির ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ লক নির্মাণের তারিখের তালিকাতে :

	পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বরের উত্তর-পশ্চিমে।
	শিশিরেশ্বর।
৬৫০—৯৫০	কপালিনী।
	উত্তরেশ্বর।
	সোমেশ্বর, মুখলিঙ্গমতে।
	সারি দেউল।
	মুক্তেশ্বর, সিদ্ধেশ্বরের দক্ষিণে
	লিঙ্গরাজ, ত্রিভুবনেশ্বর, অথবা ভুবনেশ্বরের বৃহৎ মন্দির।
	কেদারেশ্বর, মুক্তেশ্বরের দক্ষিণে।
	সিদ্ধেশ্বর, মুক্তেশ্বরের পঞ্চাশ গজ উত্তরে।
৯০০—১০০০	ভগবতী।
	সোমেশ্বর, বৃহৎ মন্দিরের দুইশত পঞ্চাশ গজ উত্তরে।
	ব্রহ্মেশ্বর।
	মুখলিঙ্গেশ্বর।
	বিরজা ও বরাহনাথ, যাজপুরে।
	মার্কণ্ডেশ্বর, পুরীতে।
	নাকেশ্বর।
	ভাস্করেশ্বর।
একাদশ শতাব্দীতে	রাজারাণী, মুক্তেশ্বরের তিনশত গজ উত্তর-পূর্বে।
	চিত্রকরণী।
	কপিলেশ্বর।

	রামেশ্বর।
	যমেশ্বর।
দ্বাদশ শতাব্দীতে	মৈত্রেশ্বর।
	জগন্নাথের বৃহৎ মন্দির পুরীতে।
	মেঘেশ্বর।
	বাসুদেব, বিন্দুসাগর পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব তীরে।
	কোণারকের সূর্য মন্দির।
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে	লিঙ্গরাজ মন্দিরের নাটমণ্ডপ।
	মাদবের বিষ্ণুমন্দির, কটক জেলায়।
	গোপীনাথ রেমুন্‌নায়।

পরিভাষা

১ অলিন্দ	বারান্দা
২ অঙ্গশিখর	মূল শিখরের চারিপাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখর
৩ অন্তরালয়	গর্ভগৃহের সম্মুখের তোরণ বা প্রকোষ্ঠ।
৪ অপ্সরা	অমৃতলোকের অধিবাসী এই অপ্সরারা, স্বর্গের নর্তকী।
৫ অন্তর্ভিত্তি	। ভিতরের প্রাচীর।
৬ অধিষ্ঠান	। সমতল ছাদ, দাঁড়িয়ে আছে তার উপরে মন্দিরটি।
৭ অর্ধমণ্ডপ	। মণ্ডপের সম্মুখের তোরণ বা প্রকোষ্ঠ।
৮ আমলক	। নাগর মন্দিরের মুকুট এই আমলক, পরিচিত অমলশিল আর অমলসারক নামেও, শীর্ষে নিয়ে আছে চূড়া আর কলস। মুকুট নাগর মূল শিখরের বা মূলমঞ্জরীর, মুকুট তার অঙ্গের প্রতিটি মঞ্জরীর বা শৃঙ্গেরও। সূক্ষ্মাগ্রতার ধার। প্রতীক এই আমলক অমৃতলোকের, স্বর্গের সোপানেরও।
৯ উরুমঞ্জরী ১০ উরুশৃঙ্গ	অঙ্গশিখর।
১১ কীর্তিমুখ	অন্যতম প্রাচীনতম অলঙ্করণ মন্দিরের, পরিচিত সিংহমুখ নামেও।
১২ খপুরি	শিখরের উর্ধ্বাংশের অংশ।
১৩ গণ	অর্ধদেবতা, শিবের অনুচর এই গণেরা।
১৪ গন্ধর্ব	শূন্যের অধিবাসী এই গন্ধর্বরা, প্রস্তুত করেন দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য স্বর্গীয় সোমরস। অভিজ্ঞ

ঔষধ প্রস্তুতিতে, সঙ্গীতেও।

১৫ চৈত্য	। বৌদ্ধ ধর্মমন্দির।
১৬ চৈত্য গবাক্ষ	। গবাখ্যাকৃতি শৈল্পিক প্রতীক।
১৭ চন্দ্রশিলা	। গর্ভগৃহের অথবা মন্দিরের সম্মুখের অর্ধবৃত্তাকার সোপান।
১৮ ছজ্জা	। ঝুলন্ত ছাদের কিনারা অথবা কার্নিস।
১৯ জঙ্ঘা	। মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরের অংশ।
২০ নাগর	। বিশিষ্ট পদ্ধতির মন্দির।
২১ নিরন্ধার প্রাসাদ	। নাই এই প্রাসাদে গর্ভগৃহের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণের পথ।
২২ পঞ্চায়ত্ন মন্দির পঞ্চরত্ন "	। দাঁড়িয়ে থাকে একই অধিষ্ঠানে পাঁচটি মন্দির-মূল মন্দির ও চারিকোণে চারিটি সহকারী মন্দির।
২২ক পীঢ়	। পীঢ়া।
২৩ প্রাসাদ	। মন্দির।
২৪ বন্ধন	। জঙ্ঘার মূর্তিসম্ভারের সারির অন্তর্বর্তী অনুভূমিক ছাঁচ।
২৫ বিদ্যাধর	। উড়ন্ত দেবতা এই বিদ্যাধরেরা, বাস করেন শূন্য ও ধরিত্রীর মাঝখানে।
২৬ বেঁকী	। কণ্ঠ, শিখরের অংশ।
২৭ বেশর	। এক প্রকারের মন্দির।
২৮ ভূমি	। কৃত্রিম তল অথবা পংক্তি বা সারি।
২৯ ভদ্র	। সমতল উপরি ভাগ অথবা চূড়ার বা শিখরের পার্শ্বদেশ।
৩০ মহামণ্ডপ	। গর্ভগৃহের সম্মুখের সুবৃহৎ সভাগৃহ।
৩১ মণ্ডপ	। অর্ধমণ্ডপের পরের সভাগৃহ।
৩২ মকর তোরণ	। অঙ্গে নিয়ে আছে এই তোরণ মকরের অলঙ্করণ।

৩৩ মিথুন	। প্রণয়ী যুগল।
৩৪ মূলমঞ্জরী	। প্রধান শিখর।
৩৫ যক্ষ	। অমৃতলোকের অধিবাসী, ধন দেবতা কুবেরের অনুচর।
৩৬ যক্ষিণী	। যক্ষের স্ত্রী।
৩৭ রেখা শিখর	। শুকনাসা শিখর।
৩৮ শালভঞ্জিকা	। নারী, পার্শ্বে নিয়ে বৃক্ষ।
৩৯ শিখর	। চূড়া।
৪০ শিল্পশাস্ত্র	। পুস্তক, বিধিবদ্ধ হয় তাতে শিল্প, কারুশিল্প ও স্থাপত্য সম্বন্ধে আইন বা বিধি।
৪১ শুকনাশা শিখর	। শুকপাখীর নাসিকাকৃতি শিখর।
৪২ শুকনাশা	। মন্দিরের বহিঃঅঙ্গের অংশ।
৪২ক শৃঙ্গ	। শিখরের চতুর্থাংশ, শিখরাকৃতিতে মূল শিখরের সঙ্গে সংযুক্ত।
৪৩ সান্ধার প্রাসাদ	। বুকে নিয়ে আছে এই প্রাসাদ প্রদক্ষিণের পথ, বেষ্টন করে সেই পথ গর্ভগৃহ, অধিষ্ঠিত সেখানে দেবতা।
৪৪ সূত্রধার	। বিধি
৪৫ স্তূপিকা অথবা	। গম্বুজাকৃতি শিখরের মুকুট।
৪৬ সুরসুন্দরী	। দেবলোকের অধিবাসী এই সুরসুন্দরী, পরম-রূপবতীও, পরিচারিকা তাঁরা প্রধান দেবতাদের।

গ্রন্থপঞ্জী

যে যে পুস্তক থেকে সাহায্য পেয়েছি তাদের ও তাদের রচয়িতার নাম

	রচয়িতার নাম	পুস্তকের নাম
১	Fergusson, J.	History of Indian & Eastern Architecture Vol I & II.
২	Percy Brown	Indian Architecture Vol I
৩	Kramrisch, Stella	The Art of India, Through The Ages.
	”	The Hindu Temple.
৪	Ganguly, M. M.	Orissa & Her Remains—Ancient & Mediaeval.
৫	Mitra, Rajendralal	Antiquities of Orissa.
৬	Coomaraswamy, A. K.	History of Indian & Indonesian Art.
		Marg (December 1958 Vol XII)
৮	Green, E. W.	An Atlas of Indian History.
৯		The Illustrated Weekly of India July 16, 1961.
১০		Do Jan. 20, 1963.
১১		Do Special Divali Issue. Oct. 28, 1962.
১২		Do Homage to Varanasi (1) Feb. 9, 1964.
১৩		Do Homage to Varanasi (2) Feb. 16, 1964.

	রচয়িতার নাম	পুস্তকের নাম
১৪	Havell, E B.	The Ancient and Mediaeval Architecture of India. London, 1915.
১৫	,,	A Handbook of Indian Art. London, 1920.
১৬	,,	The Ideals of Indian Art. London, 1920.
১৭	,,	Indian Architecture. London, 1913.
১৮	Marshall, Sir John.	Annual Reports of the Archaeological Survey of India, 1902-3 to 1930. Calcutta.
১৯	Smith, V. A.	A History of Fine Art in India and Ceylon. Oxford, 1911.
২০	Barua, B. K.	A Cultural History of Assam, (Early Period) Vol I.
২১	Barua, Srinath	Buranji or A chronicle of The Tung Khungia Kings of Assam
২২	The Tourist Division Ministry of T & C. New Delhi	West Bengal & Assam.
২৩	Barua, Rai Bahadur K.L.	Early History of Kamarupa.
২৪	Tod, James.	Annals & Antiquities of Rajasthan.
২৫	Majumdar, R. C. Raychaudhuri, H. C. & Datta, Kalikinkar.	An Advanced History of India
২৬	Panikkar, K. M.	A Survey of Indian History.
২৭	The Tourist Division, Ministry of Transport.	Guide to Khajuraho.

	রচয়িতার নাম	পুস্তকের নাম
২৮	Eliky Zannas	Khajuraho Text & Photographs with a Historical Introduction by Jeannie Auboyer.
২৯	Roy, Prof N. C.	ভারতবর্ষের ইতিহাস
৩০	নাগ, ডঃ কালিদাস	স্বদেশ ও সভ্যতা
৩১	ঘোষ, বিনয়	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি
	সরস্বতী, সরসীকুমার	পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্যকলা
৩২	বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস	বাঙ্গালার ইতিহাস
৩৩	রায়, নীহাররঞ্জন	বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব
৩৪	ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ	রাজকাহিনী
৩৫	Munshi. K. M	Somnath, The Glory of Gujrat.
৩৬	বঙ্গবাসী সংস্করণ	স্কন্দ পুরাণম্। কাশীখণ্ডম্।
৩৭	ঐ	স্কন্দ পুরাণম্। উৎকল খণ্ডম্।
৩৮	ঘোষ, জ্যোতিশচন্দ্র	ভারতের দেব-দেউল।
৩৯	তর্কালঙ্কার, জগন্মোহন	মহানির্বাণতন্ত্রম্

নির্দেশিকা

গ

ন

ষ

স

অভিমত : মন্দিরময় ভারত প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের

শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্ত দাসের অভিমত

শ্রীঅপূর্বরতন ভাদুড়ী তাঁহার সমগ্র জীবনের ভারত-পরিভ্রমণ সঞ্জাত অভিজ্ঞতার দ্বারা এই অপূর্ব "মন্দিরময় ভারত" নির্মাণ করিতেছেন। ইহার প্রথম ভাগ দুই বৎসর পূর্বে ১৩৬৪ সালের আশ্বিন মাসে এবং দ্বিতীয় ভাগ বর্তমান বর্ষের পূজাবকাশের পর প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ভাগে দ্রাবিড় বেসর ও কাশ্মীর পদ্ধতিতে নির্মিত প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ মন্দিরের এবং দ্বিতীয় ভাগে ভারতের সর্বত্র ছড়ানো প্রায় যাবতীয় গুহামন্দিরের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে নাগরপদ্ধতিতে নির্মিত মন্দিরগুলির কথা সন্নিবিষ্ট হইবে। আমরা সাগ্রহে এই শেষ ভাগের প্রতীক্ষায় আছি।

ভারতবর্ষের মন্দির সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ ইংরেজী বাংলা ও অন্য ভারতীয় ভাষায় আছে। সেগুলির অধিকাংশই চিত্রপ্রধান এবং অনেকগুলি গাইড-বুকের মত। "মন্দিরময় ভারত" একটু স্বতন্ত্র; গ্রন্থকার প্রাচীন ঐতিহ্য ও স্থাপত্যরীতির ভিত্তির উপর সাহিত্যের মাধ্যমে কথার উপর কথা গাঁথিয়া মন্দিরগুলিকে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি একাধারে ঐতিহাসিক ও কবির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে তথ্যসম্বলিত হইয়াও "মন্দিরময় ভারত" সুপাঠ্য হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মন্দিরগুলিতেই ভারতের অমর প্রাণসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, লেখক তাঁহার গ্রন্থে অতিশয় দরদ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই অনাস্বাদিত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন। প্রথম ভাগে প্রায় অর্ধশত মন্দির ও দ্বিতীয় ভাগে প্রায় কুড়িটি গুহামন্দিরের কথা ও কাহিনীর মধ্যে দিয়া লেখক গোটা ভারতবর্ষকেই নবীন পাঠকের চোখের সামনে প্রাচীন গৌরবে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। যাঁহাদের সুযোগ আছে, তাঁহারা উৎসাহিত হইবেন এবং যাঁহাদের সুযোগ নাই তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন। "মন্দিরময় ভারত" সম্পূর্ণ হউক, ইহাই কামনা করি। (শনিবারের চিঠি : মাঘ, ১৩৬৬)

বন্ধুবরেষু,

৬ মাসের জন্য দিল্লী বদলী হওয়ায় আপনার সুন্দর বইখানির অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য পাঠাতে দেরী হল—ক্ষমা করবেন। প্রবাসীতে গিয়ে যোগেশ বাগলকে বই দিন তিনি বড় রকমের আলোচনা করতে পারবেন।

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী বহু পরিশ্রম ভ্রমণ ও অর্থব্যয় করিয়া তাঁর "মন্দির-ময় ভারত" (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রকাশ করেছেন। প্রথম ভাগে তিনি দ্রাবিড় বেসর ও কাশ্মীর পদ্ধতিতে গড়া প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির মনোজ্ঞ বিবরণ ছেপে বহু প্রশংসা লাভ করেছেন।

দ্বিতীয় ভাগে দেখি ২৮০ পাতার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ গুহামন্দিরগুলির তথ্যপূর্ণ বর্ণনা। খৃঃ পূঃ ২ শতকের ভাজা-বিহার চৈত্যের পশ্চিমী নির্মাণ শৈলী দিয়ে শুরু করে পূর্ব ভারতের উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে উৎকীর্ণ গুহামন্দিরগুলির সন্ধান দিয়ে গ্রন্থকার আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। অজন্তা ও ইলোরার আনুপূর্বিক আলোচনা করে সাধারণ নরনারীকে তীর্থযাত্রায় প্রোৎসাহিতও তিনি করেছেন। সেজন্য তাঁর সাধু-বাদ করি ও তিনি শীঘ্র তাঁর ভারত শিল্প পরিক্রমা শেষ করে ধন্য হোন এই প্রার্থনা জানাই। ইতি—

শুভার্থী

শ্রীকালিদাস নাগ

মন্দিরার সম্পাদক ও The Indian P. E. N.-এর সভ্য শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত

ভারতীয় সভ্যতা ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তার সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র এবং নৃত্যকলারও প্রধান অবলম্বন ধর্ম। দেশের বিভিন্ন স্থানে গ'ড়ে উঠেছিল তীর্থ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভারতবাসী অনুভব করেছে দেব মহিমা, পবিত্র মন্দিরে রচনা করেছে বন্দনার অর্ঘ্য। ভারতের

সংস্কৃতিকে জানতে হলে এই মন্দিরগুলির সঙ্গে পরিচয় স্থাপন আবশ্যক। এ পর্যন্ত কোনও একখানি বইয়ে সকল মন্দির সম্বন্ধে তথ্যাবলী সযত্নে সংগৃহীত হয় নি। শ্রীযুক্ত ভাদুড়ী এই কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করেছেন। "মন্দিরময় ভারত"-এর প্রথম ভাগে তিনি অন্ধ্র, দ্রাবিড়স্থান, চালুক্যভূমি মহীশূর ও কাশ্মীরের মন্দিরগুলির বিবরণ এবং ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। আলোচ্য দ্বিতীয় ভাগে আছে সমস্ত গুহামন্দিরের বর্ণনা। তৃতীয় ভাগে থাকবে নাগরপদ্ধতিতে নির্মিত সব প্রসিদ্ধ মন্দিরের বৃত্তান্ত।

শ্রীযুক্ত ভাদুড়ীর এ গ্রন্থ সাধারণ ভ্রমণ কাহিনী থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। এতে 'কাহিনী' নেই, আছে সত্য ও তথ্য। ব্যক্তিগত ব্যাপারের উল্লেখ সামান্য আছে; তবে লেখক প্রধানতঃ মন্দির সমূহের সম্পূর্ণ বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন; কোন্‌টি কোন্ পদ্ধতিতে লিখিত, কে কবে নির্মাণ করেছিলেন, মন্দিরের কোথায় কি আছে, কোন মূর্তি বা চিত্রের কি তাৎপর্য—ইত্যাদি সমস্ত সংবাদ তিনি খুঁটিনাটি করে পরিবেশন করেছেন। তার জন্য, শুধু চোখে দেখা নয়, পড়াশুনাও তাঁকে করতে হয়েছে বিস্তর। জানতে হয়েছে ভারতীয় স্থাপত্যের বিভিন্ন কলাকৌশল, নানাযুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস এবং প্রচলিত কথা, গাথা ও কিংবদন্তী।

দ্বিতীয় ভাগে গুহামন্দির শ্রেণীকে তিনি প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন; দাক্ষিণাত্য, কলিঙ্গ ও মালব। দাক্ষিণাত্যে পড়েছে নাসিক, কার্লি, ভাজা, বিদিশা কানেরী, যোগেশ্বরী, এলিফ্যাণ্টা, অজন্তা, ঔরঙ্গাবাদ, ও এলোরার বিভিন্ন চৈত্য, বিহার, ও দেউল। কলিঙ্গে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি। আর মালবে বাঘ-গুহা।

অষ্টম পরিচ্ছেদে 'অজন্তা'র আলোচনায় শুধু সাধারণ বর্ণনা দিয়ে বা দাক্ষিণাত্য অংশের ক'টি গুহা মন্দির আছে. তার উল্লেখ করে লেখক ক্ষান্ত হননি। জাতক-অবলম্বনে অঙ্কিত প্রতিটি চিত্রের অবলম্বিত কাহিনী বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। দর্শক এ বইয়ের সাহায্যে চিত্রগুলির তাৎপর্য সহজে বুঝতে পারবেন। দশম পরিচ্ছেদে এলোরার বৃত্তান্তেও তিনি পূর্ব ইতিহাস জানিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্তিমালার প্রত্যেকটির অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

গ্রন্থের শেষ দিকে, 'মালব' অংশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে গুহামন্দির সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশের পরিচয়। চার যুগে এই গুহামন্দির স্থাপত্য বিভক্ত: মৌর্য, হীনযান, মহাযান এবং তৎপরবর্তী যুগ। প্রতিযুগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে এই পরিচ্ছেদে সংকলিত হয়েছে।

লেখকের ভাষা আবেগময়, কবিত্বপূর্ণ। দু'একটি সামান্য মুদ্রাদোষ (যেমন, সর্বত্র কাব্যের আরম্ভে ক্রিয়াপদ ব্যবহার এবং একই বিশেষণের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ)—সত্ত্বেও তাঁর রচনা উপভোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী।

গ্রন্থকার পাঁচ ভাগে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিতে চান। অপরাপর ভাগ প্রকাশিত হলে ভারতীয় মন্দির সম্পর্কে এখানি সকল তথ্যের ভাণ্ডার স্বরূপ গণ্য হবে, তাতে সন্দেহ নেই। সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে বৃদ্ধ বয়সে তিনি যে এই অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, পাঠকবর্গের পরিতৃপ্তিই হবে তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সম্ভবতঃ অন্য পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা তিনি পোষণ করেন না। (মন্দিরা: পৌষ, ১৩৬৬)

MINISTER

Scientific Research and Cultural Affairs, India.

New Delhi, 20th December, 1959.

Dear Mr. Bhaduri,

Thank you for your letter of 9. 12. 59. and the two volumes of your book. "Mandirmoy Bharat." I have looked, through them with pleasure. They give a very fine running account of the temples in different parts. I think your book would have been even more attractive if you had given some photographs and also discussed some special features of the archaeology of these temples.

With kind regards.

Yours Sincerely,
Humayun Kabir.

যুগান্তর পত্রিকা, ১১. ১. ৬৭ বঙ্গাব্দ. ১. ৫ ৬০ খৃষ্টাব্দ

মন্দিরময় ভারত (দ্বিতীয় ভাগ) অপূর্বরতন ভাদুড়ী। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১২। মূল্য ছয় টাকা।

কিছুকাল আগে শ্রীভাদুড়ী রচিত "মন্দিরময় ভারত" প্রথম ভাগ পড়ে কৌতূহলী পাঠক সাগ্রহে এই দ্বিতীয় ভাগটি প্রকাশের অপেক্ষায় ছিলেন। মন্দির সংশ্লিষ্ট স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকারু সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু মর্মগ্রাহী দুর্লভ তথ্য এবং ইতিহাস এর আগে সম্ভবতঃ এভাবে বাংলা সাহিত্য সম্পদে রূপায়িত করা হয় নি। তাই প্রথম খণ্ডটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে লেখক বাঙালী পাঠকের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। প্রথম খণ্ডটিতে শ্রীভাদুড়ী দ্রাবিড়, বেসর ও কাশ্মীর পদ্ধতিতে নির্মিত যাবতীয় প্রসিদ্ধ মন্দির-গুলির বিস্তৃত বিবরণ সন্নিবদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয় ভাগটিতে আছে প্রায় সমস্ত গুহামন্দিরের কথা—গুহামন্দির দাক্ষিণাত্য, গুহামন্দির কলিঙ্গ এবং গুহামন্দির মালব। এই তিনটি অঞ্চলের প্রায় গোটা তিরিশেক গুহামন্দিরের শুধু ইতিহাস নয়, শুধু স্থাপত্য ভাস্কর্য-শিল্প-সৌন্দর্যও নয়—ভাষায় ব্যঞ্জনায় এবং প্রত্যক্ষগম্য বর্ণনায় এই গুহামন্দিরগুলির বিস্মৃতিবিলগ্ন মর্মকথাই যেন উদঘাটন করেছেন লেখক। ফলে এক একটি গুহামন্দিরের কথা এক একটি রসোত্তীর্ণ কাহিনীর মতই গভীর আগ্রহে পাঠ করার মত। একদা এই মন্দিরগুলি ছিল ভারতের এবং বৃহত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র, ছিল সভ্যতার শিক্ষার সংস্কৃতির আর বিশ্বাসের মহাগৌরবময় নিদর্শন। গভীর অনুভূতির দ্বারা লেখক সেটুকু উপলব্ধি করেছেন। তাঁর সেই উপলব্ধির ফল সার্থক। এ ধরনের গ্রন্থরচনা নিবিষ্টচিত্ত অনুশীলন এবং সাধনাসাপেক্ষ এবং সেই অনুশীলন ও সাধনালব্ধ বিবরণ এক একটি সার্মগ্রিক কাহিনীর আকারে রসোত্তীর্ণ করে তোলা আরো দুরূহ। এই দুরূহ কাজেই শ্রীঅপূর্বরতন ভাদুড়ী আশাতিরিক্ত সফল। প্রথম ভাগের মত এই দ্বিতীয় ভাগটি পড়েও পাঠক লেখকের সঙ্গে সঙ্গে এই গুহামন্দিরগুলিতে ভ্রমণের আনন্দ এবং রোমাঞ্চ লাভ করবেন। লেখককে আবারও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বিপুল গ্রন্থটিতে গুহামন্দিরগুলির চিত্র সন্নিবেশ চিত্তাকর্ষক।

তৃতীয় ভাগে লেখকের নাগর পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দিরের প্রকাশ ত্বরিত হোক।

দৈনিক বসুমতী ২৪. ১০. ৬৬ বঙ্গাব্দ. ৭. ২. ৬০. খৃষ্টাব্দ

মন্দিরময় ভারত (দ্বিতীয় ভাগ) অপূর্বরতন ভাদুড়ী। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা ১২। মূল্য ৬৲।

"দেশের ও জাতির সভ্যতার মাপকাঠি তার স্থাপত্য, তার ভাস্কর্য, তার চিত্রশিল্প-তার মূর্ত বিকাশ, পরিচায়ক তার অগ্রগতির, তার সাফল্যের, তার শ্রেষ্ঠত্বেরও। বর্ধিত হয় দেশের ও জাতির সভ্যতা, বাড়ে সংস্কৃতি, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, উন্নততর হয় তার স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর চিত্রশিল্প, লাভ করে সুন্দরতম রূপ।"

আলোচিত গ্রন্থের 'নিবেদন'-এর মধ্যে প্রারম্ভেই গ্রন্থকার এই সত্য-সুন্দর কথাগুলির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে এই সত্য-সুন্দর ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের স্বরূপ ভাষার মনোহর কৌশলে যে সকল লেখক আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন প্রত্যক্ষ দর্শনের তৃপ্তি দিয়ে, তাঁদের কৃতিত্বও বড় কম নয়। "মন্দিরময় ভারত"-এর লেখক অপূর্বরতন ভাদুড়ীর সে রচনা কৌশল যে করায়ত্ত, তা এই গ্রন্থের পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এ গ্রন্থ কেবলমাত্র ভ্রমণ বৃত্তান্ত নয়, ইহা ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণামূলক শৈল্পিক প্রকাশ।

ভারত যে মন্দিরময়, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? কিন্তু এই ভারতের বিভিন্ন অংশে মন্দির-শিল্পের যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, তা যেমন উপভোগ্য, তেমনি প্রকর্মীদের প্রযুক্তি কৌশল-গুণাঢ্য। ধর্মকে অবলম্বন করে কি অপূর্ব শিল্পকার্য ও কারুকলার নিদর্শনই না ফুটে উঠেছে এই মন্দিরগুলিতে। ভাদুড়ী মশাই এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে দ্রাবিড়, বেসর ও কাশ্মীরী পদ্ধতিতে নির্মিত ভারতীয় বিশিষ্ট বহু মন্দিরের পরিচয় দিয়েছেন এবং আলোচিত দ্বিতীয় ভাগটিতে পরিচয় দিয়েছেন প্রধানতঃ গুহামন্দির-গুলির। তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে এই গুহামন্দিরগুলি বিভক্ত হয়েছে। প্রথম, দাক্ষিণাত্যের গুহামন্দির, দ্বিতীয় কলিঙ্গ গুহামন্দির এবং তৃতীয় মালব গুহামন্দির। প্রথম অধ্যায়টির মধ্যে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে নাসিক, কার্লি, ভাজা, বিদিশা, কানেরি, যোগেশ্বরী, এলিফ্যাণ্টা, অজন্তা, ঔরঙ্গাবাদ ও এলোরার বিভিন্ন চৈত্য, বিহার ও মন্দির সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি গুম্ফাগুলি সম্বন্ধে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বাঘগুহা ও গুহামন্দির নির্মাণ সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন ভারতীয় মন্দির সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নি বললেও অত্যুক্তি হয় না। বহু হাফটোন চিত্রশোভিত এই গ্রন্থ অনুসন্ধিৎসু ভ্রমণকারীর ও বিদগ্ধ ব্যক্তি মাত্রেরই অনুরঞ্জন করবে।

The Indian P. E. N. February—1960
The Literary Scene In India ; Bengali.

Among the recent publications in Bengali, *Mandirmoy Bharat* (Part II) by Shri Apurva Ratan Bhadhuri (M. C. Sarkar and Sons, Calcutta 12. Rs. 6·00) deserves special mention. It deals exhaustively with the caves and temples of Nasik, Bidisha, Kanheri, Elephanta, Ajanta, Ellora, Udaygiri, Khandgiri, Malwa Bagh and Pandab-ki-Gumpha among other monuments of historical and legendary interest, in a neat racy style depicting the writer's personal quest of beauty.

AMRITA BAZAR PATRIKA, Dated 8.5.60 : Bengali Books.

Mandirmoy Bharat (India—the land of Temples) in Bengali by Apurba Ratan Bhaduri, M. C. Sarkar & Sons Private Ltd. 14 Bankim Chatterji Street, Calcutta 12. Rs. 6·00

The volume under review is the second part of the famous book of travel by the author. Sri Bhaduri has travelled throughout this vast land of ours. He has seen the temples in particular and wherever he had gone he left no stone unturned to unearth the history of temples. Naturally his narrative has been full of historical facts and sometimes the reader may feel a little bored on account of the details of the dynasties associated with the history of the Temples.

But Sri Bhaduri is a matter of fact man and has never tried to build up stories on the travel-talk. Here he is strikingly different from the authors of "Maha Prasthaner Pathey." "Marutirtha Hinglaj" or "Ramyani Bikshya."

Those who love facts and want the truth to be told will surely reap benefit from this book. It deals with the cave temples of the South, cave temples of Orissa and Malav and contains many beautiful photographs of cave paintings, temples and sculpture work. It is a useful book of reference. Every library should have the book to interest readers to know about our land, our culture and glorious heritage.

পুস্তক পরিচয়

[গত ২৮শে মার্চ রাত্রি ৯-১৫ মিনিটের সময় কলিকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত। প্রচার করেছেন—শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী।]

মন্দিরময় ভারত—(দ্বিতীয় ভাগ)—অপূর্বরতন ভাদুড়ী। পরিবেষক: এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—ছয় টাকা।

'মন্দিরময় ভারত' একখানি ভ্রমণের বই। এটি দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম ভাগে লেখক দ্রাবিড়, বেসর ও কাশ্মীর পদ্ধতিতে নির্মিত সমস্ত প্রসিদ্ধ মন্দিরের পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য খণ্ডে তিনি দাক্ষিণাত্য, কলিঙ্গ, মালবের সমস্ত গুহা-মন্দির বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। নাসিক, কার্লি, ভাজা, বিদিশা, কানেরি, যোগেশ্বরী, এলিফ্যাণ্টা, অজন্তা, ঔরঙ্গাবাদ এলোরা, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, বাঘ প্রভৃতি স্থানের চৈত্য, বিহার, গুম্ফা ও মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে আছে।

ভারতবর্ষ স্থাপত্য বিদ্যা, অঙ্কনকলা ও মূর্তিশিল্পের জন্য চিরকাল প্রসিদ্ধ। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে কত শিল্পী, কত কবি, কত ভক্ত তাঁদের ধর্মাচরণের মাধ্যমে তাঁদের শিল্পী-মনের গোপন কথা লিখে গিয়েছেন। তার ফলে ভারতের দিকে দিকে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মঠ, মন্দির, বিহার, চৈত্য ও গুম্ফা। উত্তুঙ্গ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা

পর্যন্ত সেই সব দেব-দেউলের, শোভা ও মহিমা দেখে আজও জগতের সৌন্দর্য-পিপাসু রসিকজনের মন তৃপ্ত হয়। ভ্রমণকারীদের মধ্যে অনেকেই এই রূপময় ভারতের অপরূপ কীর্তিকাহিনীর কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখে গিয়েছেন। এই সব অভাবনীয় সৃষ্টি কর্মের মধ্যে শুধু যে আমরা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন পেয়ে থাকি তা নয়, এদের অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কত চিত্র, কত কাব্য, কত কাহিনী-বুদ্ধের অসংখ্য জন্মকথা, কত রাজসভা, কত রাজনর্তকীর অনুপম নৃত্যকলা, কত শোভাযাত্রা। এই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে দর্শকের মন চলে যায় কোন অমরাবতীর স্বপ্নলোকে।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সেই সৌন্দর্যলোকের সংবাদ পৌছে দিয়েছেন আমাদের কাছে। সেজন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ইতিহাস, কাহিনী, শিল্পকর্মের বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব, ভৌগোলিক পথ-পরিচয় সবই তিনি সন্নিবেশিত করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে।

বইটিতে কয়েকটি আলোকচিত্রও স্থান লাভ করেছে। তাতে পাঠকেরা সহজেই চৈত্য ও মন্দিরগুলির সৌন্দর্য উপভোগে সক্ষম হইবেন।

অমৃত ২২. ১২. ১৯৬১

মন্দিরময় ভারত (দ্বিতীয় ভাগ)—অপূর্বরতন ভাদুড়ী প্রকাশক: এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম ছয় টাকা।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে এই গ্রন্থের লেখক অপূর্বরতন ভাদুড়ী তারই বিবরণী দান করেছেন। প্রথম খণ্ডে শ্রীযুক্ত ভাদুড়ী দ্রাবিড়, বেসর ও কাশ্মীর পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে বর্ণনা করেছেন ভারতের সমস্ত গুহামন্দিরের। নাগর পদ্ধতিতে নির্মিত প্রায় সমস্ত মন্দিরের বিবরণ দিয়ে তিনি তৃতীয় ভাগ রচনা করবেন। লেখক স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশে মন্দিরের গঠন আর তার নির্মাণ পদ্ধতি এবং তার ক্রমোন্নতি

বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে সমকালীন ইতিহাস, সামাজিক রীতি-নীতি ও জীবনযাত্রার প্রণালী ও গুহামন্দির নির্মাণের ধারাবাহিক বিবরণী দান করেছেন। সব যে লেখক স্বচক্ষে দেখেছেন তা নয়, যা দেখেছেন এবং যা দেখেননি সব নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে গুহামন্দির—দাক্ষিণাত্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ে গুহামন্দির—কলিঙ্গ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে গুহামন্দির—মালব নিয়ে লেখক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ঐতিহাসিক পটভূমিকায়। এই গ্রন্থে কয়েকটি ছবি আছে বটে তবে চিত্রের পরিমাণ আরো কিছু বেশী থাকা উচিত ছিল। এই জাতীয় গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অধিক সংখ্যায় নেই। অথচ এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই লেখককে অভিনন্দন জানাই। ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর।